দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ও

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের কবিতার বই :

অবতামসী, আবার রাত্রি ২·০০

কবিতাভবন

নিরন্ত নির্ঝর ৩·০০

শতভিষা প্রকাশনী

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী ২·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

ভবিষ্যের শুনি পদপাত

অনিরুদ্ধ এবার যে বাড়িটা নিয়েছে মলয়ার জন্য সেটা একেবারেই সমুদ্রতীরে। আজ ক'দিন হ'লো ওরা এসেছে এখানে। প্রথম দিনকয়েক মলয়াকে কিছুটা সজীব দেখিয়েছিলো কিন্তু আজ আবার ওর জ্বর উঠেছে।

জীবনার্ত যেমন ক'রে ভালোবাসে মৃত্যুকে—অনিরুদ্ধও তেমনি ভালোবাসে মলয়াকে। আর সেই অদ্ভুত এক ভালোবাসার রসনিষেকে আজো বেঁচে আছে মলয়া। অনিরুদ্ধের মৃত্যুর মতোই আজো বেঁচে রয়েছে সে এবং তার শোষক শিকড় চালিয়ে দিয়েছে একেবারে স্বামীর জীবনের মূলে, অস্তিত্বের মর্মকোষে যেখান থেকে মূলোৎপাটন বুঝি বা কল্পনাতীতই!

বারান্দায় ব'সে ব'সে রাত্রি গভীর হয়, তবু ঘুম আসেনা অনিরুদ্ধের চোখে। জ্যোৎস্না নামে সমুদ্রতীরে, অর্থহীন মনে হয় সব। হু হু শব্দে হাওয়া বয়ে যায়। অনিরুদ্ধ চেয়ে থাকে এই জ্যোৎস্নার মধ্যে—পলক পড়ে না চোখে। অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের শব্দ আসে কানে। উতলা হ'য়েছে রাত। চেয়ে দেখলো ঘরের দিকে, মনে হ'লো মলয়া ঘুমোচ্ছে, মনে হ'লো জগৎ ঘুমোচ্ছে, সব ঘুমোচ্ছে—জীবন নেই। চতুর্দিক জুড়ে প'ড়ে রয়েছে দিগন্তের শব—সমুদ্রের মতোই আনীল, নিঃসীম রহস্যে! আমাদের এ-গ্রহে এই যেন প্রথম নামলো এ রকম রাত এমন ক'রে; একে নতুন ক'রে চিনতে চায় অনিরুদ্ধ—এই সুদূর রাতকে, এই মেদুর রাতকে, এই উতল রাতকে, এই উজল রাতকে। ওদিকে ও-ঘরের অনুতল বুক মৃদুতার তাল দেয় অবগাঢ় ঘুমে! ঘুমন্ত মলয়ার অনুতল বুক! ওর স্রষ্টা যদি দিতেন ওর দু'টি কালো চক্ষু ভ'রে চিরনীল চিরঘুম আশীর্বাদের মতো! মুখে অন্ততঃ মলয়া বলে ও নাকি তাই-ই চায়। সত্যি ও চায় মরণ? তাছাড়া আর কী-ই বা চাইতে পারে ও? আর আমিও··· আমিও কি তাই চাই না? সব বারের মতো এবারেও সে প্রশ্নটাকে সভয়ে এড়িয়ে গেলো।

সৈকতে বুক দিয়ে ঢেউগুলো গুমরে মরে আছাড় খেয়ে। ওর অশান্ত মনেও আজ গুমরানি যেন থামতে চায়না। সে শুনতে পাচ্ছে জলের বুকে ডাক ভেসেছে, বলছে—এসো, স'রে এসো, বোসো কাছে, আরো ··আরো কাছে। গলা ডুবিয়ে কথা বোলো কেউ শুনে ফ্যালে পাছে! চাঁদের আলোও ডাকে যেন, বলে—বেরিয়ে এসো, নিচে নেমে এসো। এসো নেমে যেখানে ছায়ার আবিলতা নেই।

বড়ো অদ্ভুত লাগে এই সব প্রলাপী মনের আজগুবি কল্পনা অসম্বদ্ধ চিন্তার জঞ্জাল ঘাঁটতে, বড়ো অদ্ভুত লাগে।…সে সিঁড়ির দোর খুললো ‥নেমে গেলো নিচে…সদর দোর খুললো…নেমে গেলো কম্পাউণ্ডের মধ্যে…গেট পার হ'য়ে গিয়ে দাঁড়ালো সিকতাভূমিতে, অনর্গল হাওয়াতে বিস্তীর্ণ মুক্তির স্বাদ লাগলো তার সারা গায়ে; মনে হ'লো সকল বন্ধন খ'সে প'ড়ে গিয়েছে শুষ্ক, জীর্ণ, ভঙ্গুর লতাডোরার মতো।

সব কিছু সঁপে দিয়ে অভ্যস্ত সংকীর্ণতার কাছে, সব কিছু ফেলে রেখে পিছনে, সে এসে দাঁড়ালো উন্মুক্ত আকাশের তলায়—যেখানে শুধুই শূন্য, ছুটী অসীম, কর্তব্য নেই, চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই কিন্তু বেগ আছে জীবনে যাতে ডানা ছড়িয়ে ভেসে পড়তে পারা যায় ঐ নিঃসীম শূন্যে!

সাগরের কূলে কূলে জল উছলায়, আলো উছলায় আকাশের কূলে কূলে। এই বন্যার মাঝখানে তবু কেমন ক'রে অপরিসীম স্পর্ধাভরে শূন্যের মরুদ্বীপ জেগে আছে মনে? শান্তি, শান্তি, শান্তি কোথায়? শান্তি নেই কোথাও তবু ক্ষান্তি আছে জীবনে, সেই তো পরম লাভ। সুপ্তি নেই, তৃপ্তি নেই সাগরে; শতবাহু মেলে তাই সমুদ্র অনির্দিষ্টকে কাছে পেতে চায়। তৃপ্তি নেই চাঁদে, তৃষ্ণা জেগে রয় জ্যোৎস্নায়…এই অতৃপ্তির শেষ বুঝি খালি অবলুপ্তির মধ্যে? আত্মা তার কেঁদে ওঠে—কোথায় কোথায়! উচ্ছ্বসিত অন্তহীন সমুদ্রের দিকে চায়, মনে হয় তৃপ্তি রয়েছে যেন ওরই অতল তলে অবলুপ্তির কুক্ষিগত হ'য়ে। পলকে চেতনা যেন উঁকি মেরে যায়, অমনি সে মনে মনে বলে—কী এ সব পাগলামি! ফিরে গিয়ে সে এখন কী করবে? কী করবে সারা রাত? বাসবীর চিঠি পড়বে? মলয়া ঘুমিয়েছে! উঃ কী তৃষ্ণা! সামনে সীমাহীন জল—ছলনায় লবণাক্ত—উথলে উঠছে স্পর্শের বাইরে। যেমন নিঃশব্দে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে গিয়েছিলো তেমনি নিঃশব্দেই ফিরে এলো। শব্দ করলো না এতোটুকুও পাছে মলয়ার ঘুম ভাঙে!

মলয়ার আবার জ্বর হ'য়েছিলো আজ। দুত্তোর ‥

সামনে সুবিশাল জলধি তবু তৃষ্ণার এক অঞ্জলিও জল নেই—সুধু লবণাক্ত ছলনা অবিরল ওথলাচ্ছে স্পর্শের বাইরে।

…বাসবীর চিঠিগুলো সে ছিঁড়ে ফেলবে।

খুট্ খুট্ দু'টি শব্দ। অনিরুদ্ধ সন্তর্পণে স্যুটকেস খোলে। মাঝে মাঝে চোখ রাখে মলয়ার দিকে। মলয়া হয়তো একবার পাশ ফিরলো এই সময়ে। থেমে গেলো অনিরুদ্ধ—ওকে খানিক লক্ষ্য করলো—মলয়া ঘুমোচ্ছে ঠিকই—

জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে প'ড়েছে ওর কোলের কাছে। অনিরুদ্ধ চিঠির তাড়াটা বের ক'রে আনলো, বসলো বারান্দার চেয়ারটায়। এ চিঠিগুলোই তার জীবনের সব চেয়ে গোপন সম্পদ্—যক্ষের মতো এই গুপ্তধন এতদিন নিভৃতে রক্ষা ক'রে এসেছে ; এখন কিন্তু আর নয়। এগুলো এখন অর্থহীন, আজকের এই রাতের মতোই অর্থহীন অনিরুদ্ধের আজকের জীবনে।

এক একখানি চিঠি নেয়, কুচি কুচি ক'রে ছেঁড়ে আর সেগুলো ছেড়ে দেয় হাওয়ায়—এ যেন তার একটা খেলা! এই খেলার নেশায়, নিজেকে আঘাত করার নেশায় নিজেই মেতে ওঠে। জীবনের যা সব চেয়ে প্রিয়, এতদিন যা সে মলয়ার চোখের অন্তরালেও রক্ষা ক'রে এসেছে তাই সে আজ কুচোকুচো ক'রে ছেড়ে দিতে লাগলো এলোমেলো হাওয়ায়। হাওয়ায় ভর ক'রে তারা এক ঝাঁক পতঙ্গের মতো ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নামতে লাগলো, তারপর কে কোথায় চলে গেলো উড়ে তাই একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। শেষচিঠিটা পর্যন্ত এইভাবে উড়িয়ে দিয়ে এসে অনিরুদ্ধ যখন বসলো চেয়ারে তখন তার অবস্থা অনেকটা নেশা-ছুটে-যাওয়া মাতালের মতোই নির্জীব। আপন খেয়ালে অনিরুদ্ধ কতোক্ষণ বসে আছে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অথচ লক্ষ্যই করেনি শীর্ণ ক্লান্ত একটি ছায়া কখন নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে ঘর থেকে বারান্দায়।

স্তব্ধতা যেন বেজে ওঠে—ঘুমোবে না?

অনিরুদ্ধ চমকে উঠে বলে—অ, ঘুম তোমার ভেঙে গেলো বুঝি? যা হাওয়ার দাপট!

মলয়া অনিরুদ্ধের সামনে আরো এগিয়ে আসে, ওর চলার ছন্দেও যেন ঘুম আছে এত মৃদু। পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় ওকে আরো পাণ্ডুর দেখায়।

অনিরুদ্ধের কাঁধে হাত রেখে মলয়া বলে—বলো তো কেন ঘুমোওনি আজ?

—কেন আবার—এম্নি। ঘুম হ'লো না।

—কেন হ'লো না, কী এত সব ভাবছো বলো তো?

মলয়ার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থাকার পর অনিরুদ্ধ ব'লে ওঠে—কিছু না, রাত দেখছিলাম।

—বেশ, তুমি তাহ'লে রাত ছাখো, আর আমি তোমায় দেখি, কেমন? পাশে একটু জায়গা দেবে?

—একটা চেয়ার এনে দিই দাঁড়াও। কিন্তু এত হাওয়া কি ভালো তোমার পক্ষে?

—হাঁ ভালো। কোথা যাচ্ছো?

—চেয়ার আনি একটা। তুমি ওটাতেই বোসো।

—না, এসো এতেই কুলিয়ে যাবে।

ব'লে মলয়া অনিরুদ্ধের হাতখানা হাতের মধ্যে নেয়, বলে—একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে বড়ো, গাইবো ?

—গাও, কিন্তু অযথা পরিশ্রম হ'বে যে ?

—কিচ্ছু হ'বে না ভয় নেই মরবো না বরং আরো পরমায়ু বেড়ে যাবে এবং আরো ভোগাবো।

মলয়ার ঠোঁটে ম্লান একটুখানি হাসি মিলিয়ে যেতে-না-যেতে গান ফুটে ওঠে—

এই, জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ
পাশে তোমার হ'বে কি আজ স্থান ?

জ্যোৎস্নামথিত ক'রে সুরের অমৃত ওঠে। রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যঞ্জনা ও সুরের হিল্লোল—দু'য়ে মিলে এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ আনে প্রাণে যা সুদূর সৌন্দর্য-লোকে চকিতে-দেখা লাবণ্যের মতো প্রাণ মাতিয়ে তোলে—যা প্রাত্যহিক পরি-মণ্ডল থেকে এত বিদূরিত, বিদেহী ও অচেনা তবু কিন্তু চেনা যায় দেহ দিয়ে নয়, দেহাতীতকে দিয়ে ;—যা এত দিব্য এত করুণ তবু অনামী বেদনায় এত অরুণ যে, অনুভুতির অস্পষ্টতার মধ্যেই এর যতটুকু শিহর, অরুন্তুদ বেদনার মধ্যেই এর অরুণিম পুলক। হাওয়ায় হাওয়ায় মলয়ার গান ভেসে যায় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বুকে, যে-সমুদ্র ঘনিয়ে আসে অনিরুদ্ধের হৃদয়ে, জ্যোৎস্নালীন বাতাসে যে-গান ভেসে যায় হিম-নীলিম আকাশে আকাশে, যে-আকাশ ঘন হ'য়ে আসে অনিরুদ্ধের বুকে, সংহত হ'য়ে থাকে ওর নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

...গান শেষ হ'য়ে যায় তবু তার প্রভাব ব'য়ে চলে দু'জনের নীরবতার মধ্য দিয়ে, সেই নীরবতার স্রোতে অনিরুদ্ধ কষ্টে কথা ভিড়ায়—'আজ কেন আবার তোমার জ্বর হ'লো ? আর রাত জেগো না চলো, ঘরে যাই।

মলয়া বলে—হোক গে। জ্বর নিয়ে আর ভাবতে পারিনা। আজকে এমন রাত।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ কী যেন মনে ক'রে জিগেস ক'রে ফেললো—মোটেই কি ঘুম হয়নি ? তুমি সমানেই জেগে আছো, না ?

—হ্যাঁ। দেখছিলাম তুমি কী রকম ছট্‌ফট্‌ করছিলে। অবশ্য আমিও ছট্‌ফট্‌ করছিলাম, তবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। যখন তুমি দোর খুলে বেরিয়ে গেলে সমুদ্রতীরের দিকে এত ভয় করছিলো একলাটি। শিয়রের খোলা জানলাটা দিয়ে দেখছিলাম তুমি বেরিয়ে চ'লে গেলে, আবার ফিরে এলে।

—তারপর—তারপর কী করলাম ?

মলয়ার শাদা দাঁত পাৎলা ঠোঁটের ফাঁকে একবার ঝিকিয়ে ওঠে, শুকনো শুকনো মুখখানিতে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রে মলয়া বললো—তারপর···কী আর করবে? এখানে এলে, এসে বসলে।

—এই শুধু? না বলো, বলো। তারপর কী করলুম? বলো।

মলয়ার হাতখানা ধ'রে অনিরুদ্ধ উত্তরোত্তর চাপ দিতেই থাকে আর বলতে থাকে—বলো, বলো। মলয়া কিছুক্ষণ সহ্য করতে করতে 'উফ', ক'রে ওঠে, বলে—লাগে না আমার? অনিরুদ্ধের কানে কিন্তু সেকথা ঢোকে না সে ক্ষিপ্তের মতোই তখনো ব'লে চলেছে—বলো, বলো, বলো।

বেদনায় চোখে জল এসেছিলো মলয়ার, সে বললো—তুমি আমায় মারছো? মলয়ার প্রশ্নের চাবুক খেয়ে অনিরুদ্ধ মুহূর্তেই যেন সচেতন হ'য়ে ওঠে, বলে—কই মলয়া? না তো, কী বলছো তুমি?—না, না, না···

মলয়া তার ব্যথা-কাতর হাতখানি তুলে ধরে অনিরুদ্ধের চোখের সামনে। হাতখানি নিয়ে এবার খুব আদর করতে থাকে অনিরুদ্ধ, বলে—তোমার লেগেছে খুব, না মলয়া? আমি বড় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, অতোটা খেয়াল করিনি।

মলয়া অনিরুদ্ধের সেকথার কোনো জবাব দেয়না, একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—তুমি যে অসুখী সেকথা তুমি ঢেকে রাখতে পারো নি আমার কাছে···যাই মনে করো না কেন! সে চেষ্টাও তুমি আর কোরো না বুঝলে? মন আরো অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়বে দিন-দিন।

মরীয়া হ'য়েই সরাসরি জিগেস ক'রে ফ্যালে অনিরুদ্ধ—চিঠিগুলো তুমি পড়েছো তাহ'লে?

—যদি বলি পড়েছি তাহ'লে কি খুশি হ'বে?

—কেন নয়? সবই জানো যখন ··

—তুমি কিন্তু বাসবীকে বিয়ে না ক'রে বড়ো ভুল করেছো। সুখের মুখও দেখতে পেলে না, রোগের সেবাই করলে খালি।

নিরুত্তর অনিরুদ্ধ বারান্দায় পায়চারি করতে সুরু ক'রে দেয়।

—আচ্ছা তোমাদের বিয়ে কেন হয়নি বলো তো? প্রতিবন্ধক কী ছিলো?

—বাবার অভিপ্রেত ছিলো না। জানোই তো তাঁর কী রকম জ্যোতিষে বিশ্বাস ছিলো। আমাদের দু'জনের গ্রহসংস্থান এমন নয় ব'লেই তাঁর ধারণা হ'য়েছিলো যে, মিলনের দ্বারা তার থেকে কোনো শুভ আসতে পারে। তাঁর সকল ধারণাকে সকল সময়ে সম্মানই করেছি কখনো তো অবাধ্য হইনি।

কিন্তু আমাদের এ মিলন থেকেও তো কোনো শুভ এলো না, বিশেষ ক'রে তোমার দিক থেকে বিচার করলে।

—না আসুক, বাবার ইচ্ছাপূরণ তো করেছি। একটু বিবিক্ত গলায় অনিরুদ্ধ বলে।

—আমায় যদি কেউ ঐ রকম চিঠি লিখতো তো আমি সেগুলো প'ড়েই বাকিজীবনটা কাটিয়ে দিতাম সুবোধ সুশীল ছেলের মতো—শেষটায় আবার বিয়ে ক'রে বসতাম না।—তা যিনি যতোই বলুন না কেন—ত্যাজ্যপুত্তুর করবার ভয় দেখালেও নয়।

নেহাৎ নিরীহ ঠাট্টায় মলয়া কথাগুলো বল্লেও অনিরুদ্ধের কানে সেগুলো তিরস্কারের মতোই শোনায়। অনিরুদ্ধ ব'লে ওঠে—বিয়ে ক'রে ভালো করিনি, নয়? আমায় বিয়ে ক'রে তোমার দিক থেকে কি কিছু অসুবিধে আছে মলয়া?

অনিরুদ্ধ কথাগুলো এমন ক'রে বললো যে চাঁদের আলোয় ওর চোখ হু'টো দেখে ভয় পেয়ে গেলো মলয়া, বললো—তুমি বড্ডো বেশি সিরিয়স্ হ'য়ে পড়ছো আজকাল। কোন্ কথা কী ভাবে নাও বুঝে উঠতে পারা যায়না সব সময়ে, আজকাল বড়ো ভয়ে-ভয়ে কথা বলতে হয় তোমার সঙ্গে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ ততক্ষণে আবার তার ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেছে, আর কোনো কথা আসে না তার কাছ থেকে। অন্য কথা পাড়বার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেও ফল হয়না কিছু, কোনো সাড়াই আসে না অনিরুদ্ধের কাছ থেকে। শেষটা আগের কথারই জের টেনে মলয়া বলে—কোথায় বিয়ে হ'য়েছে বাসবীর?

অনিরুদ্ধ বলে—সে শুনে তোমার লাভ? হ'য়েছে তোমার চেয়ে ভালো জায়গাতেই।

মলয়া বলে—ইচ্ছে করে তাকে একবার দেখি; আমাদের হু'জনের তো আর কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হ'লো না।

—হ'বার সম্ভাবনাও নেই এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে।

তবু মলয়া যেন জোর দেয় ভুল দিকেই যাতে আরো তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে ওঠে অনিরুদ্ধের মন তবু কিন্তু সে মলয়াকে রূঢ় কথা বলে না বড়ো একটা। সেখান থেকে উঠে অনিরুদ্ধ ঘরে চ'লে যায়। তারপর বেরিয়ে আসে ঘুমের ওষুধের শিশিটা নিয়ে, বলে—নাও, খেয়ে নাও একটা পিল। শোবে চলো ঘরে।

রোগ ও পথ্যের বিষয়ে মলয়া কখনো অবাধ্য হয় না স্বামীর বরং তৎক্ষণাৎ তাই করে। সেও বললো—তুমিও জেগে থেকো না, চলো।

হু'জনেই ঘরে যায়। স্বতন্ত্র শয্যা—ঘরের হুইপ্রান্তে হুইজনের। মৌন মুখে

যে যার শয্যাগ্রহণ করে কিন্তু কারো চোখেই ঘুম আসে না। জান্‌লা দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঘরে খাটের ওপর। সেই জ্যোৎস্নার মৌন অন্ধকার থেকে অনিরুদ্ধকে বহুক্ষণ লক্ষ্য করলো মলয়া। জেগে জেগে বিছানায় খানিক এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো অনিরুদ্ধ—বেরিয়ে গেলো বারান্দায়। চাঁদনী রাতের মাৎলামি তখনো একটুও কমেনি।

…ওর সুন্দরের নয়নপাতে ঘুম আসে না এই সুন্দর রাতে। জীবন তুচ্ছ মনে হয় মলয়ার। মনে হয় অকিঞ্চিৎকর এই রোগশয্যার জীবন। তবু বেদনার গুচ্ছ বুকে নিয়েই সে শুয়ে থাকে চিন্তার চিতায়—তৃণতুচ্ছ, অসহায় নিঃস্ব, দেবার কিছুই নেই, ভিক্ষা নেওয়ার ভারেই বিপর্যস্ত, স্বামীর করুণার ভিখারী শুধু।

মনের মর্মরে তার ব্যথার রক্তের কলঙ্ক—অনপনেয়। তার সুন্দরের মনের রাজ্যে—বাসবী যেখানে যায় বিজয়িনীর মতো সে সেখানে যায় ভিক্ষাপাত্র হাতে। হাসি দিয়ে মন জয় করার বলিষ্ঠতা নেই ব'লে কি কান্নার জাদু দিয়ে মন ভোলাবার এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা? নিয়ত করুণা উদ্রিক্ত ক'রে সে তার স্বামীর পাশের স্থানটি নিরাপদ ক'রে রেখেছে সত্য, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টার গ্লানিতেই যে ভ'রে উঠলো জীবন! তাদের দাম্পত্য-বন্ধন যে শিথিল নয় এটুকু মলয়া জানে এবং সেইসঙ্গে এও বোঝে যে তার প্রতি স্বামীর প্রেমের চেয়ে অনুকম্পাই বেশি। স্বামীকে নইলে তার চলে না এক মুহূর্তও। কেবল বেঁচে থাকতেই স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করার অনেক কিছু আছে, অথচ বিনিময়ে দেবার মতো তার কিছুই নেই। নিজের এই অসহ্য দৈন্য মাঝে মাঝে ওর রোগজীর্ণ জীবনকে আরো দুর্বহ ক'রে তোলে! সুদূর উত্তরজীবনের সেই পথপ্রান্তের দিকে সে উৎসুক চোখে বেদনার উপশম খোঁজে, পথের যে-প্রান্ত মরণের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে আছে।

অন্ধকার থেকে লৌহজিহ্ব ঘড়িটা মলয়ার পিছনে অবিরত টিক্‌টিক্ করে—সময়ের ঢেউ গোনা চলে। মলয়া ভাবে, আচ্ছা, কী রকম সেই বাসবী যে অনিরুদ্ধকে শান্তি দিতে পারতো? তার স্বামীর জীবনের সুখশান্তি সবকিছু অপহরণ ক'রে কোন্ অজ্ঞাত দূরত্বে ব'সে আছে এই বাসবী হয়তো নিজ পারি-বারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই। মলয়ার ইচ্ছে করে কল্পনার সেই বাসবীকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে ডেকে এনে খুব খানিক বকুনি দেয় এমন নিষ্ঠুরতার জন্য। সময়ে সময়ে মলয়ার মনে হয় যে, স্বামীর প্রতি সকল কৃতজ্ঞতার পালা শেষ হয় বারেকের জন্যও এই বাসবীকে ওর কাছে এনে দিতে পারলেই—কিন্তু

সেকি আর হ'বার ? বাসবী তো এখন ধনিগৃহিনী ! তাছাড়া তার নিজের অন্তরেরই কোথাও যেন দুটো কপিশ চক্ষু সদাজাগ্রত পাহারা দেয়—সে চক্ষু ঈর্ষ্যার।

লোকমুখে বাসবীর বর্ণনা যেখানে যা শুনেছে সেই সব জুড়ে জুড়ে মলয়া আজ বাসবীকে কল্পনায় স্বজন করতে চায়। শুনেছে বাসবী খুবই সুন্দর—খুব মানে শুধু খুবই নয়, খুব মানে অসামান্য, খুব মানে অত্যন্ত বিরল সেই সৌন্দর্য যা লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বাসবীর রূপের কথা মলয়া অনিরুদ্ধের মুখ থেকে জানবার চেষ্টা করেছে কতোবার কিন্তু অনিরুদ্ধ সে-সব প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি, এড়িয়ে গিয়েছে বরাবরই। তবে যতোদূর সে শুনেছে বাসবী বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ; তাহ'লে হয়তো তার শরীরের ডৌল এতদিনে মোটার দিকেই গিয়েছে। ধনিসমাজের সহবৎদুরস্ত মেয়ে যেমন হয়। গলা নাকি খুব মিষ্টি—গাইতে পারে সুন্দর—তারের যন্ত্র বাজাতে জানে—সে যে পিয়ানো বাজাতে ভালোভাবেই শিখেছিলো তার উল্লেখ এই চিঠিগুলোর মধ্যেই তো পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যচর্চা করতো আগে সেইজন্য দেহের গঠনও অতো সুন্দর হ'তে পেরেছে। তারপর আবার সাহিত্যের বাতিক—বিশেষ ক'রে সাহিত্য সম্পর্কে তো সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচি-সম্পন্না, অবসর সময়ে কাব্যচর্চা করে—চিঠিতেই বোঝা যায় সেটুকু ; সুন্দর সুন্দর চটকদার কথা বলতে পারে—আধুনিক কালের সাহসিকাদেরই একজন—প্রেম করতে ভয় পায়না—প্রেমপত্র লিখতে পারে আশ্চর্য চমৎকার। চিঠিগুলো ওর বাস্তবিকই সুন্দর—তবে পড়লে মলয়ার কেমন যেন একটু ঈর্ষ্যাই জেগে ওঠে বাসবীর ওপর। ঠিক তারই মতো ভালোবাসবে তার স্বামীকে অন্য একটি মেয়ে সময়ে সময়ে এইটাই মলয়ার অসহ্য মনে হয়। তার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে যে, অনিরুদ্ধ-বাসবীর প্রেম কতোদূর পরিণতি লাভ করেছিলো। কিন্তু একথা তো আর স্বামীকে জিগেস করা যায় না। বিয়ে হ'য়ে যাবার অব্যবহিত আগে বাসবী যে শেষ দু'খানা চিঠি লিখেছিলো অনিরুদ্ধকে, সে দু'খানা চিঠি অনিরুদ্ধের চিঠির বাণ্ডিল থেকে মলয়া সরিয়ে রেখেছে আজই। এতদিনের সঞ্চিত চিঠি ছিঁড়ে ফেলার সেই কি কারণ ?

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বাজলো। ঘুম আজ আসবে না। বাইরে অনিরুদ্ধ কী করছে ? বাসবীর চিঠিটা মলয়া লুকিয়ে রেখেছে বিছানার তলায়। উঠে বসলো মলয়া। বালিশ সরিয়ে চাদর সরিয়ে তোষকের ভাঁজের মধ্যে থেকে বের করলো চিঠি দু'খানা। বিছানা ছেড়ে উঠলো। ভোরের হাওয়া দিয়েছে। বুকের মধ্যে চিঠিটা নিয়ে বোরয়ে এলো বাইরের বারান্দায়।

নিঃশব্দে গিয়ে দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে অনিরুদ্ধ বারান্দার একটা আরাম-চেয়ারে। একটা করুণ ক্লিষ্ট আত্মসমর্পণ ওর ঘুমোবার ভঙ্গিতে। একবার ভাবলো, জাগাবে। আবার ভাবলো—থাক, ঘুমোক। আজ ঘুমোতেই পারেনি মোটে।

মলয়া আবার ফিরে এলো ঘরে, অনিরুদ্ধের টেবিলে ব'সে টেবিল-আলোটা জ্বাললো। তারপর বুকের মধ্যে থেকে বের করলো বাসবীর চিঠি। বারবার-পড়া-চিঠি আবার পড়তে লাগলো। শেষ চিঠিটায় লিখেছিলো বাসবী ঃ

এইবার আর চুপ ক'রে থাকার সময় নয় নিরুদা। সংকল্প আনো মনে, মনের দ্বৈধভাব কাটিয়ে বড়ো গলায় বলো—পথ আমাদের এক ও অভিন্ন। তাহ'লেই আমি নির্ভয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। দেখছো না বিনা দ্বিধায় চলার মতো সামনে আর পথ নেই। দু'মোহানায় এসে পেঁৗছেছি আমরা, এবার পথ বেছে নিতে হ'বে। মোড়ে এসে তো দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই, কারণ জগৎ চলছে, কর্মস্রোত ঠেলছে।

তুমি কর্তব্যনিষ্ঠ জানি। বাবার ওপর তোমার কর্তব্য রয়েছে কিন্তু নিজের ওপর কর্তব্য কি তার চেয়েও কম ? আর আমার ওপর কি তোমার কর্তব্য নেই ? তুমি না আমায় ভালোবেসেছো—ভালোবাসার মর্যাদা দিয়েছো ?

আমি তো বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু মুছে দিয়েছি মন থেকে যেখানে তোমায় রেখেছি শুধু—তুমিই আমার মান, তুমিই আমার ক্ষতিপূরণ, আমার অভিধেয়, পরিচয় সব···পড়তে পড়তে কী যেন ভেবে বিমনা হ'য়ে গেলো মলয়া, ওর হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে কখন্ চিঠিখানা প'ড়ে গিয়েছিলো খেয়ালও করেনি।

ঘড়ির বাজনা শুরু হ'তে অন্যমনস্কতা ভাঙলো। রাত চারটে। এরই মধ্যে এক ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। চিঠি দু'টো তুলে নিলো, ভাঁজ ক'রে ব্লাউজের মধ্যে রাখলো, টেবিল-আলোটা নিবিয়ে ফের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো, দেখলো আরাম-চেয়ারটা খালি প'ড়ে রয়েছে, অনিরুদ্ধ নেই। উঠে কোথায় গেলো অনিরুদ্ধ চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখছে এমন সময়ে অন্য দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কথা এসে মলয়াকে অবাক ক'রে দিলো—রাত তো আর বেশি নেই। এইবার শোও, আর কখন ঘুমোবে ?

শব্দ অনুসরণ ক'রে চোখ ফেরাতেই মলয়া দেখতে পেলো অনিরুদ্ধ বারান্দার রেলিং ধ'রে জ্যোৎস্না-স্নাত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে !

মলয়া এগিয়ে গেলো অনিরুদ্ধের দিকে, ওর দুই উরু তখন কে জানে কেন বড়ো থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিলো।

অনিরুদ্ধ সেটা যেন বুঝতে পেরেছিলো, সে ধ'রে ফেললো মলয়াকে, বললো—তুমি বড়ো কাঁপছো যে, ব'সে পড়ো চেয়ারে।

অনিরুদ্ধ চেয়ারে বসিয়ে দেয় মলয়াকে। ওর হাত লেগে মলয়ার বুকের মধ্যেকার কাগজ খড় খড় ক'রে ওঠে, মলয়া অনিরুদ্ধের হাতকে বাধা দেয়। চিঠিখানা ওর কাছ থেকে নেবার কোনো চেষ্টাও আর অনিরুদ্ধ করেনা, বরং অন্যদিকে স'রে যায়। চেয়ারেই বসে আবার।

সঙ্গে সঙ্গে মলয়াও নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধের চেয়ারটারই পাশে। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবার যেন তা দেখেও দেখলো না, কোনো কথাও বললো না।

—খুব রাগ করেছো তো আমার ওপর? ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলো মলয়া স্বামীর কাঁধ একটুখানি ছুঁয়ে, স্বামীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে।

উদাসীন বিষাদে অনিরুদ্ধ তার সুদূর দৃষ্টি সুদূরতর ক'রে ছড়িয়ে দিতে দিতে মুখ না ফিরিয়েই বড়ো অদ্ভুত গলায় বললো—না, শোওগে।

তবু শুতে যেতে পারলো না মলয়া। দেখতে দেখতে মরা জ্যোৎস্না ম'রে এলো আরো তবুও সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক।

বজ্রে তোলো ব্রজের বাঁশির সুর—কে তুমি ?

বিরূপাক্ষকে লেখা চিঠিখানা খামে ভরতে ভরতে অনিরুদ্ধ বলে—বিরূদাকে লিখে দিলাম আমরা শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। এখানকার জল-হাওয়ায় মলয়ার বিশেষ কিছুই উপকার হয়নি।

মলয়া বলে—চিঠি ফেলতে লোক যখন পাঠাচ্ছো আমারও একটা চিঠি আছে দিয়ে দাও এই সঙ্গে। প্রণতি-দির চিঠির জবাবটা লিখে রেখেছি ক'দিন কিন্তু ডাকে দেওয়া হয়নি। টেবিলের ওপর ঐ বইটার মধ্যে ছাখো পাবে।

—প্রণতি-দি ? মানে অদ্রীশদার স্ত্রী ?

—হ্যাঁ।

—কী লিখেছেন ?

—কী আর লিখবেন ? দুঃখ করেছেন এমন শিক্ষিত স্বামী, মাতাল নয়, দুশ্চরিত্র নয়, তবু স্বামী-ঘর ক'রে সুখী হ'তে পারলো না, সবই ভাগ্য ! আজকে ওদের দেখে কে বল্‌বে একদিন ওরাই প্রেম ক'রে বিয়ে ক'রেছিলো সকলের মতের বিরুদ্ধে। সেই বিয়ের আজ এই পরিণতি ? মা-বাপ একদিকে···নতি-দি আর একদিকে গেলো—কারো কথাই শুন্‌লো না। ওর বাবা নিত্য কতো বোঝাতেন বিরূপাক্ষ ভালো ছেলে, জলপানি-পাওয়া ছেলে, ডাক্তার হ'চ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে মোটা টাকা রোজগার করবেই। ও তোকে ভালোও বাসে—আমাদের ইচ্ছে তোকে ওর হাতেই দিই। কিন্তু ওঁর যে বরাতে দুঃখু পছন্দ হ'লে কেন ? উনি ওম্নি অদ্রীশবাবুকে পেয়ে ভুলে গেলেন, বিরূ-দাকে আর পছন্দ হ'লোনা—কবিগৃহিণী, কাব্য-প্রেরণা হ'তে সাধ গেলো। আজকে তাই ভালোভাবেই পস্তাচ্ছেন। বিরূদাও হয়তো আজও সেই দুঃখেই বিয়ে করলো না।

অনিরুদ্ধ বলে—বাইরে থেকে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু যাক্‌গে ও আলোচনা। কোন্ বইটার মধ্যে বলছিলে, এইটে ? লেখার টেবিল থেকে বইটা তুলে নেয় অনিরুদ্ধ।

মলয়া বলে—এবার লাইব্রেরী থেকে যে বইটা এসেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐটেই।

বই খুলে চিঠিটা বের ক'রে নিয়ে বইটা উল্টে-পাল্টে দেখলো অনিরুদ্ধ।

—আরে, অদ্রীশবাবুরই লেখা বই যে ! এ সব লাইব্রেরীতেও ওঁর বই রাখে নাকি ? সবটা পড়েছো ? কী রকম লাগলো ?

মলয়া বলে—ওঁর বই যেমন হয় তেম্নি। উনি তো মেয়েদের জন্যে লেখেন না। আমাদের মতো লোক ওঁর কী বুঝবো বলো ? তবে পড়তে

যতোটা ভালো লাগে তার চেয়ে অদ্ভুতই লাগে বেশি—তোমরা যাকে বলো ওরিজিনালিটি। দেখোই না তুমি প'ড়ে। আমার তো মনে হয় উনি যতোটা ভাবেন তার চেয়ে অনেক কম পাঠককে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সেইজন্যে ওঁকে আমরা অনেক কম বুঝি।

—ঐখানেই তো আমরা মনে করি অদ্রীশদার অনন্যতা। আমাদের মধ্যে যারা ওঁর গোঁড়া ভক্ত তারাও সবটা বুঝি না, বুঝতে চেষ্টাও করি না—কিন্তু যতটুকু বুঝি তাতেই স্তুতিমুখর হ'য়ে উঠতে বাধে না—বলতে আটকায় না—'বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম, জয় তব জয়!' গোছের উচ্ছ্বাস।

মলয়া বলে—কিন্তু বাস্তবতার দোহাই পেড়ে যে-সব লোক কলম ধরেন তাঁরাই কি খুব বেশি বাস্তব? রোমান্তিক যুগের লেখকদের চেয়ে কি কম রোমান্তিক? শুধু ভঙ্গীর পার্থক্য—কিন্তু ভঙ্গীই কি সব? দুজ্ঞেয়তাই কি ওরিজিন্যালিটি ব'লে চলে যেতে পারে? দুরূহতাই কি কখনো উদ্দেশ্য হ'তে পারে? বইটার প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে হলো তার স্রষ্টার বক্তব্য কেবল ব'লে যাচ্ছে—কেউ স্বাধীন নয়,—তারা লেখকের ব্যক্তিত্বের দ্বারা যেন বড়ো বেশি আচ্ছন্ন। তখনই মনে হয় একি তবে লেখকের নিজ মতবাদের কষ্টকৃত প্রচারপত্র? তাহ'লে এটা তো নিছক বিজ্ঞাপন-সাহিত্যের দামেই বিকিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ বলে—গেলোই বা মলয়া। এ যুগে বিজ্ঞাপন-সাহিত্য তো কিছু তুচ্ছ নয়। সাহিত্য যে প্রচারেরই বাহন। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের বড়ো অংশটাই প্রচার-সাহিত্য। এ-বিষয়ে আর অভিযোগ ক'রে লাভ নেই। অনেক চিন্তাশীল লোক অনেক ভেবে গেছেন এই নিয়ে—জীবনের জটিলতা যত বাড়বে, সমস্যা যত বাড়বে সাহিত্যের গতিও তত এদিকে যাবে।

মলয়া স্বীকার করে—তা বটে। কিন্তু এ যে মিথ্যে ভেক, আসলে মানুষটি রূপকথার দেশের মানুষ—বাস্তববাদীর মুখোশের আড়ালে মানুষটিকে চেনা যায়।

অনিরুদ্ধ বলে—তা জানি। অদ্রীশদার ঐ এক দুর্বলতা। তারপর ওঁর স্বকীয় আদর্শবাদের রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে আমাদের সামাজিক সকল সমস্যাকে প্রতিফলিত ক'রে দেখেন। তাই ওঁর দেখা সহজ দেখা নয়। প্রায়ই ওঁর দেখার সঙ্গে আমাদের মেলে না কারণ আমরা যে শাদা চোখে দেখি।

মলয়া বলে—তোমার কি মনে হয় তা জানি না আমার কিন্তু বরাবরই মনে হয়েছে যে ওঁর চরিত্রেরা কেউ স্বাভাবিক নয়—ঘটনা সংস্থাপনও সময়ে সময়ে অদ্ভুত; অদ্ভুত সব সিচুয়েশন তৈরি ক'রে অদ্ভুত সব পাত্রপাত্রী নিয়োগ করেন—সেটা অনেকস্থলেই চিত্তাকর্ষক হয় বটে স্বাভাবিক হয় না। এই বইটা তুমি পড়ে

দেখো মনে হ'বে এসব অদ্ভুত পাত্রপাত্রীর সৃষ্টি লেখকের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যেই। এরা কোনো অতীতের নমুনাও নয়, বর্তমানেও এদের অস্তিত্ব নেই, উত্তরকালেও এরা সম্ভাব্য নয়।

জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে অনিরুদ্ধ মলয়ার কথাগুলো শুনে যায়, শেষে মন্তব্য করে—ওঁর এ বইটা পড়িনি বটে তবে ওঁর অনেক বই-ই তো পড়েছি আগে তাতে আমার যা ধারণা হয়েছে সে অনুসারে ওঁর পাত্র-পাত্রীদের বেশির ভাগই তুমি-আমি যে অর্থে মানুষ সে অর্থে ওরা কেউ মানুষ নয়—মানুষের ছায়াভিক্ষেপ বল্‌তে পারো—প্রোজেক্‌শন।

এই পর্যন্ত ব'লে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ।

গেটে একটি ঘোড়ার গাড়ি থেমেছে।

অনিরুদ্ধ ব লে ওঠে—কেউ বোধ হয় এসেছে মলয়া। বলতে বলতে নিখুঁত সাহেবী-পোষাক-পরা লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন। ব্যস্তভাবে গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো অনিরুদ্ধ বাঙালী-স্বাস্থ্যবত্তার এই বিরল নমুনাটিকে। তাঁর একহাতে ছড়ি, অন্যহাতে একটি ছোট স্যুটকেস্।

বিছানায় দেহ ঢেলে মলয়া ক্লান্তভাবে জিগেস করে অনিরুদ্ধকে—কে এলো আবার এখানে?

—ঠিক চিনতে পারলুম না—এর আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

মিনিট দুই পরেই বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে হাজির হয়ঃ আমি ডাঃ বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আস্‌ছি। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।—আগন্তুক

অনিরুদ্ধ বেয়ারাকে ব'লে দেয়—বসা গে যা, বল আমি যাচ্ছি।

মলয়াকে বলে—বিরূদার কাছ থেকে লোক এসেছে চিঠি নিয়ে। দেখি গে যাই কী খবর।···একটা কামিজ গলিয়ে নেমে আসে একতলায় বসার ঘরে।

—আপনিই অনিরুদ্ধবাবু?

—হ্যাঁ আমিই। বলুন?

ভদ্রলোক পকেট হাতড়ে একটা চিঠি বের করলেন, বল্লেন—আপনাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে না হ'লে দু'একটা রাতের জন্যে আশ্রয় চাই, অনিরুদ্ধবাবু। আপনার বিরূদার সুপারিশ আছে সঙ্গে।

ভদ্রলোক চিঠিটা অনিরুদ্ধের হাতে দেন।

—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। ব'লে অনিরুদ্ধ চিঠিটা খোলে।

চিঠিটা ছিলো এই রকম :—নিরু, এই পত্রবাহক হচ্ছেন আমার বিপ্লবী বন্ধু শ্রীযুক্ত বন্ধু মিত্র—প্রদোষের গুপ্ত-সমিতির অন্যতর নিয়ামক। এঁকে যথাযোগ্য আতিথ্য দিও। ইনি সঙ্ঘের কাজেই ওখানে যাচ্ছেন। বড়জোর দিন দুই থাকেবেন। যা কিছু সাহায্য তিনি চান, আশা করি সে সকল কিছুরই অভাব তোমার ওখানে হ'বে না। অত্র পত্রে তোমায় শুভেচ্ছা জানাই—মলয়াকে আমার স্নেহ দিও।

চিঠিটা শেষ ক'রে অনিরুদ্ধ বলে—এ আর বেশি কি? এজন্য বিরূদার সুপারিশের দরকার করে না, কই বসুন? দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আপনার মতো মাননীয় ব্যক্তি আতিথ্য নেবেন সে তো ভাগ্য!

বন্ধু বলে—বসার সময় নেই, এখুনি বেরোতে হবে কাজে। আর বেশি সময় নষ্ট না ক'রে যদি ব'লে দেন কোন্ ঘরটায় চাবি দিয়ে যেতে পারি তো ভালো হয়। কারণ এই স্যুটকেস্‌টা রেখে যেতে হবে এখানেই।

অনিরুদ্ধ ইসারায় ডাকলো—আসুন আমার সঙ্গে, কোন্ ঘরখানা আপনার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক হয় দেখবেন চলুন।

দেখে শুনে দোতলার একখানা ঘর নির্দ্দিষ্ট হয়। স্যুটকেস্‌টি রেখে একটি নিজস্ব তালাচাবি লাগিয়ে বন্ধু বেরিয়ে যায়।

আসে দুপুর কেটে গেলে। অনিরুদ্ধ অতিথির জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে দুপুর শেষ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়।

অনিরুদ্ধ তখন ঘরেই ব'সে ছিলো বন্ধু যখন ফিরলো। মলয়ার সঙ্গে অনিরুদ্ধ কথা কইছিলো শুনতে পেলো সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তারপর দোরের তালাচাবি খোলার শব্দ।

মলয়া বললো—ঐ এলেন বোধ হয়।

অনিরুদ্ধ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। লজ্জিত হ'য়েই বলে—আপনার দেরি দেখে আমরা শেষ পর্যন্ত অতিথিকে অভুক্ত রেখেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলুম।

বন্ধু বালকের মতো হেসে ওঠে। কাছে এসে একেবারে কাঁধে হাত দেয়, যেন কতদিনের পুরোনো বন্ধু তারা। বন্ধুর মধ্যে অনিরুদ্ধ এমন কিছু পায় যাতে ক'রে সে চিনতে ভুল করে না তাকে একান্ত অন্তরঙ্গ ব'লে।

বন্ধু বলে—বেশ করেছো, ঠিকই করেছো। আমার জন্যে অনর্থক অপেক্ষা করলে আমাকে অপ্রস্তুতই করতে। আমার রোগা বোনটিকেও কি আট্‌কে রেখেছিলে নাকি?

—না, না, মলয়া খেয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ—দেরি করতে দিই নি।

—খেয়ে নেবে না তো কী করবে ভাই কতক্ষণ বসে থাকতে পারো তুমি এই সব অগস্ত্যপন্থীদের জন্যে? বেরিয়ে গেলে যাদের ফেরবার ঠিক নেই। সম্প্রতি আমারই এক লক্ষ্ণৌবাসী বন্ধু আমার এই নতুন নামকরণটি করেছেন। লক্ষ্ণৌ থেকেই ঘুরতে ঘুরতে এখানে আস্‌ছি। এবার যখন লক্ষ্ণৌ যাই আমার বন্ধুটি খুব অভিযোগ-অনুযোগ করে বল্লেন—সেবার সন্ধ্যের ঝোঁকে চিঠিলেখার অসুবিধে হচ্ছে ব'লে দু'টো বাতি কিনতে সেই যে বেরিয়ে গেলে—ফিরে আস্‌তে বছর ঘুরে গেলো। বল্‌লাম—আমার মতো ভবঘুরের বছর এম্নি করেই ঘোরে—এতে আর আশ্চর্য কী?—শেষ পর্যন্ত এসেছি তো ফিরে—ওই তো রক্ষে হ'য়ে গেছে কথা। বন্ধুটিও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বলেন—ফিরেছো বটে তবে বাতি দুটো আনোনি কিনে এবারেও। স্যুটকেস্ হাতড়ে খুঁজে-পেতে দেখে তবে স্বীকার করতে হয়—বাতি আনা হয়নি বটে ভুল হ'য়ে গেছে।

বন্ধুর কথায় অনিরুদ্ধ হাসতে থাকে। বন্ধু বলে—চলো বোনটিকে দেখে আসি। বিরু বলছিলো সে নাকি সব সময়েই ভোগে। অসুখটা কী বলো তো?

সংক্ষেপে পীড়ার পরিচয় দিতে দিতে অনিরুদ্ধ বন্ধুকে নিয়ে মলয়ার ঘরে ঢোকে। মলয়া শুয়েছিলো বই নিয়ে। যদিও সে সপ্রতিভ মেয়ে তবু অপরিচিত অতিথিকে দেখামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় সামান্য কাপড় তুলে দেয়।

অনিরুদ্ধ বলে—মলয়া, ইনিই প্রদোষদার সঙ্ঘের বন্ধু-দা—বন্ধু মিত্র। প্রদোষ-দার সঙ্ঘের ইনিই বাহুবল। আমরা এঁর নাম শুনেছি—চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য এই প্রথম হ'লো। মনে আছে বিরুদা বলতেন যে, সঙ্ঘ-সংগঠনে এঁর মতো দান আর কারো নেই, এমন কি প্রদোষদারও নয়।

বন্ধু অনিরুদ্ধকে বলে—চুপ করো, ভাই, নিরু। পরিচয়ের ঘটায় তুমি আমার বোনটিকে ভয় পাইয়ে দেবে দেখছি।

মলয়াকে বলে—না বোন, আমি এমন কেউ হোমরা-চোমরা নই। সংঘের প্রাথমিক সভ্য পর্যন্তও নই।

অনিরুদ্ধ হেসে যোগ করে—কিন্তু সঙ্ঘই এঁর সব।

মলয়া বলে—না দাদা, ভয়তো পাইনি। আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝি। আপনাদের মত ও পথ আমি জানি বলেই তো আপনাদের শ্রদ্ধা করি। ভয় তো করি নে আপনাদের।

বন্ধু বলে—তা তো হ'বেই বোন, তোমরা যে বীরজায়া।

অনিরুদ্ধ বলে—বীরজায়া ব'লে লজ্জা দেবেন না, বীরের ভগিনী বলুন।

তারপর অবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্ধু সেদিন আবার বেরোলো,

ফিরলো, অনেক রাত্রে। মলয়া তখন জেগে নেই। নিষুতি চারিধার। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বারান্দায় ; অনিরুদ্ধ পায়চারি করছিলো। বন্ধু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দোতলায়, হাতে ওর স্যুট্‌কেস। অন্ধকার থেকেই জিগেস করলো অনিরুদ্ধ—কে, বন্ধু-দা ?

—হ্যাঁ। শোওনি এখনো ?

—না, শুতে আমার দেরিই হয়।

অনিরুদ্ধ বারান্দার আলো জ্বালে। সেই আলোয় বন্ধুর মূর্তি দেখে চমকে ওঠে। রক্তস্নাত বেশ। প্যাণ্টের অনেক জায়গায় রক্তের দাগ, বিশেষ ক'রে কোটের হাতের কাছটা রক্তে ভিজে।

হাতের স্যুট্‌কেস্‌টা বন্ধু ক্লান্তভাবে নামিয়ে রেখে বলে—একগ্লাস জল খাওয়াতে পারো ভাই ?

প্রাথমিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতেই অনিরুদ্ধ একটু সময় নিলো। তারপর প্রথম যখন বাক্যস্ফূর্তি হ'লো তখনই সে ব'লে উঠলো—বন্ধু-দা ইস্‌, এ যে রক্ত ! কী ব্যাপার ? খবর ভালো তো ?

বন্ধু শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললো—তোমার জানবার মতো কিছু নয়। নিশ্চিন্ত থাকো ; মলয়া জেগে আছে ?

—না ঘুমিয়েছে।

—তুমিও শোও গে যাও, রাত অনেক হ'লো। আর দেরি করছো কেন ভাই ?

বন্ধুর এ অনুজ্ঞার উত্তরে অনিরুদ্ধকে বলতেই হ'লো—এই যে যাই।

ঘর থেকে এক গ্লাস পানীয় জল এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে অনিরুদ্ধ বলে—পাশের ঘরে টেব্লে আপনার খাবার আছে—ঘর খুললেই পাবেন।

—আচ্ছা।

বন্ধু ক্লান্তভাবে নিজের ঘরের তালাটি খুলে স্যুট্‌কেসটি নিয়ে গিয়ে সশব্দে মেঝেয় নামিয়ে রাখে। অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে জিগেস করে—বাথরুমটা কোথা ?

অনিরুদ্ধ বন্ধুকে বাথরুমটা দেখিয়ে দেয়।

বন্ধু বলে—এবার তুমি যেতে পারো।

এর পর তো আর থাকা চলে না। অনিরুদ্ধ বোঝে এখন আর তার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। বাথরুমে দোর পড়ে। অনিরুদ্ধ বিছানায় যায় কিন্তু ঘুম আসতে চায় না।

অদ্ভুত একটা লোমহর্ষক উদ্বেগ যেন বিছানায় কাঁটা বিছিয়ে রেখে গেছে—তাতে শুয়েই এপাশ-ওপাশ করছে অনিরুদ্ধ, ঘুম আসছে না। বাইরে চাঁদের

আলোয় অস্পষ্ট আবছা দেখাচ্ছে সব, কুয়াশার কুহেলিকায় কেমন ভুতুড়ে, কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে—আজকের এ জ্যোৎস্না আনন্দ আনে না প্রাণে।

ঘুম যদি বা আসে তো ভেঙে যায় অতি সহজেই। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই অনিরুদ্ধ কাপড়-পোড়া গন্ধ পায়। কোথা থেকে যেন বিস্তর ধোঁয়া ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। অনিরুদ্ধ বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। ছাখে বন্ধুর ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। ভেন্টিলেটারের জাফ্রি দিয়ে আলোর আল্পনা এসে পড়েছে অন্ধকার বারান্দার সিলিঙে। ঋজু আলোক-রেখা ঘোলাটে দেখায় ধোঁয়ার জন্য। ধোঁয়া আসছে ওখান দিয়েই।

রীতিমতো ব্যস্ত হ'য়েই অনিরুদ্ধ বন্ধুর দোরে ঘা দিতে থাকে—বন্ধুদা, বন্ধুদা, জেগে আছো? এত ধোঁয়া কিসের?

ভেতর থেকে অবিচলিত কণ্ঠের উত্তর আসে—জেগে আছি, ভয় নেই। শোও গে যাও।

খড়খড়ির ছিদ্র দিয়ে অনিরুদ্ধ তবু দেখার চেষ্টা করে। খানিকটা চেষ্টার পর সে কিছুটা দেখতেও পায়; ধোঁয়ার আড়াল থেকেও বন্ধুকে দেখা যায় কিছুটা—বন্ধু চেয়ারে ব'সে আছে, হাতে ছড়ি। সেই ছড়ি-গাছা দিয়েই বন্ধু তার প্যাণ্ট-কোট প্রভৃতি একে একে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না, সে সরে যায় সেখান থেকে। যদিও তার ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহের স্নায়ু বেশ শক্তই তবুও আজ তার বন্ধুকে বড্ডো ভয় করলো। সে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকলো সমান।

কিছুক্ষণ পরেই দোর খোলার শব্দে অনিরুদ্ধ ফিরে দেখলো বন্ধু বেরিয়ে এসেছে আপাদমস্তক নিখুঁত সামরিক পোষাকে সম্ভ্রান্ত হ'য়ে। প্রায় চেনার জো নেই। একেবারে পুরোপুরি কর্ণেল, সমস্ত ডেকরেশন সুদ্ধ।

বন্ধুকে কিছু জিগেস করার আগে অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। বন্ধুর চোখে এড়ায়নি সেটুকু, সে বললো—দেখছো কী নিরু-ভাই? স্যাল্যুট্ করো।

বন্ধু নিজের বুকের ক্রাউন-স্টারগুলোর দিকে দেখিয়ে দেয় আঙুল দিয়ে।

যখন থেকে বন্ধু এসেছে তখন থেকেই অনিরুদ্ধ লক্ষ্য ক'রে আসছে ওকে, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না—অদ্ভুত হেঁয়ালীর মতোই ঠেকছে বন্ধুর সমস্ত আচরণগুলো। যেমন অভিসন্ধিপূর্ণ ওর ঘোরা-ফেরা তেম্নি ত্রাসসঞ্চারক ওর আচার-আচরণ। বন্ধুকে অনিরুদ্ধ যতোই বুঝতে না পারে ততোই আরো যেন আতঙ্কিত হয়।

শঙ্কিত স্বরে সে বলে—বন্ধুদা, হঠাৎ একি সাজ? এ পোষাক পেলে কোথা?

অনিরুদ্ধকে আরো বিস্মিত ক'রে দিয়ে বন্ধু এবার ভয়ঙ্কর সহজভাবে হাসতে হাসতে বলে—শিকার ক'রে আনলাম।

—তুমি খুন করেছো বন্ধুদা? আমি বুঝেছি।···অনিরুদ্ধের স্বরে উৎকণ্ঠা এবং ভয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

বন্ধুর স্বভাবশান্ত হাস্যময় মুখে মুহূর্তের জন্য ভীষণ ভ্রূকুটি খেলে যায়, বলে—খুন কাকে বলো নিরু-ভাই? শ্বাপদ মারলে শিকার বলতে হয় মানুষ মারলে তবেই না খুন? যাবতীয় প্রাণার নাম-করা শত্রু যে বাঘ—তাকে মারাই তো বীর্যবানের খেলা! সেটা হ'লো শিকার—ভালো জিনিশ, শুভ জিনিশ। তাই বল্লাম শিকার ক'রে এনেছি। এটুকু জেনো তোমার বন্ধুদা খুনী নয়, গুণী শিকারী। এতে কোনো হৃদয়হীনতা নেই—নিঃস্বার্থ কল্যাণ-চেষ্টা রয়েছে।

বন্ধুর চোখ অন্ধকারে অঙ্গারের মতো জ্বলে।

বন্ধু আবার বলে—ছাখো নিরু-ভাই, আজকেই রাত্রির ট্রেনে আমাকে এখান থেকে স'রে পড়তে হ'বে। বোনটিকে ব'লে-ক'য়ে বিদায় নিয়ে যেতে পারলাম না—আমার হ'য়ে তুমিই কাল বোলো। মলয়া যদি এ সব কিছু না জানতে পেরে থাকে তো জানাবার দরকার নেই।

—আজকেই যাবেন? এই রাত্তিরে!

—হুঁ, আজকেই যেতে হ'বে। থাকার তো উপায় নেই। ক্যাম্পে হাজরে দিতে কালই পেঁছিতে হ'বে কলকাতায়।

—তারপর···কলকাতায়ই কি থাকবেন এখন?

—তা কি বলা যায়?

ব'লে বন্ধু খানিকক্ষণ অনিরুদ্ধকে দৃষ্টিবিদ্ধ ক'রে নিয়ে বলে—যদিও তোমার সঙ্গে মাত্র একটি দিনের পরিচয় তবুও আমার মনে হয় তোমায় অনেক কিছুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলা যায়। আমার মানুষ চিনতে বড়ো একটা ভুল হয়না নিরু-ভাই। তোমাকে তাই এটুকু অন্তত বলতে পারি যে, কলকাতা ছেড়ে শিগগিরই যেতে হ'বে উত্তর সীমান্তে যেখানে নতুন ক'রে আশার আলো দেখা দিয়েছে—যেখান থেকে এবার নতুন সূর্য উঠবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম-সীমান্তে যে-চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে উত্তর-সীমান্তে তা-ই হয়তো কালে সার্থক হ'য়ে উঠবে। সমস্ত আয়োজন সেখানে সুসম্পন্ন হ'তে চলেছে। সেখান থেকেই ডাক এসেছে আমারও। এ রকম স্বর্ণ-সুযোগ যে-কোনো জাতির ভাগ্যে শতাব্দীতে দু'একবারই আসে। এ চেষ্টা এবারেও ব্যর্থ হ'লে এ রকম সুযোগ আর হয়তো নাও আসতে পারে।

অতঃপর বন্ধু স্যুটকেস্‌টা তুলে নিয়ে সিঁড়ি নামতে আরম্ভ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও নিচে এলো, বললো—চাকরটাকে আর জাগিয়ে কাজ নেই, চলো, আমিই ফটক বন্ধ ক'রে দিয়ে আসছি।

বন্ধুর পিছন পিছন অনিরুদ্ধও গেট পার হ'য়ে নেমে এসে দাঁড়লো রাস্তায়। নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। সমুদ্রের হাওয়া আসছে হু হু ক'রে। অনিরুদ্ধের হাতখানা নিয়ে বন্ধু বললো—সদ্য-শত্রুরক্তে-পবিত্র-করা এই কড়া হাতের অভিবাদন মনে রেখো ভাই।

বন্ধু সবল মুঠিতে অনিরুদ্ধের সঙ্গে করকম্পন করে। সে-শক্তির পরিচয়ে অভিভূত হ'য়েই অনিরুদ্ধ উত্তর করে—মনে রাখবো বন্ধুদা, পথ তোমার নিরাপদ হোক! যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হোক!

আচ্ছা! বেঁচে থাকলে আবার দেখা হ'বে।···বন্ধু মিশিয়ে যায় অন্ধকারে।

পরদিন একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত খবরটি বড়ো বড়ো চিত্তাকর্ষক হরফে ছাপা হ'য়েছে অনিরুদ্ধ পড়লো ঃ

সৈন্যাবাসের নিকট শ্বেতাঙ্গ শব প্রাপ্তি

সহরে খানাতল্লাসীর হিড়িক

পুলিশ বিভাগ কর্তৃক পাঁচ হাজার

টাকা পুরস্কারঘোষণা।

গতকল্য সৈন্যাবাসের নিকট একটি বিবস্ত্র শ্বেতাঙ্গ শব পাওয়া যাওয়ায় পুলিশী কর্মতৎপরতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৈন্যাবাসে খোঁজ লইয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, গত রাত্রি হইতে কর্নেল ফিশার নামক জনৈক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসর বহু মূল্যবান দলিলপত্রাদি সহ নিখোঁজ হইয়াছেন। কর্নেল ফিশার-এর এই আকস্মিক নিখোঁজ হওনের সহিত এই রহস্যজনক শবপ্রাপ্তির সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া পুলিশ মহল হইতে অনুমান করা হইতেছে। স্থানীয় বহুবাড়িতে খানাতল্লাসী হইয়াছে এ পর্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। দলিলপত্রাদি পুনরুদ্ধার করা সম্পর্কে পুলিশ বিভাগ হইতে প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এই সব দলিলপত্রাদি সম্পর্কে কিংবা এই হত্যা সম্পর্কে কেহ কোনো সন্ধানসূত্র দিতে পারিলে পুলিশ বিভাগ

হইতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ঘোষিত পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা।

কাগজ পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ। মলয়া স্বামীকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করছিলো, শুধালো—কী ভাবছো?

দূর সমুদ্রের ঝিলিমিলি থেকে চোখ সরিয়ে এনে অনিরুদ্ধ রাখলো মলয়ার ক্লান্ত করুণ মুখের ওপর। বললো—বন্ধুদা কাল রাত্তিরে কখন্ ফিরলেন, জানো?

মলয়া বল্লো—না। কতো রাত্তিরে ফিরলেন, কী ব'লে গেলেন বল্লে না তো।

অনিরুদ্ধ বললো—বন্ধুদা কাল ফিরলেন রাত দুপুরে, আমি তখনো জেগে ছিলাম। বললেন, জরুরী দরকারে আজই আমাকে যেতে হচ্ছে কলকাতায়—রোগা বোনটির ঘুম আর ভাঙিয়ে কাজ নেই, আমার হ'য়ে কালকে না হয় তুমিই ওকে বোলো। আজ রাত্রির ট্রেনই আমাকে ধরতে হ'বে, চল্‌লুম।

মলয়া শুধু মন্তব্য করলো—আসাটাও যেমন আকস্মিক যাওয়াটাও তেম্নি। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেলেন কিন্তু।

একটি সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' ব'লে মলয়ার কথায় সায় দিলো অনিরুদ্ধ।

বন্ধুদাকে কেমন দেখলে মলয়া?—অনিরুদ্ধ জিগেস করে।

মলয়া বলে—এমনটি আর দেখিনি কখনো। বইতে পড়েছি কিংবা শুনেছি বটে এমনতরো গুটি কয় মানুষ তৈরি হ'য়ে উঠেছে আমাদের দেশেও। এবার সেটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করাও ভাগ্যে ঘটে গেলো। মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়, নয়?

অনিরুদ্ধ বললো—হুঁ; আমি কিন্তু ঠিক এম্নিই আরো একজনকে দেখেছি—সে হচ্ছে প্রদোষদা।

নিজ উর্ণাজালে উর্ণনাভ

কলকাতার অভিজাত পল্লীর মধ্যে বিখ্যাত ডাক্তার ও মনস্তাত্ত্বিক বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্যের নব-নির্মিত বাসভবন—তারই সুসজ্জিত একতলার বসার ঘরে ব'সে আছে বিরূপাক্ষ। পাশেই রোগী দেখার চেম্বার। প্রাতঃকালীন রোগী দেখার হাঙ্গামা তার এইমাত্র চুকেছে এবং সে 'চেম্বার-ঘর' থেকে উঠে এসে বসেছে এ ঘরে। বেলা তখন এগারোটার কাছাকাছি; প্রকাণ্ড এক সেক্রেট্যারিয়েট টেবলের সাম্‌নে গদি-আঁটা এক ঘুরন্ত চেয়ার—বিরূপাক্ষ ব'সে আছে সেখানে, টেবলের ওপরকার কী কতকগুলো জরুরী কাগজপত্রের মধ্যে নিবিষ্ট হ'য়ে। বয়স পঁয়ত্রিশ কিন্তু দেখলে ত্রিশের কাছাকাছি মনে হয়। রং কালো নয়—শ্যামল; লাবণ্যযুক্ত; স্বাস্থ্যের দীপ্তি মুখে।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নার্স সতী বিশেষ মনোযোগ সহকারে মাথায় রুমাল বাঁধছিলো, সে বিরূপাক্ষকে জিগেস করলো—পুরী থেকে যে চিঠি এলো তাতে কী খবর পেলেন সেখানকার?

বিরূপাক্ষ বললো—খবর একই রকম। মলয়ার শরীর ভালো নয়—কোনো উন্নতি হয়নি। ওরা ফিরে আসছে।

—কবে? তাকি কিছু লিখেছেন?

—তেমন ঠিক ক'রে কিছু লেখেনি, নিরু। তবে খুব সম্ভব এ-মাসের কয়টা দিন কাটিয়ে ও-মাসের প্রথম সপ্তাহে আসবে। এর পরের চিঠিতে দিন স্থির ক'রে লিখবে নিশ্চয়ই।

নিখুঁত ভাবে রুমাল বাঁধা শেষ ক'রে সতী গাউন তুলে পায়ের মোজা টানতে টানতে আড়চোখে নিজেকেই আপাদমস্তক ভালো ক'রে দেখে নেয়। তারপর হীল-তোলা জুতোর টো-এ ভর দিয়ে বিরূপাক্ষের দিকে ফিরে দাঁড়ায়—সর্বশুক্লা, প্রস্তুতি-প্রখর।

সর্বশুক্লা বললাম অর্থাৎ বেশবাসের দিক থেকে—নইলে সুন্দরী নয় সতী; রং-ও ফর্সা বলা যায় না, বলতে হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। তাহোক মোটের ওপর সদাহাস্যমুখী এই মেয়েটির স্বাস্থ্যের আভা ও অটুট যৌবন-শ্রী তাকে বেশ একটা লাবণ্যের অঙ্গরাখা পরিয়ে রেখেছে।

বিরূপাক্ষ ডাক্তারের কাজে এই পূর্ণযৌবনা স্বাস্থ্যবতী নার্সটি এসেছে আজ বছর পাঁচেক হ'তে চললো। সেই থেকে এ গৃহস্থালীর সে-ই কর্ত্রী।

বিরূপাক্ষ জিগেস করলো—বাসবীদের ওখানে যাবে নাকি একবার ?

সতী বললো—বলেন তো যাই। শারীকে কিন্তু ফোন ক'রে দিয়েছি সকালে।

—হস্‌পিট্যালের ফাউণ্ডেশন-ডে অ্যানিভার্‌সারির অ্যানুয়াল রিপোর্টটা রেডি করতে হ'বে আজকের মধ্যেই—আর তো সময় নেই, কখন ওদের ওখানে যাই বলো তো ?···একটু মুস্কিলে পড়েছে বিরূপাক্ষ।

সতী বললো—আপনি কাজ করুন, আমি তো যাচ্ছি বুঝিয়ে বলবো'খন।

সতী বেরোচ্ছিলো কিন্তু বেরোনো হ'লো না; বিরূপাক্ষ কাজ করতে বসছিলো কিন্তু হ'লো না, বাধা পড়লো। স্লেট হাতে চাকর সুজন এসে খবর দিলো এক ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে সে বসিয়েছে বাইরের ঘরে। আগন্তুকের অদ্ভুত বেশবাসের সে এক কৌতুকাবহ বর্ণনা দিলো।

সুজনের হাত থেকে স্লেটখানা নিয়ে আগন্তুকের হস্তাক্ষর দেখেই লাফিয়ে ওঠে বিরূপাক্ষ—প্রদোষ এসেছে সতী।

—প্রদোষবাবু ? আপনি যান, রিসিভ করুন গে। আমি এখুনি বেশটা বদলে আসছি।···সতীর স্বরে বিস্ময় ও ব্যস্ততা।

বিরূপাক্ষের স্বজনকল্প বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ এলে কে জানে কেন সতী তাদের সামনে পেশাদারী পোষাকে পারতপক্ষে বেরোতে চায় না। সে তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি বেছে নিয়ে অন্য ঘরে চ'লে গেলো। বিরূপাক্ষ শশব্যস্তে নেমে গেলো নিচে। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এলো প্রদোষকে সঙ্গে ক'রে। তিব্বতী লামার ভেক নিয়ে ঢুকলো প্রদোষ। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। জীবনব্যাপী সহস্রকৃচ্ছ্রসাধনায় মুখের সুকুমার পেলবতা কঠোর রূপ নিয়েছে—অবয়ব দীর্ঘ, বলিষ্ঠ—রৌদ্রলাঞ্ছনায় বর্ণ ঈষৎ তামাটে—একটা আন্তরিক শক্তির বিচ্ছুর-প্রতিভায় দীপ্ত মুখ।

বিরূপাক্ষ হাসতে হাসতে বলে—মেক্‌-আপটা নিখুঁত করেছো কিন্তু। তারপর···কী খবর ?

প্রদোষ চোখের ইঙ্গিত করে। বিরূপাক্ষ ভৃত্যকে যেতে বলে।

সুজন চ'লে গেলে পর প্রদোষ বলে—খবর তো আছেই যৎকিঞ্চিৎ···বিনা খবরে কি কখনো আমায় আসতে দেখেছো বিরূ ?

বিরূপাক্ষ বলে—সেইজন্যই তো ভয় করে ভাই। তারপর ··সরকারীভাবে এখনো ফেরার আছো তো ?

প্রদোষ হাসতে হাসতে বলে—এখন আবার ফেরারও নয় ফৌত—প্রদোষ

রায় মারা গেছে টোকিও যাবার পথে—সাইগন রেডিও শোনোনি? খবরের কাগজ ছ্যাখো নি?

বিরূপাক্ষ সহাস্যে বলে—না, একেবারে চোখেই দেখি, কাগজ দেখি না।

প্রদোষ বলে—প্রদোষ ম'রেই নির্দোষ হ'য়েছে, জানো বিরূ? কিন্তু তারই এক সহকর্মী যেন ম'রেও মরছে না—বর্তমানে ভারত সরকারকে সেই নাস্তানাবুদ ক'রে মারছে।

—আচ্ছা, তুমি কি জানো বিরূ, বন্ধুদার কোনো খবর?

—জানি। সব মঙ্গল, তোমার বন্ধুদার সম্বন্ধে আশঙ্কার কোনো কিছু থাকে না কোনোদিনই। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

—এসেছিলো? কবে?

—চার পাঁচ দিন আগে।

—তারপর? আচ্ছা থাক্, পরে শুনবো।

শাদা-সিধে একটি শাড়িতে সম্ভ্রান্ত হ'য়ে ইতিমধ্যে সতী ঘরে ঢুকলো।

প্রদোষ বিরূকে জিগেস করলো—ইনিই সতী দেবী না?

বিরূপাক্ষ বললো—হ্যাঁ, এই হচ্ছে সতী, আমার নার্স, খুব কম্পিটেণ্ট। একে নইলে আমার চলে না।

আমার নার্স—খুব কম্পিটেণ্ট···বিরূপাক্ষের এ দু'টি কথাতেই সতীর নিজেকে মনে হয় তৃণের চেয়েও তুচ্ছ—তার কি আর কোনো পরিচয় নেই? সে নার্স, খুব কম্পিটেণ্ট নার্স তাই তাকে নইলে বিরূপাক্ষের চলে না। বিরূপাক্ষ এই রকমই বলে, সকলের কাছে এই পরিচয়ই সে দেয়—সতীকে সে অপমান করবার জন্যে বা আঘাত দেওয়ার জন্যে এ রকম বলে না। এভাবেই সে সতীকে তার স্থাননির্দেশ ক'রে দেয়, যোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেয় মাত্র। আগে আগে এতেই সে অপমান বোধ ক'রেছে কিন্তু এখন তার সহ্য হ'য়ে গেছে, প্রদোষের দিকে চেয়ে সতী ব'লে ওঠে—আমিও যেমন কম্পিটেণ্ট নার্স, আমার মনিবও তেম্নি ভালো লোক, দয়া ক'রে আজ এক বছর বিনা মাইনেয় রেখেছেন। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে শুনতেই তো পেলেন মনিবের লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট?

প্রদোষ বলে—সত্যি, এ তোমার বড়ো অন্যায় বিরূ।

প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে বিরূপাক্ষ বলে—যেদিন থেকে চাবির রিং ওর আঁচলে উঠেছে সেইদিন থেকে শুনছি মাসে মাসে ওর মাইনেটা নাকি বাকি পড়ছে—ও অন্তত তাই বলছে আজকাল, সত্যি-মিথ্যে ওই জানে। কিন্তু যতদিন আমার টাকা আমার কাছে থাকতো ততদিন কিন্তু কড়ায় গণ্ডায় সব শোধ ক'রে দিয়েছি।

সতী প্রদোষের দিকে চেয়ে বলে—শোধ ক'রে কোথায় দিয়েছেন জিগেস করুন তো। শোধ ক'রে আমার হাতে দেননি, দিয়েছেন ওঁরই হাসপাতালের চাঁদার খাতায়।

বিরূপাক্ষ ও প্রদোষ দু'জনে মিলে সমস্বরে হো হো ক'রে হেসে ওঠে। প্রদোষ বলে—তুমি তাহ'লে ওঁকে তো বড়ো ফাঁকি দিয়েছো, বিরূ?

বিরূপাক্ষ বলে—ফাঁকি কোথায় ওটা তো ভলাণ্টারী ডোনেশন। সতী আমাদের হস্‌পিট্যালের বড়ো একজন ডোনর। আমি তো ভেবেছি ট্রাস্টিদের মধ্যে সতীর নামটাও ঢুকিয়ে দিয়ে যাবো।

প্রদোষ 'হিয়ার-হিয়ার' ক'রে ওঠে তারপর বলে—শুনলেন তো সতী দেবী?, আপনি নেহাৎ মন্দ মনিব পাননি।

বিরূপাক্ষ বলে—হ'লো তো? শুনলে তো প্রদোষের মত?

এমন সময়ে ফোন বেজে উঠলো, সতী গিয়ে রিসিভারটা তুলেই বিরূপাক্ষের দিকে ফিরে বলে—ট্রাঙ্ক কল্‌—পুরী থেকে।

বিরূপাক্ষ এসে সতীর কাছ থেকে রিসিভারটা নিলো। সতী ও প্রদোষের দিকে ফিরে বিরূপাক্ষ বলে—নিরু ডাকছে পুরী থেকে।

দিদিমণি!···সতী পিছন ফিরে ভাখে সুজন এসে হাজির।

সুজন বলে—হাসপাতাল থেকে কে একজন এসেছে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

—বাবুর সঙ্গে এখন দেখা হ'বে না, চল্‌ আমিই যাচ্ছি। ব'লে বেয়ারার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো সতী।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপাক্ষ প্রদোষকে দোর বন্ধ করার ইঙ্গিত করে। প্রদোষ নিঃশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে একেবারে ছিট্‌কিনি দিয়ে দেয়। তারপর এসে দাঁড়ায় বিরূপাক্ষের পাশে।

বিরূপাক্ষ তখন রিসিভারের সামনে কথা কইছিলো—নিরু?···মলয়া কেমন আছে? অ্যা? হ্যাঁ, হ্যাঁ···নিশ্চয়···তারপর? আমিই দিয়েছিলাম বন্ধুকে তোমার ঠিকানা···অ-অ···বটে? তাই নাকি? কর্নেল ফিশার-এর লাস পাওয়া গেছে খবরটা কাগজে বেরিয়েছে নাকি? ··হ'তে পারে, কাগজটা দেখিনি এখনো ভালো ক'রে···কবে? কাল রাত্তিরে বলছো?···বন্ধু নির্বিঘ্নে গা ঢাকা দিতে পেরেছেন তো?···আজকের কাগজে বেরোতে পারে তাহলে···হুঁ···অঃ কবে আসছো তোমরা? দিন ঠিক করলে জানিও ··হ্যাঁ···জানালে তোমাদের আনতে স্টেশনে গাড়ি পাঠাবো। আচ্ছা।

সতী ফিরে এসে ভাখে বিরূপাক্ষের ঘরের দোর বন্ধ। চেয়ারে একটু

অপেক্ষা করলো, পরে হাঁক দিলো স্বজনকে। স্বজন এলে তাকে ব'লে দিলো—ছাখ স্বজন, এর মধ্যে আর কেউ যদি আসে তো বলবি বাবু কলকাতার বাইরে গেছেন। বাড়িতে কেউ এসেছে বা কোনো পুরুষ আছে একথা বলিস্‌নি যেন। যা, বাইরের ঘর আগ্‌লাগে।

গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করতে স্বজন চ'লে গেলো নিচে।

তারপর রুদ্ধদ্বার ঘরের বাইরে পায়চারি করতে লাগলো সতী। ওর পদক্ষেপে কেমন যেন অস্থিরতা—মাঝে মাঝে দোরে কান পেতে কী যেন শুনতে চেষ্টা করে, হয়তো বিফল হয়। ফিরে এসে আরো চঞ্চলভাবে পায়চারি শুরু করে।

বহুক্ষণ ধ'রে প্রদোষকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার ঘরে মন্ত্রণা করার পর বিরূপাক্ষ যেম্নি বেরুচ্ছে অম্নি সতী এসে ওদের সাম্‌নে দাঁড়ালো। প্রদোষের পরনে এখন পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক। বিরূপাক্ষের নতুন স্যুটটা প'রেছে প্রদোষ—প্রথমেই নজরে পড়লো সতীর। একটু ট্যানা ট্যানা একটু ছোটো ছোটো দেখাচ্ছিলো বটে মোটের ওপর মন্দ না, কিন্তু তা নিয়ে মন্তব্য করার মতো মন সতীর তখন ছিলো না। তাই সে দেখেও দেখলো না।

—কী? কে এসোছিলো?—বিরূপাক্ষ জিগেস করলো।

সতী বললো—কী জানি। চিনলাম না। আমার তো একটুও ভালো মনে হ'লো না লোকটিকে। হস্‌পিট্যালের সকলকেই তো ব্যক্তিগত ভাবে জানি—ইনি এ হস্‌পিট্যালের কেউ নন। যদিও ইনি হস্‌পিট্যালের পরিচয় নিয়েই দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে কিন্তু আসলে ইনি হস্‌পিট্যালের কোনো খবরই রাখেন না। এই একরকম কথা বলেন পরমুহূর্তেই আবার অন্যরকম কথা বলেন ·· আমার তো বিশ্বাস হ'লো না লোকটিকে।

—কেন এসেছে বললো? কী দরকার?

—প্রাইভেট নেচারের দরকার। খোদ ডক্টর ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারো কাছে বলার নয়। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—তুমি কী বল্‌লে?

—বল্লাম ডাক্তারবাবু হঠাৎ বিশেষ একটা জরুরী ডাকে কলকাতার বাইরে গেছেন—এ খবর তো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

—সে কী বললো?

—সে বললো হাসপাতালে খবর গেছে কিনা জানি না কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, তিনি এখন ভেতরেই আছেন এবং এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। অগত্যা বললাম, এত খবরই জানেন যখন বসুন তাহ'লে, অপেক্ষা করুন।

ব'লে আসার সময়ে টুক্ ক'রে ঘরের দোরটা ভেজিয়ে ছিট্‌কিনি টেনে দিয়ে পালিয়ে এসেছি। তারপর ভদ্রলোক যা চেঁচামেচি লাগিয়েছেন দোরটা বুঝি বা ভেঙেই ফেলবেন!

বিরূপাক্ষের চেয়ে প্রদোষকেই বেশি বিচলিত দেখা যায়।

সতীর দিকে চেয়ে সে বলে—বাঃ, আশ্চর্য বুদ্ধিমতীর কাজ করেছেন আপনি। আগে চলুন তো আড়াল থেকে লোকটিকে দেখে আসি।

সতীকে অনুসরণ ক'রে নিচে নেমে আসে প্রদোষ। খোলা জানালায় উঁকি মেরে দেখে নিলো লোকটির চেহারা আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো। ফিরে দেখলো বিরূপাক্ষও এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে।

বিরূপাক্ষ জিগেস করলো—কে? চিনতে পারলে?

প্রদোষ বললো—সমর—স্কাউণ্ড্রেলটা।

—ওই বুঝি অ্যাপ্রুভার হ'য়েছে?

—হুঁ। নেহাৎ তোমার বাড়ি ব'লে তাই এখনকার মতো পার পেয়ে গেলো নইলে ক্রিমি-কীটের মতোই মাড়িয়ে মেরে ফেলতাম। ওর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ—বিশ্বাসঘাতকতার যে-সব প্রমাণ বন্ধুদার কাছে রয়েছে তাতে ওর জ্যান্ত ঘুরে বেড়াবার কথা নয়, নেহাৎ ভাগ্যবশেই বেঁচে বেড়াচ্ছে।

—ওর তাহ'লে কী ব্যবস্থা করতে চাও?

—ওর বিলি-ব্যবস্থা আমি এখুনি ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

তারা তিনজনেই আবাব ফিরে আসে দোতলায়।

ওপরে এসেই প্রদোষ ফোন তুললো—কে? হিমাংশু?···আমি পি. আর. বিরূর বাড়ি থেকে কথা বলছি···সমরেশকে এখানে আটকে ফেলা হ'য়েছে· এখুনি ওকে এখান থেকে সরিযে ফেলার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তুমি এখুনি একটা ট্যাক্সি ক'রে চার-পাঁচজন বিশ্বাসী এবং সশস্ত্র লোক সঙ্গে নিয়ে চ'লে এসো।

এরই আধঘণ্টার মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। চারজন যুবক নামলো। প্রদোষ নেমে আসতেই তাদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হ'লো কোণের দিকের ছোট্টো একটি ঘরে। মিনিট কয়েক পরামর্শের পর প্রদোষ বললো—আমি চাই, যার ওপর কাজের ভার পড়বে একমাত্র সেই সব কিছু জানবে, এ ছাড়া সঙ্ঘেরও দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন না জানে। সমরেশকে তোমরা এখন সাবধানে গার্ড ক'রে নিয়ে যাও তোমাদের ওখানে; আজকের দিনটা রেখে কালকেই ওকে চালান দিও যথাস্থানে। কলকাতা ছেড়ে আমি আজকেই চ'লে যাচ্ছি। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কতো রাউণ্ড ক'রে অ্যামিউনিশন আছে?

—মাত্র একশো।

—এবার তিব্বত হ'য়ে যে চালানটা আসছে সেটা নির্বিঘ্নে পেঁ ৗছলে তা থেকে তোমাদের কিছু দিইয়ে দেবো। এখন ওতেই কাজ চালিয়ে নাও।

হিমাংশু এতক্ষণ যে-খবরটা দেবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করছিলো এইবার সেটা সে বলে ফেললো—একটা খুব জরুরী খবর আছে।

প্রদোষ জিগেস করে—কী?

হিমাংশু বলে—খবর পেলাম আজই পুলিশ এ-বাড়ি সার্চ করতে আসছে।

—আমরা অনেক আগেই তা আশঙ্কা করেছি হিমাংশু, তার জন্যে তৈরিও হ'য়ে আছি। আমার সঙ্গে এবার এসো তোমরা এই ঘরে।

সমরেশকে যে-ঘরে আটক রাখা হ'য়েছিলো সেই ঘরের ছিট্‌কিনি খুলে সকলে একই সঙ্গে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে একবার সমরেশকে আকস্মিকভাবে হিংস্র হ'য়ে উঠতে দেখা গেলো, বলে উঠলো—খবরদার! পথ ছেড়ে দাও।

জামার মধ্যে থেকে লুকানো রিভলভার বের করতে উদ্যত হ'লো সমর। অম্নি পাঁচজনের পাঁচটি রিভলভার উদ্যত হ'য়ে উঠলো প্রত্যুত্তরে।

তিক্ত হাসি হেসে প্রদোষ বললো—নাবাও, মূর্খ! বাঁচতে চাও এখনো অস্ত্রত্যাগ করো।

প্রদোষের দিকে বিহ্বল হ'য়ে চাইলো সমরেশ, মুহূর্ত খানেক কী যেন ভাবলো তারপর রিভলভার ফেলে দিয়ে মাথা হেঁট করলো। অম্নি হিমাংশুপ্রমুখ যুবক-চতুষ্টয় ঘিরে ধরলো সমরেশকে আর সেও নতমস্তকে প্রদোষের নির্দেশ-মতোই উঠলো গিয়ে ট্যাক্সিতে।

ওদের রওনা ক'রে দিয়ে প্রদোষ বিরূপাক্ষকে বলে—বিরূ, তুমি তার চেয়ে চলো আমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসবে। সতী দেবী বরং থাকুন—উনি বাড়ি থাকলেই হ'বে।

বিরূপাক্ষ একটু যেন দ্বিধা করে, বলে—সতী তাহ'লে একা থাকবে? কেন, সতীও চলুক না।

প্রদোষ বলে—না; এ সময়ে কেউ বাড়ি থাকা দরকার। বিরূ, তুমি কী হে? সতী দেবীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়েকেও তোমার একা রেখে যেতে ভরসা হ'চ্ছে না? তোমারই তো চোখের সামনে কী ভাবে কায়দা করলেন সমরেশকে, দেখলে তো?

সতী অবিচলিত গলায় বলে—যান না আপনারা। আমি তো আছিই।

বিরূপাক্ষ একবার প্রদোষের মুখের দিকে চাইলো একবার সতীর মুখের

দিকে চাইলো—তার মন হয়তো সরছিলো না, মুখে সে কিন্তু বললো না কিছু প্রদোষের পিছন পিছন বেরিয়ে এলো বাইরে।

প্রদোষ ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে দিলো না, বললো—চলো বিরূ, আমিই তোমায় নিয়ে যাবো ড্রাইভ ক'রে। নিজে ড্রাইভ ক'রে ফিরতে পারবে তো? অভ্যেস আছে?

—সে হবে'খন। মোটর কিনেছি আজ বছর দশেক কিন্তু ড্রাইভার রাখতে পেরেছি মাত্র ৪।৫ বছর। তার আগে তো নিজেই চালাতাম।

—পথ কিন্তু অনেকটা।

—কতোটা স্পষ্ট ক'রে বলো? সেই বুঝে তেল নিই সঙ্গে।

—আরো দু'এক টিন তেল নিয়েই নাও সঙ্গে। পথ ৪০।৫০ মাইলও হ'তে পারে। বেরুলে কিছুই বলা যায়না ঠিক ক'রে।

বিরূপাক্ষ ড্রাইভারকে হুকুম করে—দু'টিন তেল দিয়ে দাও তো সঙ্গে।

বিরূপাক্ষের মোটর যখন সহর-সীমা ছাড়িয়ে রেল লাইন অতিক্রম ক'রে গেলো প্রদোষ বললো—তোমায় অনর্থক কষ্ট দিতে বাধ্য হলুম বিরূ, তোমায় টেনে আনলুম অনেকটা দূর! কিন্তু কেন যে আনলুম তা গিয়ে বুঝতে পারবে।

দু'জনে নীরবে অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর প্রদোষ হঠাৎ হতাশার স্বরে ব'লে ওঠে—আচ্ছা, বিরূ, স্বপ্ন আমার সফল হ'বে না?

শুনে বিরূপাক্ষের কষ্ট হ'লো, সে বললো—আমরা সকলেই তো অহরহ সেই কামনা করছি ভাই।

আবার খানিক চুপচাপ।

ব্যারাকপুর পার হ'য়ে পূর্ণগতিতে চলেছিলো ওদের মোটর; বিরূপাক্ষ এক সময় প্রদোষকে জিগেস করলো—এখন কোথায় যাবে?

প্রদোষ বললো—উপস্থিত কাঁচরাপাড়ার রেল-কারখানার কুলিবস্তিতে। যে-সব জায়গাগুলো সমরোপকরণ তৈরির ঘাঁটি সে-সব জায়গার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হ'বে এবং কয়েকটা ব্যাপক ধর্মঘটের জমি ক'রে রেখে যেতে হ'বে আমাকে। এজন্যই দু'এক দিন এখানে কাটিয়ে রওনা হবো আসামের দিকে।

হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকানির সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিলো মোটরটা। বিরূপাক্ষ দেখলো দূরে তাসের ঘরের মতো সারিসারি অগণিত শেড, চিম্‌নি, ধোঁয়ার ফানেল, ধোঁয়া, ধাতুর আর্তনাদ। কাঁচরাপাড়ার কারখানা-এলাকায় ঢুকেছে গাড়িখানা। শ্রমিকদের কলোনি এখান থেকে দূরে নয়। প্রদোষ এখানেই নেমে পড়লো তার স্যুটকেস নিয়ে, বললো—বিরূ, এবার তাহ'লে যাও। গিয়ে

দেখবে তোমার বাড়ি হয়তো সার্চ হচ্ছে। আশা করা যায় তোমাকে এ-সবের মধ্যে জড়াতে পারবে না। এর পর থেকে তুমি কিন্তু সাবধানে চ'লো, তোমার ওপরেও নজর পড়লো গোয়েন্দা-বিভাগের।

ওর কথাগুলো বিরূপাক্ষের কানেই যেন ঢুকলো না, সে ব'লে উঠলো—কোনো রকম দরকারে পড়লে আমাকে যেন মনে কোরো, ভুলো না।

বিরূপাক্ষ নিজের অর্থস্ফীত ব্যাগটা প্রদোষের হাতে গুঁজে দিয়ে এসে মোটরে স্টার্ট দিলো।

আসার সময়ে সমানেই বিরূ ভাবতে ভাবতে এসেছে বহু আগের একটি স্মরণীয় দিনের কথা—যেদিন তারা তিনজন প্রদোষ, অদ্রীশ এবং সে—দীক্ষিত হ'য়েছিলো তিনটি বিভিন্ন মন্ত্রে। সে বিজ্ঞানে ; অদ্রীশ সাহিত্যে ; আর প্রদোষ ?—একমাত্র প্রদোষেরই এই ভীষণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার শক্তি ও সাহস ছিলো তাদের তিনজনের মধ্যে। শেষপর্যন্ত ওই বা কি পারবে সার্থক হ'তে, তাদের অভিশপ্ত যুগের শাপমোচন করতে ?

তারা তিনজনে তিন দিক থেকে দেশকে মহনীয় উত্তরাধিকার দিয়ে যাবে—এ বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছে তারা তিনজনেই। কিন্তু কে কতোটুকু সার্থক হ'তে পারলো ? তার নিজের সার্থকতা শেষ হ'লো কিছুটা অর্থ আর মাত্র কয়েকটা ডিগ্রী অর্জন করতেই। আর অদ্রীশ নিজেকে অপব্যয় ক'রে ফেললো সাহিত্যে একটা নতুন শৌখিনতা, নতুন ভাবালুতার আমদানী করতে ; কিছুটা প্রতিষ্ঠা আর অনেকখানি দারিদ্র্য অর্জন করতেই। তাদের তিনজনের মধ্যে প্রদোষই একমাত্র সর্বত্যাগী কর্মযোগী, সাধনা ওর সার্থক হোক, অভিনন্দিত হোক ! দেশের কল্যাণে ওর এই মহান্ মৃত্যুপণ-ব্রত সার্থকতায় উদ্‌যাপিত হোক ! সারা দেশ ওরই মুখ চেয়ে রুদ্ধশ্বাসে এখন দুঃখের দণ্ড গুন্‌ছে !

সেদিন ফেরার পথে হাসপাতাল হ'য়ে আসতে গিয়ে বিরূপাক্ষ সেখানেও খানিকটা আটকা প'ড়ে গেলো, কিন্তু মন তার রইলো বাড়িতে। অথচ এদিকে হাসপাতালের ফাউণ্ডেশন-ডে অ্যানিভার্‌সারি উপলক্ষে কালকে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজনও ক'রে ফেলা হ'য়েছে যে !

হাসপাতাল হ'য়ে বিরূপাক্ষ যখন বাড়ি ফিরলো তখন বিকেল। ঢোকামাত্রই চোখে পড়লো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মালপত্র ও আসবাব—সব কিছুই অগোছালো। সতী এসে খবর দিলো—খানিক আগে পুলিস এসে এ বাড়ি সার্চ ক'রে গেছে।

পুলিস খানাতল্লাসীই করলো স্রধু, বিরূপাক্ষকে শেষপর্যন্ত কোনোরকম ব্যাপারে জড়াতে পারলো না। কারণ কিছুই আপত্তিকর পাওয়া গেলো না কিংবা কোনো গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে বিরূপাক্ষের সংশ্রব প্রমাণিতও হয়নি কোনোদিন। বাহ্যতঃ সে রাজনীতি নিয়ে কোনোদিনও মাথা ঘামায় নি। বরং এ বিষয়ে তার মতবাদ অত্যন্ত মামুলি ও স্পষ্ট, নেহাৎ সরলরেখাতেই ন্যস্ত।

দুর্গম পথ, দুর্গত দেহ মন

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল। আসামের ছোট্ট একটি রেল-স্টেশন। ট্রেন যখন ইন্ করলো প্ল্যাট্‌ফর্মে অধীর প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলো বছর পঁচিশেকের একটি অনূঢ়া মেয়ে—ওই হ'লো প্রদোষদের সমিতির সম্পাদিকা—রঙ্গিলা। রং নাতিগৌর, স্থিরবুদ্ধিতে প্রদীপ্তমুখ, চটুল নয় গম্ভীর মুখশ্রী। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ছাড়াও অতিরিক্ত এমন কিছু আছে ওর চেহারায় যা দেখলে মানুষ সহজেই ব'লে উঠতে পারে—হাজার মেয়ের মধ্যে এই এক মেয়ে!

ছোটো স্টেশনটিতে যাত্রী ওঠা-নামা বিশেষ হয় না। হয়তো দু'একজন ওঠে। ট্রেন মিনিটখানেক থামে। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরে দেখা গেলো জনবিরল প্ল্যাট্‌ফর্ম বেয়ে একজন যুবক এগিয়ে আসছে—হাতে স্যুট্‌কেস। রঙ্গিলাও সেদিকেই এগিয়ে যায়, বলে—দাও স্যুট্‌কেসটা আমার হাতে। স্যুট্‌কেসটা প্রদোষের হাত থেকে নেয়। তারপর প্রদোষের মুখের দিকে চেয়ে সে একটু চমকে ওঠে, বলে—একি, তোমার মুখের চেহারা এমন কেন? চোখ এত রাঙা? ভালো আছো তো?

একটু হেসে প্রদোষ বলে—তেমন ভালো আর কোথা? বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে। চোখ দু'টো কি খুব রাঙা বোধ হচ্ছে?

শুনে রঙ্গিলা আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে—জ্বর? সে কি গো? বিদেশে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে জ্বর নিয়ে এলে? এখানে না আছে ডাক্তার না আছে বদ্যি।

প্রদোষ স্তোক দিতে চেষ্টা করে রঙ্গিলাকে—ও শ্রমজ্বর, দু'দিন বিশ্রাম পেলে আশা করি ঠিক হ'য়ে যাবে। ব'লে আরক্তচক্ষে ক্লান্ত দেহে প্রায় একরকম টলতে টলতেই প্রদোষ আগে থেকে ঠিক-ক'রে-রাখা একটি গরুর গাড়িতে উঠে বসে রঙ্গিলার হাত ধ'রে। স্টেশন থেকে রঙ্গিলার ডেরা অন্তত দুইক্রোশ—একটি সঙ্গতিপন্ন সজ্জন মুসলমানের বাড়িতে।

প্রদোষের অবস্থা দেখে রঙ্গিলার কিন্তু বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছিলোনা যে দু'দিন বিশ্রাম পেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে ব'লে। হ'লোও তাই। সব ঠিক হ'য়ে গেলো না, প্রদোষের জ্বর বাড়লো।

রঙ্গিলার পারিবারিক চিকিৎসার কয়েকটিমাত্র ঔষধে আর কুলোলো না। জ্বরের প্রকোপ দেখে ভয় পেয়ে গেলো রঙ্গিলা। এ্যালোপাথ ডাক্তার আনতে হলো ১৫।২০ মাইল দূরের শহর থেকে। সপ্তাহ কেটে গেলো রোগনির্ণয় হ'লো

না। নিজেকে নিয়ে কোনোদিন এ রকম বিব্রত হ'য়ে পড়ে নি রঙ্গিলা। রোগোদ্ধারের চেষ্টার তলায় দেশোদ্ধারের চেষ্টা চাপা পড়ে গেলো। সমিতির চিঠিপত্র টেলিগ্রাম আসে, উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক খোলা পর্যন্ত হয় না। অর্থহীন মনে হয় সব, স্বধু রোগশয্যার শিয়রে ব'সে এই যে অনন্যমনা সেবা এ-টুকুই যেন সার্থক। অঙ্গের অবশিষ্ট অলঙ্কার উন্মোচন ক'রে রঙ্গিলা অর্থ সংগ্রহ করলো। তার মনে হতে লাগলো এ যেন এক পুণ্যযজ্ঞ, একমাত্র এতেই সে নিজেকে ধন্য ক রতে পারে। সেই অর্থের বিনিময়ে শহর থেকে ডাক্তার আসতে লাগলো নিত্য; রোগীর রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলো শহরে। রিপোর্ট এলো টাইফয়েড। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়, কোনো দিকে ফিরে তাকাবার সময় পায় না রঙ্গিলা। এইভাবে জীবন-মৃত্যুর ধস্তাধস্তি সে উদ্বিগ্নচোখে অসহায়ের মতো দেখতে লাগলো আর সাহসে বুক বাঁধলো। বিকারের ঘোরে কতো সময়ে কতো কি ভুল বকতো প্রদোষ, বিছানা ছেড়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করতো দেখে-শুনে শঙ্কিত হ'লেও রঙ্গিলা একেবারে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো না; যতদূর সম্ভব প্রদোষের শুশ্রূষায় অবিচলিত থাকতেই চেষ্টা করলো। প্রদোষের সেবায় নিযুক্ত থাকাই যেন এখন তার কাছে প্রেরণার মতো।

এম্নি ক'রে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দেবার পর প্রদোষের জ্বর-বিকার কাটে, ডাক্তার কিছু আশ্বাস দিয়ে যান। শেষটায় জ্বর একদিন সত্যিই আর এলো না— রঙ্গিলার সেদিন কী আনন্দ !

…প্রদোষ এখন আরোগ্যের পথে। তাই রোগীর কাজ আগের চেয়ে অনেক কম; স্বতরাং রঙ্গিলা এখন প্রসাধনেরও সময় পায়। প্রাতঃকালীন প্রসাধন সেরে সে সবেমাত্র প্রদোষের ঘরে ঢুকেছে তখনো সকালের রোদে রাত্রির লজ্জার লাল আভা কাটেনি অম্নি প্রদোষ রঙ্গিলার খুশি-খুশি মুখখানার দিকে তাকিয়ে ব লে উঠলো—তোমাকে আজ নাম ধ'রে ডাকবো, কমরেড ?

উত্তরে রঙ্গিলাও হাসিতে মুক্তার ঝিলিক এনে বললো—ডেকো। তোমার যে এ খেয়াল হ'বে সে তো আমার ভাগ্য।

সেদিন রাখী উৎসব !

প্রদোষ ডাকলো—রঙিল !

রঙ্গিলা ওর শয্যা-শিয়রে দাঁড়িয়েই উত্তর দিলো—কী ?

প্রদোষ বললো—সকালের চেয়েও রঙিল তুমি।

রঙ্গিলা বললো—তুমি প্রদোষের চেয়ে।

কী ফুলের গন্ধ আসছে বলো দেখি?···প্রদোষের সহাস্য জিজ্ঞাসা একটু কুটিল হলো।

রঙ্গিলা উত্তর দিলো—কামিনী।

প্রদোষ বললো—কামিনীর গন্ধ এই রকম?

রঙ্গিলা বললো—হ্যাঁ গো।

প্রদোষ বলে—এর আগে তো কোনোদিন পাইনি?

রঙ্গিলা বলে—খেয়াল করোনি তাই।

প্রদোষ বলে—আগে হয়তো ফোটেনি তাই। এবার ফুটেছে।

—হুঁ, ফুটিয়েছো।·· পিঠের ওপর সপাৎ ক'রে বেণীটা ফেলে পালিয়ে গেলো রঙ্গিলা। কিন্তু ফিরে এলো একটু পরেই আঁচল ভ'রে কামিনী ফুল তুলে নিয়ে। কিছু ফুল রেখে দিলো বালিশের পাশে, বাকিটা আঁচলে নিয়ে গাঁথতে গাঁথতে বললো—আজকের রাখী-উৎসবে ফুলের রাখী বেঁধে দেবো তোমার হাতে।

একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রদোষ শুধালো—ফুলের?

রঙ্গিলা বললো—হ্যাঁ গো, দেখছো না গেঁথেছি?

রঙ্গিলা ফুলের রাখীটা প্রদোষকে দেখালো, ওর হাতে পরিয়েও দিতে গেলো।

প্রদোষ বললো—কিন্তু ফুল যে বড়ো কোমল, বড়ো কমনীয়, বড়ো ক্ষণিক কমরেড! অতো ফুলের রাখীর আদান-প্রদান করতে গেলে রাখী যে-সংকল্পের প্রতীক সেই সংকল্পই দুর্বল হ'য়ে পড়তে পারে, তাই নয়? প্রতীক-নির্বাচন কাব্যিক হতে পারে প্রশংসনীয় নয়।

—না ভয় নেই, এ রাখী যাকে দিচ্ছি মন তার ইস্পাতে বাঁধা। রক্তাক্ত হ'বে তবু সে-বাঁধন আল্গা হ'বার জো নেই। সেজন্য তার বাহ্য-প্রতীক ধারণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই।

রঙ্গিলা ফুলের রাখীটা পরিয়ে দেয় প্রদোষের হাতে। প্রদোষ হাসে, বলে—আমি তোমায় ইস্পাতের রাখী দেবো—সংকল্পের দৃঢ়তার স্মারক।

রঙ্গিলা বলে—জন্ম-জন্ম তাই দিও তুমি। লোহার রাখীই পরিয়ে দিও এই হাতে। রঙ্গিলা বাড়িয়ে দেয় বাঁ হাতখানা। রঙ্গিলার হাতখানা প্রদোষ হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—সোনার কলঙ্কও রাখো নি, এম্নি ক'রে শূন্য ক'রে ফেলেছো হাত?

রঙ্গিলা প্রদোষের কাছে সত্যগোপন করতে গিয়ে বলে—ভালো লাগলো না তাই সিঁৎলে ফেলেছি চুড়ি। ধনিসমাজের ও-সব কৌলীন্য সর্বদা অঙ্গে না রাখাই ভালো।

প্রদোষ বলে—এতদিন রেখেছিলে যখন আজকে হঠাৎ একথা কেন ?

রঙ্গিলা বলে—কেন আবার ? তুমিই তো বলো—সোনা জিনিশটা বড্ডো বেশি সম্ভ্রান্ত, বড্ডো বেশি কুলীন। যাদের সঙ্গে আমায় কাজ করতে বলো, যাদের মধ্যে আমায় ফিরতে বলো, যাদের হাতে আমায় হাত মিলোতে বলো—তাদের কাছে সোনা হাতে দিয়ে গেলে তারা তো আমার হাতে হাত মিলোবে না—তারা যে পেছিয়ে যাবে ভয়ে, তারা যে অবিশ্বাস করবে আমায়, আমার কথায়।

প্রদোষ বলে—বেশ, যাদের বিশ্বাস হারাবার ভয়ে অলঙ্কারের কলঙ্কও রাখোনি অঙ্গে, তারা তো কেউ উপস্থিত নেই তোমার পাশে। আমি অন্তত সইতে পারবো তোমার হাতে দু'একগাছা সোনার চুড়িও। যাও, নিয়ে এসো দেখি আজ সোনার রাখী পরিয়ে দিই তোমার সোনালি হাতে।

রঙ্গিলা স্যুট্‌কেস্ খুলে বের ক'রে আনে একটা নোয়া—সাবিত্রীর নোয়া কে যেন কবে দিয়েছিলো তাকে। কী ভেবে যে সে এতদিন এটা ফেলে দেয়নি তার মনই জানে। এটার কথাই আজ তার মনে এলো। বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়ে রঙ্গিলা বললো—দাও পরিয়ে।

প্রদোষ বুঝে ফ্যালে, বলে—গয়নাগুলো দিয়েই বুঝি আমায় বাঁচিয়েছো ? নইলে টাকা পেলে কোথা থেকে ? ইতিমধ্যে টাকা তো আর আসেনি সঙ্ঘ থেকে ? বুঝেছি, সেগুলো আর নেই।

রঙ্গিলা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না, স্তোক দিতে গিয়েই যেন বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।

কই, বের করো তাহ'লে দেখি ?—প্রদোষ বলে।

প্রদোষের শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলো রঙ্গিলা। সে শয়ান প্রদোষের ওষ্ঠ দু'টি চেপে ধ'রে বলে—চুপ করো ; গয়নার কথা উচ্চারণ করতে নেই এ-রকম জায়গায়। বের করা তো দূরের কথা।

প্রদোষ বোঝে সব, হাসে। বলে—কেন বলো তো ?

রঙ্গিলার চোখ রঙ্গ করে। কথায় সে হারতে চায় না, বলে—চোর-ডাকাতের দেশ কিনা।

প্রদোষ বলে— তা ছাড়া আমিও তো খুব সাধু নই কিনা।

রঙ্গিলা বলে—নওই তো। সরকার বাহাদুর বলেন মিথ্যে না, তুমিই ডাকাতের সর্দার।

রোগশীর্ণ পাণ্ডুরমুখে প্রদোষ হাসে। গর্বিত মমতায় সেইদিকে চেয়ে সখী নিজেকে ধন্য মনে করে। প্রদোষ যে আজ আরোগ্যের পথে এই কীর্তি

রঙ্গিলার দেশোদ্ধারের চেয়ে তুচ্ছ নয়। রোগীর পথ্য প্রস্তুত করতে করতে রঙ্গিলা ভাবে, প্রদোষকে মাস কয়েক কী ক'রে এখানে আটকে রাখা যায় যে পর্যন্ত না ওর শরীর ভালো ক'রে সারে। কদমগাছটায় কী কতকগুলো শিকারী পাখি বড়ো কর্কশ কোলাহল করে। রঙ্গিলার অনুভূতির অনির্বচনীয়তার প্রতি ওদের যেন দরদ নেই, দৃক্‌পাত নেই। তবু ওদেরও যেন আজ সহ্য করা যায়—সকলকে আজ যেন ক্ষমা করা যায়। আজকে প্রাণের মহোৎসবে সকলকে যেন উদারভাবে ডাকা যায়—বলা যায়, এসো, ধন্য করো, পূর্ণ করো আমায়। বৃষ্টির পালা এতদিনে বুঝি ফুরোলো? আকাশে ময়ূরের গলার রং দেখা দিয়েছে। মাসের আজ কতো তারিখ? শেষ হ'তে চললো কি? নতুন ঋতু আসছে যেন নতুন উষ্ণতা নিয়ে—কোথায় যেন সাড়া জেগেছে··· গুঞ্জন শোনা যায়। আজকের রাখী-উৎসবের স্বর্ণ-দিন নতুন শতাব্দীর সূচনা করুক!

দুধটা উনোনে চড়িয়ে রঙ্গিলা একটু অলস ভাবনার সময় পায়। কোন্ শাড়িটা সে পরবে, আজকে জগৎ যেন চেয়ে আছে তার দিকে। কী-কথা বলাবলি করছে অমন দুর্বোধ ভাষায়? ওদেরও যেন আজকে বোঝা যায়। কিসের শব্দ? চাতক ডাকছে কোথা থেকে? ঠিক বোঝা যায় না। তার নিজেরই বুক থেকে নয় তো? কার দুটো শিশু-চোখ আজকে তাকে বিহ্বল হয়ে ডাকে? ও দুটো চোখের জন্য মনে হয় আজ নিজেকে সাজাই, ও দু'টো চোখের জন্যই মনে হয় মনের মতো ক'রে জগৎকে আজ সাজাই। কে ও? কে? কে তুমি? বলো, কী নাম তোমার? প্রেম? না, না, তুমি আমাকে দুঃখ দেবে। দুঃখ দেবে তুমি? দাও, তাই আমাকে দাও। আমাকে নেবে তুমি? নাও, তুমি আমাকে নাও।

দুধ ফুলে ওঠে উনোনে, নামিয়ে নেয় রঙ্গিলা। অমনি ক'রে আবেগও আজ উথলে উঠছে তার হৃদয়ের কুম্ভে। প্রখর প্রেমের আগুন! ওরই উত্তাপে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে বুকের অমৃত, ওথলানো-দুধের মতোই।

প্রদোষ সেরে উঠেছে মনে হ'লেই কেমন যেন স্বস্তি, কেমন যেন তৃপ্তি লাগে। প্রদোষ নিজহাতে তাকে নোয়া পরিয়ে দিয়েছে আজকে রাখী-পূর্ণিমার দিনে—এয়োতীর চিহ্ন। যদিও এয়োতীর চিহ্ন-ধারণে তাদের কোনো আস্থা নেই তবু যেহেতু এটা প্রদোষ আদর ক'রে ডেকে পরিয়ে দিয়েছে তাই এটা মূল্যবান।

কী-কী আদরের নাম ধ'রে আজকে প্রদোষ ডেকেছে তাকে, কী-কী কথা বলেছে, কেমন ক'রে ক'বার চেয়েছে তার দিকে, চুপি চুপি সেই সব কথার

আলোচনা করতে ইচ্ছে যায় ঐ নির্জন দেয়ালটার সঙ্গে। প্রদোষকে সারিয়ে তোলার আশাতিরিক্ত মূল্য সে পেয়ে গেছে, মনে হয়।

দূর থেকে কোন্ পথিক-বাউলের একতারার শব্দ আসে—বং বং বং। ললিত কণ্ঠের গান—কিন্তু একি বৈরাগীর গান? রঙ্গিলা মন দিয়ে শোনে—

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।

এ আবার কেমন বাউল, কোন্ বৈরাগী ভাবে রঙ্গিলা। গান ও একতারার বং বং শব্দ আরো নিকটে আসে। তাদের দোর-গোড়াতেই থেমে যায় গান। স্থধু ক'বার একতারার টঙ্কারের সঙ্গে শোনা যায়—রানীজীর জয় হোক! ভিখারী কি ফিরে যাবে লক্ষ্মীর দোরে?

এবার গলা শুনে যেন চমকে ওঠে রঙ্গিলা, মুখ বাড়িয়ে দেখে—কে? মহাদেবের মতো এ আবার কোন্ ভিখারী? কী চায় এ? বিস্ময়ের উচ্ছ্বসিত শব্দ বেরিয়ে পড়ে রঙ্গিলার গলা থেকে। একে ভিক্ষে দেওয়ার মতো এ দেশে আছে নাকি কিছু? একবার ভাবে প্রদোষকে বলবে নাকি চেঁচিয়ে ছাখো, ছাখো চেয়ে আমাদের দোরে কে এলো ভিখারী আজ! পরক্ষণেই ভাবে থাক্। এই তো সে দেখে এলো প্রদোষ ঘুমিয়ে পড়েছে ··।

রঙ্গিলা ভিক্ষে দিতে যায়; ভিক্ষে চাল নয়, একটা থালায় একটি রাখী।

ঝুলি ফাঁক ক'রে যে-প্রার্থীটি এগিয়ে আসে সে ভিখারী নয়, বন্ধুদা। রঙ্গিলার বুঝতে বাকি থাকে না।

রাখী তু'টো রঙ্গিলা ঝুলিতে ফেলে দেয়না, বলে—ভিক্ষে তো নয়, প্রণামী নাও। দেখি হাত। তোমায় ভিক্ষে কে দেবে বলো? এমন তপস্যা কার আছে এ-ভু-ভারতে?

বন্ধুর বিপুল বলিষ্ঠ হাতের কব্জিতে কোনোমতে রাখীটা কুলিয়ে যায়। রাখীটা পরাবার সময়ে হাতটা রঙ্গিলার থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে, আবেগে চোখে জল আসতে চায়।

বন্ধু হাসে, শিশুর মতো নির্মল সে হাসি। হাসতে হাসতে সে বলে—ছেলেমানুষী অর্থাৎ মেয়েমানুষী যেন ক'রে ফেলো না, কম্রেড। কিচ্ছু বলতে হ'বে না, তোমাদের খবর সব আমি জানি। যে-ঝড় ব'য়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে তা' আমার অজানা নেই। এখন আর ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকো। প্রদোষকে চাঙ্গা ক'রে তোলো। এই এখন তোমার কাজ। আমি তোমাদের কাছেই আছি। উপস্থিত ২২নং ক্যাম্পে ডেরা ফেলেছি তোমাদেরই জন্যে।

রঙ্গিলা বলে—ভেতরে এসো, বসবে না?

বন্ধু ইঙ্গিত করে—না, আর ভেতরে যাবো না। প্রদোষকে এখন কোনো কিছু জানাবার দরকার নেই। আজকের রাখী-উৎসবের দিনে তুমি যে আমায় রাখী দিলে আমি তো ভিখিরী মানুষ, দেখছোই তো। এর বিনিময়ে কোথায় কী পাবো যে তোমায় দেবো? অতএব তোমারই জিনিশ তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি। একটা কথা জিগেস করি, গয়না বাঁধা দিয়েছিলে? কার কাছে দিয়েছিলে? জানো সে খবর? উঃ কী বোকা মেয়ে! ডান হাতের কাজ বাঁ হাতের কাছে লুকোতে গিয়েছিলে? আমায় জানাওনি, সঙ্ঘের কাছে জানাওনি তবু? প্রদোষের জীবনের দাম কি সঙ্ঘের কাছে কিছুই নয় ভাবো? একি একা তোমারই দায়?

রঙ্গিলা লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

শেষপর্যন্ত সেটা যখন আমার কাছেই পোঁছেছে এখন লুকিয়ে লাভ নেই। যা হ'য়েছে ভালোই হ'য়েছে। আজকের দিনে তবু তোমার হাতে সোনা দিতে পারলুম!

ভিক্ষের ঝুলি থেকে বন্ধু একগোছা সোনার চুড়ি বের করে। রঙ্গিলার হাতে এক এক ক'রে পরিয়ে দিতে থাকে। হঠাৎ টপ্ টপ্ ক'রে দু'ফোঁটা জল পড়ে বন্ধুর হাতে, সে ব'লে ওঠে—এঃ, শেষপর্যন্ত সেই ছেলেমানুষী অর্থাৎ মেয়েমানুষীই ক'রে ফেল্লে?

ধরা গলায় রঙ্গিলা বলে—তুমি তো সব জানো বন্ধুদা?

প্রশামক গলায় বন্ধু বলে—জানি বৈকি, বোন।

ভিখারীর ছদ্মবেশে সেদিন বন্ধু যেমন এসেছিলো তেম্নি চ'লে গেলো বাইরে থেকেই। কেবল যাবার সময়ে ব'লে গেলো—আবার আসবো। আমার প্রতিনিধি হ'য়ে প্রদোষের হাতে তুমি এই রাখীটা বেঁধে দিও। ব'লো বন্ধুদা পাঠিয়ে দিয়েছে। সাবধানে থেকো, ওকে সাবধানে রেখো। সঙ্ঘের যতো চিঠি এখন আমার ক্যাম্পেই যাচ্ছে, বড্ডো ব্যস্ত আছি। আজকের মতো যাই।

বং বং ক'রে একতারাটি বাজাতে বাজাতে চ'লে যায় বন্ধু। যতোক্ষণ দেখা যায় রঙ্গিলা চেয়ে থাকে সেই দিকে। তারপর তার দৃষ্টির পরিধির বাইরে বন্ধু চ'লে গেলে সে ফিরে আসে রান্নাঘরের উনোনের কাছে। একটা বেদনার মাধুর্যে ভ'রে থাকে ওর মন। উঁকি মেরে দেখে যায় প্রদোষ তখনো ঘুমোচ্ছে। চারিদিকে কী উজ্জ্বল দিন! আঁচলে চোখ মোছে। তার চোখের জলে ধুয়ে গিয়েই বুঝি এতটা উজ্জ্বল হ'য়েছে দিন!

এই তো এই রান্নাঘরের নিভৃতে সে পেয়েছিলো প্রেমের চকিত দেখা—সে পেয়েছিলো প্রেমকে। এখন যে পেয়ে গেলো 'প্রেমের-চেয়ে-বড়ো'র দেখা। বিস্ময়ে, আনন্দে, বেদনায়, মাধুর্যে, সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, সকরুণ কৃতজ্ঞতায় একশা ক'রে দিয়ে গেছে সে। একবার দেখা দিয়ে চোখ তার আবার ধাঁধিয়ে দিয়ে গেছে বন্ধু, তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।

প্রদোষ শুধু তারই নয়, প্রদোষ যে সারা দেশের। দেশের দশের মুখ চেয়ে ওর ওপর তার সব দাবি ছাড়তেই হ'বে। যতোই কঠিন হোক সে-কাজ তবু তাকে তা' করতে হবেই।

সব কাজ সেরে রান্নাঘর থেকে রঙ্গিলা যখন প্রদোষের ঘরে ঢুকলো, প্রদোষ তখনো ঘুমোচ্ছে—কেমন ক্লান্ত, কমনীয় ওর ঘুমোবার ভঙ্গিটি। এখন তার হাতে কোনো কাজ নেই, অনেক অবসর। প্রদোষের শিয়রে এসে বসে নিঃশব্দে।

কী জানি কেন তবু ঘুম ভেঙে যায় প্রদোষের। চোখ চায়। বলে—কতক্ষণ এসেছো? রান্নাঘরের সব কাজ সারা হ'য়ে গেছে?

রঙ্গিলা বলে—এই তো এলাম। যেম্নি এসে বসেছি তুমিও অম্নি জেগে উঠলে। সব কাজ সারা হ'যে গেছে।···এইবার তুমি খাবে না?

প্রদোষের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেয় রঙ্গিলা। প্রদোষ আবার চক্ষু বুজোয়। প্রদোষের মুখের কাছে মুখ এনে ঝুঁকে প'ড়ে রঙ্গিলা জিগেস করে—ঘুম পাচ্ছে? কিন্তু এখন আর ঘুমোয় না, খাবার আনি? একেবারে খেয়ে ঘুমিও'খন। কই দেখলেও না একবার আমার হাতের দিকে চেয়ে?···রঙ্গিলা অভিমানের অভিনয় করে।

প্রদোষ চোখ চেয়ে বিস্মিত হয় রঙ্গিলাকে দেখে, হাতে ওর চুড়ি, এতক্ষণ লক্ষ্যই পড়েনি। বলে--বেশ, বেশ, ওগুলো কি তোমার কাছেই ছিলো? কখ্খনো না।

—কাছেই ছিলো না তো এর মধ্যে নিয়ে এলাম কোথা থেকে, বলো?

প্রদোষ বলে—যাই হোক, যেখানে থাক্ আমি কিন্তু—খুব খুশি হ'য়েছি দেখে। দেখি দাও তো হাতখানা। রঙ্গিলার হাতখানা প্রদোষ হাতের মধ্যে নেয়, বলে—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি এগুলো তোমার কাছে ছিলো না। থাকলে তখনই তুমি বের করতে যখন অতো ক'রে বল্লাম।

রঙ্গিলা বলে—থাক্‌গে এখন ওকথা। এর রহস্য না হয় আর দু'দিন পরেই জেনো, কী বলো? আর দেরি করেনা এই রোগা শরীরে। খাবার আনিগে যাই।

তখনই রঙ্গিলা পথ্য এনে হাজির করে। প্রদোষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে রঙ্গিলার

দিকে চেয়ে বলে—আমার জন্যে তোমার খুব দুর্ভোগ যাচ্ছে যাহোক। সারাটা দিন হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়েই কাটছে।

উত্তরে রঙ্গিলা বলে—ওকথা বোলো না—তোমায় যে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছি এর চেয়ে আর আমার সুখ কী? দিনের বেশির ভাগ রান্নাঘরে কাটলেও তুমি জানো না আজকাল দিনগুলো আমার কী আনন্দে কাটে।

প্রদোষ বলে—সত্যি নাকি?

রঙ্গিলা বলে—নয় তো কি? আগে রান্নাঘরে ঢুকতেই পারতুম না, সেও তো তুমি জানো। আর এখন কী রকম অভ্যেস হ'য়ে গেছে তাও তো তুমি দেখছো? মেয়েমানুষের সব রকম অভ্যেস থাকা উচিত। ইস্, শাড়ি থেকে যে বড্ডো ধোঁয়া গন্ধ বেরোচ্ছে—মাগো, কী বিশ্রী! ব'লে নিজেই নিজের নাকের কাছে শাড়ির আঁচলটা ধরে, বলে—কাপড়টা বদলে গাটা ধুয়ে পুকুরঘাট থেকে আসছি এক্ষুনি·· ততক্ষণ তুমি বরং কাগজটা পড়ো।

প্রদোষ জিগেস করে—পুকুর কোথায় এখানে?

—আছে একটা পেছন দিকে। তুমি তো জ্বর নিয়ে এলে, ছাখোনি কিছুই। ব'লে রঙ্গিলা পিছনের ছোটো জান্‌লাটা খুলে ছায়—দেখছো? ঐ ছাখো।

আজকে রঙ্গিলা একটা মিহি তাঁতের কাপড় এবং সাবানের কৌটো নিয়ে ঘাটে যায়, ব'লে যায়—জান্‌লাটা খোলাই রইলো, কেমন? ঘাট থেকে দেখতে পাবো তোমাকে। ব'লেই হেসে ফ্যালে রঙ্গিলা।

প্রদোষ হাসতে হাসতে বলে—এ আবার কী খেয়াল?

রঙ্গিলা বলে—তুমি তো আর ওদিকে চাইছো না, খোলা রইলোই বা?

প্রদোষ সহাস্যে বলে—ভুলেও তো চেয়ে ফেলতে পারি?

সোজাসুজি রঙ্গিলা বলে—চাইলেই বা! তুমি তো আর ভস্মলোচন নও যে চাইবামাত্র ভস্ম হ'য়ে যাবো কিংবা টুক্ ক'রে গ'লে জল হ'য়ে মিশে যাবো পুকুরে!

—তুমি আমায় পরীক্ষা করতে চাও, কম্‌রেড?

—তোমায় পরীক্ষা? না, অতো ধৃষ্টতা আমার আর নেই। নতুন ক'রে আজকে আবার তোমায় কী পরীক্ষা করবো, বলো তো? এর চেয়ে বয়স যখন আমার বছর আষ্টেক কম ছিলো, যৌবন যখন আরো অনেক কমনীয় ছিলো, ছলা-কলা দেখিয়ে তখন যদি না বাঁধতে পেরে থাকি তো এখন পারবো? ও-রকম কিছু মনে এলে গলায় দড়ি দিতুম।

কথার শেষ দিকটায় রঙ্গিলা যেন কিছুটা বেদনা প্রকাশ ক'রে ফ্যালে। জান্‌লাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে রঙ্গিলা চ'লে যায়। খানিক বাদে রঙ্গিলা যখন

পুকুরঘাট থেকে ফিরে আসে প্রদোষ কৌতুক ক'রে বলে—তোমার এত দেরি হচ্ছে দেখে ভয় হ'লো একা গেছো পুকুরঘাটে। অন্য কিছু না হলেও ডুবে তো যেতে পারো। সাঁতার নিশ্চয়ই জানো না—শহরের মেয়ে। ভাবলুম, দেখি, হাত বাড়িয়ে জান্‌লাটা খুলে। জান্‌লা যেমনি খুলতে গেছি দেখি কাপড় ছাড়ছো।

হাতের ভিজে কাপড়টা ঝপ্ ক'রে মাটিতে ফেলে দিয়ে রঙ্গিলা বালিকার মতো দাপাদাপি ক'রে ওঠে অনুনাসিক উচ্চ হাসিতে—উঃ বাপ্‌রে, কী মিথ্যেবাদী একেবারে পুকুরচুরি কাণ্ড!

নিজেরই কৌতুকে প্রদোষ নিজেও খুব হাসে।

বলে—এই ছাখো বিশ্বাস করছো না? আরে! সবটা খুলিনি একটুখানি ফাঁক ক'রে দেখে আবার ভেজিয়ে দিয়েছি।

রঙ্গিলা বলে—বেশ করেছো। ভাবছো বুঝি এই ব'লে আমায় লজ্জা দেবে? পারবে না।

প্রদোষ বলে—আজ ৫।৬ বছর আগে এই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি কী রকম খাপ্পা হ'য়ে উঠেছিলে মনে আছে?

রঙ্গিলা বলে—সেকথা ছেড়ে দাও। তখন কি তোমায় এমন ক'রে বুঝেছি।

প্রদোষ বলে—জান্‌লার ব্যাপার যদি সত্যি হয় তাহ'লে লজ্জার কিছু খুঁজে পাও না, রঙ্গিলা?

দ্বিধাহীন কণ্ঠে রঙ্গিলা বলে—না, শুকদেবের চোখকে আবার কিসের লজ্জা?

পুরোনো খবরের কাগজের তাড়া নিয়ে এবার বসে রঙ্গিলা। মাসখানেকের পুরোনো কাগজ ঘেঁটে, বেছে, প'ড়ে শোনাবে প্রদোষকে। প্রদোষ যখন অসুস্থ ছিলো তখনকার কোনো খবরই তো জানা নেই প্রদোষের। তাই কয়েক-দিনের মধ্যে এইভাবে খবরগুলো প্রদোষ জেনে নিচ্ছে রঙ্গিলার কাছ থেকে।

খবর শুনতে শুনতে একসময়ে প্রদোষ বলে—এবার থেকে বিকেলে একটু ক'রে বেরোনো অভ্যেস করা যাক্। কী বলো?

—ভালোই তো, পারবে আজ থেকে?···রঙ্গিলা জিগেস করে।

প্রদোষ বলে—পারবো। পারতেই হ'বে। কী ভাবে এখন সময় কাটাচ্ছি বলো তো? দেহের আলস্যে মনও যে ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে।

রঙ্গিলা বলে—আমার তো মনে হয় আরো দিনকতক তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, ডাক্তারও দেখো এই কথাই বলবে।

প্রদোষ বলে—কতো যে কাজ প'ড়ে রয়েছে যা সময়মতো না করলে পণ্ড হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।

রঙ্গিলা বলে—সবই বুঝি। তবু তুমি আরো দিনকতক অবসর নাও। সঙ্ঘের চিন্তা মনে এনোনা।

—সঙ্ঘের কী হচ্ছে কিছুই তো খবর রাখি না। কোনো খবরই জানতে দাও না।

রঙ্গিলা বলে—সময় হ'লেই জানবে। এখুনি নতুন কোনো কাজের ভার নিতে যেওনা। আমার এই অনুরোধটি রাখো। আবার আগের শক্তি ফিরে পেলে তখন ও-সব চিন্তা কোরো। শরীরের দিকে ছাখো আগে।

—বন্ধুদার খবর জানো কিছু? প্রদোষ জিগেস করে।

রঙ্গিলা বলে—তোমার অসুখ তাঁকে জানানো হয়েছে। সব কাজ ছেড়ে এখন তিনি এখানে এসেই রয়েছেন এই পর্যন্ত খবর পেয়েছি। সঙ্ঘের কাজ তাঁর নির্দেশমতোই চলছে। তুমি আমার ওপর নির্ভর ক'রে এখন দিনকতক ভালো ক'রে সেরে নাও। বন্ধুদা এতে খুশিই হ'বেন।

—বন্ধুদা আমাদের এখানে এসেছিলেন?—প্রদোষ জিগেস করে।

রঙ্গিলা বলে—না, ঠিক আমাদের বাড়ি ঢোকেননি কখনো। তবে কাছাকাছি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। তিনি আমাদের সব খবর রাখেন কিন্তু নিজের খবর বা সঙ্ঘের খবর জানিয়ে এখন আমাদের উদ্বিগ্ন করতে চান না। তুমি ভালো ক'রে সেরে না ওঠা পর্যন্ত সঙ্ঘের কাজে তিনি আমাদের বিব্রত হ'তে দেবেন না।

চিন্তিত মুখে প্রদোষ বলে—কিন্তু বন্ধুদাকে এতদিন ধ'রে জড়িয়ে রেখে দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের ঘেরাও ক'রে ফেলার একটা চেষ্টা গত কয়েকমাস ধ'রে খুব সক্রিয় হ'য়ে রয়েছে, বিশেষ ক'রে সমরেশের ঐ ব্যাপারটার পর।

রঙ্গিলা বলে—এখানে ওঁকে না জড়িয়ে রেখেই বা কী করা যায় বলো? তুমি প'ড়ে রইলে—আমি রইলাম তোমায় নিয়ে।

রঙ্গিলাকে বাধা দিয়ে প্রদোষ ব'লে ওঠে—না, না, এই তো খাড়া হ'য়ে উঠেছি ছাখো না।

প্রদোষ রোগশীর্ণ দীর্ঘ দেহটাকে চেষ্টা ক'রে খাড়া ক'রে তোলে, ওর দিকে চেয়ে রঙ্গিলার চোখে জল আসতে চায়।

রঙ্গিলা তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। প্রদোষের এখনো পায়ের ঠিক হয় নি, দাঁড়ালে হাঁটু কাঁপে।

—বাইরে দাওয়ায় গিয়ে বসবে একটু?—রঙ্গিলা জিগেস করে।

রঙ্গিলার কাঁধে ভর দিয়ে প্রদোষ বলে—তাই চলো।

এই প্রথম রোগশয্যা এবং ঘর ছেড়ে বাইরে এলো প্রদোষ।

দুই

সীমান্তে বিপ্লবাত্মক কাজ চালাবার জন্যে সঙ্ঘের একটা নতুন মন্ত্রণাকেন্দ্র যেখানে খোলা হ'য়েছে রঙ্গিলার ক্যাম্প থেকে সেটা প্রায় মাইল পনেরো দূর হ'বে। জায়গাটা ছোটোখাটো শহর গোছের। শহরের বাইরে পাকা সড়ক যেখানটায় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ক্ষীণ হ'য়ে গেছে সেইখানটায়—সেই বনের মধ্যে স্থানীয় জমিদার চৌধুরীদের পোড়ো বাড়িটা ছিলো। পুরাকালের সেই পরিত্যক্ত অট্টালিকার আজো দু'একটি মহলের কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে মাত্র। কতোটুকু আছে সেটুকু জানবার কৌতূহলও হয়নি কারো। চৌধুরীবাড়ির আভিজাত্যের বোঝা নিয়ে বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ আজো সে বনের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাধিস্থ আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাড়ি তৈরি করবার প্রয়োজন পড়লে সেই জঙ্গল ভেঙেও লোকে যাতায়াত করতো। কতোলোক পুরোনো ইট-কাঠের লোভে এসে সাপের কামড়ে মারাও পড়েছে তাই এখন আর চোরেও ঘেঁষে না ওদিকে। সকলেই ভয় পায়। ওদিকটায় বড্ডো সাপ। এখন হরিণ-বাড়ির অস্তিত্ব নেই তবু এদিকের জঙ্গলটার উল্লেখ করতে হ'লে লোকে এখনো বলে 'হরিণ-বাড়ির জঙ্গল'। চৌধুরী-বাড়ির মতো এ-বনটারও যেন আভিজাত্য আছে—চারিদিক থেকে জঙ্গলের দুর্ভেদ্য-প্রাচীর রচনা ক'রে আজও যেন সে বাবুদের বাড়ির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করছে। এই হরিণ-বাড়ির জঙ্গলের কাছাকাছি কোথাও বসতি নেই। এ-ধারটায় আসতে বড়ো একটা কাউকেই দেখা যায় না। হঠাৎ আজ ক'দিন জনকয়েক বৈরাগীকে দেখা যাচ্ছে এ-পথে। পথে তাদের দেখেছে গ্রামের লোক—ওদেরই আখড়া নাকি এ বনের মধ্যে। সে নিঝুম বন আজও দিনের বেলায় আগের মতোই ঝিমোয় কোনো সাড়া-শব্দ, কোনো প্রাণ-লক্ষণই পাওয়া যায় না। কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই সে-বন সন্দেহজনকভাবে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। দিনের বেলায় বৈরাগীরা মাধুকরী সংগ্রহ করতে শহরের দিকে যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। জোনাকির মতো মিটিমিটি সঞ্চরমাণ আলোর শিখা ইতস্তত দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের চারিধারে। মানুষের গলার শব্দও পাওয়া যায় কিন্তু সেই আলো দেখবার জন্যে বা সেই কথা শোনবার জন্যে ওৎ পেতে থাকবার মতো সাহসী বা কৌতূহলী কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বনের মধ্যে।

সন্ধ্যা তখনো ঠিক হয়নি এক ভদ্র যুবককে এই পাকা সড়ক ধ'রে হরিণ-বাড়ির জঙ্গলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত এসে ইতস্তত করতে দেখা গেলো। আগন্তুককে দেখলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি এ-জায়গার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। তিনি

হয়তো বনের মধ্যে ঢোকার পথ খুঁজছিলেন। জঙ্গল ভেঙে খানিকটা গিয়ে, শেষটায় আর এগোবার চেষ্টা না ক'রে আগন্তুক ফিরে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছেন এমন সময়ে পিছনে একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর পেয়ে ফিরে তাকান—হরি বোল, হরি বোল··· !

গেরুয়াধারী বৈরাগী একজন আসছেন তার দিকে। বৈরাগীকে দেখামাত্রই আগন্তুক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করেন।

—আরে, হিমাংশু হঠাৎ যে! খবর ভালো তো সব ?

আগন্তুক বিমর্ষমুখে বলে—না, বন্ধুদা, ভালো নয়। বিশেষ সংকট উপস্থিত, আপনার উপদেশ নেওয়ার জন্য তাই তো এলাম। সমরেশদা বিশ-নম্বর ক্যাম্পের আটক থেকে পালিয়েছেন আবার।

দুঃসংবাদটা শুনেই বন্ধুর মুখের পেশীগুলো মুহূর্তের জন্য কঠোর হ'য়ে ওঠে··· কিন্তু সে কেবল মুহূর্তেরই জন্য, পরে আবার আগের মতোই প্রসন্নমুখে বলে—বাঃ, বেশ, সাবাস্ যাহোক! কী ব্যাপার বলো তো? বিশ নম্বর ক্যাম্পের লোক আফিং ধরলো নাকি ? কাগজপত্র কিছু খোয়া গেছে তো ?

হিমাংশু হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

বন্ধু বলে—হুঁঃ, তারপর ? রঙ্গিলার ক্যাম্পে হ'য়ে এসেছো ? খবর দেওয়া হয়নি প্রদোষকে ?

—না বন্ধুদা; আগেই আপনাকে জানাতে এলাম। আপনি যা বলবেন সেই রকম ব্যবস্থাই হ'বে।

—আগে সেখানে হ'য়ে এলে ঠিক করতে। যাক্ দেখি কতদূর কী হয়! আমার সঙ্গে সাবধানে এসো, ঐ দিক দিয়ে পথ আছে। নতুন এসেছো কিনা পথ ঠিক পাচ্ছিলে না বোধহয় ?

হিমাংশু বলে—হ্যাঁ, পথ তো সোজা নয়; খুঁজে পাওয়া শক্ত বৈকি। আর পথ খুঁজে পেলেও সে-পথে যাওয়াও তো দেখছি আরো শক্ত।

বন্ধু আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, উচ্ছ্বসিত উচ্চহাসিতে বন কাঁপিয়ে ব'লে ওঠে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি···কৃষ্ণপ্রেমের পথ তো সোজা নয়—এম্নি ক'রেই কাঁটা বিছানো বুঝলে ভাই হিমাংশু ? মন রে, হরি বল্ !···অনেক ঘোরপ্যাঁচ পথ দিয়ে যেতে হ'বে আমাদের···অনেক ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে, অনেক মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে··· ··।

অযুত ছত্রপতি বনস্পতির ছায়ায় ছায়ায়, নিরবচ্ছিন্ন কাঁটা ঝোপের বেড়া ভেঙে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরো গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যায় এরা দু'জন।

এইখানেই বন্ধুর ডেরা।

দুস্তর, তবু সেতুবন্ধন হয়

প্রদোষ যদিও আগের স্বাস্থ্য ফিরে পায়নি তবু রঙ্গিলার যত্নে, পরিচর্যায় এখন অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ ক'রেছে, রঙ্গিলার আগ্রহে রোজ বিকেলে একটু ক'রে বেড়াতে বেরোচ্ছে। রঙ্গিলাও সঙ্গে যায়। গল্পে-গাছায় সাহচর্যে দিনগুলো এখন অনেকটা লঘু হ'য়ে উঠেছে আগের চেয়ে। বহু বৎসরের নিয়মতান্ত্রিকতার শৃঙ্খল খ'সে যাওয়ায় তার মনের সামনে অবকাশের আকাশ অবারিত হ'য়ে গেছে। ছুটির হাওয়ায় হাওয়ায় দিনগুলো ছুটে যেতে যেতে আজকেই হঠাৎ যেন হোঁচট খেলো।

গৃহস্বামী গুলজার আলির পরিচারিকার ডাকাডাকিতে এ দিন প্রত্যূষে রঙ্গিলার ঘুম ভাঙলো; দোর খুলে বেরোতেই শুনলো একজন ঘোড়সওয়ার এসে তার জন্য অপেক্ষা করছে ঐ পাকুড়তলায়।

খবরটা শোনামাত্র সে এগিয়ে গেলো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারের পাকুড়-গাছটার দিকে। প্রদোষের ঘরের দোর তখনো বন্ধ, হয়তো ওঠেনি।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটার কিছুটা দেখা যায় ওদের রোয়াক থেকেই কিন্তু পাকুড়তলা দেখা যায় না, আড়াল পড়ে।

রঙ্গিলাকে এগিয়ে আসতে দেখে দূর থেকে অভিবাদন ক'রে ঘোড়সওয়ার মাটিতে নামলো।

—কী ব্যাপার, হিমাংশু?···রঙ্গিলার স্বরে আশঙ্কার আভাষ।

—ভালো না। বলছি সব। আগে বলুন প্রদোষদা কেমন আছেন।

—ভালোই আছেন। তবে আগের স্বাস্থ্যে ফিরে পেতে সময় লাগবে এখনো।

—আজকাল ঘরের বাইরে বেরোন?

—অল্প-স্বল্প। দু'চারদিন হ'লো বিকেলের দিকে একটু ক'রে বেরোচ্ছেন।

হিমাংশু বলে—তাহ'লে ··ওঁর সঙ্গে একটু যে দেখা করিয়ে দিতে হ'বে।

রঙ্গিলা কিন্তু-কিন্তু ক'রে বলে—দেখা করতে চাও? কিন্তু ওঁকে যে এখনো সঙ্ঘের কোনো কথা জানানো হয়না। এখনো ওঁর বিশ্রামের দরকার। বন্ধুদাও সেকথাই বলেন।

—আমি একথা অনুমোদন করিনা।···অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর পিছন থেকে আসে।

দু'জনেই পিছন ফিরে দেখলো প্রদোষ এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনা ভূমিকায় প্রদোষ বলে—দুঃসংবাদ আছে যা বুঝছি, খুলে বলো।

হিমাংশু বলে—বুঝেছেন ঠিকই। সমরেশদা আবার পালিয়েছেন।

—সেকি ? তোমরা তবে করছিলে কী ?···দেখতে দেখতে প্রদোষের মুখ কঠিন হ'য়ে ওঠে। হিমাংশু বলে—সমরেশদা আমার ত্রুটিতে পালাননি। ভেতরে চলুন, বলছি সব।

প্রদোষ ও রঙ্গিলাকে অনুসরণ ক'রে হিমাংশুও এসে ঢুকলো ঘরে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে উষ্মাপূর্ণ বিতর্ক চললো কিছুক্ষণ ধ'রে।

আধঘণ্টা পার হ'তে-না-হ'তে উপর্যুপরি কয়েকবার ঘোড়ার ডাক শোনা গেলো পাকুড়তলার দিকে। উচ্চকিত হ'য়ে ওরা তিনজনই জান্‌লার ধারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু পাকুড়তলাটি দেখা যায়না জান্‌লা থেকে, জঙ্গলে আড়াল পড়ে। ওরা জান্‌লায় এসে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গেই ঘোড়া-ছোটার শব্দ কানে এলো। তাড়াতাড়ি দোর খুলে ওরা তিনজনেই বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। উঠোন পার হ'য়ে রাস্তার ধারে নেমে এসে হিমাংশু ওদের দেখালো পাকুড়তলাটি ফাঁকা, তার ঘোড়াটা নেই। কারো মুখে কথা নেই। সকলেই আশ্চর্য ! সেই সময়ে সব্জীর বোঝা মাথায় নিয়ে পথ দিয়ে হাটে যাচ্ছিলো এক হাটুরে, প্রতিবেশী ব'লে রঙ্গিলা তাকে আগে থেকেই চেনে। ও নিশ্চয়ই দেখেছে, ব্যাপারটা ওকেই জিগেস করবে ভাবছিলো রঙ্গিলা। কিন্তু জিগেস আর করতে হ'লো না। নিজে থেকেই সে এগিয়ে এলো রঙ্গিলার দিকে, বললো—যাচ্ছিলাম আপনার কাছেই।

রঙ্গিলা সবিস্ময়ে জিগেস করে—কেন ?

—এই যে, এটা দিতে।···ডু'লাইন পেন্সিলে লেখা একটি কাগজ রঙ্গিলাকে ছায়। রঙ্গিলা প'ড়ে প্রদোষকে দিলো, প্রদোষ প'ড়ে হিমাংশুকে দিলো। চির্‌কুটটি অস্বাক্ষরিত হ'লেও নির্ভুলভাবে বন্ধুর হস্তাক্ষর চেনা গেলো।

—কে দিলো ? কোথা পেলে এটা ?

—ঐ যে আপনার এখান থেকে যে পল্টন সাহেব এখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেলেন তিনিই এটা আপনাকে দিয়ে যেতে বললেন।

প্রদোষ ও রঙ্গিলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। প্রদোষকে বিশেষ চিন্তাবিষ্ট দেখা যায়। চিরকুটটিতে লেখা ছিলো : রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য তৈরি থাকো সময় নেই। কাগজপত্র সরাও। স'রে পড়ার চেষ্টা ক'রে লাভ হ'বে না।

—কিন্তু বন্ধুদা একবার দেখা ক'রে গেলেননা ! ··আক্ষেপ করলো হিমাংশু।

—হাতে নিশ্চয়ই সময় ছিলো না।···প্রদোষ গম্ভীর মুখে বললো।

—আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে উদ্বিগ্নমুখে তিনজনেই ঘরে ফিরে এলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রদোষের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাগজপত্র একটি স্টালের

বাক্সের মধ্যে পুরে বাক্সটি পুঁতে রেখে আসা হ'লো বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা মাঠের মধ্যে। ঘেমে নেয়ে হিমাংশু ক্যাম্পে ফিরলো, রোদে পুড়ে মুখ ওর টক্‌টকে রাঙা!

হিমাংশু ফিরেই রঙ্গিলাকে বলে—রঙ্গিলাদি, এক গ্লাস জল খাওয়ান যদি···

রঙ্গিলা লজ্জিত হয়, বলে—সুধু জল? কাল হয়তো খাওয়াই হয়নি কিছু, তার আগের ছ'দিনও তো ট্রেনে কেটেছে। দেখি ঘরে কী খুদ-কুঁড়ো আছে?

উঠে গেলো রঙ্গিলা।

হিমাংশু বলে—না, না, কাল সন্ধ্যায় বন্ধুদার ওখানে খাওয়া হয়েছিলো বৈকি। স্রেফ্ এক গ্লাস জল হ'লেই হ'বে।

রঙ্গিলা কিন্তু শুনলো না, উঠে যেতে যেতে ব'লে গেলো—তাহোক, কাল রাত তো ঘোড়ার পিঠেই কেটেছে। এমন খবর এনেছো ভাই যে, সব ভুলিয়ে দিয়েছো। এতক্ষণ এ-সব কথা মনেও পড়েনি।

হিমাংশু বলে—সে আর আপনাদের দোষ কি রঙ্গিলাদি? ভগ্নদূতকে কে আর জামাই-আদর করে বলুন?

প্রদোষ হাসে, বলে—হ্যাঁ, ভালোকথা, তোমায় তো আসার কথা কিছুই জিগেস করা হয়নি। কোন্ ট্রেনে এসেছো, সুরমা মেলে?

—হ্যাঁ।···হিমাংশু তারপর তার আসার বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রঙ্গিলা ছ'টি রেকাবে কিছু কাটা ফল ও ছ'গ্লাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢোকে। একটি প্রদোষকে ছায়, একটি রাখে হিমাংশুর সাম্‌নে। নিজে বসে মেঝেয়।

খাওয়ার শেষে ওরা গল্প করছিলো হঠাৎ মোটরের শব্দ শোনা গেলো বিজন পাড়াগাঁর রাস্তায়; শুনে সকলেই সচকিত। এ রাস্তায় মোটর প্রায় কখনোই আসে না, ঘোড়ার গাড়ি ছ'একটা বরং দেখা যায় কালে-ভদ্রে।

প্রদোষ বলে—আর কী? চলো এবার হিমাংশু। জামাই-আদর খুঁজছিলে না?

প্রদোষ নির্বিকার, হিমাংশু অধোবদন, রঙ্গিলা সন্ত্রস্ত।

বলতে বলতে একে একে তিনখানা জীপ গাড়ি থামতে দেখা গেলো। নামলো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বন্দুকধারী সঙ্গে একজন সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টর আর সেই সঙ্গে সমরেশ। সমরেশ খানিকটা দূর থেকে অঙ্গুলি-সংকেতে দেখিয়ে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শ্বেতাঙ্গ রক্ষীরা উদ্যত বন্দুক নিয়ে সার বেঁধে সাবধানে এগিয়ে এলো, পেছন পেছন ইন্সপেক্‌টর।

প্রদোষ ও হিমাংশু এগিয়ে এসে মধ্য-পথেই তাদের অভ্যর্থনা করলো ; তাদের পেছন পেছন এলো রঙ্গিলাও। দূরে দাঁড়িয়ে ক্রুর চক্ষে দেখছিলো সমরেশ ওদের দিকে। একে একে ওদের তিনজনেরই হাতে হাত-কড়া লাগানো হ'লো। সশস্ত্র প্রহরীদের দ্বারা বেষ্টিত ক'রে ওদের তোলা হ'লো জীপ গাড়িতে। হাতে হাত-কড়া লাগানোর মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিমাংশু গোটা কয়েক রূঢ় ধাক্কা খেলো। একে একে ওদের তিনজনেরই দেহ-তল্লাস করা হ লো পুলিস কর্মচারীর আদেশে। রঙ্গিলা প্রতিবাদ করতে গেলো শ্লীলতা রক্ষা হচ্ছে না ব লে, কিন্তু পুলিসী কর্তা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। ওদের ঘরের জিনিশ-পত্র তচ্‌নচ্‌ ক'রে প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে যৎপরোনাস্তি খোঁজাখুঁজি হ'লো, কিছুই বিশেষ পাওয়া গেলো না।

সব চেয়ে নিকটবর্তী থানাও এখান থেকে দশ বারো মাইল। ওদের সশস্ত্র প্রহরায় নিযে চললো তিনখানা জীপগাড়ি। প্রথম গাড়িতে সমরেশ ও কয়েকজন প্রহরী ; দ্বিতীয় গাড়িতে প্রদোষ, হিমাংশু, রঙ্গিলা ও একজন প্রহরী ; তৃতীয় গাড়ীতে পুলিস-কর্মচারী ও কয়েকজন প্রহরী।

পূর্ণ বেগে গাড়ি কয়খানা দৌড়চ্ছিলো ঐ গ্রাম্যপথ বেয়ে। নাতিপ্রশস্ত পথ—গরুর গাড়ির চাকায় ক্ষয় পেয়ে গিয়ে স্থানে স্থানে গহ্বর হ'য়ে গেছে। একপাশে ঝোপজঙ্গল, অপর পাশে বিস্তীর্ণ জলা ও পাটখেত।

কয়েক মাইল দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম ক'রে আসার পর হঠাৎ গাড়িগুলো থেমে গেলো। আর এগোনো সম্ভব নয়, পথ বন্ধ। এই গাড়িগুলোর পথে বাধাসৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যেই যেন কারা কতকগুলি মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি পথের ওপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে রেখে গেছে। সে-বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব না হ'লেও বহু শ্রম ও সময়সাধ্য। গাছের গুঁড়িগুলো যেমন মোটা তেম্নি লম্বা। পুলিস-কর্মচারী পরিস্থিতি দেখে চিন্তান্বিত। তাঁরা সকলেই নেমে দাঁড়ালেন গাড়ি থেকে, সমরেশের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। যে-পথ দিয়ে এতোখানি এলেন সে-পথ দিয়ে আবার ফিরে যাওয়াই কি এখন উচিত হ'বে? নাকি সকলে মিলে হাত লাগিয়ে ঐ গাছের গুঁড়িগুলো সরিয়ে ফেলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করা হ'বে? তাদের মধ্যে সম্ভবত এই আলোচনা সবে মাত্র সুরু হ'য়েছে এমন সময়ে দূরে একটা শব্দ হ'লো—খুব সম্ভব বন্দুকের। সঙ্গে সঙ্গে সমরেশ প'ড়ে গেলো মাটিতে। সকলের মধ্যেই ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হ'লো। সকলেই সভয়ে আশে-পাশে চারিদিকে চাইলো কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেলো না।

সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা শব্দ হ'লো। পুলিস-রক্ষী প্রত্যেকেই ধরাশায়ী হ'লো। তারপর ঝোপজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো মুখোসধারী জন বিশেক মানুষ। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টার বন্দী হ'লেন এদের হাতে।

হতাহতদের বন্দুকগুলো জড়ো ক'রে রাখা হ'লো এবং হতভাগ্যগুলোকে টেনে টেনে পাশের জলায় ফেলে দিতে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লো সকলে। তাদের মধ্যে থেকে খালি একজন এগিয়ে এলো এদের তিনজনের শৃঙ্খলমোচন করতে।

প্রদোষের প্রাণে আবেগ, হিমাংশু উচ্ছ্বসিত, রঙ্গিলার চোখে জল।

তিনজনেই সমস্বরে ব'লে ওঠে—বন্ধুদার জয় হোক।

বন্ধু বলে—এ কিন্তু অন্যায়। বলো জয় হোক জনগণের, বলো জয় হোক জন-গণ-মন-অধিনায়কের ··

বন্ধু ওদের ডাকে—চলো ; সমরেশকে দেখা যাক্ একবার।

প্রদোষ, হিমাংশু ও রঙ্গিলা এবার বন্ধুদার অনুসরণ ক'রে গিয়ে দাঁড়ায় সমরেশের কাছে। সমরেশের বুক তখন রক্তে ভাসছিলো, সে বললো—চললুম ; ক্ষমা কোরো রঙ্গিলা। তোমার জন্যই এ-প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলাম।···ক্ষমা কোরো বন্ধুদা ; ঈর্ষ্যায় তোমার বিরুদ্ধতা করেছি ··কিন্তু জানতাম তোমার আয়োজন এই রকমই নিশ্ছিদ্র হয়। যাক্ এর জন্য আমার দুঃখ নেই। সমাজবীক্ষায় চিরদিন আমি প্রদোষের বিপরীতদর্শী—প্রতিযোগিতায় প্রতিকূল—সঙ্ঘের মধ্যে অসংগতি। প্রদোষের প্রতিবাদের স্থান নেই এ সঙ্ঘে—আর আমি ছিলাম সেই সক্রিয় প্রতিবাদ। আমায় সরিয়ে ফেলে বন্ধুদা, সেই প্রতিবাদের খণ্ডন করলে, হয়তো ভালোই করেছো, তোমাদের সংঘ এবার সুসংগত হোক।

এর পর চিরকালের জন্যই চোখ বুজে এলো সমরেশের।

সমরেশের মৃতদেহকে সামরিক কায়দায় সম্মান দেখিয়ে সকলে মিলে দিয়ে এলো সলিল-সমাধি ঐ বিলের জলে। সকল কাজ শেষ হ'লে বন্ধুদার সহকারীরা বিদায় অভিবাদন ক রে অদৃশ্য হ'লো ঝোপে-জঙ্গলে।

তারপর সেই তিনখানা জীপগাড়ি আবার ফিরে চললো সেই পথে যে-পথ দিয়ে এসেছিলো একটু আগে প্রদোষ, রঙ্গিলা ও হিমাংশুকে নিয়ে। এবার কিন্তু ওদের সঙ্গে রইলো বন্ধুও। আর রইলো দু'চারজন বাছাই-করা বিশ্বস্ত সহকর্মী।

ফিরতি পথ। তীব্র বেগে গাড়ি ছুটছে। বন্ধু চিন্তাবিষ্ট। প্রদোষ ও হিমাংশু উভয়েই নীরব। রঙ্গিলা হঠাৎ জিগেস করলো—আমরা কোথায় চলেছি, বন্ধুদা ?

বন্ধু বললো—চলো। আপাতত আমি যেখানে ডেরা ফেলেছি সেইখানে।

ডেকে ডেকে ফিরে গেলো কুসুমের মাস

বঙ্কুর ক্যাম্প যেখানে, জমিদার চৌধুরীদের সেই প্রকাণ্ড পোড়োবাড়িটার কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তারই নিচের তলার খান দুই তিন ঘর বেছে নিয়ে, পরিষ্কার ক'রে, অপাতত আছে ওরা। ভাঙা-চোরা ঝড়ঝড়ে আটফাটা হ'য়েও তবু নিচের তলাটুকুই দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। ওপরের তলাগুলো সম্পূর্ণভাবে নয়তো আংশিকভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়েছে। ভাঙা ইট-সুরকি ও মৃত্তিকার স্তূপ বহুদিন প'ড়ে থাকার দরুন ছাদের ওপরে প্রায় কোমর পর্যন্ত আগাছার ঘন জঙ্গলের স্বষ্টি হ'য়েছে। ঘন-বনে-ঢাকা বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি-আবৃত একটা টিবির মতো মনে হয় বাইরে থেকে দেখলে। ভিতরে এলে বিশ্বাস হয় এখানেও মানুষ বাস করতে পারে। এই দুঃসাহসিকেরাই হয়তো বহুদিন পরে নতুন ক'রে আবিষ্কার করলো যে এখানে আগেও মানুষ থেকে গেছে এবং আবারও থাকতে পারে। শুধু বৃষ্টির দিন একটু ভয়ে-ভয়ে কাটাতে হয় কিন্তু ভয়ই বা কী, আর ভরসাই বা কিসের? ভয় করতে গেলে রাত্তিরে এখানে ঘুমোনোই চলে না। বাদুড়, চামচিকে, সাপ-খোপের সঙ্গে প্যাক্ট ক'রেই ওরা এখানে আছে।

বঙ্কুর ঘরেই প্রদোষের জায়গা হ'লো। রঙ্গিলার জন্য নির্দিষ্ট হ'লো তার পাশের ঘর আর ও-পাশের বড়ো ঘরটায় সঙ্ঘের আরো কয়েকজন সহকর্মী যারা এখানে কাল পর্যন্ত ছিলো, উপস্থিত নেই, তাদেরই মালপত্র রয়েছে।

এখানে এসে ইস্তক এই কয় দিনেই যেন একটা পরিবর্তন দেখা গেলো প্রদোষের মধ্যে। দিনরাত কাগজ-ফাইল চিঠিপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকে। রঙ্গিলা চুপি চুপি এসে উঁকি মেরে ফিরে চ'লে যায়, কথা কইবার অবকাশ পায়না। খাবার দিয়ে গেলেও প'ড়ে থাকে। বারবার আসতে হয় মনে করিয়ে দিতে। প্রশ্ন করলে রঙ্গিলার ভাগ্যে জোটে সংক্ষিপ্ত এককথার উত্তর, তারপরই আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে যায় প্রদোষ। রঙ্গিলারও এইবার কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে ওর ঘরে আসতে।

এতদিনের আলস্য ও শৈথিল্যের পর কেমন যেন একটা কর্মোন্মুখতা ক্রিয়া করছে ওর ভেতর, কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ওর মধ্যে। প্রদোষের এই পরিবর্তনকে সানন্দে সুস্বাগত করলো কেবল বঙ্কু, অবশ্য রঙ্গিলাও স্বীকার করলো এটাকে, তবে স্বীকার করলো একটু বিষণ্ণ মনেই। পুরোপুরিভাবে পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবার আগেই প্রদোষ অন্তত ফিরে পেলো আগেকার মন।

বন্ধু বেরিয়ে যায় সকালে, আর ফেরে সন্ধ্যায়, কি কোনো-কোনো দিন ফিরতে রাত্তিরও হ'য়ে যায়। বেশি রাত হ'লে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে রঙ্গিলা, প্রদোষের মুখ আরো বিমর্ষ, আরো গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। সে আরো ঘন ঘন পায়চারি শুরু ক'রে দেয়।, খানিকক্ষণ পর বন্ধু কিন্তু ফিরে আসে ঠিক, এসে সকল উৎকণ্ঠার অবসান ক'রে দেয়।

আসার পর অনেক রাত অব্দি প্রদোষের সঙ্গে গোপন আলোচনা হয়। আজকাল সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগেস করে প্রদোষ, নিজ মতামত প্রকাশ করে, পরামর্শ দেয়, সময় সময় তর্কও করে। আলোচনার সময়ে ওকে আজকাল বেশ একটু উত্তেজিতই দেখা যায়।

সব কিছু শুনে ও বিশেষভাবে পর্যালোচনার পর প্রদোষ একদিন বললো—আর নয়, বন্ধুদা। এখান থেকে এইবার ক্যাম্প তোমার তোলো। দেরি নয়, কালই। আমি তো বিশেষ ভালো বুঝিনা।

বন্ধু হাসে, বলে—তুলতাম অনেক আগেই। তোমার জন্যই ক্যাম্প্‌টা আরো ক'দিন রাখা বিশেষ দরকার। তবে দু'একদিন দেরি হ'লেও অচিরাৎ কোনোকিছু ক্ষতিরও সম্ভাবনা নেই। তবু যতো শিগ গির যাওয়া যায় ততোই মঙ্গল। সেই চেষ্টাই হচ্ছে।

প্রদোষ বলে—আমার জন্যে ? না, আমার জন্যে মোটেই আর দরকার নেই। আমার জন্যে তোমায় আর এখানে থাকতে হ'বে না বন্ধুদা। আমি আমার প্ল্যান সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, কালই আমায় যেতে হ'বে এখান থেকে।

—কালই ?—বিস্মিত হয় বন্ধু।

—হ্যাঁ। তবে একথা রঙ্গিলাকেও বলিনি এখনো। কিন্তু এভাবে থাকলে তো আমার চলবে না। কাজের ডাক আর যে ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে।

—কিন্তু···কাজের ভার নেবার মতো শক্ত কাঁধ কি তোমার হ'য়েছে এখনো ? সেটা অবশ্য তুমিই ভালো বোঝো।

—কী করবো ? যা হ'য়েছে এতেই চলবে।

বন্ধু আর দ্বিরুক্তি করেনা।

পরদিন সকাল থেকে প্রদোষ যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো। আজ সে আর গম্ভীর নয়, বিমর্ষ নয়, চিন্তাবিষ্ট নয়। হেঁয়ালির মতোই ওর এই প্রফুল্লতা।

ও আজ উঠেছে খুব ভোরে, রঙ্গিলা তখনো ওঠেনি—তার ঘরের কপাট তখনো বন্ধ। প্রদোষ ভাবলো এইবেলা একটু বেরোনো যাক্‌। হরিণ-বাড়ির জঙ্গল ছাড়িয়ে যে মস্ত ফলবাগানটা আছে সেই পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিলো সে। সেই

বাগানের মধ্যে যে দিঘি, তারই পাড়ে ব'সে ব'সে অনেক কথাই আজ ভেবেছে, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সে ভেবে ঠিক ক'রে ফেলেছে আজ। এজন্যই সে খুশি।

প্রদোষ বাগান থেকে যখন ফিরলো রোদ আর রঙ্গিলা তখন সবেমাত্র উঠেছে।

রঙ্গিলার ঘরে ঢুকে অকারণেই সে আজ ডাকে—রঙিল !

রঙ্গিলা উত্তর ছায়—কেন, কম্‌রেড ?

—এম্নিই।

—তবু ভালো, মনটা বুঝি আজ ভালো আছে ?

উত্তরে প্রদোষ কেবল হাসে স্বীকৃতি-সূচক হাসি।

—বলি, সকালে উঠে গেছলে কোথা ?

—এই জঙ্গলটা পেরোলে যে ফলবাগানটা আছে ঐ দিকে—ওখানেই গিয়েছিলাম। বাগানটার ভেতরে প্রকাণ্ড একটা দিঘি আছে দেখেছো কোনোদিন ?

—না, ওদিকে যাইনি একবারও। তুমিও তো আজই প্রথম গেলে ?

—হ্যাঁ।

—আমায়ও ডাকলে না কেন ?

—তোমার ছুয়ার কেন বন্ধ ছিল ?

ব'লেই প্রদোষ আবার নিজ বক্তব্য সংশোধন ক'রে নেয়, বলে—ডেকেছি গো ডেকেছি। ডেকেছিলাম মনে মনে। তুমি শুনতে পাওনি, তাই বলো।

রঙ্গিলা বলে—মনেরও কান আছে বুঝি ? কবিকেও যে হার মানালে !

প্রদোষ বলে—নিশ্চয়। যতো কথা মন শোনে তার সামান্য ভগ্নাংশও কান শুনতে পায় না। মনে মনে ডাকা শুনতে পাবার জন্যে তোমার তাহ'লে কান তৈরি হয়নি এখনো।

রঙ্গিলা বলে—হ'বেও বা। তোমার সঙ্গে কে পারবে বলো ?

সমস্ত দিনটা রঙ্গিলাকে দিয়েই যেন ভরিয়ে রাখলো প্রদোষ। বন্ধু এলো রাত্তিরে। তারপর খুব নিচু গলায় মন্ত্রণা চললো অনেকক্ষণ। রঙ্গিলা আজকাল ওদের গোপন মন্ত্রণায় যোগ দেওয়ার উৎসাহও বোধ করেনা। ওরাও তাই আর রঙ্গিলাকে ডাকেনা। এ-সব কাজে দিন দিন তার কেমন যেন একটা ক্লান্তি আসছে, সেটা নিজেই যেন অনুভব করতে পারছে। তার মনে হয় যেখানে বন্ধুদা রয়েছে, প্রদোষ রয়েছে, সেখানে সে আর কী করবে ? কিন্তু আজ তার মনে হ'লো একবার গিয়ে বসে ওদের কাছে এবং অংশ নেয় ওদের আলোচনায়। তাই সে গিয়েছিলো কিন্তু গিয়ে দাঁড়াতেই ওদের গুপ্ত মন্ত্রণা বন্ধ ক'রে ওরা কী সব আজে-বাজে কথা পাড়লো। রঙ্গিলা স্পষ্টই যেন বুঝলো এটা। তাই

সে আবার স'রে এলো ওখান থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে একেবারে শুয়েই পড়লো। সেখান থেকে দেখতে লাগলো মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় রহস্যময় দু'টি ছায়া হাতমুখ নেড়ে কী যেন ফিস্‌ফাস্ করছে। আবছায়া আবছায়া দেখা যাচ্ছে ওদের! ওর আস্থা কবে থেকে যেন রূঢ়ভাবে ধাক্কা খেয়েছে। ভেবেছে, কী হ'বে এতে? এতটা আত্মনিগ্রহের পরিবর্তে, এতগুলো প্রাণবলির বিনিময়ে কী পেলো ওরা শেষপর্যন্ত? এ-রকম ধৃষ্ট প্রশ্ন এই সঙ্ঘের মধ্যে একমাত্র সমরেশই তুলতে পারতো এবং তুলেছিলোও। সে স্পষ্টই ব'লেছিলো—এতে কিছু হ'বে না, বঙ্কুদা। পারো তো প্রদোষকে একথা বুঝিও। তোমার উৎসাহেই এ-ভাবে কল্প-মরীচিকার দিকে ছুটছে প্রদোষ। আর রঙ্গিলা? রঙ্গিলার জন্য দুঃখ হয়, সত্যই!

যাক্ গে, এ-সব কী ভাবছে সে? এই চিন্তাগুলো মন থেকে তাড়িয়ে দিতে যায় রঙ্গিলা। যেখানে প্রদোষ অধিনায়ক, বঙ্কুদার মতো মানুষ যে-সঙ্ঘের নিয়ন্তা সেখানে তার আনুগত্য তো প্রশ্নের অতীত।

ওদের ঘরে আলো নিবে গেলো, রঙ্গিলা শুয়ে-শুয়ে দেখলো সব। ওর চোখে আজ ঘুম নেই! কে পায়চারি করছে? এখন কতো রাত? নিশ্চয়ই অনেক। চাঁদ উঠেছে রাত ক'রে। কী তিথি? রঙ্গিলার টাইম্‌পিস্‌টা টিক্‌টিক্ করে। ওরই গর্ভে মুহূর্ত মুখর। বঙ্কুদা শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়েই পড়েছে হয়তো। কিন্তু প্রদোষ? আজ ক'দিন ধ'রে প্রদোষের কী যে হ'লো? রাত্তিরেও ঘুমোয় না। প্রহরীর মতো ঐ একভাবেই পায়চারি ক'রে যায়, কোনো কিছু আশঙ্কা ক'রেই হয়তো। নইলে কার্টরিজ-বেল্ট শুধু শুধু চড়াবে কেন? তাছাড়া ভাবতে গেলেও যে পায়চারি করে। কোনো এক বড়ো রকম সমস্যায়, কি সঙ্কটে প'ড়ে ও যখন সমাধান খোঁজে তখন ওকে ও-রকম পায়চারি করতে দেখা যায়। রঙ্গিলা বরাবরই ওকে দেখে আসছে ঐ রকম। চিন্তার জোয়ারে রাজ্যের যতো ধোয়াট নেমে আসে। মাথা আরো ঘুলিয়ে যায়। রঙ্গিলা পাশ ফিরে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না, প্রদোষের পদশব্দ সমানেই আসতে থাকে তার কানে। অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রা আসে একটুখানি। কিন্তু তাও ভেঙে যায় প্রায় তখনই। রঙ্গিলা ভাবে আজকে একেবারে পূর্ণ সামরিক বেশে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে কেন প্রদোষ? ব্যাপারটা কেমন যেন হেঁয়ালির মতো লাগে তার।

বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক প্রেতায়িত, প্রদোষ এসে দাঁড়িয়েছে তার জান্‌লার সাম্‌নে। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে যেন দ্বিধা করে, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে স'রে যায়। অন্ধকারে রঙ্গিলা একবার মাথা তোলে বালিশ

থেকে। ছাখে প্রদোষ স'রে গেলো সেখান থেকে, গিয়ে দাঁড়ালো ভাঙা ইট-রাবিশের স্তূপের ওপর বিবর্ণ-জ্যোৎস্নার তলায়। সেখান থেকে চললো জঙ্গলের দিকে—এক হাতে স্যুট্‌কেস্, অন্যহাতে টর্চ। উঠে পড়লো রঙ্গিলা। কোথা যাচ্ছে, পালাচ্ছে নাকি? ওর সাম্‌নে দিয়েই প্রদোষ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো টর্চের আলোয় সন্তর্পণে পথ দেখতে দেখতে। ওকে অনুসরণ ক'রে রঙ্গিলাও গেলো খানিক। একবার ভাবলে চেঁচিয়ে ওকে ডাকবে নাকি? বা ডাকবে নাকি বন্ধুদাকে? গিয়ে ধরবে নাকি হাতখানা? বলবে নাকি—কোথা চল্লে? ফিরে চলো। মনে করলো বটে, কিন্তু কার্যত কিছুই করলো না রঙ্গিলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো কয়েক মুহূর্ত ওর নিষ্ক্রমণ তারপর ফিরলো নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু পেছন ফিরতেই চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো রঙ্গিলাকে।

বন্ধু পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছিলো। পেছন পেছন বন্ধু কখন উঠে এসেছিলো সেকথা টেরও পায়নি রঙ্গিলা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনেই চুপ ক'রে থাকে খানিক।

বন্ধু বলে—ফিরে চলো।

রঙ্গিলা নিঃশব্দে বন্ধুকে অনুসরণ ক'রে ফিরে আসে ঘরে। চাঁদের ফালি তখন মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ে!

রঙ্গিলা জিগেস করে—কম্‌রেড বুঝি চ'লে গেলো?

—তাই তো অন্তত মনে হ'লো।

—কিন্তু জানিয়ে গেলে কিছু ক্ষতি ছিলো? এভাবে লুকিয়ে পালাবার মানে?

—ওর কথা ছেড়ে দাও। ঐ রকম মানুষ ও।

রঙ্গিলা জিগেস করে—বন্ধুদা, তুমি বুঝি জানতে? কই, বলোনি তো আমাকে?

উত্তর এড়িয়ে বন্ধু শুধু হাসতে থাকে।

রঙ্গিলা বলে—তোমারও কি ধারণা আমি ওকে যেতে দিতাম না?

বন্ধু বলে—তা হ'বে কেন, বোন? অতো বড়ো অসুখ থেকে সারিয়ে তুলে সঙ্ঘের জিনিশ তুমি তো সঙ্ঘকেই ফিরিয়ে দিয়েছো, নিজের জন্য তো রাখোনি। এটাই তো তোমার অবিস্মরণীয় দান। আমার মনে হয় কি জানো? তোমাকে এড়িয়ে প্রদোষ নিজেকেই এড়াতে চেয়েছে। ওকে তুমি ভুল বুঝোনা। তোমার জয়ের গৌরব তুমি অবলীলায় দান করতে পেরেছো সঙ্ঘকে সেই গৌরবে গৌরবিত্ হ'য়েছে সঙ্ঘ। এতে অনুতাপেরও কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই।

গলার কাছে কান্না ঠেলতে থাকে রঙ্গিলার। সে বলে—কিন্তু ওর শরীর

এখনো কিচ্ছু সারেনি, বন্ধুদা। মুখে ও যাই বলুক। তুমি তো ওকে দেখেই বুঝতে পারছো !

বন্ধু বলে—বুঝতে পারলেও আমি যে ওকে বাধা দিতে চাইনে। ওর কাজই ওকে শক্তি দেবে। ওর বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। যাও, শোওগে যাও এবার। আর যে-ক'দিন এখানে আছি সে-ক'দিন আমায় রাত জাগতে হ'বেই। জায়গাটা এখন আর নিরাপদ নেই এইটুকু জেনে রাখো।

মেঘপুঞ্জের মসীলেপে তখন প্রায় মুছে গেছে জ্যোৎস্না। রঙ্গিলা তার বিছানায় ফিরে এলো নিঃসঙ্গ একটি জল-ভরা মেঘের মতোই !

অথ বিষ্কম্ভক

অব্জভূষণ কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি সার্ সাগ্নিক মুখার্জির একমাত্র পুত্র। কলেজ-জীবনে এক সময়ে সে কিছুদিনের জন্য বিরূপাক্ষের সহপাঠী ছিলো—এই সূত্রটুকুই হ'লো ওদের পূর্ব-পরিচয়। তবে বিরূপাক্ষের মতো অব্জ নাকি ছাত্রহিশেবে তেমন কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি কোনোদিন, কিন্তু তাতে কী? বিরূপাক্ষ আজ যেমন শহরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার, অব্জভূষণও তেম্নি শহরের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। উপার্জন-গৌরবে পিতাকে সে বহুদিন বহুগুণে অতিক্রম ক'রে গেছে। অব্জের বৃদ্ধ পিতা সাগ্নিকবাবু অবসর-গ্রহণের পর কয়েক বৎসর যাবৎ বিপত্নীক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ক'রে অবশেষে শান্তিতে লোকান্তরগ্রহণ ক'রেছেন—সেও নেহাৎ কম দিন নয়, বছর চারেক হ'বে। পিতার দেহান্তে পৈতৃক উত্তরাধিকার-স্বরূপ অব্জভূষণ পেয়েছিলো প্রচুর অর্থ আর সেই সঙ্গে একমাত্র বিবাহযোগ্যা ভগিনী—শারীকে। শারীর বয়স এখন ১৯।২০ বছর। অব্জ কর্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতা, বোনকে খুবই ভালোবাসে। অব্জের স্ত্রী বাসবীও ননদকে খুব ভালোবাসে এবং তার সঙ্গে সখীর মতোই অপকট আচরণ করে।

বাপের আদুরে মেয়ে বলতে যা বোঝায় শারী ছিলো তাই। সদাসর্বদা পিতৃ-সাহচর্য শারীর একটা মস্ত অবলম্বন ছিলো—সে অবলম্বন অকস্মাৎ অপসারিত হ'লে অর্থাৎ পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরেই শারীর মনোবিকার-লক্ষণ প্রকাশ পেলো। তখন শহরের সব চেয়ে বিখ্যাত মানসিক চিকিৎসক এবং নিজেরও প্রাক্তন বন্ধু বিরূপাক্ষকেই ডাকলো অব্জ। বিরূপাক্ষের চিকিৎসার গুণে শারী সেরে উঠেছে। সেই থেকে এ-বাড়ির সঙ্গে বিরূপাক্ষের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে আত্মীয়তায় এসে পৌঁছেছে। এ-বাড়ি যাতায়াত তার অনেকদিনের। আগে আসতো অব্জের বন্ধু হিশেবে এখন সে ডাক্তারী করতে এলেও এ-বাড়ির কেউ আর তাকে নিছক ডাক্তার ব'লে গণনা করে না; ইদানীং সে যেন অব্জের পরিবারের অঙ্গীভূতই হ'য়ে গেছে। সে এ-বাড়ি এলে অব্জের স্ত্রী বাসবী 'বিরূদা' 'বিরূদা' ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে; শারী তো ডাক্তারবাবু বলতে আত্মহারা আর অব্জের মাথা তো সে কিনেই রেখেছে শারীকে সারিয়ে তোলার পর থেকে। বাসবী বিরূপাক্ষকে 'বিরূদা' ব'লে ডাকলেও শারী এখনো ওকে ডাক্তারবাবু ব'লেই ডাকে।

পিতাকে হারানোর শোক শারীকে অত্যন্ত বিচলিত ক'রেছিলো ব'লেই যেন অঞ্জ ও বাসবী তাকে সর্বদা স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। মাত্র মাস কয়েক হ'লো শারী সুস্থ মন ফিরে পেয়েছে। এ-সময়ে সামান্য দুঃখ, অভিমান, ক্রোধ কিংবা যে-কোনো আলোড়নই ওর মনোজগতে বিপ্লব ঘটাতে পারে। সেজন্য অঞ্জভূষণের ও বাসবীর ভাবনার ও সতর্কতার অন্ত নেই।

অনিরুদ্ধকে কতকটা জানা গেছে এবার বাসবীকে বিশদ ক'রে জানতে চলেছি আমরা। কিংবা আরো সঠিক, বলতে গেলে বলতে হয় দু'জনের পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনকেই জানতে হবে আমাদের। সমাজের উঁচু-ধাপে যাঁরা ঘোরা-ফেরা করেন তাঁরা জানেন কলকাতার সমাজে বাসবী মুখুজ্জের স্থান কতোখানি বিশিষ্ট। যে-সব মহিলারা বাসবীকে ঈর্ষ্যা করেন তাঁরা বলেন বাসবী যে এতখানি মর্যাদা পায় সে অঞ্জের স্ত্রী ব'লেই। কিন্তু সেটা সবটুকু সত্য নয়—বাসবী নিশ্চয়ই একজন বিশিষ্ট ধনীর স্ত্রী কিন্তু সেটুকুই তো তার সবটা পরিচয় নয়। ধনিগৃহিণী তো আরো অনেকেই আছেন তাঁরা তো কেউ প্রত্যেক সামাজিক কৃত্যে বাসবীর মতো পুরোভাগিনী হননা। স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তাই যেন বাসবীকে বিশিষ্ট ক'রে দিয়েছেন অসামান্য রূপ দিয়ে অন্যান্য ধনিগৃহিনীদের থেকে। রূপেরও একটা আকর্ষণ আছে বৈকি! আর স্বধুই কি রূপ? অমন কৃষ্টি-সম্পন্ন মন? সব তাতেই বাসবীর উৎসাহ—কি সাহিত্যে, কি সংগীতে, কি শিল্পে, কি স্বাস্থ্যচর্চায় [বিশেষ ক'রে অবশ্য সাঁতারে]—সব জায়গা থেকেই তাই তার ডাক আসে, সবাই তাকে চায়। শহরের এলিটেরা যাকে ব'লে থাকেন 'টোস্ট অব্ দি টাউন' বাসবী ঠিক তা-ই। কলকাতার বিশেষ একটা অঞ্চলের যতো সভা, সমিতি বা যে-কোনো সামাজিক কৃত্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে সে-সবগুলোরই পুরোভাগে তাই দেখা যায় বাসবীর রূপচ্ছবি। অতিরঞ্জিত কি সত্য জানি না তবে বাসবীর বান্ধবী ও সখীমহলে একটা জোর গুজব আছে যে, বাসবীর মুখখানি নাকি ইন্‌সিওর করা রয়েছে কোনো এক বিলেতী বীমা-কোম্পানীর কাছে লাখো টাকায়—আর তার বুকটাও [মানে বাস্ট নয়, হৃদয়] নাকি ইন্‌সিওর করা আছে আর একটা বীমা-কোম্পানীর কাছে লাখো টাকারও চেয়ে বেশিতে তবে তার প্রিমিয়ম ধার্য হ'য়েছে টাকায় কি প্রেমে সেকথা জানা নেই। শুধু জানা গেছে যে দ্বিতীয় বীমার নমিনিটি অঞ্জভূষণ নয়—নমিনিটি নাকি সাঁতারু অনিরুদ্ধ রায়। অবশ্য গুজবটা অতিরঞ্জিতও হ'তে পারে কিন্তু যার সম্বন্ধে এতো গুজব তার দিকে তাকালে যতোকিছু অতিরঞ্জন সবই ক্ষমার যোগ্য মনে হয়। কিন্তু এহো বাহ্য। এবার অনিরুদ্ধের কথায় আসি।

অনিরুদ্ধের বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন চাকুরে তার তুলনায় বাসবীর বাবা মধ্যবিত্ত তবে মধ্যবিত্ত হ'লেও গৃহস্থ হিশেবে সচ্ছল। অনিরুদ্ধের বাবা ও বাসবীর বাবা পরস্পর শুধু প্রতিবেশীই না, সামাজিক অর্থে বন্ধুও ছিলেন সেই সূত্রে অনিরুদ্ধ ও বাসবীর মধ্যে মেলামেশাও ছিলো যথেষ্ট। বাসবীর বাবা মধ্যবিত্ত হ'লেও তিনি তাঁর সর্বস্বপণ ক'রেছিলেন মেয়ের শিক্ষা, সহবত ও রুচিগঠনকল্পে। তার সুফলও তিনি পেয়েছিলেন। বাসবীর পড়াশোনা সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ পর্যন্ত—নিশ্চয়ই তেমন কিছু বেশি নয়। বাসবীর বাবার লক্ষ্য তো শুধু কয়েকটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় সেই সঙ্গে সমভাবে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভও যাতে কন্যা করতে পারে সেদিকেও বিশেষ যত্ন ছিলো তাঁর। পড়া শোনার সঙ্গে গান, নাচ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যচর্চা ইত্যাদি সকল বিভাগেই বাসবী শিক্ষা পেয়েছিলো। পিতার ইচ্ছানুসারে বাসবীর শিক্ষা-দীক্ষা যদিও মিশনরী স্কুলেই হ'য়েছিলো কিন্তু সেজন্য উৎকট সাহেবীয়ানাতে ম'জে গিয়ে মেয়েটি যাতে একটি কিম্ভূত-কিমাকার জীব তৈরি না হয় সেদিকেও বাসবীর পিতার দৃষ্টি ছিলো। মোটকথা পিতার সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টির তলায় তলায় এইভাবেই তৈরি হ'য়ে উঠলো বাসবী। বাসবীর স্বাস্থ্যচর্চার অনুষঙ্গ হিশেবে অনিরুদ্ধের কথা স্বভাবতই আসবে। কারণ বাসবী সাঁতার শিখেছিলো অনিরুদ্ধদেরই সন্তরণ-ক্লাবে। ওকে সাঁতার শিখিয়েছিলো অনিরুদ্ধই। স্কুল ও কলেজ-জীবন থেকেই অনিরুদ্ধের সকল রকম ব্যায়ামে সুনাম—বিশেষ ক'রে সাঁতারে দক্ষতা ছিলো অদ্ভুত। মেয়েদের পক্ষে বাসবীর দক্ষতাও অবশ্য কিছু কম হ'য়ে ওঠেনি অনিরুদ্ধের শিক্ষাদানগুণে।

ওদের অভিভাবকদের মনে ওদের বিয়ের কথা যে একেবারে ওঠেনি তা নয়। উঠেও ছিলো এবং শেষপর্যন্ত অনিরুদ্ধের পিতা ওদের বিয়ের প্রস্তাবটা জ্যোতি-র্বচনের ফেঁকড়া তুলে নাকচ না ক'রে দিলে হয়তো হ'য়ে যেতো। কিন্তু তাঁর জ্যোতিষে বিশ্বাসটাই ওদের মিলনের পথে দুরতিক্রম্য বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো। বাসবীর বাবার কাছ থেকেই প্রথমে ওদের বিবাহ-প্রস্তাবটা যেহেতু উত্থাপিত হ'য়েছিলো তাই সেটা যখন ওভাবে অগ্রাহ্য হ'লো তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হ'য়ে-ছিলেন। এ নিয়ে শেষটা অনিরুদ্ধের পিতার সঙ্গে বাসবীর পিতার মনোমালিন্য হয়। ফলে এতদিনকার বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে।

বাসবীর মতো দুর্লভ কন্যারত্ন কি আর বেশিদিন অনূঢ়া প'ড়ে থাকে? ওর অসামান্য রূপ ও স্বাস্থ্য আকৃষ্ট করেছিলো ধনিসমাজের আরো বহু সুদর্শন যুবকের দৃষ্টি। বহু গণমান্য লোকের পুত্র বাসবীর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এসেছিলো বাসবীর পিতার কাছে।

বাসবীর শ্বশুর সাগ্নিকবাবু তো কেবল রূপ দেখেই বাসবীকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছাপ্রকাশ ক'রেছিলেন। বাসবীর পিতা যখন অজভূষণের মতো পাত্র পেলেন, এ হেন যার পৈতৃক বৈভব, এই রকম বংশ, কুল, মান ও সামাজিক মর্যাদা তখন তিনি যে এই সুপাত্রের প্রতি বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হ'য়েছিলেন সেটা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বিবাহ জিনিশটাকে পিতারা চিরকাল সামাজিকভাবেই বিচার ক'রে থাকেন, কিন্তু মেয়েরা বিচার ক'রে থাকে অন্য দৃষ্টি-কোণ থেকে।

যাক, শেষপর্যন্ত বাসবীর মন পেয়েও বাসবীর পিতার মনোনয়ন পেলোনা অনিরুদ্ধ কিংবা প্রথমটায় মনোনয়ন পেয়েও পরে হারালো যখন একথা স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেলো যে, সে নিজেরই বাপের সম্মতি বা অনুমোদন পাবেনা বাসবীকে বধূরূপে ঘরে আনার জন্য। বাসবীর অন্যত্র বিবাহের কথাবার্তা অগ্রসর হ'তে থাকলো এদিকে অনিরুদ্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো সময় ও সমস্যা এড়িয়ে যেতে লাগলো নিষ্ক্রিয়তায় ও নিরুত্তরে। বাসবী একাই বা কি করবে? এম্নি ক'রে বাসবী অনিরুদ্ধের হাত ছাড়া হয়ে চ'লে গেলো অজভূষণের হাতে।

ভালোবাসার পাত্রকে না পেলে যে-কোনো মেয়েরই বিবাহিত জীবন সাধারণতঃ বিড়ম্বিত হওয়ার কথা। তদনুপাতে বাসবীর জীবন বিড়ম্বিত হ'তে পারতো কিন্তু তা যে হয়নি তার কারণ অজের ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমা প্রভৃতি গুণে। সর্বোপরি অজের টাকা—টাকারও একটা সান্ত্বনা আছে বৈকি। বাইরে থেকে দেখলে বাসবীকে এখন সুখীই মনে হয়। এ জগতে বাঁচতে গেলে অনিবার্যকে গাত্রসহ ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? বিশেষ ক'রে বাসবীর মতো মেয়েদের পক্ষে জগতে যারা বাঁচতে চায়, হাসতে চায়, প্রচুর প্রাণশক্তি চারিদিকে ছড়াতে চায় পরিপার্শ্ব সজীব ক'রে রাখার জন্য।

অনিরুদ্ধের বাবা অবসৃত চাকুরে। অনিরুদ্ধ বি. এ. টা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজে যে-সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন সেখানেই ছেলেকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পূর্বেকার সুপারিশের জোরে। ঢোকার সময়ে মাইনে যদিও বেশি নয়, তা হোক পিতা পুত্রের সামনে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধ'রে আপাতত তাকে সন্তুষ্ট ও শান্ত ক'রেছিলেন। অনিরুদ্ধের মতো সুন্দর ছেলে, অল্পবয়সী, মাস গেলে টাকা আনছে—পাত্রীর অভাব হ'লো না। বাসবীর বিবাহের মাসখানেক, মাস দেড়েকের মধ্যেই অনিরুদ্ধের পিতাও পুত্রবধূ নির্বাচন ক'রে ফেললেন মলয়াকে। বিয়ে চুকে গেলো। কিন্তু বিয়ের পর বছর না ঘুরতে হঠাৎ একদিন অ্যাপোপ্লেকটিক্ স্ট্রোকে অনিরুদ্ধের পিতা মারা গেলেন! রেখে গেলেন কিছু নগদ টাকা আর একটা নব-নির্মিত

বাড়ি। তবে চাকরিতে ইতিমধ্যে কিছুটা উন্নতি হ'লো অনিরুদ্ধের, মাইনেও বাড়লো।

পিতৃবিয়োগের পর আরো একটা বছর ঘুরে আসার আগেই মলয়ার এমন সব রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো যাতে ডাক্তাররাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'লেন, অনিরুদ্ধকে সাবধানও ক'রে দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী কালে পঙ্গুই হ'য়ে যেতে পারে। তা-ই হ'লো। মলয়া দিন-দিন প্রায় পঙ্গু হ'তে চললো। নিয়তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধও পণ করলো যে, শেষপর্যন্ত সারিয়ে তুলবেই স্ত্রীকে—যদি সেজন্য তাকে সর্বস্বও খোয়াতে হয় তাও করবে সে। বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে সে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়ালো—অফিস থেকে ছুটি আর কতো পাওয়া যায়? অথচ স্ত্রীর সেবার জন্য তাকে ছুটি নিতে হ'বেই। ক্রমাগত ছুটির পর ছুটি নিতে নিতে শেষটা চাকরিতে ইস্তফাই দিতে হ'লো অনিরুদ্ধকে। হাতের যা-কিছু টাকা প্রায় সবই নিঃশেষিত হ'লো, বৎসরের পর বৎসর মলয়ার চিকিৎসার ব্যয়-নির্বাহ করতে এমন কি শেষ অবলম্বন পৈতৃক বাড়িটাও অনিরুদ্ধকে দায়াবদ্ধ করতে হ'লো। স্থাবর অস্থাবর সব কিছুই পণ ক'রে অনিরুদ্ধ মাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারলো একটা অশক্ত পঙ্গু নারীকে। মানুষের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে—অনিরুদ্ধ আগে মানুষ, পরে স্বামী। সেজন্যই অনিরুদ্ধের ধৈর্যসীমাও অতিক্রান্ত হ'লো প্রায়। যতোই দিন যেতে থাকলো মলয়াকে আরো যেন স্বার্থান্ধ, অবুঝ, হিংসুটে ও ক্রুর মনে হ'তে থাকলো তার। বৎসর আসে, বৎসর যায় অনিরুদ্ধের জীবন উত্তরোত্তর আরো দুর্বিষহ হ'য়ে ওঠে—এই হ'লো আমাদের কাহিনীর আরম্ভের পটভূমি।

অদেখার দেখা দিলো দিক্

সেদিন দুপুরে শারী শোবার ঘরেই ছিলো। খাটের ওপর আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় ডায়েরী লিখছিলো, দিনপঞ্জী রাখাটা ওর শখ, লিখলো : 'ডাক্তারবাবু আসেননি।' কথাটুকু লিখে নিজেই ভ্রূ কুঁচ্কালো একবার, জান্‌লার বাইরে চাইলো খানিক, তারপর লিখলো : 'হয়তো ভুলেই গেছেন ; ভুলতে উনি পারেন—ওঁর পক্ষে ভোলা সম্ভব কারণ উত্তমর্ণের গৌরব নিয়ে আছেন উনি। কিন্তু আমি যে পারিনা—কী ক'রে আমি ভুলবো যে, জগতের মধ্যে সব চেয়েই ঋণী আমি ওঁর কাছে—জীবনের জন্য ঋণী। কোনো সময়েই ভুলতে পারবো না, কেমন ক'রে ভুলবো ? কী আমি করবো এই ঋণভার নিয়ে ?'... হৃদয়ে আবেগের তোলপাড় কিন্তু সে-অনুপাতে মাথায় এলো না কিছুই যে সেটুকু একটু ভালো ক'রে প্রকাশ করতে পারবে। এ কী হ'য়েছে তার ? কেন এমন হয় ? ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

নতুন চাকরটা এসে নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা-পিরিচগুলো সরিয়ে নিলো। ওগুলো হাতে নিয়েই শারীর পায়ের দিকটাতে দাঁড়িয়ে রইলো খানিক সম্ভবত কিছু বলার অছিলায়। শারী কিন্তু জানে লোকটার কিছুই বলার নেই। লোকটা ঐ রকম, না তাড়া খেলে হুঁশ হয়না, অসভ্যের মতো হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সবে কাজে বাহাল হ'য়েছে লোকটা। একবার মনে হ'লো একটু ধমকে দ্যায়, বলে, এই বে-আদব, অসভ্য কোথাকার! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, কী চাস্ ? কী দরকার তোর ?

কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তা পারলো না।' শুধু শুধু মানুষের মনে কষ্ট দিতে কী ক'রে যে পারে লোকে সে তো ভেবেই পায় না, মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলো লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে তেম্নিভাবে পেয়ালা-পিরিচগুলো হাতে নিয়ে। শারী আর পারে না, জিগেস করে—কী, দাঁড়িয়ে আছিস্ যে ?

লোকটা দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে শুরু ক'রে দ্যায়, বলে—দেখছি ছবিগুলো। দেয়ালের মাঝামাঝি বড়ো অয়েল পেনটিঙ্‌টার তলায় গিয়ে দাঁড়ায়, জিগেস করে—এই বুঝি বড়কর্তার ছবি, দিদিমণি ?

মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে শারী বললো—হুঁ।

—আর এইটে বুঝি আপনার ?

—হ্যাঁ। কেন ? নিজের কাজে যা। হাতে কাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

অতঃপর সোজা বারান্দা ধ'রে চ'লে গেলো লোকটা। শারী লক্ষ্য করলো ওকে—আশ্চর্য কালো পিঠ, অদ্ভুত সুগঠিত স্বাস্থ্য! আশ্চর্য বর্বর ওর বাহুর পেশী, আশ্চর্য বর্বর সেই পেশীর পৌরুষ! এক একবার মনে হয় দেখুকগে ও। ও যদি চায় ওর চোখ তবু সহ্য হয় কিন্তু ঐ যে পাশের বাড়ির লক্কা ছোঁড়াটা বিকেল হ'লেই ছাতে ওঠে, তার চোখ অসহ্য! শকুন বা হাড়গিলে পাখির চোখের মতো। স্বাস্থ্যের বিকারে বিকৃত, অসুস্থ রিরংসায় পীড়িত!

দেয়ালের আরশিতে নিজের চেহারার প্রতিফলনটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে দৃষ্টি আবার নিয়ে গেলো জানলার বাইরে। কিছুক্ষণ পর ডায়েরীর খোলা পাতায় শারী কয়েক লাইন যোগ করলো: ঐ যে বর্বর-যৌবন লোকটা, সেও সুখী, সেও মুক্ত। দেউড়ীতে গিয়ে দর্‌ওয়ানের সঙ্গে ও যখন প্রাণ খুলে হাসে তখন পাড়াসুদ্ধ লোক যেন সচকিত হ'য়ে ওঠে। অথচ ও তো সামান্য চাকর। ও শ্রম বিক্রী ক'রেছে বটে, নিজেকে করেনি। অর্থের জন্যে কারো কাছে ঋণী হ'লেও বা হ'তে পারে কিন্তু প্রাণের জন্য তো কারো কাছে ঋণী নয়। কিন্তু আমি? শৃঙ্খল, অসহ্য শৃঙ্খল দেহে নয়, মনের গায়ে। একটা অপরিশোধ্য ঋণের বোঝা যেন সর্বদাই আমাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে।

সকলেই বলে ডাক্তারবাবু ন্যাকি অসম্ভব যত্ন নিয়েছেন আমাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার জন্য। কিছু কিছু স্বপ্নের মতো মনে আছে মাত্র। কিন্তু কেনই বা উনি আমার জন্য এতটা করবেন? কিসের প্রত্যাশায়? আমি ভেবে দেখেছি বুঝতে পারিনি কিছু। ওঁর সঙ্গে কীই বা সম্পর্ক! দাদার সঙ্গে এক কলেজে প'ড়েছিলেন এই মাত্র তো? ঐ রকম কর্মব্যস্ত লোক, যাঁর সময়ের অতো দাম, রোজ তিনি কী ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে গেছেন তা বোঝা যায় না। কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রেখে যে দান করে তার দান যেমন ক'রে মানুষকে বাঁধতে পারে তেমন আর কিছুতে পারে না। দানের গৌরব নিয়ে, দাতার গর্ব নিয়ে উনি কি চিরদিনই এমন মাথা উঁচু ক'রে থাকবেন? আর আষ্টে-পৃষ্ঠে কৃতজ্ঞতায় বাঁধবেন? প্রতিদানে আমার কি কিছু দেবার নেই যাতে ঋণের কিছুটা অংশও পরিশোধ করা সম্ভব হ'তে পারে? উনি কি তা' নেবেন? বিনিময়ে কিছুই যদি না নেন তাহ'লে ওঁর কাছ থেকে কৃপা স্বীকার করা এইখানেই যেন শেষ হয়। ঋণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। সেই ভালো নাই বা আর এলেন উনি। কেনই বা আসতে যাবেন? আমরাই বা কেন ওঁকে কষ্ট দিতে যাবো?

...এই পর্যন্ত লিখেছে শারী এমন সময়ে বাসবী ঘরে ঢুকলো। বাসবীকে

দেখে খাতাখানির ওপর বালিশ চাপিয়ে দিয়ে তারই ওপর একেবারে সটান শুয়ে পড়লো শারী। বাসবীর চোখে সেটা এড়ালো না। বাসবী এসে খাটে বসলো, বললো—কী লিখছিলি ভাই, দেখা না?

শারী বিরক্ত হ'য়ে বললো—না দেখাবো না। জ্বালাতন কোরো না বৌদি। সরো বাপু, স'রে যাও।

বাসবী সরে না, আরো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আসে। শেষটা শারীকে জড়িয়েই শুয়ে পড়ে, বলে—রাগিস কেন? শুই একটু তোর কাছে। তোর বিছানাটা ভাই আরো নরম আমার চেয়ে। তোর নরম গায়ের ছোঁয়া লেগেই বুঝি এত নরম?

শারী। বেশ তো রাত্তিরটা শুলেই পারো আমার কাছে। তার বেলায় নয়। রাত্তির হ'লেই বুঝি আমার বিছানাটা কড়া হ'য়ে যায়? কাল ডাকলুম, এসো বৌদি ভয় করছে। আসা হ'লো না। তার বেলায় কী রকম ব্যাজার!

বাসবী। ব্যাজার নয় রে, নয়। দেখিস্, আজ ঠিক তোর কাছে শোবো।

শারী। ঠিক তো? আর কোনোদিন কিন্তু পাবে না ও-ঘরে শুতে।

বাসবী। না পেলুম তো ভারী ব'য়েই গেলো। কিসের ভয় দেখাচ্ছিস্?

এমন সময়ে শারী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—উঃ আচ্ছা, বালিশের তলায় বেমালুম হাত ঢোকানো হ'চ্ছে? আমি বুঝতে পারছি সব। বলছি যখন দেখাবো না, জোর ক'রে দেখতে পারবে?

বাসবী। না দেখাবি তো না দেখাবি, ভারি বয়ে গেলো।...বালিশের তলা থেকে হাত বের ক'রে নিলো বাসবী, বললো—উঃ যা অন্তরটিপুনি দিয়েছিস্।

শারী। বড়ো চালাক তুমি না?

বাসবী। তোর মতো তো কুঁদুলী না। তাহ'লে রাত কাটাবি কেমন ক'রে বল্?

শারী। বেশ তো আমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে দেখো কী করি তারপরে বোলো।

বাসবী। রক্ষে করো ভাই।

শারী। কেন বৌদি?

বাসবী। জানিস্ তো আমার শোয়া বড়ো খারাপ। শেষটায় রাত দুপুরে চুলোচুলি শুরু করবি আর কি আমার পাশে শুলে।

শারী। কই দাদার কাছে শুলে তো চুলোচুলি বাধেনা, আমার কাছে শুলেই অম্নি চুলোচুলি বাধবে? দাদা আমার চেয়ে লক্ষ্মীছেলে বুঝি?

বাসবী। লক্ষ্মী না হাতী চুলোচুলি বাধে না আবার—বাধে বৈকি! তবে তোরা তা জানতে পারিস্ না, এই যা।

গূঢ় কৌতুকে শারী হাসে, বলে—দাদা বেচারী আজ তাহ'লে একলা থাকবে ?

বাসবী। একলা থাকবে কেন—আমার বদলে তুই শুতে যাস। আর আমি তোর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে একা শুয়ে বাঁচবো।

শারী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। প্রথমটা মনে হয় বাসবীর অশিষ্ট কথার প্রতিবাদে সে ও-রকম ক'রে ওঠে পরক্ষণেই দেখা যায় শারীর খাতাখানা বেহাত হ'য়ে গেছে তার বালিশের তলা থেকে। শারী ক্ষিপ্তের মতো হ'য়ে কোনোমতে খাতাখানা কেড়ে নিতে পারলো বাসবীর কাছ থেকে, অবশ্য বাসবীও তেমন জোর করলোনা ওর সঙ্গে, শুধু ব'লে উঠলো—উঃ, তোর হাতে যা নখ শারী ! শখ ক'রে নখ রেখেছিস্ মানুষ খুন করার জন্যে নাকি ? তোর কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকাই দেখছি ভালো।

দেখি, দেখি, আঁচড়ে গেলো বুঝি ?—শারী ব্যস্ত হ'য়ে জিগেস করলো।

বাসবীর হাতের একটা জায়গায় সত্যিই আঁচড় লেগেছে দেখে শারী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললো—যা করছো তুমি···কী এমন ছাই-পাঁশ লেখা যে তাই দেখবার জন্যে এত ? বেশ, এই নাওগে যাও।

ব'লে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে বাসবীর সামনে ঝপ্ ক'রে খাতাখানা ফেলে দিয়ে শারী ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাসবীও ওর পেছন পেছন এলো, বললো—আহা রাগিস্ কেন ? আমি দেখলে এতই যদি রাগ হয় তো দেখাস্‌নে, তুলে রাখগে।

আমি তো দিব্যি আপন মনে ছিলাম তুমি কেন জ্বালাতন করতে এলে বলো তো ? ··ঝাঁঝালো গলায় শারী বলে।

বাসবী বলে—বেশ বাপু, এ্যাকালষেঁড়ে একলা থাক্, আমি চললুম।

শারীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বাসবী।

বাসবীকে চলে যেতে দেখে শারী একবার ভাবলো ফিরে ডাকবে নাকি বৌদিকে ? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, থাক্, সে হ'বে'খন। বৌদির রাগ পড়তে কতোক্ষণ ! খাতাখানা আগে ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে আসা যাক্ ; পরে বৌদির রাগ ভাঙানো যাবে'খন।

খাতাখানা তুলে রেখে শারী বাসবীর ঘরে যায়। বাসবী তখন কী যেন একটা বই নিয়ে শুয়েছিলো। শারী গিয়ে সোজাসুজি একেবারে বাসবীর গা ঘেঁষে বসলো। ব'সে ছোটো মেয়ের মতো আব্‌দার শুরু করলো—কী বই পড়ছো বৌদি ? ভালো বই ? গল্পটা বলো না।

শারীর দিকে চেয়ে বাসবী হেসে ফেললো, বললো—মাথা ঠাণ্ডা হ'য়েছে ?

কেন? এবারে জ্বালাতন করতে এলি কেন? কী হ'লো এবার? কে কাকে জ্বালাতন করতে এলো?

শারী বড়ো সুন্দর ঘাড় দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললো—বেশ করবো। জ্বালাতন করবো না? নিশ্চয় করবো। আমি তোমায় জ্বালাতন করবো, তুমি আমায় জ্বালাতন করবে, দু'জনেই দু'জনকে জ্বালাতন করবো আমরা—তবে তো আমাদের দুপুর এভাবে কেটে যাবে। দুপুর কেন আমাদের জ্বালাতন করে বলো?

এর পরদিন। বেলা বারোটা পর্যন্ত বিরূপাক্ষের আসার প্রতীক্ষায় কাটলো শারীর। রাস্তায় মোটরের শব্দ হ'লেই পর্দা ফাঁক ক'রে জান্‌লায় এসে দাঁড়ায়। কোথায়? কোনো গাড়িই তো থামে না গেটে। উত্তরোত্তর মন অস্থির ও মেজাজ রুক্ষ হ'য়ে ওঠে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে শারী ব'লে ওঠে—তাহ'লে আজও এলেন না।

কী যেন সেলাই করছিলো বাসবী, সে বললো—হুঁ, এত বেলায় আর কি আসেন?

শারী। দেখলে তো বৌদি, কী রকম? কাল না হয় খবর পাঠানো হয়নি তাই আসেন নি—আজ তো খবর গেলো। আজ তো না আসার কোনো ছল-ছুতো নেই। আমি নিজে হাতে লিখে পাঠিয়েছি চিঠি··

বাসবী। নিত্যি নিয়ম ক'রে আর নাই বা এলেন, তুই তো এখন ভালো আছিস্। মিছিমিছি কেন আর ওঁকে কষ্ট দেওয়া—ফী নেন না যখন?

শারী। বেশ, এবার থেকে ফী দেওয়া হ'বে। দাও না কেন তোমরা? কী এমন বাধ্যবাধকতা যে উনি বিনা ফীতে দেখছেন—আমাদেরই বা কী এমন সঙ্গতির অভাব?

বাসবী। দিতে গেলেও আমাদের কাছ থেকে উনি কি তা নেবেন? উনি কি সেই রকম ব্যবসাদার লোক? 'অফার' ক'রে কি আর দেখা হয়নি? তোমার দাদা প্রথম দিনই দিতে গিয়েছিলেন। তাতে উনি ক্ষুণ্ণই হ'য়েছিলেন বরং।

শারী ঝাঁঝিয়ে উঠলো—রেখে দাও ও-সব সৌজন্য। ফী-এর টাকা এবার থেকে আমার হাতে দিও দেখি, আমি দেবো। এতে দয়া বা অনুগ্রহেরও কিছু নেই কিংবা বাধ্যবাধকতারও কিছু নেই কোনো তরফ থেকে। গুনে গুনে টাকা ফেলবো যতোবার ইচ্ছে আনবো, উনিও ভাবতে পারবেন না যে অনুগ্রহ

করছেন, আমরাও ভাববো না যে মিথ্যে কোনো বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই যে চেম্বার সাজিয়ে ডাক্তাররা ব'সে থাকে টাকা ছাড়া কোন মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শুনি?

বাসবী। আমার কাছে তো খুব বড়াই করছিস। বিরুদার হাতে ফী-এর টাকা দিতে পারবি?

শারী। নিশ্চয়। কেন পারবো না? ওঁর বাড়ি গিয়ে নিজহাতে দিয়ে আসবো। আজ পর্যন্ত কতোবার এসেছেন তোমাদের হিশেব আছে তো?

বাসবী। বলিস্ কী রে? পারবি?

শারী। হ্যাঁ, পারবো।

বাসবী। তুই কী মেয়ে রে! ওঁকে তুই এভাবে অপমান করতে পারবি? উনি তোকে এত ক'রে সারিয়ে তুললেন, আর তুই-ই ওঁকে অপমান করবি? একটুও কি তোর কৃতজ্ঞতা নেই? মাঝে তুই কী হ'য়ে গিয়েছিলি···আজ তো আবার সহজ মানুষ হ'য়েছিস, সে কার দয়ায়? ওঁর ঋণ কি শোধা যায়?

একথায় শারীর ঔদ্ধত্য যেন কিছুটা পশ্চাৎপদ হয় সাময়িকভাবে। খানিক ভেবে সে বলে—কথাটা যে সত্যি তা' জানি। কিন্তু তাই ব'লে আমি তো কারো পায়ে ধ'রে কাঁদতে যাইনি যে, ওগো, এসো গো আমায় সারিয়ে তোলো।

বাসবী। তোমাতে কি আর তুমি ছিলে যে পায় ধরতে যাবে, বা ডাকতে যাবে? তোমার হ'য়ে আমরা যে তা' করেছি।

শারী। তোমরা করেছো যখন কৃতজ্ঞতাটা তোমাদেরই থাকুক। আমি ও-সবের কিছু জানিনা, ব'লে দিলুম।

শারী মুখ ঘুরিয়ে বসলো।

ঘরের বাইরে থেকে অব্জভূষণের গলার স্বর শোনা গেলো—কই শারী, তোমার বৌদি ঘরে আছেন নাকি?

শারী বলে—হ্যাঁ, আছেন দাদা।

অব্জভূষণ দোর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো—ডাক্তারবাবু অসুস্থ—আসতে পারেননি। মিস্ চ্যাটার্জিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তিরস্কারপূর্ণ চোখে বাসবী শারীর দিকে চাইলো, বললো—দেখলি তো মানুষকে কী রকম ভুল বুঝিস্?

বাসবী স্বামীকে জিগেস করে—কোন্ ঘরে বসেছে সতী? চলো যাই এ-ঘরে তাকে নিয়ে আসিগে।

বাসবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সতীর উদ্দেশে।

শারী উঠে দাঁড়ায় আরশির সামনে। আঁচলে মুখটা মুছে নেয়। চুলটা ঠিক ক'রে নেয়। রুক্ষ চুলগুলোর জন্তে চেহারাটা নিজেরই মনে হয় বড্ডো শুষ্ক ও ম্লান! আরশিতে নিজেকে একবার আপাদমস্তক ভালো ক'রে দেখে নেয়, শাড়িখানার অগোছালো ভাঁজগুলো সুবিন্যস্ত ক'রে নেয়। সারা দেহে সুষ্ঠু একটা বিন্যাস এনে যেম্নি বসেছে সোফায়, সতীকে নিয়ে বাসবী ঘরে ঢুকলো।

—কই, দেখি পেশেণ্টের কী খবর?

প্রত্যুত্তরে শারী সতীর দিকে চেয়ে অভ্যর্থনার হাসি হাসলো, দেখিয়ে দিলো পাশের সোফাটি, বললো—চিরকাল আপনাদের পেশেণ্ট হ'য়ে থাকতে ইচ্ছে করে বুঝলেন, সতীদি।

সতী বলে—সে তো বুঝতেই পারছি। নইলে এত জোর তলব পড়েছে কেন ডাক্তারবাবুকে। শরীর কি ফের খারাপ বোধ করছো?

শারীকে ঈষৎ লজ্জিত দেখায়, সে কুণ্ঠিত স্বরে বলে—না; তেমন কিছু নয়—তবে সময়ে সময়ে কেমন যেন হ'য়ে পড়ি। মন বড়ো দুর্বল হ'য়ে পড়েছে ভাই। আপনাদের আশ্বাসে তবু খানিকটা জোর পাই। সেজন্যই তো রোজ কষ্ট দেওয়া ডাক্তারবাবুকে। কী রকম শরীর খারাপ হ'য়েছে ওঁর?

সতী বলে—ব্লাড্‌প্রেসারটা বেড়েছে। দু'দিন হ'লো হাসপাতালেও যাচ্ছেননা।

শারী বলে—আমার দোষ নেই কিন্তু। কী ক'রে জানবো বলুন? কালকে ফোন যে ধ'রেছিলো সে তো এসব কোনো খবরই দ্যায়নি।

সতী বলে—বোধহয় নতুন বেয়ারাটা ফোন ধ'রেছিলো।

শারী যথার্থ কুণ্ঠিত স্বরে বলে—সতীদি, ডাক্তারবাবুকে আপনি বলবেন আমি জানতামনা ব'লেই···

সতী বলে—কিন্তু এতে তো এতো কুণ্ঠিত হ'বার কিছু হয়নি···

শারী তবু বলে—না, না, ভাই সতীদি, তা হোক···আপনি জানেননা, ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই চ'টে গেছেন···আপনি বলবেন···

—হ'বেও বা, আমি জানিনা। আচ্ছা, বলবো।···শারীর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সতী না হেসে পারলোনা।

সতীর সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে বাসবীও হাসলো, বললো—দ্যাখো তো ভাই তোমার পেশেণ্টটিকে। ক্ষণে ক্ষণে রকম রকম খেলা খেলছেন। এখন তো কেমন সরু সুতো কাটছেন কিন্তু খানিক আগে ওরে বাপ্‌স্, কী রাগ! বাড়ি ব'য়ে গিয়ে এখুনি ডাক্তারবাবুর ফী মিটিয়ে দিয়ে আসছিলেন।

সতী বলে—তাই নাকি? হ্যাঁ দিদি? তাহোক, দিদি আমার বড়ো ভালো···

শারী চেঁচিয়ে ওঠে—আচ্ছা বৌদি, কী করেছি আমি তোমার? আমার পেছনে কেন এমন ক'রে লেগেছো বলো তো?...শারীর স্বরে ভর্ৎসনা।

বাসবীর কথার প্রতিক্রিয়া চাপতেই বুঝি শারী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এক একবার বাসবীর মনে হ'তে লাগলো সতীর কাছে এমন ক'রে শারীকে ফাঁস করে দেওয়াটা হয়তো ভালো হয়নি।

বাসবীকে সতী জিগেস করলো—ননদকে কেমন দেখছেন আজকাল?

বাসবী বলে—মোটের ওপর ভালোই··তবে বরাবরই তো ভয়ানক অভিমানী—একটুতেই মন বিগড়ে যায়।

সতী বলে—না, ওকে এখন বেশ ফুর্তিতে রাখবার চেষ্টা করতে হ'বে।

বাসবী বলে—চলুন, শারীকে খুঁজিগে—সে হয়তো ও-ঘরে গেছে।

বাসবীর সুসজ্জিত ঘরে বাসবী ও সতী একই সঙ্গে ঢোকে। শারী দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে তখন শুয়ে ছিলো বাসবীর খাটে। ওরা এসে খাটেই বসে।

শারী ফিরে বাসবীর দিকে বিরক্তি-ভরে তাকায়, বলে—আচ্ছা বৌদি, তোমার জন্যে পালিয়ে এলুম, তুমিও এখানে এলে জ্বালাতন করতে?

—না, না, বাপু, তোমরা কথা কও, আমি যাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ঈষদ্ধাস্যমুখী বাসবী। একটু পরে সে যখন ফের ঢুকলো, দেখলো বেরোবার জন্যে তৈরি হ'য়ে শারী দাঁড়িয়েছে আরশির সামনে।

বাসবীকে দেখে শারী ব'লে ওঠে—বৌদি, সতীদির সঙ্গে যাচ্ছি।

বাসবী সতীর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায়, বলে—সত্যি নাকি? কোথায়?

সতী বলে—আমিই ওকে বলছি যে, এইবার ও একটু ক'রে বেরোতে পারে এখানে-ওখানে। কোনোদিন বা সিনেমায় গেলো, কোনোদিন বা বন্ধুর বাড়ি গিয়ে খানিক গল্পগুজব করলো—এ সবের স্বাস্থ্যকর প্রভাব আছে মনের ওপর। নইলে সবসময়ে রুগী সেজে বাড়ি ব'সে ব'সে কেবল রোগের চিন্তা এটা মনের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বিশেষত যার মন স্বভাবতই পীড়িত।

শারী বলে—জানো বৌদি, সতীদি আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার কিন্তু সিনেমায় যেতে ভালো লাগেনা বাপু। বললাম, তার চেয়ে চলুন আপনাদের ওখানেই যাই। শুনলাম যখন ডাক্তারবাবু অসুস্থ, এখুনি সতীদির সঙ্গে গিয়ে পড়লে আচমকা তাঁকে খুব অবাক্ ক'রে দেওয়া যাবে, কী বলো?

বাসবী বলে—বেশ তো যাওনা। আজই তো প্রথম বাড়ির বার হ'চ্ছো, ওঁর কাছেই যাও। ওঁর দৌলতেই আবার মানুষ হ'য়েছো যখন···

সতীর পেছন পেছন শারীও বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সিঁড়ি নামতে নামতে সতী বাসবীর দিকে চেয়ে বললো—যদি শারীকে পৌঁছে দিতে দেরিও হ'য়ে যায় তো ভাববেন না যেন।

—সঙ্গে তুমি রইলে ভাববার কিছু নেই। একলা কোথাও যেতে দিতে ভরসা পাইনা। মাথার ব্যামো—কখন কী রকম হ'য়ে ওঠে বলা যায়না তো।

—তোমার কেবল ঐ এককথা···মাথার ব্যামো আর মাথার ব্যামো!···বিরক্ত হ'য়ে ওঠে শারী।

সতী বলে—মিছে নয়, ছাখো না! কোথায় মাথার ব্যামো? এমন সুন্দর মেয়ে! স্বপ্ন দেখছেন নাকি তোমার বৌদি?

সতীর দিকে চেয়ে বাসবী হাসতে হাসতে বললো—স্বপ্নই বটে—দুঃস্বপ্ন! সুখের বিষয় সে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে ভাই তোমাদেরই চেষ্টায়।

সতীর সঙ্গে শারী মোটরে উঠছে এমন সময়ে হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ দুলিয়ে একজন ভদ্রমহিলা গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে একবার যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন কয়েক মুহূর্ত, তারপর মোটরের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বলেন—হ্যালো তন্বী, তুমি কি বেরোচ্ছ? আমি তো তোমার সঙ্গেই আলাপ করতে এসেছিলাম···তাঁর হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনোকিছু বলার আগেই শারী ব'লে ওঠে—হ্যাঁ। মৃদুলাদি, আমি যাচ্ছি একটু। আপনি ভেতরে যান, বৌদি আছেন।

ব'লে শারী মোটরে গিয়ে বসে।

সেই ফাঁকে চশমার মধ্য দিয়ে মৃদুলা তীক্ষ্ণ শাণিত চোখে সতীকে আপাদমস্তক দেখে নেন, বলেন—কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

পরক্ষণেই যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে যাওয়ার ভান ক'রে শারীর দিকে চেয়ে মৃদুলা ব'লে ওঠেন—ওহো, এই সেই নার্স?

শারী এবার মৃদুলাকে পুরোপুরি উপেক্ষাই করে, ওর কথার কোনো উত্তর ছায়না, সুধু সতীকে চোখ টেপে। অর্থাৎ ওর কোনো কথায় কান দেবার দরকার নেই। সতী তবু ছোট্টো একটু জবাব দিয়েই ফ্যালে—আজ্ঞে, আমিই সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত যাই বলুন···

মোটর তখন স্টার্ট নিয়েছে।

মৃদুলার কাছে সতীর অস্তিত্বটাই যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত, এম্নি ভাবখানা দেখিয়ে সে এবার সম্বোধন করে শারীকে—তাহ'লে তোমার আসতে কি দেরি হ'বে?

শারী বল্লে—দেরিও হ'তে পারে যদি এঁরা (সতীর দিকে দেখিয়ে দিয়ে) শিগ্‌গির না ছাড়েন।

মৃদুলা তবু গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা চলতে চলতে বলে—আমি কি তাহ'লে তোমার জন্যে 'ওয়েট্' করতে পারি?

শারী বলে—আমার জন্যে আর অপেক্ষা করার দরকার নেই মৃদুলাদি।

গাড়ি তখন এতটা দূর এগিয়ে পড়েছে যে আর কথা চলেনা। উপেক্ষার স্পর্ধা নিয়ে ওদের গাড়িটা চ'লে যায়। মৃদুলার সাপের মতো চোখ দুটো চশমার কাচের আড়ালে হু হু ক'রে জ্ব'লে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে যে-পথ দিয়ে এসেছিলো সে-পথেই পা বাড়ায় কিন্তু মাত্র কয়েক পা গিয়েই আবার কী ভেবে ফিরলো। শারী চ'লে গেলেও বাসবী তো আছে। অন্তত ওর কাছেও খানিকটা বিষোদ্গার করতে পারলে ওর আজকের দুপুর কতকটা সার্থক হয়! দেউড়ী ও দর্‌ওয়ান পেরিয়ে পাম ও ক্যাসুয়ারিনার ছায়াশ্রিত ও কঙ্করাস্তৃত বীথিপথ মাড়িয়ে মৃদুলা সেন এসে দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দার নিচে। অমনি বেয়ারা দৌড়ে এলো।

কী দরকার? কাকে চাই? কী নাম? কোথা থেকে আসছেন?

বেয়ারার পর পর এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে খুব বনেদী উপেক্ষার সুর তুলে গম্ভীরভাবে মৃদুলা শুধু বলে—ও-হো তুমি নতুন এসেছো বুঝি? মিসেস্ মুখার্জি অর্থাৎ তোমার মা-ঠাকরুনকে একবার খবর দাও; বলো মিস্ সেন এসেছেন। তাহ'লেই বুঝতে পারবেন।

বেয়ারা অভ্যর্থনা-কক্ষে মৃদুলাকে বসিয়ে পাখাটা খুলে দিয়ে যায়।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে প্রসাধনীতে ভরা হ্যাণ্ডব্যাগটা মৃদুলা খুললেন। স্কুল মিস্‌ট্রেস্ মৃদুলা সেন বয়স যাঁর পঁয়ত্রিশ পার হ'য়ে গেছে, বিবাহে যাঁর ভয়ানক বিরাগ তাই অবিবাহিতা, কথায় বার্তায় পিউরিটান্ সাজবার ঝোঁক যাঁর বড়ো বেশি, বিবাহ জিনিশটাকে যিনি প্রায় অশ্লীলতার কাছাকাছিই মনে করেন,—এতটাই ঘৃণা করেন ব'লে বড়াই ক'রে বেড়ান যে, জীবনে তিনি কখনো কোনো বিয়ের নিমন্ত্রণে পর্যন্ত যাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজা এই যে, প্রসাধন-পারিপাট্যে কোনো ষোড়শীর চেয়েই তিনি কম উৎসাহী নন! রোগা শরীরে অল্পই মাংস আছে, রুক্ষ মুখ, অসম্ভব তীক্ষ্ণ চোখ—চুল অল্প এবং অনার্যসুলভ কুঞ্চিত—কৃপাণের মতো নাক। কোমলতা মসৃণতা কিছুতেই নেই, বলনে, চলনে, ভাবে, ভঙ্গিতে এমন কি মেদেও মসৃণতা নেই। তবে মোটের ওপর মানুষটা কুশ্রী নয়, রুক্ষ একটা সুষমা আছে।

জনশ্রুতি আছে, কবে কে যেন তাঁকে আঘাত করেছিলো তাই আজো বাজছেন এমি খনখনে গলার স্বর! কুৎসা রটনায় অরুচি নেই কোনো সময়েই। অলি একসময়ে নাকি তাঁরও জুটেছিলো তবে এখন তিনি অন্য গলিতে। কেউ কেউ বলেন—সুবিধে পেলে এখনো এক বাচ্চা প্রজাপতির সন্ধানে আছেন। এই হ'লো স্কুল মিস্ট্রেস্ মৃদুলা সেন—যিনি সকল সময়ে সকল ছাত্রীকেই নীতিশিক্ষার বালাই দিয়ে নিরন্তর নির্মমভাবে নিপীড়িত করেন।

পরিচিত মহলে কোথাও বিবাহোৎসব লাগলে তিনি অনাহূত অমঙ্গলের মতো উদিত হন অনেক আদেশ-উপদেশ অনুরোধ-বিরোধের বোঝা নিয়ে। জীবনে বহু বিবাহ তিনি ভেঙে দিতে সক্ষম হ'য়েছেন একথা মনে করতেও একটা বিশেষ রকম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ভাঙ্‌চি দেওয়া তাঁর একটা পেশা একথা সর্ব-জনবিদিত। বেশ একটু অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের মানুষ এই মৃদুলা। নারী-সমাজে তিনি প্রকাশ্যে মৃদুলাদি ব'লে সম্বোধিত হ'লেও অন্তরালে কুঁদুলা-দি ব'লেই সমধিক খ্যাত।

শারী ও সতী বেরিয়ে গেলে পর একা-একা ভালো-না-লাগার বিরক্তির মধ্যে থেকে বাসবী হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে, পিয়ানোটা অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। নতুন যে-গৎটা সে শিখছিলো সেটা অভ্যেস করলে এখন মন্দ হয়না, দুপুরটা তবু যাহোক কাটে।

পিয়ানোর সামনে ব'সে বাসবী সবে ঢাকাটা তুলেছে এমন সময়ে চাকর খবর দিয়ে গেলো, মিস্ সেন এসেছেন। মনে মনে বিরক্ত হ'লেও বাসবীকে পিয়ানো ছেড়ে উঠতেই হয়। সমাজে ব্যবহারিক ভদ্রতারক্ষার বালাই, বড়ো বালাই।

মৃদুলা মুখে পাউডারের 'পাফ'টা ঘষে নিচ্ছিলো বাসবী যখন ঘরে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকেই বাসবী শব্দ ক'রে হেসে ওঠে—ইস্, এ কী ক'রেছেন মৃদুলাদি? এত পাউডার মাখে? জ'মে আছে যে খাঁজে খাঁজে।

মৃদুলা অপ্রস্তুত হ'য়ে খানিক কথা হাতড়ায়, বলে—ওঃ বড়ো গরম! এবার আশ্বিনেও এত গুমোট···আমি তো ঘামের জ্বালায়···

মৃদুলার কথার পিঠে বাসবী কথা যোগ করে—মুখে কেবল থাবা থাবা পাউডার মাখেন। তাই না?

মৃদুলাও অগত্যা বাসবীর উচ্চহাসিতে যোগ দিলো।

বাসবী বললো—আপনার ছাত্রী কিন্তু বাড়ি নেই, বেরিয়েছে। এখন তাহ'লে?

মৃদুলা বললো—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। বললে, ভেতরে যান বৌদি আছেন। ওর সঙ্গে সেই নার্স'টা ছিলো।

(সহাস্যে) বাসবী। ও সতীর কথা বলছেন?

(তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) মৃদুলা। অতো নাম-টাম জানিনা—ঐ যে বিরূপাক্ষ ডাক্তারের সেই বেহায়া নার্স টা। ও বুঝি এখানে প্রায়ই আসে?

(ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে) বাসবী। আসে বৈকি।

মৃদুলা। ওর সঙ্গে ছেড়ে দিলে শারীকে? এটা কিন্তু আমার ভালো লাগলোনা। ওকে জেনে-টেনেও, ওর সব বৃত্তান্ত শুনেও কেমন ক'রে যে তোমরা নাকে তেল দিয়ে থাকো বুঝিনা। শারী আমার ছাত্রী, ওকে আমি স্নেহ করি। ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমার একটা কর্তব্য আছে।

এর উত্তরে বাসবী মৃদু হেসে বলে—ওর সম্বন্ধে কর্তব্য শুধু যে আপনারই রয়েছে একথাই বা আপনি ভাবছেন কেন? ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদেরও কর্তব্য রয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস আমরা তা' ঠিকমতোই পালন ক'রে যাচ্ছি।

দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে মৃদুলা ঔদাস্যের সঙ্গেই বলে—জানিনা বাপু, তোমরা কী ভেবেছো। কিন্তু আমার যদি মেয়ে থাকতো তাহ'লে ও-রকম নার্স-টাসে'র সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাকুক, ওগুলোকে বাড়ি ঢুকতে পর্যন্ত দিতুমনা।

বাসবী বলে—শারীর সেটা সৌভাগ্য যে আপনার মেয়ে হ'য়ে সে জন্মায়নি।

এবার বেশ একটু হতাশ হ'য়েই মৃদুলা বললো—তাহ'লে দেখছি তোমার মতে ও-রকম মেয়েকেও বাড়ি ঢুকতে দে'ওয়া উচিত।

বাসবী মৃদু হেসে বলে—ওঁরা আর আসেন কোথা? গরজে প'ড়ে আমরাই ওঁদের ডাকি। সতী, বিরূদা এঁরা দু'জন শারীর জন্য যা ক'রেছেন সে-ঋণ শোধবার নয়। আপনার ভুল হচ্ছে মৃদুলাদি, বাড়ি না ঢুকতে দেওয়ার প্রশ্ন তাঁদের বেলাই ওঠে যাঁরা অনাহূত এবং তুচ্ছতম কাজেও আসেননা বরং আসেন অকাজে কিংবা দুষ্কাজে। বিরূদা ও সতী শারীর জন্য এত যে করলেন তার বিনিময়ে কোনোকিছুর প্রত্যাশীও নন। ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা আমাদের কতো!

মৃদুলা এ-জায়গায় বাসবীকে একটু শ্লেষ ক'রে নিলো—বিরূপাক্ষ ডাক্তারকে 'বিরূদা' বলছো বুঝি আজকাল? কবে থেকে?

বাসবী বলে—যবে থেকে পরিচয়।

হোপ্‌লেস্!…ব'লে এবার মৃদুলা একদম এলিয়ে পড়ে একটা কৌচের ওপর! অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটুখানি চোখ বুজিয়ে থাকার পর হঠাৎ যেন জেগে উঠলো মৃদুলা, উপদেশচ্ছলে বললো—ত্যাখো বাসবী, নির্বিচারে দাদা বলাটা আমি বিশেষ পছন্দ করিনা।

বাসবী বলে—আপনার পছন্দ কিংবা অপছন্দে অপরের যে কিছুই আসে যায়না সেটা বোঝেননা কেন ?

ধাক্কা খেয়ে হঠবার পাত্র মৃদুলা নন, অবাঞ্ছিত উপদেশ অপাত্রে অযাচিতভাবে দিতে গিয়ে এ-রকম কথার মার খানও, কথার মার দেনও। এ তাঁর অভ্যেস আছে।

মৃদুলা ব'লে ওঠেন—How silly ! এই কথা তুমি বললে ! কী করে ? আচ্ছা যাক্‌গে ওকথা। By the bye···একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো—তোমার সেই বিরূদা না নিরূদা···না কী ব'লে যেন ডাকতে তাকে ?—I mean সেই ছোকরা যার সঙ্গে মলয়ার বিয়ে হ'য়েছে।

বাসবী ভ্রূকুঞ্চিত করে।

মৃদুলা বাসবীকে একবার আড়চোখে লক্ষ্য ক'রেই যেন আরো উৎসাহের সঙ্গে বললো—সেই যে তোমাদের আখ্‌ড়ার সেই ছোক্‌রা গো··

বাসবী ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব চেপে রাখতে চেষ্টা ক'রে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি ; ব'লেই ফেলুন না কী হ'য়েছে ?

মৃদুলা বলে—হ'বে আর কি ? আহা, মলয়ার জীবনটা তো নষ্ট হ'য়েই গেলো ! রিনা ব'লে একটি মেয়ে তুমি জানো বোধহয় তাকে ? তোমরা তো একই সঙ্গে ঐ ছোকরার কাছে সাঁতার শিখতে। তার কাছেই শুনলাম তোমাদের সব কথা···

বাসবী হাসির আবরণের মধ্যে থেকে বিতৃষ্ণ গলায় বলে—কী শুনলেন ?

—এই তোমাদের বিয়ের আগেকার সব ব্যাপার···আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি।

—না বিশ্বাস ক'রে অন্যায় করেছেন। যে যা বলবে বিশ্বাস ক'রে নিলেই তো ফুরিয়ে যায়, অসময়ে অপরকে জ্বালাতে আসতে হয়না।

বাসবীর এত স্পষ্ট ইঙ্গিতও মৃদুলা গায়ে মাখলোনা এবং এ সত্ত্বেও বললো —এ সব যে মহাভারতের ব্যাপার চট্ ক'রে কি আর বিশ্বাস হয় ? এখনো সে তোমায় চিঠিপত্র লেখে ?

—প্রেমপত্র ? প্রেমপত্র দেখার লোভও আছে নাকি ? বাইরে থেকে আপনাকে অমন কাঠখোট্টা দেখালে কী হয়···ভেতরে বইছে চাপা রসের ফল্গু যে ! মৃদুলাদি ?

বাসবী হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

মৃদুলা এবার উষ্মাপ্রকাশ ক'রেই ফ্যালে, বলে—আঃ কী যে সব তাতে হাসো, এ হাসার কথা নয়, বাসবী। তোমার চাল-চলন কী যে বিশ্রী হচ্ছে দিন দিন।

যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে এবং সংযতকণ্ঠে বাসবী বলে—সব সময়েই আপনাকে

এই কথাটা মনে রাখতে বলি যে, এটা আপনার স্কুল নয়। আরো একটা কথা···রাগ করবেননা···রাজ্যের লোককেই তো আপনি উপদেশ দিয়ে বেড়ান, আমাকেও তো এখুনি কতোগুলো দিলেন—এবার আমিও আপনাকে একটা উপদেশ দিই শুনুন—আর কতোদিন এমন ক'রে সকলের প্রণয়ে ঈর্ষ্যা ও দাম্পত্যে বিঘ্ন ক'রে বেড়াবেন? তার চেয়ে কথা শুনুন নিজেই একটি বিয়ে ক'রে ফেলুন—অভ্যেস শুধরে যাবে।

ভেবে দেখলে কথাটা কিছুই নয় তবু হঠাৎ যেন দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে মৃদুলা—এ্যাঁ, বলো কী বাসবী? নিজের বাড়িতে পেয়ে তুমি আমাকে এতো বড়ো অপমান করলে? এমন কথা কেউ কখনো আমায় বলতে পারেনি যা তুমি আজ আমায় বললে। মানুষকে বাড়ির মধ্যে পেলে যাকে যা নয় তাই ব'লে অপমান করা যায় নাকি? বিশেষ ক'রে আমার মতো পিওর মেয়েকে? এতো ভালো সমাজে মিশি, এতো জায়গায় যাই এ রকম অভদ্র ব্যবহার কেউ করেনি আমার সঙ্গে, এতো বড়ো অপমান কেউ করেনি···

গলা বিকৃত হ'য়ে যায় মৃদুলার। কথা হজম করার শক্তি যার অপরিসীম, সেই মৃদুলা সেন এতো সামান্যতেই এ রকম বিচলিত হ'য়ে উঠবে এ ভাবতেও পারেনি বাসবী।

বাসবী বলে—ভুল বুঝবেননা, মৃদুলাদি। অপমান তো করিনি, সদুপদেশ দিতে গিয়েছিলাম। সুস্থ মনে ভেবে দেখলে দেখবেন রাগের এতে কিছু নেই।

এক রকম প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে যায় মৃদুলা।

বাসবীদের বাড়ির বিস্তৃত কম্পাউণ্ড পার হ'য়ে, গেট পার হ'য়ে মৃদুলা যখন রাস্তায় পৌঁছলো তখন তার দু'গাল বেয়ে দু' ফোঁটা জল নেমে আসছে! তাড়াতাড়ি অগ্নি রুমালটা চেপে নিয়ে সে দুফোঁটা নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেললো মৃদুলা। এদিক-ওদিক চেয়ে অকারণেই বড়ো ক্ষিপ্র বেগে চলতে লাগলো। সভয়ে এক একবার পিছন ফিরে তাকাতে থাকলো, বাসবীর সেই কথাগুলো যেন তার পিছু নিয়েছে। কথাগুলোর তাড়া খেয়ে সে যেন সমানেই দৌড়তে থাকে। সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলোর অদৃশ্য হাত যেন এখুনি গ্রাস ক'রে ফেলবে তাকে, কোথায় লুকোবে সে? মৃদুলার যাই মনে হোক আমার তো মনে হয় আসংজ্ঞাত নির্জ্ঞান গ্রাস ক'রে ফেলতে চাচ্ছে সংজ্ঞানকে। কোথায় লুকোবে মৃদুলা?

বাড়ি ফিরে সেদিন আর চুলে কলপ দেওয়া হয়না মৃদুলার।

ঝড়ে-কাঁপা লতা খোঁজে শাখা

বিরূপাক্ষ তার শোবার ঘরে কী একটা মেডিক্যাল জার্নাল হাতে নিয়ে খাটে শুয়েছিলো শারীকে সঙ্গে ক'রে যখন সতী সে-ঘরে ঢুকলো। ঢুকতে ঢুকতে সতী বললো—ডাক্তারবাবু দেখুন, কাকে ধ'রে এনেছি।

বিরূপাক্ষ পাশ ফিরে দেখলো বেশে, বাসে, প্রসাধনে একেবারে নিখুঁত হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে শারী। উঠে বসে বিরূপাক্ষ। এ যেন সে মেয়েই নয় যাকে সে এতদিন এত কাছে দেখে এসেছে, এত ঘরোয়াভাবে বছর খানেক ধ'রে অশ্রান্ত সেবা করেছে, চিকিৎসা করেছে, প্রাণপণ করেছে অস্বাভাবিকতা থেকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে। এ যেন নতুন কেউ, নতুন জৌলুস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—নতুন দৃপ্তি নিয়ে চোখে—নতুন তীক্ষ্ণতা! এক মুহূর্তকাল শারীকে আপাদমস্তক দেখে বিরূপাক্ষ বলে—আরে, এ কে? অভাবনীয় কাণ্ড যে!

শারী বলে—অভাবনীয় বলছেন কেন ··আমায় বুঝি আসতে নেই?

সতীর দিকে চেয়ে শারী একটু ঠাট্টার স্বর তোলে—দেখছেন তো সতীদি, 'প্রবেশ-নিষেধ' টাঙানো আপনার এলাকায়।

সতী ব'লে ওঠে—অমন বদনাম দিওনা ভাই, যার এলাকা বলছো সেই তো তোমাকে সঙ্গে ক'রে আনছে।

বিরূপাক্ষ বলে—সাধু, সাধু!

সতী দু'জনের দিকে চেয়ে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, ব'লে গেলো—আসছি, বোসো। আমায় আবার এখুনি হস্‌পিট্যালে বেরোতে হ'বে।

সতী সেখান থেকে চ'লে গেলে একটু কৌতুক-কুটিল চক্ষে শারী বিরূপাক্ষকে বললো—কই, বসতে বললেননা?

বিরূপাক্ষ বললো—আপনা থেকেই দেখতে আসতে পারলে যখন ভেবেছিলাম বসতেও পারবে।

ওঃ, ভেবে নিয়েছিলেন? বেশ তাই হ'বে। শুয়ে পড়ুন···উঠে বসলেন কেন? আমি বসছি।

পায়ের দিকে খাটের প্রান্তে শারী বসলো।

বিরূপাক্ষ আপত্তি তুললো—আহা, ওখানে কেন? ঐ চেয়ারটায় বোসোগে না। ···বিরূপাক্ষ পা দুটো সরিয়ে নিলো।

শারী কিন্তু উঠে দাঁড়ালো, বললো—প্রথমে তো বসতেই বললেননা, তারপর যখন দেখলেন আপনা থেকেই বসেছি—তখন উঠতে বলছেন। আমি চললুম।

বিরূপাক্ষ ডাকলো—শোনো শারী, শোনো।

শারী কিন্তু সাড়া না দিয়েই বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। মিনিট কয়েক পরে এলো একেবারে সতীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে।

সতী ঘরে ঢুকেই বললো—তাহ'লে চললুম ডাক্তারবাবু, শারী রইলো। যা দরকার হ'বে বলবেন। যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে গেলুম, পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।

শারী বলে—দেখলেন তো ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি এখন আপনার নার্স—আপনি এখন রুগী আর সতীদি হচ্ছেন ডাক্তার—ওঁর ডিরেক্‌শন মতোই এখন আমি আপনাকে চালাবো, বুঝলেন তো?

সতী বলে—সত্যিই তাই, হাসছেন যে বড়ো? আমি ফিরলে শারী আমায় চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবে এখান থেকে। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। শারী, ডার্করুমের কালো পর্দা দুটো দোরে দিয়ে দিওতো। বাইরের জান্‌লা দু'টো আমি বন্ধ ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

জান্‌লা দু'টো বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলো সতী, শারী জিগেস করলো—ঘুমের ওষুধটা দেখিয়ে দিয়ে গেলেননা?

সতী বলে—কম্পাউণ্ডিং রুমে এসো—দেখিয়ে দিচ্ছি। তবে ডোসেজ্‌টা ডাক্তারবাবুর কাছে জেনে নিও।

বিরূপাক্ষ বলে—আমি শারীকে দেখিয়ে দেবো'খন। দু'আউন্স দিও বেশ মজাসে ঘুমোনো যাবে।

শুনে সতী আর্তনাদ ক'রে ওঠে—খবরদার। তাহ'লে সে ঘুম আর ভাঙবেনা।

—কাজ কী ও-সবে, সতীদি? এম্নিই ঘুম হ'বে, কেন হ'বেনা? ঘুম আমি ঠিক পাড়িয়ে দেবো, দেখবেন।

সহাস্যে বিরূপাক্ষ বলে—কাজটা ঠিক খোকা ঘুম পাড়ানোর মতোই সোজা, না শারী?

সতী হো-হো ক'রে হেসে ওঠে।

এরই একটু বাদে সতীর মোটরটা কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে গেলে পর শারী বিরূপাক্ষের ঘরে কালো পর্দা দুটো দিয়ে দিলো। আয়না-লাগানো টেবিলটার সাম্‌নেকার গদি-আঁটা সোফাটায় বসলো। হঠাৎ টেবিলের ওপরে রাখা একটা খামের প্রতি নজর পড়তেই শারী সেটা হাতে নিলো। নিজেরই হস্তাক্ষর! শারী তো কাল এই চিঠিটাই পাঠিয়েছিলো বিরূপাক্ষকে।

বিরূপাক্ষ আগে থেকেই ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলো।

শারী চিঠি থেকে চোখ তুলে বললো—এ দুর্বিনীত চিঠিটা ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু।

বিরূপাক্ষ হেসে উঠলো, বললো—ক্ষমা কেন? ওটাতেই তো আমার ফী দিয়ে দিয়েছো—ওটার দাম অনেক। দাও তো রেখে দি।

শারী চিঠিটা কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—আপনাকে ফী দেবো কী সাধ্য আমার? নিজে তা ভালো ক'রে জানেন ব'লেই তো ঠাট্টা করছেন—সে কি আর আমি বুঝিনা?

বিরূপাক্ষ। না, ভাই, ঠাট্টা করিনি। কিন্তু থাক্ ওকথা···

শারী। না, থাকবে কেন? অন্যায় করেছি মাপ চাইতে দিন—সেজন্যই দৌড়ে আসা। ভাবতেও পারিনি যে, আপনি এরই মধ্যে এতখানি অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারেন। তারপর আজ যখন শুনলুম আপনি বাথ্‌রুমে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন তখন আর থাকতে পারলুমনা। আপনি এত বড়ো মনস্তাত্ত্বিক স্বধু কি চিঠিটাই পড়েছেন, এ-চিঠির পেছনে যে মনস্তত্ত্ব সেটা কি একবারও মনে হয়নি?

বিরূপাক্ষ। এতে এত বিচলিত হ'বার তো কিছু নেই। কিছুই অপরাধ করো নি তুমি। তুমি যে এতটা দাবি রাখো আমার ওপর—এটা জেনে খুশিই হ'য়েছি। প্রথম যেদিন বাড়ির বার হতাম তোমাদের ওখানেই যেতাম ঠিক।

শারী। আপনি প্রতিদিন আমাদের ওখানে যেতেন এটাই ছিলো কতো বড়ো একটা আশ্বাস, মনে হ'তো সুস্থ হ'য়ে গেছি। আপনি গেলে নিজে চা ক'রে খাওয়াতাম, গল্পগুজব হ'তো, মন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে যেতো। সেটা না হ'লেই বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে, একটুও ভরসা পাইনা, মনের জড়তা কাটতে চায়না সারাদিনেও···অসুস্থবোধ করি। কেন এমন হয় বলুন তো?

বিরূপাক্ষ। হয়তো এরও কোনো কারণ আছে। আমাদের মনের নির্জ্ঞানে এমন অনেক কথাই থাকে যা আমরা জানিনা বা জানতে চেষ্টা করিনা, বা এড়িয়ে যাই বা আমাদের মনের অধিশাস্তাই তাকে পিষ্ট ক'রে রাখে। কিন্তু এ-ধরনের অনেক কথারই খবর বিশেষজ্ঞেরা রাখেন।

শারী। আপনি তো তাঁদেরই একজন তাই আপনাকে জিগেস করছি, বলুননা।

বিরূপাক্ষ। বিশেষজ্ঞ হ'লেও আমায় তো বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে রাখোনি, অন্তরঙ্গের পর্যায়ে টেনে এনেছো যে ভাই। তাই বলতে আমি অপারগ। তাছাড়া আজ আর ডাক্তারী করবার ইচ্ছে নেই।

বিরূপাক্ষের কথায় শারীর খেয়াল হয়, সে ব'লে ওঠে—আপনাকে এমন ক'রে

জাগিয়ে রাখলে তো চলবেনা। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। মাথাটা ছেড়েছে? একটু ওডিকলোন দিয়ে দেবো?

বিরূপাক্ষ। দিতে পারো; তবে প্রেসার না কমলে ঘুমও হ'বেনা। মাথাও ছাড়বেনা।

শারী বিরূপাক্ষের শিয়রে গিয়ে বসে। ওডিকলোনের জলে মাথাটা বেশ ক'রে ভিজিয়ে দ্যায়, বলে—মাথাটা টিপে দেবো? দেখবেন এক্ষুনি ঘুম আসবে।

বিরূপাক্ষ। না ভাই, কেন পণ্ডশ্রম করবে—ঘুম আসবেনা। তার চেয়ে চেয়ারে গিয়ে বোসো। বাকি বেলাটুকু গল্পগাছায় কেটে যাক।

শারী। না, আপনি আজ পেশেণ্ট, এখন আপনার কোনো কথা শোনা হ'বেনা। আমি সতীদির ডিরেক্‌শন মতো কাজ করবো। ঘুম আপনাকে পাড়াবোই।

বিরূপাক্ষ। আমাদের বিজ্ঞান নরম হাতের জাদুতে বিশ্বাস করেনা, শারী। ঘুম যদি পাড়াতেই চাও তো আগে দশ মিনিম Rawolfia Serpentina-র আরক দাও। ঘুম পাড়ানোর বাহাদুরী তবেই তুমি পাবে।

শারী। তা কেন? আগেই ওষুধ কেন? দেখুন ঘুম আসে কিনা। বৌদির মুখে আমার মাথা টেপার সুখ্যাতি যদি শুনতেন তাহ'লে আমার কথায় নির্ভর করতে পারতেন।

শারীর লঘু লীলায়িত আঙুলগুলো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—বিরূপাক্ষের কপালে ঘন চুলের অরণ্যের মধ্যে কখনো অদৃশ্য হ'য়ে যায়, কখনো বেরিয়ে আসে, রগের পাশে কানের পাশে ফুলের মতো ছুঁয়ে যায়, কখনো কখনো মৃদু চাপ দ্যায় চুলে, কখনো মৃদু টান দ্যায়, কখনো কুঞ্চিত ক'রে দ্যায় কপালের চামড়া, কখনো টান ক'রে টিপে ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শারী নিজের অসাধারণ দক্ষতা প্রতিপন্ন করে। মাঝে মাঝে বসনপ্রান্তের মৃদু-ছোঁয়া, চুড়ির শিঞ্জন-সংগীত—সব নিয়ে অপূর্ব একটা আবেশ আনে, একটা অপূর্ব অনুভূতিতে বিরূপাক্ষের চোখ বুজে আসে। বিবিধ প্রসাধনীর এক মিশ্র সুগন্ধে, মাঝে মাঝে কাপড়ের রেশমী ছোঁয়ায়, চুড়ির শিঞ্জন-সংগীতে অপূর্ব এক অনুভূতি সারা গায়ে ছড়ায়, বিরূপাক্ষের চোখ বুজে আসে, স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকে সে।

শারী। এই বলছিলেন, আপনাদের বিজ্ঞান নাকি নরম হাতের জাদুতে বিশ্বাস করেনা? কিন্তু চোখ যে আপনার বুজে আসছে।

—সার্টিফিকেট চাও? তা দিতে পারি।

—সার্টিফিকেট না ছাই। সার্টিফিকেট লাগবেনা।

—হাত দু'টি তোমার যতোই নরম হোক Rawolfia Serpentina-র চেয়ে নয়।

—আচ্ছা সে জানি।···গাঢ় কৌতুক শারীর চোখে!

বিরূপাক্ষ। আচ্ছা ভাই, একটা কথা ভাবছিলাম—এই হাতেই তো কালকের চিঠিখানা লিখেছিলে যে হাত এখন কপালে বুলোচ্ছো?

শারী দুষ্টুমি-ভরা কণ্ঠে বলে—উঁহুঁ, আর এক জোড়া হাত গজিয়েছিলো কাল আপনাকে চিঠি লেখবার জন্যে।

—আজ মাথা টেপবার জন্যেও ফের যদি সেইটেই গজাতো কী হ'তো তা'হলে? ···বিরূপাক্ষ সমূহ সন্ত্রাসের অভিনয় করে!

—ঠিক হতো; অশ্বত্থামার মতো মাথার জ্বালায় পাগল হ'য়ে বেড়াতেন। সরু-মোটা হাসির ঐকতানে দ্বিপ্রহর চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

বারবার পেড়াপাড়িতে শারী অগত্যা বিরূপাক্ষকে ঘুমের ওষুধ ছায়। তবে দশ ফোঁটা দিয়ে বলে পনেরো ফোঁটা।

ওষুধ খাওয়ানো হ'লে এসে বসে বিরূপাক্ষের শিয়রে, বলে—কথায় কথায় সময় কেটে যাচ্ছে কী রকম দেখুন ঘড়ির দিকে চেয়ে। আপনার কপালে ওষুধের সঙ্গে আমিও হাত মিলোলাম, আর তো আপনার জাগা চলবেনা। সতীদি এসে যদি দেখেন আপনি ঘুমোননি আমায় কী বলবেন বলুন তো? চোখ বুজোন শিগ্‌গির।

শারী বিরূপাক্ষের চোখে হাত চাপা ছায়।

ওর এই অকুণ্ঠ আচরণে বিরূপাক্ষের বেশ মজা লাগে। সে চক্ষু বুজিয়েই হাসিমুখে বলে—কেন শারী, আমাকে কি শিশু মনে হ'লো?

—আপনি শিশুরও বাড়া। ··শারী ধমকে দিয়ে ওঠে—চুপ ক'রে থাকুন।

Rawolfiaর হাত আরো ঠাণ্ডা, আরো নরম শারীর চেয়ে। একগাদা তন্দ্রার ফেনার তলায় তলিয়ে যেতে থাকলো বিরূপাক্ষ। নিঝুম ঘুম-সায়র, আনীল, ফেনিল, স্বপ্নের কুয়াশা জমে সেখানে। রহস্যের রিরংসু জালক জড়িয়ে ফ্যালে হাত-পা, চেতনা, চোখের পাতা—শেষহীন গড্ডরিকা চলে, গোনা যায়না—শাদা শাদা ভেড়ার পাল চলছে যেন সংজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞানে, গ্লেসিয়ারের মতো মন্দগতি, চেতনার উচ্চচূড়া থেকে অবচেতনার অতল গূঢ় উপত্যকায়! শাদা ভেড়ার শেষহীন স্রোত চলেছে তো চলেছেই·· একটানা গলার ঘন্টির শব্দ ঝুন্···ঝুন্···ঝুন্ বেজে চলেছে ঘুমের কাকলি—ঘুমের পরীর হাল্কা আঙুল ঝঙ্কার তোলে স্নায়ুতন্ত্রীতে—ঘুম-সারেঙের করুণ স্বর—কল্পনার কানে ও-স্বরের তুলনা নেই, ঠিক যেন বৃষ্টির শব্দ টিনের চালে কিংবা শার্শির কাচে—শারীর চুড়ির শব্দ ও তো নয়—সুর, সুদূর, বিধুর, মেদুর, মধুর···অনুভূতির অমিত পাতাল দোলে, অস্পষ্ট অলস আব্‌ছায়ায়··· রাশ-ছাড়া আত্মা মন আঁকাবাঁকা রেখায় চলে—

[illegible] পরবলয় নির্জ্ঞানের [illegible]কে ছুঁয়ে মূঢ় হ'য়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে চেতনার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি বন্ধ হ'য়ে যায়। দ্বৈধ সত্তা ক্রমশ একের মধ্যে লুপ্ত, ঘনীভূত ও সংহত হয়—চেতনা-অবচেতনার পরস্পর গলাগলি, কথা বলাবলি থেমে যায়—ঘুম আসে।

শারী উঠে গিয়ে বসে টেব্‌লের সামনে একটা সোফায়। দক্ষিণ জানলার সিল্কের পর্দা তখন উড়ছিলো, ফুলে উঠছিলো নৌকোর পালের মতো। দূরের হাওয়া—দুপুরের ঘুমের স্বরের মতো কানে আসে—অবস্থত সময় মন্থর।

জানলার পর্দা সরিয়ে খানিকটা ফাঁক ক'রে ছ্যায় শারী—সেই সুদূরেই চেয়ে থাকে—বাড়ির সমুদ্রের পারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়া দেখা যায়।

রোদ কড়া নয়—উত্তাপ মৃদু। ঈষৎ শ্যামল, অদ্ভুত আলো—পীতাভ রং। কী যেন একটা নেশা শরৎ হাওয়ায় মেশা—একটা নতুন উষ্ণতা, অনাস্বাদিত স্বাদ। সতী কখন আসবে? প্রতীক্ষায় থাকে শারী; মোটরের হর্ন এখুনি হয়তো বেজে উঠবে গেটে। শব্দে বিরূপাক্ষ জেগে উঠবেনা তো?

বিরূপাক্ষের ঘুম যখন ভাঙলো সতী ও শারী তখন পাশের ঘরে ব'সে আলাপ করছে। ওদের আলাপের গুঞ্জন বিরূপাক্ষের কানে আসছিলো। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তখনো জড়িয়ে আছে নতুন কোনো গন্ধের সুস্নিগ্ধ স্মৃতি—ঘুমের জড়তার মধ্যে থেকে সেটাকে চিনতে চেষ্টা করে বিরূপাক্ষ। মাথার শিয়র থেকে শারী স'রে গেছে তবু সেই গন্ধ শারীর শরীরের প্রতিনিধি হ'য়ে এখনো রয়েছে। রোদ প'ড়েছে তির্যক হ'য়ে। বাড়ির কার্নিসের ছায়া বাইরের 'লনে'। আলো কমে গেছে বারান্দায়, আলো কমে গেছে 'করিডরে'।

এরই একটু পরে সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দ হয়, শারী সিঁড়িতে নামতে নামতে ট্রিমলোর স্বরে কথা বলে—চললুম তাহ'লে সতীদি, আপনি বসুন। আপনাকে আর আসতে হ'বেনা। ড্রাইভারই আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে। উনি কেমন থাকেন কাল ফোন করবেন নিশ্চয়ই।

সতী বলে—না ভাই, বৌদি কী ভাববেন? মনে-মনে বলবেন—কী বে-আক্কেলে ছাখো, নিয়ে গিয়ে একা ছেড়ে দিলে মেয়েটাকে। চলো, পৌঁছে দিই। উনি তো ঘুমোচ্ছেন। সুজনকে ব'লে যাচ্ছি, কাছে থাকবে।

ব'লে সুজনকে বাবুর ঘরে হাজির থাকার নির্দেশ দিতে-দিতে সতী শারীর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। ক্লান্ত বিরূপাক্ষ পাশ ফিরে চোখ বুজোলো।

খয়া-লাগা একি ঝরা ফুল

ক'দিন পরেকার কথা—বিরূপাক্ষ এখন সুস্থ হ'য়েছে অনেকটা। আগেকার মতোই হাসপাতালে যেতে সুরু করেছে দিন দুই হ'লো। তবে সকাল সকাল ফেরে আর দুপুরে বাড়িতেই থাকছে আজকাল। দুপুরের এই সময়টুকু ওর পড়াশোনায় কাটে। কিন্তু কে জানে কেন পড়াশোনাও আজ যেন তার ক্লান্তিকর ঠেকছে। রোদে কিসের যেন আমেজ—ওদিকে চাইলে কাজে বিভ্রম আসে! সে বই বন্ধ ক'রে দেখছিলো এই রোদকে—শোষণ ক'রে নিচ্ছিলো এর মৃদু উত্তাপ, ভাবছিলো এই রোদের মৃদু উত্তাপের জন্ম হ'লো কি স্তূপীকৃত স্মৃতির নিঃশব্দ দহন থেকে? এমন সময়ে আপাদমস্তক চাদরে-মোড়া একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন।

প্রণতি যে! হঠাৎ? পথভুলে নাকি? ··বিরূপাক্ষের মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

প্রণতি অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে চাদর সরাতে সরাতে বলে—বড্ডো জরুরী দরকারে এসেছি, বিরূদা। এটা রেখে যদি কিছু টাকা দাও তো খুব উপকার হয়।

চাদরের মধ্যে থেকে রুপোর দোয়াত ও কলমদান বের ক'রে প্রণতি বিরূপাক্ষের সামনে টেবিলের ওপর রাখে।

প্রণতিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বিরূপাক্ষ বলে—টাকার দরকার থাকে নিয়ে যাও। মিছিমিছি এটা বয়ে আনার কী দরকার ছিলো? তুমি তো জানো আমি পোদ্দার নই।

প্রণতি বলে—তুমি তো কতোবার কতো উপকার করেছো, সেকথা ভুলিনি ··

—তবে এটা কেন বয়ে আনলে?

প্রণতি বলে—এম্নিই; এটা তোমার এখানেই থাক্ বিরূদা—তুমি এতে অমত কোরোনা। বস্তির ঘরে নড়বড়ে লেখার টেবিলে কি এ জিনিশ মানায়, তুমিই বলো? এত বেখাপ্পা দেখায় যে কী বলবো!

প্রণতির একথার 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনো জবাবই দ্যায়না বিরূপাক্ষ শুধু রুপোর-দোয়াত-সম্বলিত কলমদানটা নিয়ে ওপরকার খোদাই-করা লেখাগুলো পড়তে থাকে—

প্রণতি বলে—এটা ওকে ক্লাব থেকে দিয়েছিলো আর বছর। তখন কে ভেবেছিলো এটার এই দশা হ'বে?

—আর ওটা?···বিরূপাক্ষ জিগেস করে প্রণতিকে।

—এটা রুপোর ফ্রেম। এই ফ্রেমে ক'রে বাঁধিয়েই তো ওকে মানপত্রটা

দিয়েছিলো ক্লাব থেকে। এতে অনেকটা রুপো আছে···প্রণতি আশ্বাসের মতো ক'রে বিরূপাক্ষকে বললো।

বিরূপাক্ষ যেন কথাটা শুনতে পায়নি এমনভাবে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যায়, বলে—অপদার্থ টা এখন কোথাও বেরোয়—কোনো কাজে-টাজে? নাকি এখনো আগেরই মতো টো টো কোম্পানীতে ব্যাগার খাটে?

নিজের রসিকতায় বিরূপাক্ষ নিজেই একটু হাসলো কিন্তু পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলো, বললো—কতোবার বলেছিলাম—এক্ষুনি বিয়ে করিস্‌নি অদ্রি। শতকরা নিরানব্বইটা সুস্থলোকের মতো একটি ছোটোখাটো কাহিনীর প্রতিপালন তোর ধাতে হ'বেনা। আমার কথা শুনলেনা তো তখন।

একথার প্রতিবাদ না ক'রে প্রণতি আর থাকতে পারেনা, বলে—ওকথা বোলোনা বিরুদা, বিয়েতে আমিই ওকে জড়িয়েছিলাম; ও আমার সম্মান রেখেছিলো। সেজন্য আমি তো ওকে দোষ দিতে পারিনা। লোকে যাই ভাবুক।

মৌন বিরূপাক্ষ জানলার বাইরে মন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো কয়েক মুহূর্তের জন্য এখন ফের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে পর দেখতে পেলো প্রণতি ঠিক তেমনি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে বোধহয় তার খেয়াল হলো তাই ব'লে উঠলো—বসলে না, নতি? বসো। তোমার নিশ্চয়ই এখন খুব তাড়া নেই।

প্রণতি প্রথমটা দ্বিধা ক'রেও শেষপর্যন্ত বসলো।

বিরূপাক্ষ বললো—দিনকতক আগে অদ্রি যখন এসেছিলো এখানে, কী-যেন একটা খবরের কাগজে ঢুকেছে বললো, মাইনেও যা বললো নেহাৎ মন্দ নয়।

প্রণতি বললো—সেইখানেই তো বেরোচ্ছে। মাইনেটা এখনো পায়নি কিনা, তাই। মাইনের টাকাটা পাওয়া গেলে তখন আর অসুবিধে হবেনা।

বিরূপাক্ষ জানলার বাইরে চেয়ে কী ভেবে যেন হাসলো একটুখানি আত্ম-বিশ্বাসের হাসি। সুস্পষ্ট, দৃঢ় অথচ নরম গলায় আস্তে আস্তে বললো প্রণতিকে—আমার মনে হয় তোমাদের অসুবিধে বরাবরই থাকবে, নতি। ওকে এতদিন দেখেও তুমি ওর ওপর এতটা ভুল ধারণা পোষণ করো জেনে সত্যিই অবাক্ লাগছে। চাকরি বজায় রাখবার মতো সুস্থ অদ্রীশ কখনো ছিলোও না বা বর্তমানে নেইও।

এই দ্বিতীয়বার অদ্রির অসুস্থতার উল্লেখটা প্রণতির কানে কেমন যেন বাজলো। প্রণতি বললো—কেন, সুস্থ নয়? কী হ'য়েছে ওর? স্বাস্থ্য তো ওর ভালোই, এমন তো কিছু খারাপ নয়।

বাদানুবাদের নিস্পৃহতায় রুক্ষ অথচ ভদ্রতায় কোমল কণ্ঠে বিরূপাক্ষ আরো

স্পষ্ট হ'তে গিয়ে বললো—মানসিক অসুস্থতার ইঙ্গিতটাই করতে চেয়েছিলাম, নতি। ভবিষ্যদ্বেত্তা নই যে, ভবিষদ্বাণী করবো ; তবে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ হিশেবে ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে আশঙ্কা আছে। সেদিন অদ্রি যখন এখানে এসেছিলো তখন ওকে যে-রকম দেখেছিলাম তাতে তো আমার আগের আশঙ্কাই ঘনীভূত হ'লো। অর্থাৎ কসুর এইখানেই। নিজেরই মাথায় টোকা মেরে, সঙ্কেত করলো।

—সেকি ? দেশের লোক যার সংবর্ধনায় সভা ডাকছে, মানপত্র দিচ্ছে, সে মানুষ পাগল ? কী যে বলো, টাকা রোজগার সে হয়তো না করতে পারে তাব'লে তার প্রাপ্য সম্মানটুকুও তুমি দেখছি দিতে কুণ্ঠিত—থাক্ তোমার অর্থ-সাহায্যের দরকার হ'বেনা, চললুম।

প্রণতির চ'লে যাবার জন্যে দোরের দিকে পা বাড়ায়। বিরূপাক্ষও এসে প্রণতির পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়, অনুতপ্ত, লজ্জিত, বলে—অমন ক'রে যাবি কোথা ? খেপিস্নি, শোন্ পাগলী, বোস্ আগে। এখন তুই পরের ঘরের ঘরনী হ'য়েছিস্ ব'লে বুঝি তোর ওপর আমার আর এতটুকুও জোর নেই ?

আকস্মিকভাবে এই 'তুমি'টা 'তুই' হ'য়ে যাওয়ার জাদুক্রিয়ায় প্রণতির প্রস্থানোদ্যম ক্ষান্ত হ'য়ে যায়। ঈষৎ গাঢ়স্বরে স্নেহসিক্ত পাগলী ও তারপরের কথা-গুলোতে আর ঔদ্ধত্য প্রকাশের জোর পায়না প্রণতি, ব'সে পড়ে, বলে—আচ্ছা, তুমি কী আমায় এখনো রাগিয়ে দিয়ে, খেপিয়ে দিয়ে আমোদ পাও, বিরূদা ?

বিরূপাক্ষ টেবিলের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বলে—পতিনিন্দা শুনতে নেই, না রে ?

প্রণতি লজ্জিত মুখে চুপ ক'রে থাকে।

বিরূপাক্ষ আরো বললো—মনোবিজ্ঞানের কয়েকটা নিষ্ঠুর সত্য তোর কাছে খুলে বলতে যাচ্ছিলাম তা তুই বুঝলিনা, রাগ করলি। তুই কি ভাবিস্ তোদের শুভ আমি ঈর্ষ্যা করি ? অদ্রি আমার বাল্যবন্ধু—ওকে আমি ভালোবাসি, তুইও তো আমার অপ্রিয়পাত্রী নস্—সেকথা তো তোর অবিদিত নয়। ডাক্তার অনেক সময়ে রোগীর প্রিয় পরিজনদের আতঙ্কিত করে, তা ব'লেই কি ডাক্তার রোগীর অশুভকামী ? অজ্ঞ থাকলে আতঙ্ক এড়ানো যায় কিন্তু পরিণতি এড়ানো যায়না। কুকুরে কামড়ালেও অজ্ঞ আতঙ্কিত হয়না কিন্তু জলাতঙ্কেই মরে। বরং সময়মতো রোগ নিরূপণে ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় অবাঞ্ছিত পরিণতি এড়ানো যায়। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লেই বিজ্ঞান কখনো মিথ্যা স্তোক দ্যায়না।

প্রণতি প্রতিবাদের একবার শেষচেষ্টা করে—প্রতিভা ব'লে তাহ'লে কিছু স্বীকার করবেনা ? সবই উড়িয়ে দেবে পাগলামি ব'লে ?

—কল্পনা ও চিন্তাশক্তির যে অনন্যতা, ওকে আজ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সুধীজনের

সাধুবাদ অর্জন করেছে, সেটার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পাগলামিই। হ'তে পারে শৌখিন তবু এটা ঐ জিনিশই ; প্রকারে ভিন্ন হ'লেও জাতিতে অভিন্ন। সম্প্রতি আমি এ নিয়েই গবেষণায় নিযুক্ত আছি। আজ ক'বছর আগে এই শহরতলীতে যে মানসিক চিকিৎসালয় করেছি তাইতে ও-রকম একটি প্রতিভাকে কিছুদিন নজর-বন্দী ক'রে রাখবার স্থযোগ পেয়েছিলাম। দেখেছি, প্রায় বছর খানেক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালানোর পর তার প্রতিভার জ্বর ছেড়ে গিয়েছিলো। কিছুদিন আগে লোকটির সঙ্গে একবার দেখা হ'য়েছিলো, তাতে দেখলাম আজকাল সে নিতান্ত সাধারণ একটি মানুষ। আজ সে সাধারণ মানুষের চিরন্তন জীবনযাপন-প্রণালীই গ্রহণ করেছে।

প্রণতি হাসতে হাসতে বললো—বুঝেছি এবার তোমার কথা। কিন্তু প্রতিভা যদি পাগলামিই হয় তো সে-পাগলামি কিছু দোষের নয়, তাতে লজ্জারও কিছু থাকেনা। তোমার এ-সব অদ্ভুত ধারণা আগে থেকে জানলে রাগতুমনা। আচ্ছা, আমায় রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতে খুব ভালো লাগে, নয় ?

বিরূপাক্ষ প্রণতির অকালশুষ্ক মুখের দিকে চায় আর বলে—রাগে, বিরাগে, অনুরাগে তোকে সকল সময়েই দেখতে ভালো লাগে, নতি। বাড়ি তো আমার খালিই প'ড়ে থাকে, তোরা চ'লে আয় না এখানে। কেন ঐ বিশ্রী বস্তিতে কষ্ট ক'রে আছিস্ ? চ'লে আয়, ভাই-বোনে মিলে-মিশে থাকা যাবে'খন।

—তুমি এখন একাই আছো ?

—কেন, কিছু শুনেছিস্ নাকি ?

প্রণতি বিরূপাক্ষের একথার কোনো জবাব ছায়না। চুপ ক'রে থাকে। বিরূপাক্ষ নিজে থেকেই বলে—আমি থাকি আর সতী থাকে—সতী আমার নার্স। এখুনি এসে পড়বে দেখতেই পাবি। নিকটেই এক জায়গায় গেছে—আমারই এক পেশেণ্টের বাড়ি।

প্রণতি আর থাকতে পারেনা, ব'লেই ফ্যালে—নার্সের নাম সতী ?

বিরূপাক্ষ হাসে, বলে—হঁ্যা, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

এ জায়গায় বিরূপাক্ষ ও প্রণতি পরস্পর অর্থপূর্ণ হাসি বিনিময় করে। বিরূপাক্ষ বলে—এ তোর অন্যায়, নতি। আগে থেকেই কাউকে শ্লেষ করিস্‌নি ভাই, ছাখ্ আগে তারপর যা মন্তব্য করতে হয় করিস্। সতী বড়ো ভালো মেয়ে, যেমন লক্ষ্মী তেমনই গোছালো—আমায় বড়ো ভালোবাসে।

প্রণতি বলে—এ আর কী এমন নতুন কথা শোনালে, বিরূদা। তোমার নার্স তোমার কাছে রয়েছে এতদিন, তোমায় ভালোবাসবে না ?

ব'লে প্রণতি বড়ো বেখাপ্পা হাসে।

বিরূপাক্ষ গম্ভীর মুখে বলে—সত্যি-মিথ্যেয় মিশে কতোদূর তোদের কানে গেছে জানিনা কিন্তু তাতে আমার কিছুই আসে যায়না। সতী আগে মন খারাপ করতো, বলতো—পেটেই খেলেননা যদি পিঠে সইছেন কেন? এভাবে জীইয়ে রাখার খেলা আপনার শেষ করুন এবার—আমায় বিদেয় ক'রে দিন।

বুঝতাম ওর কথা, বলতাম—ছাখোই না শেষপর্যন্ত অপবাদ সত্যি হ'য়েও তো যেতে পারে, ধৈর্য ধ'রে থাকো। তাহ'লে তো পিঠে সইবে?

কিন্তু ও আমায় চিনে নিয়েছিলো তাই বলতো—হাজার ধৈর্য ধ'রে থাকলেও লোকনিন্দাই পুঁজি হ'বে জীবনে; এর বেশি আপনি কিছুই দিতে পারবেননা, কৃপণ; বুঝে নিয়েছি আমি আপনাকে। নইলে আজ তিন পুরুষ ধ'রে আমাদের নার্সগিরিই পেশা—লোকনিন্দা ও অপবাদের তোয়াক্কা করতামনা। তাই অপবাদের কথা যখনই ভাবি বা মুখে বলি তখন এটুকু বুঝে নেবেন যে আমার জন্য নয়, আমার কীই বা মান আর কী-ই বা খোয়াবো। আপনার তরফ থেকে ভেবেই বলছি বিদেয় ক'রে দিন। আমিই বা কেন আপনার অপবাদের কারণ হ'তে যাবো? এমন নির্দোষ একজন যাঁর কাছে আমি উপকৃত, তাঁরই সুযশে, সুনামে, কেন সুধু সুধু কালি দিতে যাবো? এতখানি অকৃতজ্ঞ নই।

প্রণতি এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনে-শুনে ব'লে ফ্যালে—তুমি তাহ'লে ঐ সতীকেই বিয়ে ক'রে ফেলো বিরূদা, কিছু নিন্দে হ'বেনা।

বিরূপাক্ষ বলে—পাগল! সে-পথ বন্ধ। পূর্বরাগের পাঠ শেষ করিয়েছি ওকে—এর বেশি আর এগোনো হ'য়ে ওঠেনি।

প্রণতি বলে—আর পড়া দাওনি কেন? শুরুও করোনি অনুরাগের পরিচ্ছেদ? চিরকাল তোমার সব তাতেই দেরি।

হেসে বিরূপাক্ষ বলে—অনুরাগের পরিচ্ছেদও শুরু করেছিলাম খানিকটা তারপর পড়া আর এগোয়নি। এখনো সে সময়ে সময়ে জ্বালাতন ক'রে মারে। শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থিনীর উৎসাহ দেখলাম অনেক বেশি।

প্রণতি বলে—তবে কেন এগোয়নি? ছাত্রীর মেধা বুঝি কিছু কম?

বিরূপাক্ষ হেসে বলে—বরং উল্টো; এ-ব্যাপারে একটু বেশিই মেধাবিনী। পাছে গুরু-মারা বিদ্যে হয় তাই ভাবলুম এখানে থেমে যাওয়াই ভালো।

প্রণতি বলে—সত্যি বলছি বিরূদা, ঠাট্টা করছিনা। সতীকে তুমি বিয়েই ক'রে ফেলো—সব দিক থেকে ভালো হ'বে, নিন্দুকেরও মুখ বন্ধ হ'বে।

বিরূপাক্ষ খুব হেসে ওঠে, বলে—নিন্দে হ'বে, কলঙ্ক রটবে, এই ভয়ে সতীকে

বিয়ে ক'রে ফেলতে হ'বে ? অতো কলঙ্ক-ভীরু নই। বরং আমাদের ব্যাপার নিয়ে লোকে কী-রকম মাথা ঘামায় এবং সত্যি-মিথ্যের বিচিত্র রং নিয়ে লোকের কল্পনায় ব্যাপারটা কী রকম পল্লবিত হ'য়ে ওঠে সেটা নেপথ্য থেকে দেখতে আমার তো বেশ লাগে। এ নিয়ে আমি ভাবিনা, তোরাই ব্যস্ত হোস্ দেখি।

শেষটা বলে—আসল কথা কী জানিস্, ওকে বিয়ে করা যায়না তাই করিনি।

—কেন আগের কোনো ঘটনা আছে বুঝি ওর জীবনে ?

প্রণতি উস্‌খুস্ ক'রে ওঠে একটা মুখরোচক কুৎসার আস্বাদন করতে পাওয়ার কাল্পনিক প্রত্যাশায়।

বিরূপাক্ষ বলে—ওর সম্বন্ধে যা ভাবছিস সে-সব কিছু নয়। আর তেমন কিছু ঘ'টে থাকলেও সেটা আমার কাছে কোনো বাধা হ'তোনা। ওর চেয়েও গুরুতর বাধা আছে। আমি অন্তত মনে করি সেটাকে খুবই গুরুতর। তাই পেছিয়ে গেছি।

—কিন্তু সে গুরুতর বাধাটা কী ?

—ওর দিদিমা যৌবনাবস্থা থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উন্মাদ ছিলেন। তাঁর মেয়েও অর্থাৎ সতীর মাসী আজ দশ বছর উন্মাদ-আশ্রমে বাস করছেন। সতীর মা যদিও সুস্থ ছিলেন তবুও সতীর তরফ থেকে সে বিপদ যে একেবারেই নেই তাও বলা যায়না। সুতরাং ওর দ্বারা বংশরক্ষা সম্ভব নয় যখন, এখানেই থেমে যাওয়া ভালো।

এমন সময়ে 'করিডরে' হীল-তোলা জুতোর খট্‌খট্ শব্দ হয়। বাইরে থেকে আওয়াজ আসে—দেখুন ডাক্তারবাবু···

প্রণতি বিরূপাক্ষের মুখের দিকে চাইলো। বিরূপাক্ষ বললো—সতীর গলা

বলতে বলতে সতী শারীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার পেশেণ্ট বড়ো দুষ্টু হ'য়েছে একটু ব'কে দিন তো।—বিরূপাক্ষের কাছে নালিশ জানালো সতী।

শারী ব'লে উঠলো—না ডাক্তারবাবু, ও-সব সতীদির বানানো কথা—শুনবেননা যেন। মানে আর কি···সতীদি ভীষণ··বুঝেছেন তো ?

উহ্য কথার বাকি ইঙ্গিতটুকু শারী চোখ-মুখ ঘুরিয়েই ক'রে দ্যায়।—এ-সময়টা বড়ো সুন্দর দেখায় ওকে—এ সম্বন্ধে ও নিজেও যেন বেশ সচেতন।

ঘরে ঢোকামাত্রই একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়লো শারী, বললো—আচ্ছা, আপনি সতীদির কথা বিশ্বাস করেন ?

বিরূপাক্ষ হেসে জবাব দিলো—সত্যি বললে করি বৈকি। মিথ্যে বললে করিনা।

সোফায় এলানো ঘাড় একটু বাঁকাভাবে তুলে শারী চোখ-মুখের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় বললো—তেমনি একটা বানানো মিথ্যে এক্ষুনি সতীদি 'আপনাকে বলতে এসেছেন—খুব ক'রে অবিশ্বাস করবেন বুঝেছেন ?

সতী হেসে ওঠে। সে হাসিতে সকলেই যোগ ছায় শুধু প্রণতি আরো গুটিয়ে ছোটো ক রে নেয় নিজেকে। এই আলোর ঝল্‌কানির মধ্যে প্রণতি নিজেকে খানিকটা কুৎসিত অন্ধকারের মতো ঢেকে রাখতে চায়। আধ-ময়লা সস্তা মিলের শাড়ি দিয়ে রং-ওঠা সস্তা ছিটের ব্লাউজটি ঢাকতে গিয়ে আরো কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে যায়! গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ ক'রে ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। সে বলে—চললুম বিরূদা।

উঠে পড়ে প্রণতি।

দেয়ালে রক্ষিত ফোটোটার সঙ্গে আজকের জীবন্ত প্রণতিকে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে দেখে নেয় সতী। তারপর এগিয়ে এসে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—আমি আপনাকে চিনেছি প্রণতিদি···যদিও চাক্ষুষ এই প্রথম দেখলাম। একবার আপনাকে পাওয়া গেছে যখন এক্ষুনি ছাড়া যায়না।

সতীর হাতে কেমন যেন আত্মীয়তার ছোঁয়া পেয়ে প্রণতি নিজেকে একটুখানি শিথিল ক'রে ছায়, সহজ হ'তে ছায়, বলে—কী ক'রে চিনলে ভাই ?

বিরূপাক্ষের দিকে চেয়ে সতী হেসে বলে—এই তো কিছুদিন আগের কথা, এই রকম একখানি ছবি ডাক্তারবাবুর বসার ঘর থেকে না জেনে সরিয়ে ফেলেছিলাম ব'লে এমন চাকরিটাই খোয়াতে বসেছিলাম; বড়ো জোর বরখাস্ত হ'তে হ'তে বেঁচে গেছি সেদিন। এ-চেহারাটা তাই বেশি ক'রে মনে র'য়ে গেছে।

প্রণতি বিরূপাক্ষের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুতের মতো ব'লে ফ্যালে—কেন, কী ব্যাপার বিরূদা ?

বিরূপাক্ষ খুলে বলে—তোমার সেই ছবিটা মনে নেই ?—যেটা আমার কাছে ছিলো সেটা বসার ঘরেই রেখেছিলাম। হঠাৎ কিছুদিন আগে একবার নজর পড়তে দেখি ফোটোখানা যথাস্থানে নেই। খোঁজ করলাম, সেটা বেরোলো নিচের বসার ঘর থেকে, ড্যাম্প লেগে কয়েক জায়গায় দাগ হ'য়ে গেছে। তাই বকে-ছিলাম সতীকে। সেইটে ও মনে ক'রে রেখেছে। এ নিয়ে প্রায়ই খোঁটা ছায়, বোঝোই তো মেয়েরা অতিশয়োক্তি ছাড়া কিছু বলতেই পারেনা।

শারী প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—একথা বলবেননা ডাক্তারবাবু, দেখছেন আমরা এখন দলে ভারী—আপনার ও মন্তব্যটা প্রত্যাহার করুন।

বিরূপাক্ষ সভয়ে চতুর্দিকে চেয়ে বলে—তাও তো বটে। আমরা এখনো

মাতৃপ্রধান সমাজে বাস করছি ব'লেই যেন মনে হচ্ছে। উক্তিটা প্রত্যাহার না ক'রে সত্যিই উপায় নেই।

শারী ও সতী সমস্বরে ব'লে ওঠে—তবে? পথে আসুন।

সকলে হেসে ওঠে। প্রণতিও হাসে, তবে ওর হাসিটা সতী ও শারীর মতো উচ্ছ্বসিত ও উচ্চারিত নয়। প্রণতির দিকে চাইতেই বিরূর মনে হলো একটু হাসির আবরণের আড়ালে গিয়ে নিজের জন্য একটু ভাববার অবকাশ যেন ক'রে নিয়েছে সে।

সতীর কিন্তু সবদিকে খেয়াল আছে, বিরূপাক্ষকে সে বলে—চুপ ক'রে আছেন যে বড়ো? প্রণতিদিকে আটকে রাখুন, আমি আসছি এখুনি চা নিয়ে।

বিরূপাক্ষ বলে—প্রণতি চা খায়না, সতী। তার চেয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি তৈরি করতে বলো। ওকে পেঁাছে দেবো।

সতী বলে—সে কি হয়? চা না হয় অন্য কিছু; নইলে ছাড়বো কেন? শারী, তুমি ভাই বোসো পাঁচমিনিট, ততক্ষণ কথা কও। আমি আসছি।·· সতী শশব্যস্তে চ'লে যায়।

শারীকে দেখিয়ে প্রণতি জিগেস করে—বিরূদা, ইনি তোমার পেশেণ্ট বুঝি?

বিরূপাক্ষ বলে—পেশেণ্ট, বলো, আত্মীয়া বলো, বন্ধু-ভগিনী বলো, যা বলো তাই। ওহো, তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ক'রে দেওয়া হয়নি বুঝি! এর নাম তন্বী মুখোপাধ্যায়, যদিও শারী নামেই একে সকলে ডাকে। আগে একে আর দেখোনি বোধহয়। তবে পরিচয় দিলে হয়তো চিনতে পারো, এ হচ্ছে আমার বন্ধু অব্জভূষণের বোন। থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে অসুখ হ'য়ে আর পড়তে পারলোনা। এইবার হয়তো আবার জয়েন করবে। বড়ো ভালো মেয়ে। সামান্য কিছুদিনের জন্য হলেও অব্জ যে অদ্রিরও সহপাঠী ছিলো।

প্রণতি বলে—সাগ্নিকবাবুর মেয়ে! আর বলতে হ'বেনা, বুঝেছি।

বিনয় ও সৌজন্যসূচক নমস্কার-বিনিময় হয় প্রণতি ও শারীর মধ্যে।

বিরূপাক্ষ বলে—আর এ হ'লো অদ্রীশের স্ত্রী প্রণতি—জানিনা তুমি এঁকে ঠিক চিনতে পারলে কিনা।

শারী বলে—পেরেছি বৈকি। এঁকে না দেখেও চেনা যায়। জানেন প্রণতিদি, একবার আমাদের কলেজের মেয়েরা মিলে অদ্রীশবাবুর সংবর্ধনার আয়োজন ক'রে-ছিলো। শুনেছি উনি এসেছিলেন। সেবারে উপস্থিত থাকতে পারিনি ব'লে আপশোষ রয়ে গেছে। যাক্ এবার আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো। মাঝে মাঝে যাওয়া যাবে বিরক্ত করতে। বৌদি তো ওঁর লেখার একজন গোঁড়া ভক্ত।

শারী যে প্রণতির বাড়ি বলা-কওয়া না ক'রেই একদিন গিয়ে পড়তে পারে এই ভেবে প্রণতি মনে-মনে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মুখে বলে—তাই নাকি? তোমার বৌদি ওঁর' লেখা ভালোবাসেন বুঝি?

—ভালোবাসেন না? ডাক্তারবাবুকে জিগেস' করুন, উনি জানেন।

বিরূপাক্ষ বলে—সত্যি প্রণতি। বাসবী যত্ন ক'রে অদ্রীশের লেখাগুলো পড়ে।

শারী উঠে গিয়ে বিরূপাক্ষের টেবিল থেকে খানিকটা কাগজ নিয়ে বলে—তাহ'লে বলুন প্রণতিদি আপনার ঠিকানাটা।

প্রণতি বিরূপাক্ষের মুখের দিকে চেয়ে হাসে, বলে—নম্বরটা ঠিক মনে নেই।

শারী বলে—ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন।

বিরূপাক্ষ বলে—জানিনে ভাই। ওকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি কতোবার বাড়ির কাছ পর্যন্ত, তবু বাড়ি দেখায়নি। দূর থেকে বিদেয় ক'রে দিয়েছে।

সতী চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলো তখন। চায়ের সরঞ্জামগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বল্লো—এ কিন্তু আপনার অন্যায়, প্রণতিদি এমন ক'রে কেন নিজেকে ঢেকে রাখেন, বলুন তো?

প্রণতির সামনে ধূমায়িত পেয়ালা-পিরিচ রাখামাত্রই প্রণতি বল্লো—মিছে কেন এত কষ্ট করলে ভাই। এ-সব তো আমার চলবেনা, এ-সব খাইনে।

সতী বলে—কিন্তু সবই আমার নিজের হাতে তৈরি।

প্রণতি বলে—বাঃ, তবে তো খুব কর্মিষ্ঠা বোনটি আমার। এই তো, দেখেই খাওয়া হ'য়ে গেলো। ঘড়িটা একবার দেখবে বিরূদা, ক'টা বাজলো?

বিরূপাক্ষ হাতের দিকে চেয়ে বলে—পাঁচটা।

প্রণতি উঠে পড়ে, বলে—চল্লুম শারী, চল্লুম সতী।

শারী বলে—বা রে, এরই মধ্যেই?

প্রণতি বলে—এসেছি তো অনেকক্ষণ ··তোমাদের অনেক আগে।

সতী বলে—কিন্তু আমি যে একদম কথা কইতে পারলুমনা আপনার সঙ্গে। আর একটু পরে সন্ধ্যের সময়ে গেলে কিছু অসুবিধে হ'বে আপনার?

প্রণতি বলে—তার জন্যে কী? আর একদিন হ'বে। আজকে যাই। ছেলেটা স্কুল থেকে এসে হয়তো ব'সে আছে ··আমি না গেলে খেতে পাবেনা।

বিরূপাক্ষ গায়ে কোট গলিয়ে প্রণতিকে অনুসরণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ব'লে যায়—শারী বোসো; আমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

বিরূপাক্ষ এবং প্রণতির পেছন পেছন সতীও চললো, বললো—প্রণতিদি, কই আমার হ'য়ে কিছু সুপারিশ ক'রে দিয়ে গেলেননা···চাকরিটা যাতে থাকে

প্রণতি হেসে ফ্যালে, বলে—নিজের সুপারিশ তো নিজেই ক'রে নিয়েছো দিদি। ভাবনা নেই, চাকরি তোমার কায়েম হ'য়ে গেছে।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে সতী বলে—কিছুই হয়নি প্রণতিদি···লোকে ঐ রকম ভাবে। সত্যিই যেদিন ছাড়িয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু তখন বুঝতেই পারবেন সব।

বিরূপাক্ষ বলে—মোটর তৈরি, প্রণতি ওঠোগে যাও। সতী, তুমি ওপরে যাও, শারী একলা আছে।

সতী নির্দোষ হাসির সঙ্গে বলে—তাহ'লে ব'লে রাখলুম প্রণতিদি, চাকরি যখন যায়-যায় হ'বে তখন এসে সুপারিশ ক'রে দিতে হ'বে কিন্তু। লুকিয়ে থাকলে চলবেনা। ছুটবো তখন আপনার কাছে। খুঁজে খুঁজে ঠিকানা বের করবো ঠিক, ছাড়বোনা। আচ্ছা।

প্রণতিকে মোটরে তুলে দিয়ে সতী যখন ফিরে এলো শারীর কাছে তখন সে প্রণতির রেখে-যাওয়া দোয়াতদানটা নাড়াচাড়া করছিলো।

সতী ঢুকতেই শারী জিগেস করে—আচ্ছা সতীদি, এটা অদ্রীশবাবুর বুঝি ?

এতক্ষণ সতীর চোখেই পড়েনি জিনিশটা। একটু বিস্ময় গলায় এনে সে বলে—দেখি, কই ? ওমা, প্রণতিদি রেখে গেলেন বোধহয়।··(তারপর একটু চিন্তিত মুখে) ··এই তো সেদিন অদ্রীশবাবু এসেছিলেন—ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলুম তিনি নাকি এবারে কোন এক সংবাদপত্রের আপিসে চাকরি পেয়েছেন তবে কেন···

শারী সতীর এই স্পষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝে নেয়, বলে—এই রকম টানাটানির মধ্যে ওঁদের সংসার চলে বুঝি বরাবর ?

সতী। বাংলাদেশের লেখক মানুষ বোঝোই তো কী রকম। তার ওপর শুনেছি উনি আবার অসম্ভব খেয়ালী মানুষ। দু'এক মাসের বেশি কোনো জায়গায় কাজ করতে পারেননা। হয়তো আবার এর মধ্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে ব'সে আছেন, বিশ্বাস নেই, নেহাৎ মুস্কিলে না পড়লে কি আর প্রণতি-দি···

শারী। সত্যি সতীদি, হতভাগা দেশ প্রতিভার পোষণ জানেনা। আমাদের ক্লাব 'মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি' থেকে অদ্রীশবাবুকে এবার অভিনন্দন দেওয়ার কথা উঠেছে—এ-বিষয়ে সব চেয়ে উৎসাহ বৌদিরই। চাঁদা তোলার পরিকল্পনা আছে মোটা রকমের। আমার মনে হয় লেখককে অভিনন্দন দেওয়ার উপলক্ষ ক'রে নানা রকম আনন্দানুষ্ঠানে যে-টাকাটা ব্যয় ক'রে ফেলা হয় সেটা লেখককে দিতে পারলে তাঁর যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য হয়। আমরা বলছি ও-সব ব্যয়-বহুল আড়ম্বর বাদ দিয়ে সংবর্ধনাটা নেহাৎ ঘরোয়াভাবেই হোক। অনেকে আপত্তি করছেন তাতে নাকি প্রতিশ্রুতি-মতো টাকা উঠবেনা—অনেক গণ্যমান্য লোককে

এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'বে। প্রত্যেকটি দৈনিক কাগজে এই সভার কার্যসূচী ও বিবরণ ছাপা হ'বে পুরো একটি কলম লম্বা; সাধারণ লোকের ঝোঁক বহিরঙ্গের দিকেই। এই সব দামী লেখার সাজ-সরঞ্জামগুলোর পরিণতিটা কী হয় তারই দৃষ্টান্ত বৌদিকে দেওয়া যাবে। তাহ'লেই ওদিকে অপব্যয় করার মোহ কেটে যাবে। অভাবের মুহূর্তে এগুলো আধা-কড়িতে বিকিয়ে যায়। এর চেয়ে টাকার থলি উপহার দিলে ঢের বেশি বাস্তব-দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হ'বে।

সতী। তা সত্যি। এবারে সভার অধিবেশন তোমাদেরই বাড়ি হ'বে নাকি?

শারী। বৌদি উপস্থিত সভানায়িকা যখন···খুব সম্ভব তাই। এবারে আপনারও যোগ দেওয়া চাই কিন্তু। সভ্য-তালিকায় সেই যে আপনার নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, সেই থেকে নামটাই আছে শুধু, কখনো তো কোনো অংশ নিলেন না সভার কাজে। আমাদের ক্লাবের কার্য-নির্বাহিকা সভার অধিবেশনেও কখনো যোগ দেননি। এমন হ'য়ে থাকলে তো চলবেনা সতীদি, সক্রিয় অংশ নিতে হ'বে।

সতী। কী ক'রে যাই ভাই, যতোই হোক পরের চাকরি করি। তাও কি যে সে চাকরি চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। (কথাটি ব'লে সতী নিজেই হেসে ফ্যালে) এই ডিউটি বাজিয়ে আবার সভা-সমিতি করার মতো উদ্‌বৃত্ত উৎসাহ বা শখ থাকেনা।

শারী। আহা থাক্, আর ফুটুনি কাটতে হ'বেনা—হুঁঃ, পরের চাকরি করি—ওঃ কী আমার চাকরি রে! তার চেয়ে সত্যি কথাটা বল্লেই তো হয় যে গিন্নিপনায় এতই ম'জে গিয়েছি যে সময় পাইনা।

সতী। গিন্নি না হ'য়েই এত গিন্নিপনার খোঁটা সইছি···কিন্তু এজন্যে কি ডাক্তার-বাবু বাড়তি কিছু দেন? তা দেবেনই বটে, সেদিকে মনিব আমার হুঁশিয়ার।

শারী চোখ ঠারে, বলে—রেখে দিন। আমি বুঝিনা যেন কিছু। হুঁশিয়ার মানে এমন তালকানা মনিব পেয়ে গেছেন কপাল জোরে·· এই তো বলতে চাচ্ছেন?

সতী ও শারীর মধ্যে চোখে চোখে ভ্রূকুটির দ্বৈরথ চলে, কৌতুক কণ্ডূয়িত হ'য়ে ওঠে—উচ্ছল হাস্য ও প্রগল্‌ভ বাচালতায় উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-সূর্য লাল হ'য়ে অস্ত যায়!

সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফেরে বিরূপাক্ষ।

কবিতা লুকিয়ে কাঁদে

সেদিন বিকালে বিরূপাক্ষের বাড়ি থেকে প্রণতি যখন নিজের ঘরে ফিরলো তখন কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী হৃদয়াবেগের নির্মম দস্যুতায় তার স্নায়ুতন্তুগুলি ছিঁড়ে খুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেছে। সুধু রাঁধতে বাড়তে ও ছেলেকে খাওয়াতে যতক্ষণ সে ব্যাপৃত ছিলো ততক্ষণ ক্লান্তি অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে যখন ভাবার অবকাশ পেলো তখনই অনুভব করলো কতোটা ক্লান্ত। তিলমাত্র শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই তার ভেতর। এমন সময়ে অদ্রির জুতোর শব্দ পেয়ে প্রণতি পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুলো। একবার মনে হলো জিগেস করে—এখন কতো রাত? এই অছিলাতে খুব খানিকটা ঝগড়া ক'রে নেয়, শুনিয়ে দ্যায় যাচ্ছেতাই—কিন্তু পরক্ষণেই অসীম বিরক্তিতে, ঘৃণায় ও নিজ দুর্ভাগ্যের কাছে নীরব করুণ আত্মসমর্পণে এতটা ক্লান্ত লাগলো যে, সে কিছুই করলোনা, চোখ বুজিয়েই প'ড়ে রইলো সুধু। এতদিনে এত যুক্তিতে, এত অনুনয়ে, এত আদেশে, এত কলহে যে স্বামীকে সে আপন খেয়াল থেকে বিচলিত ক'রতে পারেনি, কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে পারেনি সেই জড়ের সঙ্গে ফের নতুন ক'রে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের নিষ্ফল পুনরাবৃত্তি করবার ধৈর্য বা উৎসাহ আজ আর বোধ করলোনা, হার স্বীকার ক'রে নিলো। এই পরাজয়ের লজ্জায় তার আজীবন কি স্তম্ভিত হ'য়ে থাকাই উচিত নয়?

কিন্তু মন মানে না, বিদ্রোহ করে; চিন্তার চিতা নেভেনা; বোঝাপড়া শেষ হয়না অতীতের সঙ্গে, বর্তমানের হিসাব-নিকাশ গোঁজামিলে মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়না, অন্তর্দাহ অনুভব করে। আজ আর সে উঠবেনা, অদ্রির খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে, ইচ্ছে হ'লে নিজে নিয়ে খাবে। তার চেয়ে এখন সে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করবে, একটু ঘুমোতে পারলে সে বেঁচে যেতো কিন্তু চিন্তার জ্বরে ঘুম আসেনা, রোমন্থন করতে হয় কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

জীবনের অতিক্রান্ত পথের দিকে সে সতৃষ্ণ চোখে চায়, ঝানু কুশীদজীবীর মতো ভাবতে থাকে, হিসাব মেলাতে থাকে কী পেলো বা কতোটুকু পেলো। যা পেলো তার জন্যে ইহজীবনটার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা যেতে পারে কিনা। আজো কি হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখার সময় আসেনি।

পাশ না ফিরেও প্রণতি বুঝতে পারে অদ্রি হাত-পা ধুয়ে এসে খেতে বসলো, খাওয়া হ'য়ে গেলো,আঁচাতে গেলো। ফিরে এসে লিখতে বসলো আলোটা নিয়ে।

ততক্ষণে প্রণতির ভাবনায় এমন জট প'ড়ে যায় যে তা থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারেনা। স্মৃতির পর স্মৃতির সূত্র টেনে হাঁপিয়ে ওঠে প্রণতি, কোনো উপায়ন নেই, উপেক্ষা আছে। করুণ চোখে জীবনের বিগত অধ্যায়গুলো ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যায় প্রণতি, রিক্ততারই ইতিহাস শুধু!—ভীষণভাবেই বঞ্চিত সে, ভীষণভাবেই প্রতারিত! তার পোড়া ভাগ্য চিরদিন ভ্রূকুটি ক'রেই এলো, প্রসন্নমুখে চাইলোনা কখনো। জীবনের ফেলে-আসা-পথ রিক্ততার সঞ্চয়েই ভারাক্রান্ত! এতটা সময়ের ওপর দিয়ে স্বধু শূন্যের মিছিল—শব্দ ক'রে শূন্যের পর শূন্য চ'লে গিয়েছে, দৈন্যের পর দৈন্য—ওদের শব্দ আজ তাকে খেপিয়ে তুলছে।

ওদিকে প্রণতির বিছানা থেকে কিছু দূরে কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে ব'সে অদ্রি লিখে যেতে থাকে, উল্টে যেতে থাকে পাতার পর পাতা। অদ্রির অভিনিবেশ গভীর হ'তে থাকে রাত্রির সঙ্গে। ওর ঝর্না-কলমে ঝলকে ঝলকে অন্ধকার ঝ'রে পড়ে শাদা কাগজের পিঠে কালো হরফের বিপুল শোভাযাত্রায়!

লেখন-নিরত স্বামীর দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে প্রণতি ভাবে—ঐ যে আত্মবিস্মৃত মানুষটি—যাকে পেয়েও সে কিছুই পায়নি—সে বাড়ি-গাড়ি চায়নি, ধন-সম্পদ, স্বখ-ঐশ্বর্য কিছুই সে চায়নি, স্বধু চেয়েছিল মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে, তাও কি পেয়েছে সে? অমন মানুষকে স্বামী হিশেবে পাওয়া কিছু না-পাওয়ারই সামিল। নিজের কল্পিত স্বপ্নলোকের মানুষ যেন ও! ও মানুষ স্বামী হিশেবে বিড়ম্বিত করতো সব মেয়েকেই। প্রাত্যহিক জীবনের বস্তুতান্ত্রিক চাহিদাগুলোর প্রতি যেন ওর ঘৃণিত ঔদাসীন্য! কাউকেই ও ভালোবাসতে পারেনা, তাই প্রণতিকেও ভালোবাসতে পারেনি প্রাণ দিয়ে, ও স্বধু ভালোবেসেছে নিজেকে—নিজের কল্পনাকে, নিজের স্বপ্নকে, নিজের শিল্পকে। কিন্তু স্বপ্ন নিয়েই তো আর জগৎ নয়!

অদ্রি যেন কোনো অতিমানুষিক প্রভাবে চালিত হ'য়ে কথা-বোঝাই পাতার পর পাতা উল্টে চলে—কাগজের পিঠে কলমের খস্ খস্ শব্দ হয়—এম্নি প্রণতি রোজ শোনে; অক্লান্ত খস্ খস্ খস্—রাত্রির সরীসৃপ ধূসরিত মাটির পিঠে এগিয়ে চলে ঐ শব্দে! নিঃশব্দে রাত বাড়ে, প্রণতি ভাবে বাঁচা কিসের আকর্ষণে? উদ্দেশ্য খুঁজে পায়না প্রণতি, হাত্ড়াতে থাকে। ভাবে, কিসের জন্য সে কৃতজ্ঞ থাকবে এই জীবনটার প্রতি? কেন বাঁচবে সে? স্বামীকেও যদি না পেয়ে থাকে তবে জীবনে তার সান্ত্বনা কোথায়? যে তার স্বামীকে জানেনা সে বলবে ও স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ও কাউকেই ভালোবাসতে পারেনা কখনো। কিন্তু ওর সম্বন্ধে ওটা ঠিক সত্য ধারণা নয়। প্রণতি ওকে আত্মকেন্দ্রিক বলেনা, বলে স্বপ্নকেন্দ্রিক। স্বপ্ন নইলে বাঁচতে পারেনা, বাঁচতে পারবেনা। তবে ওই বাঁচুক ওর সঙ্গে প্রণতি আর কেন?

আজ আট বছর তাদের বিয়ে হ'য়েছে—এই দীর্ঘ আট বছরই ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁচে আছে প্রণতি। আজ প্রায় ছ'বছর প্রদীপের জন্ম হ'য়েছে, সেই থেকে তার স্বামী শহরে এসে বাসা করেছে ভাগ্যান্বেষণের জন্য, তার আত্মভোলা স্বামী জগতের কাছে প্রতারিত হ'য়ে এসেছে বরাবরই। নিজের ভাগ্যই অদ্রিকে প্রতারণা ক'রেছে প্রণতির চেয়ে কম নয়। কিন্তু অদ্রির তাতে কিছুই আসে যায়না, কারণ সে বিফলতা মনেই নেয়না। ব্যর্থতা যেন হাঁসের পাখায় জল ঝাড়লে আর থাকেনা।

অদ্রি বাস্তব-ক্ষেত্রে পরাজয় পেলে স্বপ্নের মধ্যে মুখ লুকোয়। ঐ ওর সান্ত্বনা পাবার পদ্ধতি। কেমন গায়ে মাখেনা, অভিযোগ করেনা। কিন্তু প্রণতি যে ভেঙে পড়ে। নিজের হাতের ক্ষয়া আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে সময় সময় প্রণতি ভাবে যে, তাকে কী না করতে হয় অদ্রির সংসারের জন্যে? মুখ বুজিয়ে সে ঝিয়ের কাজ করে এবং দিনের কাজের ফাঁকে অবসরটুকুও সে বিশ্রাম নেয়না। এমন কি সময় সময় রাত জেগে শেমিজ-জামা তৈরি করে বিক্রীর জন্যে কিন্তু এ সবের কোনো খোঁজ কি রাখে ঐ উদাসীন লোকটি? এত যে খাটে তবু প্রাণধারণের সমস্যা মেটেনা, বেশি কি দু'বেলা পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত জোটাতে পারেনা, ঘোচাতে পারেনা এই বস্তি-জীবন। কতকগুলো পশুর সঙ্গে থাকা আর পশু হ'য়ে থাকা। কারখানার মিস্ত্রিদের সঙ্গ আর তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশ তার সহ্যের বাইরে চ'লে যাচ্ছে।

অদ্রীশ পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। প্রণতি ভাবে এবার শুতে আসবে বুঝি, বলে—শোবে এসো। একটুও ঘুমোওনি আজ ক'দিন।

অদ্রীশ বলে—আমার দেরি আছে যেতে। ঘুমিয়ে পড়ো।

প্রণতি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—চোখের সামনে দপ্ দপ্ ক'রে আলো জ্বলতে থাকলে মানুষের ঘুম আসে নাকি?

—বেশ, কাগজ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, আলো ওদিকে যাবেনা, হ'বে তো তাহ'লে?

প্রণতি জেদ ধরে—না, আলো নিভিয়ে দাও। অনর্থক তেল পুড়বে কেন?

—অনর্থক কোথায়? এতক্ষণ লিখছিলাম, এখুনি আবার লিখবো।

—লেখাটাই তো অনর্থক·····প্রণতির কথায় তীব্র ঝাঁজ।

অগত্যা অদ্রি টেবিল-ল্যাম্প নিবিয়ে দ্যায়।

খাতা কলম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে প্রণতি এসে স্বামীর গতিরোধ করে। হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—রাগ হ'লো বুঝি? কোথায় চল্লে?

—রাত-বেড়াতে নয় নিশ্চয়ই।

—এইবার বস্তিতে বাস পূর্ণাঙ্গ হয় তা'হলে।

—ওটা যে পারিনা ভালো ক'রে জানো ব'লেই তো এতটা চলে। তাই না?

প্রণতি হেসে ফ্যালে অদ্রির কথায়।

—গিরীনবাবুদের রোয়াকে গ্যাসের আলো আছে, সেখানেই চল্লুম। অনর্থক কাজে তোমার অর্থব্যয় করিয়ে দেওয়াটা অনুচিত সেটা আজ বুঝতে পারলুম।

—না, তা হতে পারেনা। ওদের চাকর-বামনগুলো পর্যন্ত তোমায় পাগল ভাববে, অনেকে ভাবেও তাই, তা কি বুঝতে পারো? তার চেয়ে এখানে ব'সেই লেখো, আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

—না। তোমার অসুবিধে হ'বে, অনর্থক তেল পুড়বে।

—হোক অসুবিধে, পুড়ুক তেল। তা ব'লে পরের বাড়ির রোয়াকে ব'সে রাস্তার আলোয় তোমার লেখা হ'তে পারেনা।

অদ্রির খাতাপত্র প্রণতি কেড়ে নেয়। প্রণতি আলো জ্বালতে যায়, অদ্রি বারণ করে। প্রণতি বলে—কেন? লিখবেনা?

অদ্রি বলে—না।

অদ্রির হাত দু'খানা ধ'রে গাঢ় স্বরে প্রণতি বলে—তবে শোবে চলো।

অদ্রি প্রণতির সঙ্গে বিছানায় যায়। খানিক পরে খেয়াল হয়, প্রণতিকে জিগেস করে—প্রদীপ কোথায়?

প্রণতি বলে—তবু ভালো, এতক্ষণে খেয়াল হ'লো? পাশের ঘরে আছে। আজ তার ঠাকুমার সঙ্গে শুয়েছে।

—কেন? শোবার সময়ে তোমার সঙ্গে কিছু হয়েছিলো বুঝি?

—হ'বে আবার কী? পিসীমা ভিতু মানুষ একলাটি থাকেন, রাত্তিরটা শুলোই বা ওঁর কাছে?

তারপরের কথাগুলো খুব মৃদু গলায় স্বামীকে বলে—ছেলে বড়ো হচ্ছেনা? তোমার নাহয় কোনো খেয়ালই নেই, আমার তো আছে। চিরদিন কেউ বাপ-মায়ের সঙ্গে একঘরে শোয় নাকি? আজ থেকে প্রদীপ ও-ঘরেই শোবে।

অদ্রি সম্পূর্ণ নির্বিকার স্বরে বলে—ও।

অদ্রি জান্‌লাটা খুলে ছ্যায়, চাঁদের আলো এসে পড়ে প্রণতির পাণ্ডুর মুখে। ব'লে ওঠে—বাঃ, কী চমৎকার আলো দেখেছো, নতি?

প্রণতি বলে—ঘুমের ওষুধের বড়ি খাও নাহয় একটা।

অদ্রি বলে—আজ ঘুমোতে নেই। কলমটা আনিগে। অনেকদিন পরে চাঁদের আলোয় কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে।

অদ্রির পাশে উপেক্ষিতা জীবন্ত কবিতাটি দীর্ঘশ্বাসমোচন ক'রে পাশ ফিরে শোয়।

সুখের লাগিয়া যে-ঘর বাঁধিনু

পরদিন রাত্রে অদ্রির বাড়ি ফিরতে অন্যদিনের চেয়ে দেরি হ'লো। কতকগুলো সাংসারিক ব্যাপারে প্রণতির মেজাজটা বেশ একটু চ'ড়ে ছিলো, এবার স্বামীর প্রতীক্ষায় হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে ব'সে থাকতে হওয়ায় আরো খানিকটা চ'ড়ে গেলো। বিরক্ত হ'য়ে শেষটায় সে বিছানায় গিয়ে শুলো।

অদ্রি ফিরলো রাত দশটার পর। প্রণতি তখন বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় প'ড়ে আছে। ঘরে ঢুকেই অদ্রি জিগেস করে—অমন ক'রে আছো কেন নতি? কী হ'য়েছে?

প্রণতি ফোঁস ক'রে ওঠে—হ'বে আর কী? আরো কতো হ'বে?

অদ্রি খানিক অবাক্ হ'য়ে থাকে, বলে—কেন, কী হ'লো?

প্রণতি বলে—খানিক আগে তোমার পাওনাদার এসেছিলো টাকার তাগাদায়। শাসিয়ে গেলো, যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে গেলো ডেকে ঘরে বসাইনি ব'লে। ঐ অতোটুকু একটা ছেলে মাত্র ভরসা। পিসীমা ভাগবত-পাঠ শুনতে গেছেন। একেই লোকটা বদমায়েস তাতে,আবার রাত্রে এসেছে মাতাল হ'যে। কী ক'রে তাকে অতো খাতির করি, বলো?

অদ্রি বলে—পাওনাদার কিনা, একটু খাতির প্রত্যাশা করে। ভেতরে ডেকে বসালেই পারতে। তারপর দু'এককথায় ভাগিয়ে দিলেই হ'তো···

মুখ বিকৃত ক'রে প্রণতি অদ্রিকে ব্যঙ্গ করে—ডেকে বসালেই পারতে। মাতাল হ'য়ে এসেছেন, তাঁকে ডেকে বসালেই হ'তো। যদি তিনি শুতেও চাইতেন তাহ'লে যত্ন ক'রে শোয়ালেও হ'তো। গাড়োল কোথাকার! সেই খেয়ালই যদি থাকবে তাহ'লে আর হুঁঃ···

অদ্রি অন্যদিকে ফিরে একে একে জামা-কাপড় ছাড়তে থাকে।

প্রণতি শাসায়—ব'লে গেছে গুণ্ডা দিয়ে টাকা আদায় করবে।

—বলুক গে।

—বেশ, বলুক। রাস্তায় ধ'রে দু'ঘা লাঠি-পেটাও করুক, আমার তো তাতে দরকার নেই, সে তুমি বুঝবে। কিন্তু তোমার পাওনাদার এসে আমায় সুদ্ধু অপমান করবে, কেন?

—মানুষ নিজেই নিজেকে সব চেয়ে অপমান করে; নইলে অপমান কেউ কারো করতে পারেনা নতি, ও নিয়ে কেন মিছিমিছি মন খারাপ করো?

ক্ষোভে, দুঃখে, বিরক্তিতে প্রণতি কপালে করাঘাত ক'রে বলে—স্বামীই যার অপদার্থ তার কি মান-অপমান কিছু আছে?

—পাগল হ'লে? ও-সবের বালাই রাখতে গেলে তার চলে?···অদ্রি উপহাস করে।

—সত্যি তার কোনো কিছুই নেই, কোনো সুখ-সম্পদ, সাধ-আহ্লাদ এমন কি মান-অপমান জ্ঞান, মনুষ্যত্ব কোনোকিছুই থাকেনা।

—নাই বা থাকলো।

এই ধরনের কথা অদ্রির মুখে শুনেই প্রণতির রাগ আরো চ'ড়ে যায়, কণ্ঠস্বর আরো উচ্চগ্রামে বেঁধে নিয়ে প্রণতি গর্‌গর্‌ করতে করতে দুম্‌দুম্‌ ক'রে রান্নাঘরে ঢুকলো।

—আমার কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি—কিন্তু দুটো নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্তর ছেলে তাকেও যে উচিত-মতো খাওয়া-পরা, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তুলতে পারেনা সে আবার পুরুষ? জীবনে ধিক্‌ তার! গলায় দড়ি জোটেনা?

কথাগুলো পিসীমার কানে যায়, তিনি পাশের ঘর থেকে বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন—আঃ, কী করো বৌমা। সারাদিন রোদে-ঘামে তেতে-পুড়ে চাকরির ধান্ধায় কোথায় কোথায় ঘোরে তার ঠিক নেই—সেই কখন খেয়ে যায় আর কখন ফেরে! যেই বাছা বাড়ি ঢোকে আর তুমিও অগ্নি মুখিয়ে থাকো? স্বামীকে এই সব কথা বলতে হয়? খুব আক্কেল যাহোক!

'ওর কথা কানে তুলোনা পিসীমা।'—ব'লে অদ্রীশ হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দোর গোড়ায় এসে ছড়া কাটিয়ে প্রণতিকে জবাব দিয়ে যায়—

কোথায় পাবো কলসী কন্যা, কোথায় পাবো দড়ি
তুমি হইও গহিন গঙ্গা আমি ডুইব্যা মরি।

খাবার এনে ধ'রে দিয়ে গেছে প্রণতি। অদ্রি মুখ নিচু ক'রে তখন খাচ্ছিলো; প্রণতি এসে বসলো পাশে। একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে পাছে আমার কষ্টটা কম হয় তাই বোধহয় ভেবে-চিন্তে আর ফেরোনা, নয়?

ভোজন-নিরত অদ্রি নিরুত্তর থাকে।

প্রণতি তবু ছাড়ে না, জবাব তার চাই-ই চাই। সে বলে—বলোনা এত রাত্ত অব্দি কোথায় থাকো, কী করো? বেলা এগারোটায় বেরোও আর রাত্ত এগারোটায় ফেরো, এতক্ষণ কি আপিস করো নাকি? কোথায় থাকো?

অদ্রি বলে—সন্ধেয় থাকি মিলন-চক্রে। কবি, লেখক, অধ্যাপক অনেকেই আসেন। আজ সভা ভাঙতে কিছু দেরি হ'য়ে গেলো।

প্রণতি বলে—সে তো যাও সন্ধে আটটায়, খেয়ে যেতে পারোনা ? আর কেউ কি তোমার মতো করে ? তারা খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্দি হ'য়ে তবে বেরোয়। তোমার কি সবই বিশ্রী হ'তে হয় ?

অদ্রি একেই খুব কম কথা বলে বিশেষত প্রণতির জেরার সামনে তো আরো। কারণ চুপ ক'রে থাকাই নিরাপদ, নইলে বচসার শেষ থাকেনা !

প্রণতি বলে—কাগজের আপিস তো পাঁচটায় বন্ধ হয়, বাড়ি এসে খেয়ে গিয়ে ছুটি দেওয়ার মতো উদারতাটুকুও দেখাতে পারোনা ? তোমার সংসারের জন্যে আমি কতোদূর কী করি খোঁজ রাখো ? ঝি-রাঁধুনীর কাজ থেকে শুরু ক'রে টাকা রোজগার পর্যন্ত সব দিকেই দেখতে হয় আমাকে। ভেবে ছাখো, তুমি তোমার দায়িত্ব কতোটুকু নিয়েছো আর লোকে কতোটা নেয় ? অনিরুদ্ধবাবুকে ছাখো তিনিও মানুষ, তুমিও মানুষ। গুন্‌তিতে হাত-পা একটাও বেশি নেই—তবে কী ক'রে হয় মানুষে মানুষে এত তফাৎ ? চিররুগ্ন অকর্মণ্য স্ত্রীর বোঝা হাসিমুখে বইছেন এত বছর ধ'রে। সেকথাই মলয়া দুঃখ ক'রে লিখেছে চিঠিতে—পুরী থেকে আজ চিঠি এসেছে মলয়ার।

মলয়ার চিঠি সম্বন্ধে অদ্রি কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনা দেখে প্রণতি আবার আগেকার সূত্র ধ'রে জের টানতে থাকে, বলে—তাই তো সময়ে সময়ে ভাবি, তোমার এত যে করি তাতেই আমার সম্পর্কে তোমার এই দায়িত্বজ্ঞান। আমি যদি মলয়ার মতো হতুম তাহ'লে তুমি কী করতে ?

এইভাবে নিরুত্তর নতমুখ স্বামীর সামনে প্রণতি অযথা অবিশ্রান্ত নিশ্বাসের বাজে খরচ ক'রে চলে। লোকে কথায় বলে বোবার শত্রু নেই কিন্তু প্রণতি বোবার সঙ্গেও শত্রুতা করে। অদ্রি হয়তো ঘামতে থাকে।

অনেক বক্তৃতার পর হঠাৎ প্রণতি সচেতন হ'য়ে ওঠে আর অদ্রির ওপর আসল প্রশ্নটিই স্থাপন করে—কাগজের আপিস থেকে কোথায় যাও, বলোনা ?

অদ্রি ভয়ে-ভয়ে বলে—আপিসে যাচ্ছিনা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ব'সে আজকাল কাজ করি।

শোনামাত্রই প্রণতি ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ে মেঝেয়, বলে—অ্যাঁ ! কী বল্লে ? আপিস যাওনা ? কোন চুলোয় থাকো এতক্ষণ, বেরোও তো ঠিক সময়ে ? অ্যাঁ ! কই বলোনি তো আগে !

অদ্রি নির্লিপ্তমুখে বলে—কী আর বলবো ? চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।

—কেন, ভেবেছো কী ? এই বছরের মধ্যে পাঁচটা কাজে ইস্তফা দিলে ?

অদ্রি এইবার বিনা দ্বিধায় স্পষ্ট কথায় ব'লে ফ্যালে—চাকরি হ'বেনা আমার

দ্বারা; বিশেষ ক'রে এ-রকম চাকরি একেবারেই পোষালোনা। খাতে না সইলে কী করবো বলো ?

—তোমার দ্বারা কী হবে শুনি ? কী সইবে তোমার খাতে ?

—হয়তো আমার দ্বারা কিছুই হবেনা, যাই কিছু করতে যাই আর লিখতে পারিনা। অথচ লিখতে তো আমাকে হ'বেই। এটুকু জেনে নিয়েছি এতদিনে।

—কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে লিখতে ? পুড়িয়ে ফ্যালো ও-সব ছাই-ভস্ম হিজিবিজি। লিখে তো সব হ'চ্ছে···হবেও সব।

অদ্রি তার কোনো জবাব দ্যায়না।

প্রণতি অনর্গল ব'কে যায়, কত ভৎর্সনা করে, কত উপদেশ দ্যায়, বলে—ঐ কাজটাতেই আবার বেরোও। কাজটা ভালো ছিলো, খাটুনি কম। মাইনে যাও বা দ্যায় তোমাকে অন্য জায়গায় তা দেবেনা কেউ।

অদ্রির কানে বিশেষ কিছুই ঢোকেনা, সে হয়তো তখন নিজের কল্পনা-বিলাসে ডুব দিয়েছে। খাওয়া শেষ ক'রে অদ্রি আঁচিয়ে ফিরলে প্রণতি আবার আরম্ভ করতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা। প্রতিবাদহীন মূক, জড়ের সঙ্গে মানুষ আর কতো ঝগড়া ক'রে যেতে পারে ?

সবে অদ্রি গুছিয়ে লিখতে বসেছে তার টেবিলে আলোটি নিয়ে। দেখে প্রণতির অকারণেই ভারি রাগ হয়। নিষ্ফল রাগে আলোটা দোর বন্ধ করার অছিলায় নিয়ে গিয়ে নিবিয়ে নিয়ে আসে।

অদ্রি বলে—একি, আলো নিবিয়ে দিলে ?

—হ্যাঁ।

—দেশলাই কোথায় ?

—নেই। যাও কিনে নিয়ে এসো।

প্রণতির দিকে অদ্রি খানিকটা অসহায়ের মতো চেয়ে থেকে শেষটায় খাতাপত্র কলম নিয়ে বেরিয়ে যায় গিরীনবাবুদের রোয়াকে। আজ আর প্রণতি বাধা দ্যায়না। একবার শুধু কী যেন ভেবে পাশের ঘরের রুদ্ধদ্বারের বাইরে থেকে কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রদীপকে ডেকে যায় কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়না। পিসীমাকেও ডাকে—প্রদীপ জেগে আছে, পিসীমা ?

যখন কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেলোনা তখন প্রণতি ঘরে ফিরে এসে একাই শুয়ে পড়লো। নিঃসঙ্গ শয্যায় তার [illegible] ঘুম আসতে চায়না। এমন রাতে ছেলেটা কাছে থাকলে তবু তার খালি বুকের কিছুটা ভ'রে থাকে, অন্ধকারে শয্যাপ্রান্তে যাহোক একটা প্রাণের একটু উষ্ণতাও পাওয়া যায়—

একটুখানি নিশ্বাস-শব্দর বাজে। তাতে তবু ঘুম আসে নইলে নিঃসঙ্গ শঙ্কার ছায়ারা বড়ো দৌরাত্ম্য লাগায়। নির্জন হ'লেই নামহীন সব ভয়-ভাবনার উপদ্রব বাড়ে, অস্থির হ'য়ে ওঠে প্রণতি।

দোরটা বন্ধও সে করতে পারেনা। কারণ মাঝরাত নাগাত অদ্রি এসে যদি দোর খোলা না পায় তাহ'লে হয়তো রাস্তায় প'ড়ে রাত কাটাবে, যা মানুষ সব পারে। সময়ে সময়ে তার বড়ো রাগ হয় মানুষটার ওপর। আবার পরক্ষণেই মনে হয় ও যেন কৃপার পাত্র। ওর ওপর রাগ করার চেয়ে নিজের মরাই শ্রেয়। প্রদীপও বড়ো হ'লে কি ওরই মতো হ'বে? না, না, তাহ'লে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা সে কি এখনই পারেনা করতে? জীবনের কঠোর পরীক্ষায় সেই বা কেন হারবে? না, না, দুঃখের পেয়ালার তলানি পর্যন্ত হজম করতে পারে নাকি তাই সুধু দেখবে। বহুদূরে ক্ষীণ আশার গুঞ্জন শুনতে পায় প্রণতি, নিজেকে স্তোক দ্যায়, তার স্বামী বড়ো হবে, প্রতিষ্ঠা পাবে, যশকীর্তি দেশজোড়া হ'বে, লোকে বুঝবে ওকে···এমনও তো হ'তে পারে। ততদিন ধৈর্য ধ'রে বাঁচা কি এতই শক্ত?···ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এলো জানতেও পারেনি প্রণতি।

পরদিন সকালে অদ্রি কখন যে এসে নিঃশব্দে কাপড় বদলে বেরিয়ে গেছে, জানেনা প্রণতি, সে ঘুমোচ্ছিলো। যখন জাগলো বেশ বেলা হয়ে গেছে। বিছানা তোলা, ঝাড়া প্রভৃতি ঘরের বাসিপাট সেরে স্নানের কাপড়-গামছা গুছিয়ে নিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছে এমন সময়ে দমকা বাতাস এসে অদ্রির লেখার টেবিল থেকে কতকগুলো আল্গা লেখা পাতা ছড়িয়ে দিলো ঘরময়। এগুলি অদ্রির একটি সদ্য-লেখা উপন্যাসের অংশ যেটি এখনো অসমাপ্ত। সেগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে কিছুটা প'ড়ে ফেললো প্রণতি—একটা জায়গায় নায়ক আত্মনাথ নায়িকা আত্রেয়ীকে বলছে—'পুরুষের জীবনে তোমরা আসো অভিশাপের মতো, মড়কের মতো। তোমরা প্রতিভার প্রতিবন্ধক মাত্র। জীবনের অগ্রগামী পদাতিকের তোমরাই হ'লে পেছনের টান, পেছনের সর্বনাশ, রসাতলের আকর্ষণ। আকাশে তোলার ছল দেখিয়ে তোমরাই তাকে যুগে যুগে পাঁকে নামিয়েছো। তোমাদের সম্মোহন লূতা-জালে বেষ্টন ক'রে প্রথমেই নষ্ট ক'রে দাও তার ওড়বার শক্তি, তারপর ক্রমশ আয়ত্তে এনে নিবিষ্ট মনে করো শোষণ···

তোমাদের প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে তাকেও উপার্জন বৃদ্ধি ক'রে যেতে হয় প্রয়োজনের তাগিদে উপায় সৎ কি অসৎ ভাবতে গেলে চলেনা। প্রয়োজনের হুল বিঁধিয়ে তার বিবেক, সুবুদ্ধি, সদ্‌বৃত্তি পঙ্গু অসাড় ক'রে দাও। কিছুদিন তোমাদের সংসারের ভার টানার পর সামান্য একটা ভারবাহী পশু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট

থাকেনা তার ভেতর। সংসারের আফিমে অভ্যস্ত হ'য়ে এলে সে তোমাদের স্বাদে আর গদ্‌গদ হ য়ে বলে—অহো, কী মধুর মাতৃত্ব ! কী দিব্য গার্হস্থ্য জীবন ! তারপর বিশাল সংসারের বোঝা ঠেলে অকালে সমস্ত শক্তির অপচয় ক'রে সে ম'রে যায় নিতান্ত অজ্ঞাত, অখ্যাত একটা পশুর মতো আদর্শ-স্খলিত, অকৃতকর্মা।'

অন্যত্র সে নায়ক আত্মনাথের কথায় অদ্রির জবানী পড়ে: পুরুষ বিয়ে করে খুব একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিছক আত্মহত্যার নেশা যখন তাকে একান্তই পেয়ে বসে কেবল তখনই সে তা' ক'রে থাকে—জীবনে এই আত্মহত্যার ঋতু যখন আসে আমরা তখন অনেক সময়ে তাকে যৌবন ব'লে ভুল করি। এই আত্মহত্যার প্রলোভন যে পৌরুষ-বলে জয় করতে পারে সে জরাও জয় করে।… বিবাহ মানুষকে বড়ো করেনি কোনোদিন বরং ছোটোই করে। কৌমার্য তাকে বড়ো হ'বার যেটুকু সুযোগ কিংবা অবসর দ্যায় বিবাহ সেটুকু নষ্ট করে। তোমরা সইতে পারোনা পৌরুষ, পৌরুষকে তোমরা ঈর্ষা করো, তোমরা পৌরুষের শত্রু। তোমাদের কী-সব তুচ্ছ সাধ অপূর্ণ র'য়ে গেলো, কী-সব তুচ্ছ আশা ভেঙে পড়লো তা নিয়ে যখন তোমরা তোমাদের স্বামীকে গঞ্জনা করো, দুঃখের সময়েও মর্মান্তিক হাসি। তাই তোমাদের মাপকাঠিতে যারা আদর্শ স্বামী, তারা আদর্শ পুরুষ নয়।

প্রণতি চমকে ওঠে, একি অদ্রির কথা ? মনে হয় অদ্রিই যেন বলছে কথাগুলো তাকে উপলক্ষ ক'রে। সে আর পড়তে পারেনা, টেবিলের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে গিয়ে বসে বিছানার ওপর, জানলার বাইরে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। অভিমানের স্ফুরণ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ওর দু'টি ঠোঁটে, চোখ জলে ভ'রে আসে।

দূরে কারখানার ধূম স্তম্ভগুলো অবিরত ধূম উদ্‌গীরণ করতে থাকে। সে ধূম্রজাল দীর্ঘ রেখা টেনে মিলিয়ে যেতে থাকে আকাশে। ওদিকে চেয়ে-চেয়ে প্রণতির মনটা তবু একটু যেন শান্ত হয়।

সে মনে-মনে ব'লে যায়—না, না, মিথ্যে, সব মিথ্যে। মিথ্যেকে ভিত্তি ক'রে যে-সৃষ্টি বেড়ে ওঠে তা ও-রকম মিথ্যেই হ'য়ে যায়। মানুষ চিরকাল ভালোবাসার মর্যাদা দিয়েও এসেছে এবং দেবে ব'লেই ওর লেখা বাঁচবেনা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ও এভাবে বৃথাই শক্তির অপচয় ক'রে চলেছে। হ'তে পারে মেয়েদের ও ঘৃণা করে কিন্তু পুরুষকেই কি ভালোবাসে ? কোনো মানুষকেই ও ভালোবাসেনা। নিজেকে ছাড়া কাউকেই ও ভালোবাসেনি কোনোদিন। ও আত্মম্ভরি কল্পনাসর্বস্ব মানুষটাকে এক হিশেবে চরম স্বার্থপর বলা যায়।

এমন সময়ে প্রণতির বৃদ্ধা পিসশাশুড়ী মাতঙ্গিনী গঙ্গাস্নানান্তে এসে উঠোনে

দাঁড়ালেন, হাতের ভিজে গামছা কাপড়গুলো ফেলে রেখে এসে তিনি প্রণতির ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে বলেন—কই, বৌমা, এখনো ওঠোনি নাকি?

প্রণতি সাড়া ছায়—তাড়াতাড়ি উঠেই বা কী হ'বে?

মাতঙ্গিনী বলেন—আজ কি তোমাদের খেতে-দেতে হ'বেনা? ন'টা বাজতে চললো এখনো উনোনে আঁচ পড়েনি, কোনো উদ্যোগ-আয়োজন নেই, ব্যাপার কী?

প্রণতি স্বাভাবিকতার মুখোসের অন্তরাল থেকেই উত্তর ছায়—না, পিসীমা, আজ আমাদেরও একাদশী।

মাতঙ্গিনী জিভ কেটে গালে হাত দেন, বলেন—ছি, ছি, অমন কথা কি মুখে আনতে আছে বৌমা, আজকের দিনে? আজকালকার মেয়ে তোমরা বাছা কী কথায় কী কথা যে ব'লে ফ্যালো মুখের একটা আগলও নেই। ঐ আমার একচক্ষু··· যমের মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে-বর্তে থাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পরো, হাতের নোয়া বজ্জোর হোক, আমার তো একেই কপাল পোড়া···তোমাদের রেখে যেতে পারলে হয়।

প্রণতি বলে—অমন আশীর্বাদ করবেননা পিসীমা, দুঃখের জীবন শেষ হ'লেই বাঁচি, পাকা মাথায় সিঁদুর দিয়ে আর দরকার নেই, আরো বেঁচে থাকলে আরো অশেষ খোয়ার কপালে আছে। সিঁদুরের পয়সা জুটবেনা ছাইয়ের আঁক কাটতে হ'বে চুলে।

পিসীমা বলেন—কী আর বলবো, কী মেয়ে মা তুমি, আজকের দিনে খুব স্বামীর কল্যেন করছো যাহোক। এখন তোমরা বুঝবেনা এখন রক্তের তেজ আছে, রাগ হ'লে মুখে কিছুই আটকায়না। আমি একে শোকা-তাপা মানুষ এসব কি আমি শুনতে পারি? অভাবের ঘরে মন-কষাকষি হ'য়েই থাকে তাব'লে ও তো তোমার ওপর কোনো অত্যেচার করেনি একদিনের তরেও। ও তা করেছে বলতে পারো? আমাদের মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিলেও স্বামীর অকল্যেন করা দূরে থাকুক কখনো মুখে রা ফোটেনি এম্নি শিক্ষে ছিলো আমাদের। তোমাদের সে শিক্ষেও নেই সে সহ্য-ধোর্যও নেই, মানোওনা কিচ্ছু।

হরি বোল্, হরি বোল্। পিসীমা হরিনাম করতে করতে প্রস্থান করেন।

আজ রাঁধাবাড়াও করবেনা এই প্রতিজ্ঞা মনে মনে বারবার ক'রে সে বিছানা নিলো। অদ্রি এসে তৈরি ভাত না পেলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে, হয়তো আসবে অনেক রাত ক'রে। কিন্তু প্রদীপ? তার ঘরে যে ছেলে রয়েছে তাকে সে উপবাসী রাখবে কোন প্রাণে? এখনি সে তো ভাত চাইবে। প্রদীপের ব্যবস্থা ক'রে রেখে নিশ্চিন্দি হ'য়ে এই যে প্রণতি শোবে আর উঠবেনা। এর ঘরে, ওর

ঘরে প্রদীপকে খুঁজে বেড়ায় প্রণতি, পায়না। বস্তির অন্যান্য ভাড়াটেরাও কেউ প্রদীপকে ছাখেনি। প্রণতির বড়ো রাগ হয়। প্রদীপ তাহ'লে নিশ্চয়ই রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াচ্ছে, বদসঙ্গে মিশছে! যা সে পছন্দ করেনা তা সবই কি একে একে ঘটবে তার জীবনে? এই বস্তির পারিপার্শ্বিকে ছেলে মানুষ হ'লে আর কী হ'বে এর চেয়ে? বাপের একটুও কি নজর আছে এ বিষয়ে?

ঠিক এম্নি সময়ে হরি মোটর-ড্রাইভারের বজ্জাৎ ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে প্রদীপকে ঢুকতে দেখে জ্ব'লে ওঠে প্রণতি। ঠিক হিংস্র ব্যাঘ্রীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটার ওপর, হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসে ঘরে। মায়ের সে উগ্রচণ্ডী রূপ দেখেই কেঁদে ফ্যালে প্রদীপ।

—আবার রাস্তায় বেরিয়েছিলি ঐ হতভাগা ছেলেটার সঙ্গে, এ্যাঁ? গলা টিপে শেষ ক'রে দেবো যে রে পোড়ারমুখো ছেলে···একটুও ভয় নেই প্রাণে?

মারের ভয়ে প্রদীপ কেঁদে ফ্যালে, বলে—না, মা, আর করবোনা।

হাত সংবরণ ক'রে নেয় প্রণতি, বলে—ঠিক তো? মনে থাকবে?

প্রদীপ ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে, হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলে—থাকবে।

মাতঙ্গিনী মালা জপছিলেন তিনিও হাঁ-হাঁ ক'রে এসে পড়েন—আহাহা, আর মেরোনা, আর মেরোনা, বৌমা। ছুটো নয়, পাঁচটা নয়, মাত্তর একটি···তারই এই খোয়ার!

না, না, মারিনি। আপনি যান তো বাপু, জপে বসেছিলেন আবার উঠে এলেন কেন? মার খাবার নামেই হতভাগা ছেলে চ্যাচাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। ··প্রণতি বলে।

মাতঙ্গিনী চ'লে যেতে যেতে বলেন—কী জানি বাপু, ভয় করে তুমি আজ যে-রকম হন্যে হ'য়ে আছো—আমারই ভয় করছে তা ও তো বাচ্চা···

খানিকবাদে রাগ পড়লে অনুতাপে অনুশোচনায় জর্জর হ'য়ে ওঠে প্রণতি, প্রদীপকে কাছে টেনে কত মিষ্টি কথা ব'লে বোঝায়, উপদেশ ছায়, আদর ক'রে বুকের ভেতর টেনে নেয়। তবু যেন তৃপ্তি আসেনা, শেষটা খানিক কাঁদে।

মাকে প্রদীপ বলে—কেন কাঁদছো মা? আমার তো লাগেনি।

ছেলের এই আন্তরিক সান্ত্বনা-প্রচেষ্টায় প্রদীপের বুকে মুখ লুকিয়ে প্রণতি আরো কেঁদে ফ্যালে, বলে—তুই কবে বড়ো হবি, প্রদীপ? মানুষ হবি, লেখাপড়া শিখ্‌বি, টাকা রোজগার ক'রে এনে দিবি, তখন আর দুঃখু থাকবেনা। তখন আর মোট্টে কাঁদবোনা।

প্রদীপ আশ্বাস ছায় যে প্রথমেই যখন সে টাকা রোজগার করবে, আগে

ফিরিওয়ালার কাছ থেকে ভালো একটা 'হেজলিন' কিনে দেবে মাকে। কারণ তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে মায়ের দুঃখ যতোটুকু বুঝে উঠতে পেরেছিলো তাতে তার মনে হ'য়েছিলো যে, কাল দুপুরে 'কিলিপ-কাঁটা-ওয়ালাটার' কাছ থেকে সেই যে দামী 'হেজলিন'টা মা কিনতে পারলোনা পয়সা ছিলোনা ব'লে তাতেই বোধহয় মায়ের এত দুঃখ। সুতরাং সে যখন বড়ো হ'য়ে টাকা রোজগার করবে তখন এর প্রতিকার সে করবেই।

অদূরে কারখানার কলের বাঁশি বেজে ওঠে, বস্তির মৃন্ময় ঘরগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। মিস্ত্রি-মজুর দরিদ্র কেরানীর পাঁচমিশালী ভিড় দলে দলে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যায় বস্তি থেকে।

প্রণতিদের জীর্ণ মাট-কোঠাটা দোতলা হ'লেও দেড়তলার সমান। চাল খোলার, দেওয়াল মাটির, মেঝে তক্তার। জানলাগুলো ছোটো ছোটো, দোর একটি—সামনে অপ্রসর একটুখানি বারান্দা। বারান্দার রেলিং এককালে যাও বা ছিলো এখন তা ভেঙে গেছে অনেকখানি। সেই ভাঙা জায়গাটায় দড়ি-সহযোগে-বাঁখারির-তালি দিয়ে বেশ কাজ চালিয়ে নিচ্ছে বাসিন্দারা। বাড়ি-ওয়ালার কাছে মেরামত করিয়ে দিতে বলবার মতো বুকের পাটা এখানে কারো নেই কারণ যদি এজন্য আবার ভাড়া বেড়ে যায়।

নিচে থেকে ওঠবার জন্যে যে সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়িটা রয়েছে সেটাও সব সময়ে জলে ভিজে ভিজে এতই জীর্ণ হ'য়ে গেছে যে উঠতে নামতে মচ মচ্ করে। সিঁড়িটার রেলিং নেই, অনেকটা মইয়ের মতো। সর্বনিম্ন ধাপটি ভাঙা তাই একধারে ইটের চাড়া দিয়ে রাখা হ'য়েছে ওটাতে। জীবনের পিচ্ছিল পথে অনেকবার পা পিছলে, আছাড় খেয়ে যারা স্বভাব-সতর্ক হ'য়ে গেছে তারাই এই সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি ওঠা-নামা করে, কিন্তু প্রণতির যে বড়ো ভয় করে!

ওই বাঁখারির রেলিং-এ আলকাৎরা-মাখানো-বাঁখারির মতোই সরু একখানা ছোটো হাত দেখতে পায় প্রণতি খোলা দোরটার মধ্য দিয়ে। কে উঁকি মারে? বিছানা থেকেই গলা বাড়িয়ে ছাখে প্রণতি সেই হরি মোটর-ড্রাইভারের বজ্জাৎ ছেলেটা—খুব সম্ভব প্রদীপকে আবার ডেকে নিয়ে যেতে এসেছে। প্রণতি চেঁচিয়ে ওঠে—কে রে ওখানে? আবার এসেছিস্।

প্রণতির গলা শোনামাত্রই দুড় দুড় ক'রে পালায় ছেলেটা। জীর্ণ সিঁড়িটা বেয়ে সবেগে নামবার সময়ে শেষের ধাপটা একেবারে ভেঙে পড়ে, আছাড় খেয়ে পালায় ছোঁড়া।

নিচে থেকে এক বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে—গেলো, গেলো! আচ্ছা ডানপিটের

মরণ! ম'রে যেতিস্ যে রে ছোঁড়া! অ্যাঁ, সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে গেলো গা।

প্রণতি বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাখে মিছে নয় সিঁড়ির শেষ ধাপটা ভেঙে দিয়েই পালিয়েছে ডাকাতটা! প্রদীপকে বলে—কক্ষনো ওর সঙ্গে মিশিস্‌নে খোকা, বুঝলি? মনে থাকবে তো?

প্রদীপ মাথা নেড়ে জানায়, মনে থাকবে।

প্রদীপকে নিয়ে প্রণতি আবার বিছানায় ফিরে আসে, সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—তুই তো এবার ইস্কুলে যাবি, নারে খোকা?

প্রদীপ বলে—দেরি হ'য়ে গেলে যাবোনা কিন্তু···দেরি হ'লে মাস্টার বকে।

প্রণতি বলে—না, না, এ বেলা তো আর রাঁধবোনা, দেরি হ'বে কেন?

ব'লে বাক্‌স খুলে একটি সিকি বের ক'রে প্রদীপের হাতে দ্যায়, বলে—কিছু খাবার কিনে নিয়ে আয়তো বাবা। তাই খেয়ে আজ ইস্কুলে যা। তোর জন্যে ভালো তরকারি রেঁধে রাখবো, বিকেলে এসে খাস্।

আর তোমরা? তোমরা খাবেনা এবেলা?—প্রদীপ জিগেস করে।

প্রণতি বলে—আমার শরীর ভালো নেই, আমি কিছু খাবোনা।

—আর বাবা?

—তোর বাবা খেয়ে আসবে।

—আর ঠাকুমা?

—ঠাকুমার একাদশী। তোর অতো ভাবতে হ'বেনা, যা বল্লুম তাই কর।

প্রদীপ সিকিটি নিয়ে মহানন্দে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এলো। চাপা গলায় বললো—মা, আরতিদি আসছে। এতো মিষ্টি-মেঠাই খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে।

গিরীনবাবুদের বাড়ির বছর দশেকের মেয়ে আরতি উড়ে বামুনটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। খাবার-বাহক নানা আহার্য সামগ্রী থরে থরে সাজিয়ে রাখলো।

প্রণতি বলে—কী ব্যাপার আরতি?

—মা কিছু খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

—কেন বলোতো?

—বাবার জন্মদিন-উৎসবে কাকাবাবুর নেমতন্ন ছিলো কিনা, কাকাবাবু (অর্থাৎ অম্রীশ) বোধহয় তা ভুলে গেছলেন। কই, যাননি তো?

—উনি ঐ রকম। তোমার কাকাবাবুর কথা বাদ দাও।

—মা তাই খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

—তা ব'লে এত? আজড়ে রাখার জন্ত থালা আনতে উঠে যায় প্রণতি।

প্রদীপ এসে আরতির হাতখানা ধরে। আরতি বলে—পরশু তুই যাবি প্রদীপ আমাদের সঙ্গে? মরা-সোসাইটি যাচ্ছি আমরা।

প্রদীপ বলে—যাবো। তুমি বলোনা ভাই মাকে, তুমি বল্লে ঠিক যেতে দেবে। মরা-সোসাইটি দেখিনি কখ্‌খনো।

আরতি বলে—আচ্ছা, বলছি দাঁড়া কিন্তু মনে থাকে যেন সীমা, রিনা, আইভি, হেনা, অংশু, রেখা এদের সঙ্গে মিশোনা খবরদার। তুমি ছেলেমানুষ বোঝোনা ওরা খারাপ মেয়ে। আইভি আমার কাছে কি বলছিলো তোর নামে জানিস্‌না তো?

প্রদীপ জিগেস করে—কী আরতিদি?

আরতি বলে—বলছিলো তুই নাকি আজকাল বিড়ি খেতে শিখেছিস্?

প্রদীপ বলে—না আরতিদি, তোমার দিব্যি, মাইরি না। আর কী বলছিলো?

আরতি বলে—সে আর তোর শুনে কাজ নেই, সে মুখে আনা যায়না।

প্রদীপ জেদ ধরে শোনার জন্যে। এমন সময়ে প্রণতি থালা নিয়ে ঘরে ঢোকে। আরতির আর প্রদীপকে সে গোপনীয় সংবাদটা বলা হয়না, চুপ ক'রে যেতে হয়।

প্রণতি আসছে দেখে আরতি বলে—বলবো'খন, আজকে এক সময়ে তুই যাস্‌না আমাদের বাড়ি।

প্রণতি ঘরে ঢুকেই জিগেস করে—কি গো আরতি, তোমাদের কী মন্ত্রণা হ'লো।

আরতি বলে—পরশুদিন মিউজিয়ম দেখতে যাচ্ছি আমরা। প্রদীপ তো ছাখেনি কখনো, ওকে দেবেন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে?

প্রণতি থালা খালি ক'রে দিয়ে বলে—আচ্ছা। ইস্কুল কামাই করতে পেলে ও তো বর্তে যায়।

অনুমতি পেয়ে প্রদীপ লাফ মারে। প্রণতি বলে—নাচ ছাখোনা ছেলের।

আরতি ওর দিকে চেয়ে হাসতে থাকে বিজয়িনীর মতো।

আর যাবার সময়ে দৃপ্ত ভ্রূভঙ্গে গ্রীবা হেলিয়ে বেণী দুলিয়ে প্রদীপের প্রতি চক্ষু হেনে চ'লে যায় যার অর্থ হচ্ছে—মনে থাকবে তো যা বল্লুম?

এরই খানিক পরে। প্রদীপ তখন স্কুলে চ'লে গেছে। ওদের বস্তির উঠানে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে কথা কইতে দেখলো প্রণতি। কী রূপ! চমৎকার শাড়িটা ওর! এ-রকম কেউ কখনো তো আসেনি এই বস্তিতে। এই রূপ, এই আভিজাত্য এই বস্তিতে অকল্পনীয়! নিশ্চয়ই মস্ত কোনো ধনিকন্যা হবে। কত যে দাম হ'বে শাড়িটার, কে জানে! কী চায়? কাকে

খুঁজছে? ঘর থেকে বাঁখারি-দেওয়া-বারান্দায় এসে দাঁড়ালো প্রণতি। কোথায় যেন দেখেছে একে, যেন চেনা-চেনা। মেয়েটি সামনে ফিরতেই প্রণতির মনে প'ড়ে যায়···ঠিক ঠিক, ওকে এইবার চিনে ফেলেছে প্রণতি! এই তো সেদিন বিরূপাক্ষের ওখানে এরই সঙ্গে তার আলাপ হ'য়েছিলো, না? সাত্ত্বিকবাবুর মেয়ে না? পাশ থেকে অতো ঠিক বুঝতে পারেনি, প্রণতির এবার আর সন্দেহ থাকেনা।

শারী প্রণতিকে দেখামাত্র এগিয়ে আসে। নিচে থেকে বলে—এই যে প্রণতিদি, দেখুন, ঠিক বের করেছি কিনা খুঁজে খুঁজে?

প্রণতি বারান্দা থেকে হাসিমুখে বলে—সত্যি ভাই, বাহাদুরী আছে তোমার।

—কই? ওপরে যাবার সিঁড়ি কোথা? এইটে?

—হ্যাঁ, তুমি কি উঠতে পারবে ও সিঁড়ি দিয়ে? একটা ধাপ ভাঙা আছে।

শারী তবু সেই ভাঙা সিঁড়ি দিয়েই উঠে আসে ওপরে, খুব সন্তর্পণে ও ভয়ে-ভয়ে, বলে—বাবা! কী ক'রে এখান দিয়ে ওঠা-নামা করেন, ভয় করেনা?

প্রণতি মুখ টিপে টিপে হাসে, বলে—আমাদের সয়ে গেছে, ভয়-ভাবনা কী আর আমাদের শরীরে আছে?

কথাটা ব'লে ফেলে নিজেই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়।

—অদ্রীশবাবু আছেন তো?

—না ভাই, তিনি তো এখন নেই—বেরিয়েছেন সেই সকালে।

—ঠিক কোন সময়ে থাকেন বাড়ি? ফিরবেন কখন?

—তা তো জানিনা, ব'লেও তো যাননি কিছু—একবার বেরোলে সময়ের তো ঠিক থাকেনা। যে খেয়ালী মানুষ···

শারী একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ে, বলে—কিন্তু তাঁকে যে চাই একবার কালকে। কাল তো রবিবার, নিশ্চয়ই কোথাও বেরোবার নেই?

—কেন বলো তো?

—তাঁর একটা সংবর্ধনার আয়োজন করছি আমরা 'মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি' থেকে। কাল রবিবার আছে এদিনে যদি সম্ভব হয় তো ওঁকে আমরা একবার আমাদের মধ্যে পেতে চাই। এ বিষয়ে সব কিছু ঠিক করার আগে ওঁর সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে নিতে এসেছি আমরা। দাদা-বৌদিও এসেছেন ব'সে আছেন গাড়িতে। নামেননি, আমাকে পাঠালেন, বল্লেন—দেখে এসো এখন অদ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কিনা।

প্রণতি ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। বলে—কই বলোনিতো কিছু? তোমার দাদা-

বৌদিও এসেছেন নাকি? তাহ'লে নিয়ে এসো তাঁদের? ঘর যা হ'য়ে আছে, কোথায় বসাই বলো তো ওঁদের?

শারী বলে—এখন থাকগে, প্রণতিদি। অদ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লোনা যখন আবার তো আজ আসতেই হ'বে, ওঁদের তখন নামালেই চলবে। মিছি মিছি ব্যস্ত হ'বার দরকার নেই এজন্য।

প্রণতি বেঁচে যায় শারীর কথায়, বলে—তাহ'লে কখন ফের আসছো তোমরা?

শারী বলে—আজ বিকেলেই। ব'লে রাখবেন ওঁকে।

—এর মধ্যেও উনি যদি না ফেরেন বাড়িতে, তাহ'লে কী হ'বে?

—আবার আসবো রাত্তির ক'রে। আসতেই হ'বে, কারণ আজই এ-বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে নিতে হ'বে কিনা। মাঝে তো আর দিন নেই। আচ্ছা, চলি তাহ'লে, আরো অনেক জায়গা ঘুরতে হ'বে আমাদের।

প্রণতি দীনতার হাসি দিয়েই বিদায় ছায় শারীকে, বলে—এলে কুঁড়েয় তবু কিছুই অভ্যর্থনা করতে পারলামনা তোমাদের। কিছু মনে কোরোনা ভাই। তোমাদের কীই বা অভ্যর্থনা করতে পারি আমরা?

—ওকথা বলবেননা, প্রণতিদি, আমরাই তো আপনাদর অভ্যর্থনা করতে এলাম—বিব্রত করতে তো আসিনি। আচ্ছা, সঙ্গে আর আসতে হ'বেনা, বসুন ঘরে। বিকেলে দেখা হ'বে আবার।··সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় শারী।

প্রণতি ভাবে এদেরও তাহ'লে আসতে হয় এখানে, হ'তে হয় এই বস্তির দ্বারস্থ? কী জন্যে? যে-মানুষকে নিয়ে যেতে পারলে নিজেকে এরা সম্মানিত মনে করে সে-মানুষ কি গ্রাহ্য করে কোনোকিছু, পরোয়া করে কোনোকিছুর? তবু এরা আসে। হঠাৎ স্বামীর ওপর করুণায়, শ্রদ্ধায় তার মন ভ'রে গেলো। জগৎকে গ্রাহ্য না করার স্পর্ধা বা শক্তি যার আছে জগৎ হয়তো তারই পেছন পেছন ছোটে। স্বামীকে কিছুটা যেন আজ বুঝে ফ্যালে সে। শারী ব'লে গেছে আবার আসবে, আসবে হয়তো রাত ক'রেই। ঘর-দোর যা হ'য়ে আছে, ইস্! এরই মধ্যে যতদূর সম্ভব ঘরটাকে সভ্য-ভব্য করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লো প্রণতি।

কে যেন হঠাৎ মেলে, মিলায়

পরদিন, রবিবার সন্ধ্যা। বাসবীদের বাড়িতে 'মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি'র প্রমোদা-নুষ্ঠান হ'বে। সেইসঙ্গে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'বে অদ্রীশকে। ওদের 'মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি'র একটা ক'রে বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছর এ-সময়ে হয়। উক্ত ক্লাবের সভ্যারাই ক্রীড়াকৌতুক দেখায় এই উপলক্ষ্যে। কিন্তু অন্যান্য বারের চেয়ে এবারে আড়ম্বর কিছু বেশি। এই উপলক্ষ্যে ক্লাবের বাইরে থেকেও বড়ো বড়ো ক্রীড়াকুশলীদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে মেয়েরা টিকিট বিক্রীও ক'রেছে অনেক। সেই টিকিট বিক্রীর টাকার অধিকাংশ দিয়েই অদ্রীশকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হ'বে—প্রতিভার পুরস্কার হিশেবে। নিজে থেকেই ঠিক ক'রেছে মেয়েরা। ব্যাপারটাকে আজ ক'দিন ধ'রে প্রতি কাগজেই বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে। বাসবীকে ধ'রেছে মেয়েরা সাঁতারের ডিমন্‌স্‌ট্রেশন দেখাতে হ'বে এদিন। কারণ ওদের মধ্যে এক বাসবীই কিছুদিন আগে সাঁতারে নাম করেছিলো। কত প্রাইজ, কাপ, মেডাল পেয়েছে সে। প্রথমটা বাসবী এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করেছিলো, বলেছিলো—আর কি এখন ও-সব পারি? দেহ ভারী হ'য়ে গেছে।···ব'লেও কিন্তু ছাড়ান পায়নি বাসবী।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে, বাসবীদের বাড়ির পেছনটায় একটা বাগান আছে যেটাকে শহরের পক্ষে প্রকৃতই প্রকাণ্ড বলা চলে। এই বাগানে মস্ত একটা দিঘি ছিলো। বধূরূপে বাসবী এ বাড়ি ঢোকার পর সে-দিঘিটাকেই সংস্কার ক'রে নিয়ে একটি আধুনিক 'সুইমিং পুলে' পরিণত করা হ'য়েছিলো বাসবীরই জন্য এবং ওরই উৎসাহে। বিয়ে হ'বার পরেও বাসবী নিয়মিতভাবে এখানেই সাঁতার অভ্যাস করতো। বহু তক্তা, কড়ি, লোহা ইত্যাদি দিয়ে ডাইভ্‌ করার মঞ্চ বাঁধা হ'য়েছিলো জলের ওপর। বাসবীর শ্বশুর সাগ্নিকবাবু যেন উদগ্রীব হ'য়ে থাকতেন পুত্রবধূর সামান্যতম ইচ্ছার প্রতিও আনুকূল্য দেখাবার জন্য। সেজন্য অর্থব্যয় করতেও তিনি কোনোদিনই কুণ্ঠিত ছিলেননা। শ্বশুরের দেহান্তর ঘটেছে আজ ক'বছর হ'লো। বাসবীর সাঁতার দেওয়ার অভ্যাসও ক্রমশ অনিয়মিত হ'তে হ'তে এখন তো একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। তবু এখনো কালে-ভদ্রে গ্রীষ্ম এলে বাসবী নামে ঐ দিঘির জলেই এবং শরীর জুড়িয়ে নিতে কাটায় বহু সময়। সেইখানেই অর্থাৎ সেই দিঘি-সংলগ্ন বাগানটায় আজ সামিয়ানা খাটানো হ'য়েছে, মণ্ডপ বাঁধা হ'য়েছে অদ্রির সংবর্ধনার জন্য। আজই বৈকালে সাঁতার হ'বে। ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামোদীরা

জড়ো হ'তে সুরু ক'রেছে। একেই মেয়েদের সাঁতার জিনিশটা দর্শক আকৃষ্ট করে বেশি তার ওপর বাসবীর নাম রয়েছে সর্বাগ্রেই; তাই টিকেট বিক্রীও হ'য়েছে খুব। বলতে গেলে অপ্রত্যাশিত রকমেরই। একদিন যে বাসবী ৪০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে মেয়ে-সাঁতারুদের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের একটা রেকর্ড স্থাপন করেছিলো। বহুদিন বাদে আজ আবার সেই বাসবীকে দেখা যাবে সাঁতারু মেয়ের পোষাকে। অভিজাত সমাজের মধ্যে ব্যাপারটা বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছে।

আজ সন্তরণ-প্রদর্শনীতে আরো অনেক নাম-করা সাঁতারুও যোগদান করবেন ব'লে প্রকাশ। বাগানটাকে ঘিরে ফেলে চারিদিকেই পোস্টার মারা হ'য়েছে—

কলিকাতার ক্রীড়ামোদীদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—
মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি পরিচালিত
চৈতালী জলোৎসব!
অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন।

নির্দিষ্ট আসন-সংখ্যা সময়ের অনেক আগেই ভর্তি হ'য়ে গেলো। অভিজাত সমাজের অনেকেই এসেছে। এই সঙ্গে শুকনো মুখে সাপের মতো চোখ দু'টো নিয়ে এসেছে মৃদুলা সেন। আরো একজন কে এসেছে স্যুট্-পরা খুব সুপুরুষ, রঙিন কাচের চশমা প'রে বসেছে পিছন দিকে। চর্কির মতো ঘুরছে শারী, ঘুরছে সতী সব কিছু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করতে, পরিচিত অভ্যাগতদের ও সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করতে। বিরূপাক্ষ ডাক্তারও বলেছে—পারি তো যাবো। কিন্তু এসে পৌঁছোয়নি এখনো। যে আসল লোক—যার সংবর্ধনায় এ-সব, তারই দেখা নেই এখনো পর্যন্ত। বাসবী, সতী ও শারী গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিলো অদ্রীশকে; অদ্রীশই আজকে সভার প্রধান অতিথি। বাসবী বললো—সতী আর শারী, তোমরা না হয় আরো একবার যাও গাড়ি নিয়ে, একেবারে ধ'রে আনা চাই ওঁকে। হয়তো ভুলেই ব'সে আছেন যা খেয়ালী মানুষ।

সতী সন্দেহ প্রকাশ করলো—ওঁকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে কি?

বাসবী বলে—যে-কোনো রকমেই হোক একবার আনার চেষ্টা তো করতে হ'বে নইলে সংবর্ধনার সকল আয়োজনই হ'য়েছে। না আনতে পারলে সব পণ্ড হ'বে।

শারী বলে—চলুন সতীদি, যাই একবার শেষ চেষ্টা করিগে। এখানে বৌদি সব ম্যানেজ ক'রে নেবে'খন। বল্লরী, প্যান্সি, শিতিমা এরা তো সবাই রইলো।

সতী বলে—চলো, দেখা যাক্।

অন্য মেয়েদের সাহায্যে বাসবী অন্যান্য সব কাজেরই সুবন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, কিন্তু অদ্রীশকে নিয়ে সতী ও শারী তখনো ফিরে এলো

না। সাঁতারের ডিমন্‌স্ট্রেশন স্থরু হওয়ার কথা পাঁচটায় কিন্তু সাড়ে পাঁচটাও বেজে গেলো, উত্তরোত্তর অধীর হ'য়ে উঠলো বাসবী। অধীর প্রতীক্ষারত দর্শকদের দৃষ্টি যেন তার ধৈর্যকেও চাবুক মারছে! সকলেই উস্‌খুস্‌ করতে শুরু করেছে এবার! কার্যক্রমের প্রথমেই রয়েছে ডাইভিং···আর তাতে প্রধান অংশ নিতে হ'বে বাসবীকেই—আর অপেক্ষা করা চলেনা। স্থরু এবার করতেই হয়। বাসবী শেষ-বারের মতো একবার দর্শকদের সারির মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখে যায় কে কে এলো আর কে কে আসেনি পরিচিতদের মধ্যে। দর্শকদের সারের মাঝখান দিয়ে সে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়—পরিচিত কতো লোক বেরিয়ে পড়ে। কারো দিকে চেয়ে একটু পরিচয়ের হাসি হাসে; কারো দিকে চেয়ে হয়তো সে জিগেস করে—খবর ভালো তো? কাউকে বা বলে—অনেক দিন পর দেখা হলো কিন্তু। আসবেন একদিন। আবার কাউকে বলে—সভা ভাঙলেই যেন চ'লে যেওনা ভাই···দেরি কোরো··তোমার সঙ্গে কথা আছে।

এইভাবে দু'এককথায় সকলকে আপ্যায়িত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলো বাসবী কিন্তু মৃদুলার সঙ্গে তার ফের চোখোচোখি হ'লো। প্রথমটা সে উপেক্ষা করেছিলো কিন্তু এবার অন্তত ভদ্রতারক্ষার জন্যও তাকে বলতেই হ'লো—এই যে মৃদুলাদি। শারীকে বলেছিলুম যাস্‌, মৃদুলাদিকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসিস্‌, গিয়েছিলো নাকি?

শারী যদিও নিমন্ত্রণ করতে যায়নি তবু সেটা স্বীকার করতে মৃদুলার মানে বাধলো তাই সে বললো—গিয়েছিলো বৈকি। যাবেনা? আমার সব ছাত্রীই যে আমায় বড়ো মানে।

বটেই তো। মুচ্‌কি হেসে বাসবী স'রে গেলো সেখান থেকে।

একেবারে শেষসারের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলো বাসবী হঠাৎ যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লো কালো স্যুট্‌ ও রঙিন চশমা-পরা স্থপুরুষ ভদ্রলোকটির পেছনে। বাসবীকে সেদিকে আসতে দেখে তিনিও হঠাৎ যেন বড়ো বেথাপ্পাভাবে মাথায় টুপিটা চড়ালেন, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে নাকের কাছটায় চেপে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত তিনিও যেন লক্ষ্য করলেন বাসবীকে, তখনকার মতো স'রে এলো বাসবী। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে বাসবীও লক্ষ্য করছিলো লোকটিকে, মনে হচ্ছিলো যেন চেনা-চেনা! ওকে দেখলে ঠিক নিরুদার কথাটাই মনে পড়ে। তাই ক'বার ইচ্ছে ক'রেই সে এখানটা দিয়ে ঘুরে গেলো। কিছুতেই নিঃসংশয় হ'তে পারছিলোনা, দ্বিধা হচ্ছিলো কথা কইতে। নিশ্চয় না হ'তে পারলে কী ক'রেই বা কথা কওয়া যায়! চশমা টুপি ও রুমালে তো মুখের আধখানাই ঢাকা রয়েছে তা সত্ত্বেও কোথায় যেন সাদৃশ্য চোখে পড়ে! আশ্চর্য, এমন মানুষের মতো মানুষও হয়? কিন্তু নিরুদা এখানে আসবে

কোথেকে? সে তো এখন পুরীতে। তবে ইতিমধ্যে এসে পড়তেও তো পারে? কলকাতায় এলে কিন্তু বিরুদার বাড়িতেই উঠতো। তার নিজের বাড়ি তো থেকেও নেই, হয়তো এবার কোনদিন সত্যিসত্যিই যাবে। ওভাবে ভেঙে খেতে থাকলে আর কতোদিন? রুগ্ন বৌয়ের পেছনেই ওর সব গেলো, এমন কি চাকরিটাও পর্যন্ত! বিয়ে করাটাই ওর কাল হ'লো। তার চোখের সাম্‌নে নিরুদার জীবনটা যে এভাবে নষ্ট হ'তে চলেছে একথা ভাবলেও যেন বাসবীর মন-মেজাজ বিশ্রীভাবে বিগ্‌ড়ে যায়। বাসবী এড়াতে চায় এ-সব চিন্তা, ভাবে যাক্‌গে, যা পারে তা হোক্‌গে। কিন্তু নিজের চোখকে সে এখন অবিশ্বাসই বা ক'রে কী ক'রে? জানা দরকার কে ও! এ রকম একটা সন্দেহ নিয়েও তো আর বাসবী থাকতে পারেনা, আবার ফিরে আসে ঐ রঙিন কাচের চশমাওয়ালা কালো স্যুট্‌ পরা ভদ্রলোকটির কাছে। এবার আর পেছনে নয়, গিয়ে দাঁড়ায় সামনে।

কালো স্যুট্‌-পরা ভদ্রলোকটি বাসবীকে তার দিকে আবার এগিয়ে আসতে দেখে দু'একবার একটু উস্‌খুস্‌ ক'রে শেষ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়েন এবং বেরিয়ে যেতেও চেষ্টা করেন কিন্তু বাসবীও পেছন পেছন এসে ধরে, বলে—যতোই ভোল্‌ বদলাও, আমি তোমায় ঠিকই চিনতে পেরেছি নিরুদা, পালাচ্ছো যে বড়ো?

—পালানো আর হ'লো কোথা? ধরা প'ড়েই গেলাম যে।···অনিরুদ্ধ হাসে।

—কবে এলে পুরী থেকে? কোথায় আছো এখানে?

—হপ্তাখানেক এসেছি। এবার এসে উঠেছি ব্যারাকপুরে।

—বৌ কেমন আছে?

—যেমন থাকা উচিত তার চেয়ে বিশেষ খারাপ নেই। ওর কথা বাদ দাও।

—তোমার চেহারা কিন্তু অনেক খারাপ হ'য়ে গেছে। উঃ, কতোদিন পরে দেখলাম তোমাকে! দেখলে প্রথমটায় চিনতেও কষ্ট হয়।

—তবুও তো চিনলে। না চিনলেই যে বাঁচতাম।

—কেন? একথা বলছো কেন? তুমি এই তো প্রথম আমাদের বাড়ি পা দিলে। নিমন্ত্রণ করলে তো আর আসতেনা,—আসোওনি এতদিন। এবার কী-যে খেয়াল হ'লো লুকিয়ে এলে এবং দৈবাৎ ধরাও প'ড়ে গেলে। যাক্‌ যেমন ক'রেই হোক পেয়েছি যখন ছাড়বোনা; তোমার জায়গা এখানে নয়, চলো ভেতরে।

বাসবী অনিরুদ্ধের হাতখানা ধ'রে টান দ্যায়।

অনিরুদ্ধ বলে—কেন? টিকিট কিনে ঢুকেছি যখন এই তো আমার জায়গা।

বাসবী হেসে বলে—টিকিটই যদি তোমায় বেচতাম তো এমন দু'এক টাকার টিকিট বেচতো কে? কী ক'রে জানলে আজকের জলোৎসবের খবর?

—খবরের কাগজে দেখলাম কিনা তোমার নাম—তাই বড়ো কৌতূহল হ'লো দেখতে যে, আমার শেখানো সামারসল্ট ডাইভ্ গুলো এখনো ঠিক পারো কিনা।

—না পারি আবার শিখে নেওয়া যাবে'খন, চলো তো ভেতরে। আজকের এই জলোৎসবে কিছু অংশও নিতে হবে তোমাকে। এসে যখন পড়েছো।

অনিরুদ্ধের হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেলো বাসবী। মৃদুলার পাশ দিয়েই গেলো ওরা—চোখোচোখি হ'লো বাসবীর সঙ্গে মৃদুলার। মৃদুলাকে লক্ষ্য না করার ভান ক'রেই অনিরুদ্ধের হাত ধ'রে যখন চ'লে গেলো বাসবী মৃদুলার সাপের মতো চোখ দু'টো তখন শকুনের মতো দেখাচ্ছিলো!

বাসবী ও অনিরুদ্ধের পেছন পেছন বল্লরী ব'লে একটি মেয়ে যাচ্ছিলো—বল্লরী বাসবীর একজন বান্ধবী। তাকে ডেকে ডাঃ বিনোদবাবুর স্ত্রী জিগেস করেন—বাসবীর সঙ্গে কে ও বল্লরী?

বল্লরী অর্থপূর্ণ ভ্রূভঙ্গি ক রে বলে—জানেননা কে? ওই তো নিরুদা! আগে কখনো দেখেননি? উনিই তো অনিরুদ্ধবাবু—নামটা শোনেননি?

মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা বলেন—হাঁ, হাঁ, শুনেছি বটে; কিন্তু যাই বলো বাপু কী সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের! সুপুরুষ বটে!

বল্লরী বলে—নিরুদার মতো সুন্দর হয়না বাঙালীর মধ্যে।

ভদ্রমহিলা স্বীকার ক'রেই নেন যে কথাটা খুবই সত্যি, বলেন—যেমন বাসবী তেমনই অনিরুদ্ধ।

প্যান্সি যেতে যেতে বল্লরীকে দেখতে পেয়ে ডেকে বলে—জানিস বল্লরী মস্ত এক আসামী ধরা পড়েছে আমাদের এই প্যাভিলিয়নের মধ্যে থেকে—একেবারে অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় কাণ্ড! খবর রাখিস্না বুঝি কিছু? আমাদের অতি-পরিচিত এক ভদ্রলোক এতলোকের চোখ এড়িয়ে দিব্যি বসেছিলেন শেষের দিকে কিন্তু বাসবীদির চোখ এড়াতে পারলেননা। কোত্থেকে সে এসেই অম্নি চিনে ফেললো আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলো।

বল্লরী ঠোঁট ওল্টায়, বলে—ওঃ, এই খবর? তোর অনেক আগেই জেনেছি আমি। জহর কি আর জহুরীর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে কোথাও? চিনে ঠিক বের করবেই। একি তোমার আমার কর্ম? আমরা সকলেই তো দেখেছি শেষ অব্দি পারলুম কি ধরতে?

দূরে বাসবীকে দেখা যাচ্ছে; প্যান্সি সেখান থেকে আহ্লাদী সুরে চেঁচায়—বাসবীদি!

—কাকে ডাকছিস? ওকি আর আমাদের কথা শুনতে পাবে, না আমাদের

চিনতে পারবে? ও এখন ভাবের মানুষকে নিয়ে মেতেছে।···প্যান্সির বাহুমূলে ছোট্টো একটা সংকেতময় চিমটি কাটলো বল্লরী।

—সত্যি, নিরুদাকে নিয়ে কী যে করবে, কোথা রাখবে কিছুই যেন ঠিক পাচ্ছেনা বাসবীদি।···প্যান্সি ঠোঁট ওল্টালো।

এরা দু'জন বাসবীর কথা নিয়ে হাসাহাসি করছে এমন সময়ে পেছন থেকে কে যেন ব'লে উঠলো—ন্যুইসেন্স্! এ রকম আন্‌ক্লিন অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারে আমাদের মতো মানুষ কতক্ষণ টিঁকতে পারে? গা ঘিন ঘিন করে···দু'জনেই পিছন ফিরে দেখলো মৃদুলা পার্শ্ববর্তিনীর কাছে আক্ষেপ করছেন। সাপের মতো চোখ দুটো তাঁর ওদের দিকে বিষ ছড়াচ্ছে!

মৃদুলার দিকে চেয়ে বল্লরী ও প্যান্সি অপ্রতিভ হওয়ার পরিবর্তে আরো অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো।

তাতেই আরো জ্ব'লে ওঠে মৃদুলা। মৃদুলা যতোই জ্ব'লে ওঠে ওরাও ততো হাসতে থাকে আর ডাকতে থাকে—মৃদুলাদি! মৃদুলাদি!

ওদের প্রতি রাগে ঘৃণায় মৃদুলা মুখ ফিরিয়ে থাকে।

সবিশেষ কৌতুকাবিষ্ট হ'য়ে ডাঃ বিনোদববুর স্ত্রী বল্লরীকে শুধালেন—কাকে খ্যাপাচ্ছো বল্লরী? মাস্টারনীকে তো? সত্যি ওটা যেন একটা সং! বাসবী যখন অনিরুদ্ধকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন ওর দিকে তোমরা তো চাওনি, আমি দেখছিলাম রগড়টা। সে কী চাউনি! হাড়গিলে যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

আবার আরো একটা হাসির লহর ব'য়ে গেলো সেদিকটা দিয়ে।

ন্যান্সির মুখে ওঁর আর একটা গুণের কথা শুনছিলাম।·· বললো প্যান্সি।

অম্নি আরো হাসির ধুম প'ড়ে গেলো।

ডাঃ বিনোদবাবুর স্ত্রী জিগেস করলেন—কী হ'লো? কী ব্যাপার প্যান্সি?

ওরা দু'জনে মিলে ব'লে উঠলো—ও আপনাদের শোনার মতো কিছু নয়··· মৃদুলাদির গুণের কথা আমরা আলোচনা করছি।

বিনোদবাবুর স্ত্রী তাঁর বয়সোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে একটু স'রে গেলেন।

প্যান্সি বলে—শুনিস্‌নি? সেদিন আভা নাগের বিয়ের বাসরে গিয়ে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে কী লম্বা সারমন্ ঝাড়ছিলো যে কী বলবো তোকে! বক্তৃতা দিতে তো কেউ ডাকেনা ওকে—একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলো বলতে বলতে, পাশ থেকে কখন যে ওর ভ্যানিটি ব্যাগটি উধাও হ'য়ে গেছে সে খেয়াল নেই। প্রথমটা গুঞ্জন উঠলো, তারপর হাসি, ক্রমশ ক্রমশ পাঁজর-ফাটা হাসির সংক্রমণে যখন সকলেই প্রায় ধরাশায়ী তখন বক্তৃতা শেষ ক'রে ব'সে পড়তে বাধ্য হ'লো। জানোই তো

আভার দিদি কী রকম মুখফোড় মেয়ে, সে বললো—দেখুননা মৃদুলাদি, আপনার ছাত্রী আইভি আপনারই ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কন্‌ট্রাসেপ্‌টিভ্‌ চুরি করছে। যাঁহাতক বলা আর সেই মুহূর্তে ও একটা Scene ক'রে বসলো।

সেই থেকে দিনকতক ওকে আর কোথাও বড়ো একটা দেখা যায়নি। এখানে আজ আবার দেখছি পোড়ামুখ দেখাতে এসেছে।

শুনে বল্লরী লজ্জায় রং বদলায়, বলে—ধ্যেৎ, মানুষটাকে তোরা যে কী করিস্‌! আভার দিদি ঐ রকম। আভার দিদি বললে আর তুই অম্নি বিশ্বাস ক'রে নিলি?

অনেকখানি নির্ভরতার সঙ্গে প্যান্সি বললো—বিশ্বাস করবোনা কেন? ওর সম্বন্ধে আমি সবকিছুই বিশ্বাস করি।

এর আধ ঘণ্টা পর। অর্থাৎ ছ'টা বেজে গেলে সতী ও শারী মোটর নিয়ে ফিরে এলো। অদ্রীশকে পাওয়া যায়নি। বাসবী জিগেস করলো—কী হ'লো?

শারী বললো—পাওয়া গেলোনা ওঁকে। প্রথমে আমরা ওঁর বাড়ি গেলাম, প্রণতিদির কথায় সেখান থেকে গেলাম মিলন-চক্রে। সেখানেও নেই। কতো আর ঘুরবো, ফিরে এলাম।

বাসবী বললো—বেশ করেছো, যাক্‌গে।

অদ্রীশকে যে পাওয়া যায়নি সে ব্যাপারটার ওপর বাসবী আর যেন কোনো গুরুত্বই আরোপ করতে চাইলোনা, বললো—আমরা কিন্তু এদিকে নিরুদাকে পেয়ে গেছি। অনেক ধ'রে-ক'রে রাজী করিয়েছি—উনিও আজ সাঁতার দেখাচ্ছেন।

শারী বিস্মিত হয়, বলে—নিরুদাকে কোত্থেকে পেলে? কোথায় তিনি?

সতী ব'লে ওঠে—সেকি? অনিরুদ্ধবাবু তো পুরীতে ছিলেন। ক'দিন আগেও তো চিঠি লিখেছিলেন ডাক্তারবাবুকে।

বাসবী বলে—আজ কিন্তু এখানেই উপস্থিত আছেন, এখুনি দেখতে পাবে।

বলতে বলতে ক্লাব-ঘর থেকে বেরোতে দেখা গেলো একজন সাঁতারের শর্ট্‌স্‌ পরা অসামান্য সুন্দর মানুষকে। বাসবী দেখিয়ে দিলো, বললো—ঐ আসছেন। চলো, পরিচয় করিয়ে দিই। তোমরা তো ওঁকে আজ এই প্রথম দেখলে।

শারী ব'লে ওঠে—সত্যি-সত্যি কী চেহারা বৌদি! তোমার মুখে যা শুনতুম সত্যিই তাই, সাক্ষাৎ অ্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ারই বটে!

বাসবী বলে—তবু ওর মধ্যে আর আগেকার চেহারার আছে কতোটুকু?

সতী বলে—ডাক্তারবাবু প্রায়ই দুঃখ করেন যে, চিররুগ্ন স্ত্রীর জন্যই নাকি ওঁর জীবনটা মাটি হ'য়ে গেলো।

অনিরুদ্ধের জীবনটা যে মাটি হ'য়ে গেলো এ প্রসঙ্গ বাসবী সহ্যই করতে পারেনা, এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে ; কথাটা চাপা দিতে গিয়ে বলে—চলো, ওর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

বাসবী হাতছানি দিয়ে অনিরুদ্ধকে ডাকে—শুনছো Elixir Vitæ ?

বাসবীর ডাক শোনামাত্রই সাঁতারের শর্টস্-পরা অনিরুদ্ধ তার অভ্যস্ত কুণ্ঠাহীনতা নিয়েই এসে দাঁড়ালো ওদের সাম্‌নে। স্বধু শারীই নয়, সতীরও চোখ মাটির দিকে নেমে এলো ওর সঙ্গে কথা বলতে। বাসবী পরিচয় করিয়ে দিলো, বললো—এদের কথাই তোমাকে বলছিলাম। এই আমার ননদ শারী, আর এ সতী।

প্রথম পরিচয়ের স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়া, একটুখানি মোলায়েম সৌজন্য, বারেকের সহাস্য সম্বোধন এবং নেহাৎ মামুলি ধরনের দু'একটা কথাবার্তা—এই পর্যন্তই। এর বেশি স্বচ্ছ আলাপ তখন সম্ভব হ'য়ে ওঠেনা। কারণ সময় নেই। ছ'টা বেজে গেছে। প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় দর্শকেরাও অধীর হ'য়ে পড়েছে। বাসবীও তাড়া ছায়—চলো, আর দেরি নয়, মঞ্চের ওপর চলো, নিরুদা।

একেবারে ডাইভিং প্লাট্‌ফর্‌মে গিয়ে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। একচোট হাততালি পড়লো। তার পেছন পেছন গেলো বাসবীও আজানুকণ্ঠ একটি দামী ঢিলা মখ্‌মলের গাত্রাবরণে আবৃত হ'য়ে। মঞ্চের ওপর এসে তার মখ্‌মলের গাত্রাবরণটি ছেড়ে ফেলে দিলো বাসবী। ঝক্‌ঝকিয়ে উঠলো যেন খোলা তলোয়ার শাণিত আর নগ্ন আর নমনীয়। রেখার উৎসবের পিনদ্ধ উৎস যেন উন্মোচিত হলো সবার চোখের সাম্‌নে। ওর প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনে, প্রতিটি পেশীর হিল্লোলে দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন পেয়ে গেলো দৃশ্যের ভূরিভোজ ! গুঞ্জন উঠলো, হাততালি পড়লো খুব। কিন্তু তবু আজ কেমন একটা ভয়, কেমন একটা লজ্জা অভিভূত ক'রে ফেলতে চাইলো বাসবীকে—কেমন যেন একটা দুর্বলতা।

এদিকে মহিলা-মন্ত্রণা-বীথির তরফ থেকে সতী এসে স্বরবধ ক যন্ত্রের সামনে ঘোষণা করে—আমরা সৌভাগ্যক্রমে আজকের সন্ধ্যায় বাংলার বিখ্যাত সন্তরণ-বীর শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছি। আমাদের অনুরোধের পীড়নে দীর্ঘ আট বছর পরে আবার লোকচক্ষে এই প্রথম আবির্ভূত হ'লেন। প্রথমেই তিনি তাঁর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রে খানিকক্ষণ দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেজন্য মহিলা-মন্ত্রণা-বীথি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এই মহিলা-মন্ত্রণা-বীথির তরফ থেকে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর সেই সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞ তাঁরই যোগ্যা শিষ্যা মিসেস্ বাসবী মুখার্জির কাছেও, যাঁর সুদক্ষ পরিচালনায়, অক্লান্ত চেষ্টায় ও নানারকম সহায়তায় আজকের এই অনুষ্ঠান

সাফল্যমণ্ডিত হ'তে চলেছে। তাঁকেও আমাদের ধন্যবাদ। তিনিও তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়ে আপনাদের চিত্ত-বিনোদন করবেন।

বাসবী প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে···এইবার আরম্ভ হ'বে। ক্রমশ সকল গুঞ্জনই স্তব্ধ হ'য়ে যায় দর্শকমণ্ডলে। কারণেই হোক বা অকারণেই হোক ওর পা দু'টো কাঁপছিলো। তাই প্রথম ডাইভ্‌টা কী বিশ্রীভাবে নষ্ট হ'য়ে গেলো লাফ দেবার সময়ে পা ফস্‌কে যাওয়ায়। লজ্জিত হ'য়ে উঠে এলো বাসবী জল থেকে। চাপাস্বরে অনিরুদ্ধকে বললো—হ'বেনা নিরুদা, তুমিই করো। এখন কী আর এ-সব পারি ?

অনিরুদ্ধ তাকে আশ্বাস দিলো—হ'বে, হ'বে···এসো দেখি···আরো একটু যাও, না আর একটু পেছিয়ে···ঘাড়টা রাখো সিধে ··হাত দুটো রাখো এইভাবে।

বাসবীর দ্বিতীয় ডাইভ্‌টা হ'লো নিখুঁত এবং এইবার তার ভয়, লজ্জা ও জড়োসড়ো ভাবটা কাটলো খানিকটা।

এত দীর্ঘকাল অনভ্যাস সত্ত্বেও অনিরুদ্ধ আজ আশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ হ'লো। এতদিনের অনভ্যাসের ক্ষতিপূরণ হয়েছিলো হয়তো প্রেরণার দ্বারা। কারণ বাসবী রয়েছে পাশে—বাসবীই ওর প্রেরণা আগেকার, আজকের এবং চিরদিনের।

সেই বাসবীকে পাশে রেখে যতোগুলো ডাইভ্‌ ও নিলো সবগুলোই হলো নিখুঁত —একেবারে গাণিতিকভাবেই মাপাজোকা। ক্যামেরায় ছবি তুলে নিলো সাংবাদিকেরা। হাত, পা এবং দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর ওপর তার আজো পর্যন্ত এমনই আশ্চর্য দখল যে, একচুলও এদিক-ওদিক হয়না। প্রত্যেকটি লাফই শুরু থেকে শেষ অব্দি জ্যামিতিকভাবেই নিখুঁত।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধ'রে অজস্র হাততালি ও হর্ষধ্বনি পাবার পর অনিরুদ্ধ শেষ করে। সকলেই একবাক্যে বললো, এত উচ্চাঙ্গের সন্তরণ-প্রদর্শনী শহরে অনেকদিন হয়নি।

প্রদর্শনী-সভা ভেঙে গেলে পর অনিরুদ্ধ বিদায় নিলো বাসবীর কাছ থেকে। অনিরুদ্ধ আর তো রাত করতে পারেনা কারণ তাকে যেতে হ'বে কলকাতার বাইরে। মোটরে ক'রে পৌঁছে দেবে ব'লে বাসবী কতো পেড়াপীড়ি করলো ওকে কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'লোনা অনিরুদ্ধ, বললো—না, ট্রেনেই যাবো। ওজন্য ব্যস্ত হ'য়োনা তুমি। এখান থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত ট্যাক্সি একটা ক'রে নেবো'খন। আর বেশি সময় নেই। যাই।

বাসবীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনিরুদ্ধ একটা ট্যাক্সি ক'রে সোজা স্টেশনে হাজির হয়। গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছে অনিরুদ্ধ এমন সময়ে ওর পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

—কে ? নিরু নাকি ?…চেনা গলা।

অনিরুদ্ধ চম্‌কে পিছন ফিরে চাইলো। একজন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা সাধু-সন্ন্যাসী গোছের লোক ডাকছেন তার নাম ধ'রে। গলার স্বরে একটুখানি ধরা গেলেও চেহারায় ধরবার জো নেই। মনে হয়, হোমরা-চোমরা স্বামীজীদেরই কেউ হ'বেন। লোকটি কথা ক'য়েই আরো যেন নিজেকে ধরা দিলো, বললো—ঠিক চিনতে পারছোনা, নয় ? কবে পুরী থেকে এলে ? কোথায় আছো ?

আগন্তুকের মুখের সাদৃশ্যটা অনিরুদ্ধ এবার যেন নিঃসংশয়ভাবেই খুঁজে পেয়েছে এমন ক'রে বললো—একি, প্রদোষদা ?

প্রদোষ ব'লে উঠলো—চুপ। আমি এখম নির্জ্জানানন্দ।

—কিন্তু একি চেহারা হ'য়ে গেছে তোমার ?

—আর ভাই বড়ো ভুগেছি এবার টাইফয়েডে। অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলাম কিন্তু যাক্ ওকথা, এখন আমি বড়ো ব্যস্ত। একটা কাজের বরাত দেবো তোমায়। এই প্যাকেটটা তোমার বিরুদাকে দিও। আমার মোটে সময় নেই নইলে বিরুর সঙ্গে নিজেই একবার দেখা ক'রে যেতাম। জিনিশটা সাবধানে নিও এবং সাবধানেই রেখো, বুঝলে ? আজকে এখুনি এটা বিরুর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই ভালো হয়। মস্ত বড়ো দায়িত্ব দিলাম তোমাকে মনে থাকে যেন।

মাঝারি গোছের একটা প্যাকেট অনিরুদ্ধকে ছ্যায় প্রদোষ।

—মলয়া কেমন আছে, তেম্নিই ? ওর ভাগ্যটাই ঐ রকম ! কী আর করবে বলো ? কিছু মনে কোরোনা ভাই। অনেক কথা জিগেস করার কিন্তু সময় নেই। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে।

এরপর প্রদোষের ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেলো একটা বিস্ময়ের ঝড় তুলে।

মুহূর্তখানেক ভেবে ঠিক ক'রে নিলো অনিরুদ্ধ তারপর একটা ট্যাক্সিতে সেও চ'ড়ে বসলো। এটা যতক্ষণ না বিরূপাক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। তাতে যদি তাকে আজ এখানেই থেকে যেতে হয়—হ'বে। ব্যারাকপুরের বাসায় ফিরে আজ রাত্রে কী আর এমন মহৎ কাজটা করতো ? মলয়ার সেবা তো ? তাই তো সে ক'রে এসেছে এতগুলো বছর ধ'রে, কিন্তু তাতে হ'য়েছে কী ? সুযোগ এসেছে যখন এবার একটু নাহয় সত্যিকারের মহৎ কিছু কাজ ক'রেই ফেললো—দেশের কাজ, দশের কাজ। প্রদোষ অনুরোধ করেছে যখন সে-অনুরোধ ঠেলবার সাধ্য কোথায় পাবে সে ? একেবারে শেষ ট্রেন ধ'রে ব্যারাকপুরে ফিরলেই চলবে।

বিরূপাক্ষ হঠাৎ অনিরুদ্ধকে দেখে বড়ো বিস্মিত হ'লো। আরো বেশি ক'রে

বিস্মিত হ'লো এত রাত্রে প্রদোষের সংবাদবাহক হ'য়ে এসেছে এই জন্মে। সতী তখনো বাসবীদের বাড়ি থেকে ফেরেনি। বিরু একবার অনিরুদ্ধকে বললো—ব্যারাকপুর যেতে তো অনেক রাত হ'য়ে যাবে আজকের রাতটা নাহয় এখানে কাটিয়েই যা।

অনিরুদ্ধ বলে—তা কী ক'রে হয় বিরুদা? মলয়া ভাববে, তা ছাড়া ওর তদারকেই তো আমার দিন কাটে। ওর কাছ থেকে দু'দণ্ড নড়লে চলেনা।

বিরূপাক্ষ বলে—ব্যারাকপুরে আর ক'দিন আছিস্ তোরা?

—মসুরীতে একটা বাড়ি ঠিক করার চেষ্টা হ'চ্ছে, দু'একদিনের মধ্যে ঠিক হ'য়েও যাবে আশা করা যায়। অপেক্ষা করছি চিঠি এলেই রওনা হ'বো। যে-ক'দিন চিঠি না আসছে সে ক'দিনই আছি।

—ওখানে কোনো কষ্ট হচ্ছেনা তো তোদের? আমি মনে ক'রেছিলাম কলকাতায় এলে তোরা আমার এখানেই উঠবি। যাক ব'লে রাখলাম ওখানে তোদের কিছু অসুবিধা হ'লে আমার এখানেই চ'লে আসিস্।

—আচ্ছা, আর দেরি করবোনা বিরুদা, তাহ'লে চলি।...বিদায় নেবার জন্মে ব্যস্ত অনিরুদ্ধ।

বিরূপাক্ষ বললো—যাবেই যখন, তখন আর আটকাবোনা, আমার মোটরটা নিয়ে যাও। নইলে কষ্ট পাবে এই রাত্রে। নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতাম সেইসঙ্গে বোনটিকেও একবার দেখে আসা হ'তো—কিন্তু ..

—না, না, বিরুদা এখন কাজ নেই তোমার গিয়ে...সবে অসুখ থেকে উঠেছো।

—তাহোক দু'একদিনের মধ্যেই যাবো তোমাদের ওখানে, বোলো মলয়াকে।

ভাগ্যক্রমে সেরাত্রে বিরূপাক্ষের ড্রাইভারটা হাজির ছিলো তাই বিরূপাক্ষের মোটর ক'রেই অনিরুদ্ধ তার ব্যারাকপুরের বাসায় ফিরে আসতে পারলো। তখনো রাত বেশি হয়নি। বহু বছরের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলো ঘণ্টা মলয়ার কাছ ছাড়া হ'য়ে থাকা অনিরুদ্ধের এই প্রথম। এতক্ষণ কেমন একটা মুক্তির হাওয়ায় শরীরটা অনিরুদ্ধের বেশ লঘু মনে হচ্ছিলো। ফিরে আসার সঙ্গেসঙ্গেই আবার আগের মতোই বিস্বাদ হ'য়ে গেলো মনটা। মুক্তির স্বাদ এতদিন ভুলেই ছিলো সে। ভাবতো জীবনটাই বুঝি এম্নি দুঃসহ, আশাভরসাহীন, নিরানন্দ ও বিরক্তিকর। কিন্তু মাত্র দু'দণ্ডের ছুটি পেয়েই সে দেখে এসেছে—এর বাইরে আজো জগৎ আছে, এর বাইরেও জীবন আছে যার জন্য মানুষ এখনো বাঁচতে চায়, যার জন্য মানুষের বেঁচে থাকা সার্থক হয়। ব্যাধির বিভীষিকা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা—এ-সব ছাড়াও এমন অনেক কিছুই আছে যার জন্য মোটের ওপর জীবনটাকে বলা যায় উপভোগ্য।

কাপড়-জামা ছাড়ার আগেই অনিরুদ্ধ মলয়ার টেম্পারেচারটা একবার দেখে নিলো। আজ আবার সামান্য জ্বর উঠেছে ওর।

কাপড়-জামা ছেড়ে এসে সে যখন বসলো চেয়ারটা টেনে জান্‌লার ধারটিতে, মলয়া বললো—ত্থাখো, বলতে মনে নেই, তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে—আছে ঐ টেবিলে।

অনিরুদ্ধ টেবিল থেকে খামখানা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। পত্রে সংবাদ এসেছে মস্থরীতে বাড়িটা ঠিক হ'য়ে গেছে। এখন মলয়াকে নিয়ে যাত্রা করার অপেক্ষা!

চিঠিটা আত্মোপান্ত প'ড়ে ফের খামে ভ'রে রেখে দিলো অনিরুদ্ধ।

মলয়া জিগেস করলো—কোত্থেকে এলো?

—মস্থরী থেকে। বাড়ি ঠিক হ'য়ে গেছে। চলো কালই যাত্রা করা যাক্।

—কালকেই?

—হ্যাঁ, ক্ষতি কী? শরীর তোমার এখানে ভালো থাকছেনা যখন দেরি ক'রেই বা লাভ কী?

—কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে উঠতে পারবে?

—পারবো।

—তবে তাই হোক।

পরদিনই মস্থরী যাত্রা করা ঠিক হ'য়ে যায় ওদের।

মলয়াকে দেখতে বাসবী হয়তো শিগ্‌গিরই একদিন এসে পড়বে—একথা নিশ্চিত। কিন্তু পাবে কি মলয়াকে? মলয়া তো তখন থাকবে প্রায় হাজার মাইল দূরে। কথাটা ভাবতেও যেন দিব্যি একটি আশ্বাসে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। বাসবীর সঙ্গে মলয়ার দেখা হোক্ অনিরুদ্ধ এটা অন্তর থেকে চায়নি কোনোদিন, বরং বরাবর এড়িয়েই এসেছে। তাই কালকেই রওনা হওয়ার কথায় যেন আশাতীত স্বস্তি খুঁজে পেলো সে।

অনিরুদ্ধ সেদিন সভাস্থল ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়ার পর সতী ও শারীর সঙ্গে বাসবী এসে মিললো। তিন জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলো যে-টাকাটা অদ্রীশকে দেওয়ার জন্য পৃথক্ ক'রে রাখা হ'য়েছে সেটা অদ্রীশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হোক্। শারী বললো—এবার কিন্তু আমি আর যেতে পারবোনা বাবা, যে মানুষ উনি—ওঁর সঙ্গে কথা কওয়াই দুষ্কর। সতীদির ইচ্ছে হয় যাবে। নাহয় একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাঠিও, প্রণতিদির নামে একটা চিঠি দিও সঙ্গে।

বল্লরী সেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সে জিগেস করলো—কেন, অদ্রীশবাবু বুঝি বড়ো দুর্মুখ ?

প্যান্সি ফোড়ন কাটলো—দুর্মুখ কী গো প্রায় অভদ্রই বলা চলে।

ওদের এই রকম মন্তব্যে বাসবী আপত্তি তোলে।

সতীও বাসবীকেই সমর্থন ক'রে বলে—অভদ্র কেন হ'তে যাবেন ? দুর্মুখই বা কোথা ? কথাই তো বলেন খুব কম। শুধুই শুনে যান। ওঁর মন্তব্যগুলো হয়তো অনেক সময়ে রূঢ় মনে হ'তে পারে কিন্তু ঐ রকমই উনি। এমন খাঁটি লোক আর দেখিনি।

শারী হেসে বলে—বেশ তো, এবার তাহ'লে সতীদি যাবেন।

সতী বলে—তা তোমরা কেউই যদি না যেতে চাও তো অগত্যা আমাকেই পাঠিও।

শারী বলে—সেই ভালো। আপনিই যান বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে, তাহ'লে আমি বেঁচে যাই। কী জানি, ও-রকম লোকের সঙ্গে কথা কইতে আমার বড়ো ভয় করে। যদিও খুব কম কথা বলেন, এবং প্রশ্ন করলেও বড়ো একটা উত্তর পাওয়া যায়না, তবু··· ! এত গম্ভীর, এত অন্যমনস্ক, যেন দেয়াল। দেয়ালও নয় ঠিক কারণ কই দেয়ালের সামনে তো ভয় বা লজ্জা—এসব কোনোকিছুই আসেনা। ওঁর সাম্‌নে কিন্তু সমীহ হয়।

—সে তো হয়ই। ওটাই ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ববানের সামনে মেয়েদের চাপল্য ও ভাবেই শিষ্ট হ'য়ে থাকে। একবার ভাবো তো কতোদূর অভাবগ্রস্ত উনি—তবু কিন্তু ওঁর টাকা সম্বন্ধে কোনো লোভ নেই কিংবা মেয়েমানুষ সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা নেই—একি সামান্য কথা ? ওঁকে অভদ্র তুমি ভাবতে পারোনা প্যান্সি, ছিঃ, মেকি সৌজন্যে এতটাই আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি যে ওঁকেও আমরা অভদ্র মনে করি—এটা নিশ্চয়ই আমাদের কুশিক্ষা। সমর্থন পাবার আশায় সতী বাসবীর দিকে চেয়ে তার কথাগুলো শেষ্‌ করলো।

বাসবীও সতীর বক্তব্যে যোগ করলো—ঠিক বলেছো সতী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখে ক্রমাগত কৃত্রিম হাসি টেনে-টেনে বৈঠকী আলাপ আনায়াসে চালিয়ে যেতে পারেন যাঁরা, মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই অকারণ সৌজন্যে বিগলিত হ'য়ে পড়েন যাঁরা, তাঁদের থেকে পৃথক্‌ উনি।

শারী ব'লে ওঠে—তুমি বুঝি জানোনা বৌদি ? তোমায় সেদিন খুলে বলা হয়নি ব্যাপারটা। সেদিন রাত্রে সতীদিকে নিয়ে যখন গেলাম তখন ভাগ্যক্রমে অদ্রীশবাবুকে বাড়িতেই পেলাম। উনি লিখছিলেন। আমরা যা কিছু বললাম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সব শুনে গেলেন। তারপর হঠাৎ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে

ব'লে উঠলেন—'জলোৎসব? মেয়েরা করবে? বেশ তো। এর মধ্যে আমায় আর কেন? টাকা দেবে? আমায়? কেন? পুরস্কার? কিসের প্রাইজ? সাঁতারের? কিন্তু আমি আমি তো সাঁতার জানিনে।'…যাই বলুন সতীদির বাহাদুরী আছে বলতে হ'বে—এই রকম চোখা-চোখা শ্লেষের পরও ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো। আমি তো আর একটিও কথা কইনি। তখনই বোঝা উচিত ছিলো যে এ-সবের মধ্যে উনি আসবেননা।

যাক্ অনেক আলোচনা ও পরামর্শের পর ঠিক হয় যে, সতী আর বাসবী যাবে প্রণতির ওখানে।

বাসবী বলে—তাহ'লে আজই টাকাটা পেঁাছে দেওয়া যাক্, কী বলো? রাত এখনো বেশি হয়নি—ন'টা বাজেনি।

সতী বলে—তাই হোক।

সতী ও শারী সেই রাত্রেই পেঁাছে দিয়ে আসে টাকাটা অদ্রীশের ওখানে। অদ্রীশ তখনো বাড়ি ফেরেনি। প্রণতির হাতেই দিয়ে এলো ওরা। শুনে বাসবী বললো—যাক্, এ ভালোই হ'লো, তিনি উপস্থিত থাকলে নিতেন কি না নিতেন; কি কী বলতেন।

সতীও সায় দিলো বাসবীর কথায় বললো—নিশ্চয়, ভালো হ'য়েছে বৈকি।

মরু-ধাঁধাঁনো চক্ষে এলো ওয়েসিসের প্রান্ত

হঠাৎ আজ গান গেয়ে ওঠে প্রণতির মন। ঐ ওদের জগৎ—প্রাসাদ-মিনারের জগৎ। কতো উঁচুতে কোন উর্ধ্বতর স্তরে—এতদিন চোখ তুলে দেখে এসেছে ও। কোথায় ওরা আর কোথায় সে ? কিন্তু প্রাসাদ-মিনার-গম্বুজের শিখর থেকে তাকে এবারে আর ডাকছেনা ওরা, ওরাও নেমে এসেছে মাটিতে। অসামান্য বিনয় নিয়েই ওরা আজ এসেছে তার দ্বারে—এই বিনয়কে অপমান দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি ? অভাবের তাড়া খেয়ে দুঃখের রৌদ্রে ছুটে ছুটে প্রণতি প্রায় অবসন্ন হ'য়ে আসছে এমন সময়ে এসে ডাকলো ওরা। তাকে ডাকছে বিনয় দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সৌজন্য দিয়ে করছে আমন্ত্রণ, বলছে—এসো, ধন্য করো। তাই ধন্য হ'য়ে গেছে প্রণতি। ওদের এই ডাকে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি। ঊষর তপ্ত বালুপথে ওরা আনলো ছায়া—ছায়ার প্রবাহ—এই প্রসন্ন ছায়ার প্রবাহে অবগাহন ক'রে ধন্য হ'লো মরুযাত্রী। টাকার তোড়াটা সে আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখলো।

টাকাটা তুলে রেখে কী-যেন-ভেবে সে একটা ভালো শাড়ি বের ক'রে ফেললো। বিকেলের রান্নাবান্না, প্রদীপকে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে এতক্ষণ সে ব্যস্ত ছিলো তাই আজ তার কাপড়-কাচা, গা-ধোয়া এখনো সারা হয়নি। হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো—ইস্, রাত হ'য়ে গেছে যে! তাহোক কলতলাটা এখন বেশ অন্ধকার হ'য়েছে—ভিড় নেই। রঙের মিস্ত্রিগুলোর জন্যে তার এখানে কাপড় কাচতে আসাই হ'য়ে ওঠেনা অর্ধেক দিন।

ওদের মাট-কোঠার একতলাটার খানিকটা অংশে রঙের কারখানা—অর্থাৎ তাঁবু ত্রিপাল প্রভৃতি জিনিশ রং করা হয়। আর খানিকটায় ছেঁড়া কাগজের গুদাম। গুদামটা অন্য সময়ে বন্ধই থাকে, সকালে একবার ঠিকাদার আসে, লোক-লস্কর নিয়ে এসে গুদাম খোলে। সে বরং ভালো। কতোক্ষণেরই বা মামলা। কিন্তু এই রং-গুদামের মিস্ত্রিগুলোর সঙ্গে দিনরাত গুঁতো গুঁতি করতে হয় কল নিয়ে, পায়খানা নিয়ে—সেটা আর সহ্য হয়না। প্রণতি সদ্য-বের-করা শাড়িখানা ও সাবানের কৌটোটা নিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে।

আঃ! চৌবাচ্চার জল ঠাণ্ডা মনে হ'চ্ছে কতো! মগের পর মগ জল ঢেলে চলে প্রণতি···নিঃশব্দ অন্ধকার আর নিঃসঙ্কোচ—গায়ের কাপড় ভেসে যায় জলস্রোতে। সারাদিনের ক্লান্তির পর স্নানের খানিক সময়—এর মূল্য অনেক। নিঃশব্দ, নিঃসঙ্কোচ অন্ধকার শঙ্কিত, সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে কার কণ্ঠস্বরে!

—এ দুলারী নলমে পানী আভি হ্যায় কি নেঁহী দেখ্ কর্ বোলো তো জরা। বলতে বলতে কে যেন একেবারে কলঘরের মধ্যেই ঢুকে আসছিলো।

—কে? কে? কে? প্রণতি প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে।

—আরে ব্বাপ্! প্রবিষ্টপ্রায় লোকটি পিছু হটতে থাকে, বেরিয়ে যেতে যেতে নিজমনেই বলতে থাকে—হাম সোচা কি দুলারী হোগী···কলঘরে ঢুকেপড়ার দিব্যি বিশ্বাসযোগ্য একটা অছিলা ইতিমধ্যে বানানো হ'য়ে গেছে তার! তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে যে অপেক্ষারত ছিলো সম্ভবত তাকেই লক্ষ্য ক'রে বলে—ইধার কাঁহা যাতে হো ইয়ার···পিঞ্জরমে চিড়িয়া বা। হটো—হট্ যাও। তাদের মধ্যে অশিষ্ট হাসাহাসি হয়—কানে আসে প্রণতির। বড়ো বিরক্তি বোধ করে সে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে নেয়। কলঘর থেকে বেরোবার সময়ে ধাক্কাধাক্কি হ'য়ে যাবার মতো হয় আর কি! দিন নেই, রাত নেই বস্তির এই একটি আব্রুদার কলঘরের বাইরে সর্বদাই লোটাধারীর লাইন লেগে আছে।

কলঘর থেকে বেরিয়ে প্রণতি যেম্নি কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে গেলো অম্নি লোকটা আবার সেদিনকার মতোই অশিষ্ট ভঙ্গিতে গান ধরলো—ও-ও-ও চলে নেঁহী যানা···আঁখিয়া মিলাকে···ইত্যাদি।

যদিও অসহ্য তবু এই অসহ্য সইবার ধৈর্যও যেন আজ পেয়েছে প্রণতি। সে আর ওদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনা। আর্‌শির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ায়, চুলটাও আজ বাঁধা হয়নি, প্রায়ই তো হয়না—সময় কোথা! প্রণতির আজ চুলটা বেঁধে নিতে ইচ্ছে যায়। রাত হ'য়ে গেছে বটে, তাহোক! রাত্রে চুল বাঁধতে দেখলে পিসীমা বকেন। হোক্‌গে আজ সে চুল বাঁধবেই। কী হয় রাত্রে চুল বাঁধলে? ও-সব বাজে কথা।

সে তাড়াতাড়ি চুল বাঁধা সেরে নেয়। অদ্রি এখুনি এসে পড়বে ভাবতে ভাবতে সত্যই অদ্রির জুতোর শব্দ হয় কাঠের সিঁড়িতে। শোনামাত্রই প্রণতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আজ তার কেমন যেন মায়া হ'লো স্বামীকে দেখে—এক মাথা উস্কখুস্ক চুল, ক্লান্ত, ম্লান চেহারা—কোথায় যে টোটো ক'রে ঘোরে কে জানে!

—শরীর ভালো আছে তো? বড়ো যে শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে··প্রণতি অদ্রির গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা ক'রে বলে—না, কই গা গরম তো মনে হয়না। আর হ'লেই বা আশ্চর্যের কী আছে? ঠিক সময়ে নাওয়া-খাওয়া নেই, রাত্তিরে ঘুম নেই, শরীরে আর কতো সয়? আজ তিন রাত্তির ঘুমোওনি। এখুনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে একেবারে শুয়ে পড়ো। হাত-পা-মুখ ধুয়ে এসোগে, দেরি কোরোনা।

প্রণতির এই অপ্রত্যাশিত সদয় ব্যবহারে অদ্রীশ বিস্মিত হয়।

সে মুখ-হাত-পা ধুয়ে এলে পর প্রণতি তাকে খাবারটা দ্যায় তারপর পাশে ব'সে

একটা পাখা নিয়ে বাতাস সুরু ক'রে ছায়। তাতে অদ্রীশ মনে মনে আরো বেশি ক'রে অবাক্ হয়। হয়তো ভাবে, একি, হঠাৎ যে তার আজ এত বেশি যত্ন? কিন্তু সে-সম্পর্কে মুখে কিছু মন্তব্য করেনা, মাত্র বলে—এখন পাখা করার দরকার হ'বেনা, নতি।

প্রণতি তবু থামেনা, বলে—তাহোক গরমটা বেশ পড়েছে।

অদ্রীশ আর কিছু বলেনা, নিঃশব্দে মুখে গ্রাস তোলে।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে প্রণতি এবার কথাটা পাড়লো, বললো—তুমি আজ গিয়েছিলে নাকি সংবর্ধনা-সভাটায়? ঐ যে মেয়েরা মিলে যেটা করেছে সাগ্নিক-বাবুদের বাড়িতে। কাল কতোবার এলো, কতো ক'রে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেলো।

—না, যাইনি, যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। ওটা তো কোনো লেখাপড়ার ব্যাপার নয়, ওটা সাঁতারের ব্যাপার। সাঁতার জানতাম তো নাহয় যেতাম, সাঁতারই যখন জানিনা তখন ওখানে গিয়ে কী করবো?

—সে জানি; ওরা যে আবার এসেছিলো খানিক আগে, ব'লে গেলো তুমি নাকি যাওনি ওদের ওখানে। তোমাকে উপহার দেবার জন্যে যে-টাকাটা রাখা হ'য়েছিলো সেটা ওরা বাড়ি ব'য়ে পেঁ ছে দিয়ে গেলো—এমনই ভদ্র! বিকেল থেকে কতোবার গাড়ি এলো তোমায় নিয়ে যেতে।···দিন বুঝে এবং গরজ বুঝে তুমিও অম্নি গা ঢাকা দিয়েছিলে, না? একবার ব'লে দিলাম মিলন-চক্রে যেতে সেখানে ওরা তোমাকে না পেয়ে আবার ফিরে এলো। গিয়েছিলে কোথায় আজ?

—আর একটা খবরের কাগজের অফিসে ছিলাম। সেখানে সন্ধ্যের দিকেই কাজ।

—যাক্ তবু ভাগ্য ভালো। জুটে গেলো একটা এরি মধ্যে? কিন্তু তোমার কাছে জুটলেই বা কী ছেড়ে তো দেবেই যখন দু'চারদিন পরে··মাইনে কতো? ওখানে যা পেতে তা-ই?

—না; তার চেয়ে কিছু কম তবে খাটুনিও অনেক কম।···তারপর ওখান থেকে গিয়েছিলাম একবার পাব্লিশারের কাছেও। জানো? আমার আগের বইয়ের একটা নতুন এডিশন বের করছে ওরা।

—কতো দেবে?

—যা ছায় দেবে। ও-সব কথা আমি কিছু কইনি তাদের সঙ্গে।

—সে জানি। বেশ করেছো। এমন নাহ'লে তোমার বুদ্ধি!

আবার কথায় কথায় প্রণতি বাসবীর ও শারীর গুণ-কীর্তন শুরু ক'রে দিলো।

খানিকক্ষণ শুনে-শুনে অদ্রি ব'লে ওঠে—টাকাটা তাহ'লে তুমি নিলে?

—ও-রকম ক'রে দিলে আবার 'না' বলা যায় নাকি?

আর কোনো কথা না ব'লে অদ্রীশ খাওয়া শেষ ক'রে উঠে গেলো। সময়ে সময়ে কেমন যেন একটা হেঁয়ালির মতো তার মনে হয় স্বামীকে, ভাবে কেনই বা সাগ্রহে নিলোনা বাসবীদের নিমন্ত্রণ, কেনই বা গেলোনা ওদের বাড়ি আর কেনই বা এত বিরক্তি, এত অনিচ্ছা ওদের কাছ থেকে উপহার নিতে (হ'লোই বা তা টাকা)! যারা ওর প্রকৃতই ভক্ত, যারা ওর প্রতিভার সম্মানমূল্য ওকে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলো তাদের উপহার প্রত্যাখ্যান করতে পারে ও? কেন? কিন্তু এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আর কোনো কথা কইতে তার ইচ্ছা করলোনা। সে এই বিষয়টার আর উত্থাপন করবেনা মনে করেছে। অদ্ভুত এই মানুষটা—এর মনের হদিস্ কি আর কোনোদিনও পাবেনা প্রণতি?

অদ্রীশ আঁচিয়ে এলে পর প্রণতি বলে—আজ ঘুমের বড়িটা খেয়ে শুয়ে পড়োগে, আর রাত জেগোনা। দেখো শরীরটা পরিষ্কার বোধ করবে কাল।

অদ্রীশ সায় দিলো প্রণতির কথায়, বললো—এম্নিতেই বড়ো ঘুম পাচ্ছে এখন।

প্রণতি বললো—তবে শোওগে। আমি আসছি হেঁসেল তুলে।

এইবার কবিতা ঘুমায়

আলোটা কমিয়ে দিয়ে অদ্রীশ বিছানায় আসে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা নয় বটে তবু প্রণতির প্রাণান্ত চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন।—চোখ তখন তার ঘুমে জড়িয়ে আসছে। দেহ, মন ক্লান্ত। তাদের পাশেই ভাড়াটেদের নতুন বধূ শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াচ্ছে, তার গলার মিহি স্বর শোনা যায়—ঘুম আসছে, ঘুম আসছে, গাছের পাতায় রাত···

শুনতে শুনতে তারও ঘুম আসছে—ঘুমের প্রচ্ছদ, ঘুমের অনুচ্ছেদ তার মধ্যে আবিষ্ট নিবিষ্ট হ'য়ে আসে তার আত্মিক সত্তা রূপকথার গল্পের মতো।

প্রজাপতির মতো ঘুম আসছে সুদূর হাওয়ায় তরঙ্গ তুলে। বিস্মৃতির কোন সুদূর দিগন্ত থেকে ঘুমের প্রজাপতি উড়ে আসছে—তার লক্ষ্য অদ্রির চক্ষু—ঘুমের নীড়ের মতো যা ঘন হ'য়ে থাকে—অদ্ভুত ফুলের মতো যা ফুটে থাকে। রঙের রেণু-ভরা ডানা দুটি তার আলস্য-মন্থর, ধীরে ধীরে নড়ে। পাৎলা পাখার হাল্কা অলস ব্যজন···মাথার মধ্যে কেমন যেন মোহের ঢেউ তোলে, হাই ওঠে, চোখ জড়িয়ে আসে। পাখা থেকে পরাগ ঝরে ঝুর ঝুর—সে রঙের ধুলোয় আদিগন্ত জ্যোৎস্না হ'য়ে ওঠে রঙিন, অনির্বচনীয় চেতনা! ঘুমের প্রজাপতি কাছে আসে, আরো, আরো কাছে। ষট্‌পদে অজ্ঞাত দিগন্ত থেকে সে যেন জড়িয়ে নিয়ে আসে, গুটিয়ে নিয়ে আসে কালো মসৃলিন, টেনে ছায় সর্বাঙ্গে, সর্বানুভূতির ওপর, নেশার মতো আবেশ আসে। এই মিহি অন্ধকারের চাদর, এই সূক্ষ্ম অন্ধকারের চাদর, এই দিগন্তজোড়া কালো মসৃলিনের যবনিকা ঢেকে দেবে চেতনা অনির্বচনীয় জড়িমায়, মধুর ক্লান্তিতে, নিষ্কলুষ বিস্মৃতিতে!

ঐ আসে···আসে···আসে···সেই রেশমী প্রজাপতি দিগ্বিদিক্ ব্যাপ্ত ক'রে, সুপ্ত ক'রে, স্বপ্নের রং নিয়ে আসে পাখায় ভ'রে—মুখের খুব কাছে এসে ঘুরতে থাকে, চুম্বন খোঁজে ওর মুখে—সুরভি পাখার বাতাস লাগে অদ্রির কপালে, গালে—পাখা থেকে পরাগ ঝরে অদ্রির মুখে পাউডারের মতো। প্রজাপতি এসে বসে ওর ভ্রূসন্ধিতে—ওর নাকের ওপর প্রলম্বিত হ'য়ে থাকে তার দেহ। দু'টি বিচিত্র পাখা মেলে ঢেকে ছায় অদ্রির দুই চোখ।

এই দু'টি আবরক বিচিত্র পাখা—ঐ কালো মসৃলিন—স্বভাবের এই অভিনন্দিত স্নেহ—আলস্যের কাছে এই আত্মসমর্পণ—এই বিরাম, এই বুঝি ঘুম? মরণের মনোজ্ঞ দোসর।

ওর উন্মন চিন্তাকাশ গুটিয়ে ছোটো হ'য়ে আসে, আনত হ'য়ে আসে, সঙ্কুচিত

হ'য়ে আসে, ঝিমিয়ে আসে, স্তিমিত হ'য়ে আসে। মনের আকাশে জ্যোৎস্নার ঢল নামে, স্বপ্নের চাঁদ ওঠে, মুছে দ্যায় জাগৃতির পঙ্কিলতা, বাস্তবের গ্লানি, অন্ধকার। সেই জ্যোৎস্নায় অদ্রির চোখ দু'টি যেন দু'টি ফুল, ফুটে রয়েছে ঐ সুপ্তি-প্রজাপতির মুখ চেয়ে!

অদ্রি ঘুমোয়—এই ঘুমে স্বপ্ন দ্যাখে—সে কী ক'রে যেন গিয়ে পড়েছে রূপ-কথার চির-ঘুমের রাজ্যে—সুন্দরের মাঝে একটুখানি কলঙ্কের দাগের মতো। অদ্ভুত সে এক অসূর্যম্পশ্য দেশ—অদ্ভুত মিনার, গম্বুজ ও স্তম্ভের সারি গিয়েছে চ'লে···বিরাট চাঁদনী···বারান্দার তলায় জল···অট্টালিকার প্রাঙ্গণ দিয়ে তর্ তর্ ক'রে চলেছে আশ্চর্য সুন্দর এক স্বর্গ-নদী। অনেকটা নাহার-ই-বিহিস্তের মতো সেই স্বর্গীয় জলস্রোত বাঁধা রয়েছে মর্মর-শাসনে—দু'টি তীরেই ধাপের পর ধাপ—মর্মর-পৈঠাগুলি নেমে গেছে স্বচ্ছ জলের অভ্যন্তরে, এই সোপানশ্রেণী রচনা করেছে এই নির্মল স্রোতস্বতীর দু'টি তীর।

প্রাসাদের মধ্য দিয়ে ছায়াক্রান্ত অল্প স্রোত বইছে ঝির্‌ঝির্···হাওয়ায় জ্যোৎস্নার রং··কালো মায়া জলে···মাঝে মাঝে এপার-ওপার-জোড়া সাঁকো—তারই অদ্ভুত কারুকৃত খিলানগুলির তলা দিয়ে স্রোত বইছে গানের মতো, অদ্ভুত স্থাপত্য! ঘুমন্ত-পুরী গভীর হ'য়েছে নৈঃশব্দ্যে। শাদা জ্যোৎস্না-রঙের ময়ূরপঙ্খী ভাসছে সেই জলে উদ্ভিন্ন শতদলের মতো। ময়ূরপঙ্খী চলেছে মন্থর গতিতে—খিলানের পর খিলান পার হ'য়ে। স্থানে স্থানে মুক্ত স্রোত—স্থানে স্থানে ঢাকা পড়েছে জল চিত্রিত ছাদের তলায়। কিছুদূর অন্তর একটি ক'রে সাঁকো—এই রকম কতো সাঁকো পার হ'য়ে, কতো খিলানের তলা দিয়ে কোথায় চলেছে ময়ূরপঙ্খী! প্রত্যেকটি সাঁকোর ওপর প্রেক্ষাকক্ষ—ওখান থেকেই রাজকন্যে ঘুমকুমারী জ্যোৎস্না দেখেন জড়িত চোখে, জল দেখেন তরল চোখে। অসূর্যম্পশ্যা রাজকন্যার এইখানেই হয় নৌকা-বিহার তাই ঢেকে ফেলা হ'য়েছে এই নদীকে ছাদের ছায়ায়।

··এই রকম জায়গায় অদ্রি কী ক'রে যেন ঢুকে পড়েছে তার রং-চটা নৌকোটা নিয়ে। মাঝির চোখেও ঘুম সংক্রামিত হ'য়েছে—মাঝি ঢুলছে—নৌকো টলছে। অদূরে ঘুমকন্যের বজরা—প্রায় সম্মুখীন—একটা দুর্বোধ্য চুম্বকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অদ্রীশের নৌকোটা—সুপ্তির শিথিলতায় মাঝির হাত থেকে হাল আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। সংঘর্ষ হয় রাজকন্যে ঘুমকুমারীর বজরার সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের। বান্‌চাল হ'য়ে যায় অদ্রির নৌকো। মজ্জমান অদ্রি প্রাণপণে হাত ছোঁড়ে একটা অবলম্বনের জন্য। উৎক্ষিপ্ত হাতে সুন্দরকে পেতে চায় অসুন্দর।

নিমজ্জমান অদ্রির কণ্ঠে মিনতি ফোটে—রাজকন্যে একটুখানি হাতটি যদি বাড়াও!

মন্দিরেক্ষণা মুখ বাড়িয়ে বলেন—ঘুম পেয়েছে আগে একটু ঘুমিয়ে নিই দাঁড়াও।

অদ্রি তলিয়ে যেতে থাকে—শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে--জল, সুধু জল। কোথাও আর কিছু নেই, খেয়া নেই, পার নেই, খুঁজে পাওয়া যায়না ঘুমকুমারীর বজরা, তবে সমুদ্দুরে এসে পড়লো নাকি সে? নিজের রং-চটা নৌকোটাই বা কোথা গেছে ভেসে?—কই বা গেল সুন্দর কন্যা মন পবনের না?

এমন সময়ে উপর্য্যুপরি কয়েকটা প্রবল ঠেলায় অদ্রির ঘুম ভেঙে যায়। প্রণতি তখন ওকে প্রাণপণে ঝাঁকানি দিচ্ছিলো, ঠেলছিলো, বলছিলো—ওঠো শিগ্‌গির; সর্বনাশ হ'য়েছে, আগুন লেগেছে ঘরে।

প্রণতির ডাকে একবার সাড়া দিয়ে অদ্রি আবার চোখ বুজোয়, ওষুধের ঘুম তখনো তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো, বললো—উঁঃ, আগুন আবার কোথায়? জল, সুধু জল!

স্বপ্নের অগাধ জলে সে তখন তলিয়ে যাচ্ছিলো।

প্রণতি এবার সজোরে হাত ধ'রে টেনে তুলে বসিয়ে ছায় অদ্রিকে, বলে—সর্বনাশ হ'য়েছে, আগুন লেগেছে ঘরে, ওঠো, শিগগির ওঠো। চেয়ে ছাখো, ঘর ভ'রে গেছে ধোঁয়ায়। পালিয়ে যাও, এখনো পালিয়ে যাও এখান থেকে।

অদ্রি এবার চোখ রগড়ে চায়, ছাখে সত্যই ধোঁয়া, বলে—কোথায় লাগলো আগুন?

প্রণতি বলে— রং গুদামেই নিশ্চয়। ঐ ছাখোনা ওদিককার কাঠের মেঝে ফুঁড়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে—এরই মধ্যে পুড়ে ফুটো হ'য়ে গেছে কতোটা?

—কতোক্ষণ লেগেছে?

—তা কী জানি। ধোঁয়ার গন্ধে গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেলো, জেগে দেখি এই ব্যাপার। খোকা রয়েছে ও-ঘরে, পিসীমা হয়তো দোর দিয়েই ঘুমিয়েছেন—যাই···প্রণতি প্রাণপণে ছুটে যায়, ডাকে—খোকা, খোকা! প্রদীপ! পিসীমা!···সজোরে দোরে ধাক্কা ছায়।

স্খলিত পায়ে অদ্রিও পেছন পেছন এসে বলে—তুমি কী করবে? তুমি যাও, আমি নিয়ে যাবো ওকে।

প্রণতি বিরক্ত হ'য়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বলে—না, না, তুমি যাও ঐ লেখার বাক্সটা নিয়ে বাইরে রাখোগে। খোকাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। দেরি

কোরোনা, দেখছোনা সমস্ত বারান্দাটা কী গম্‌গম্‌ ক'রে কাঁপছে! ওদিককার কড়িগুলো জ্বলতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

প্রণতির কথায় অদ্রির মনে পড়ে ঐ বাক্‌সটার কথা, যাতে তার জীবনের সমস্ত লেখা সঞ্চিত রয়েছে। ওটা যে তার স্বামীর কতোটা প্রিয় সেকথা প্রণতির অজ্ঞাত নয় ব'লেই সে এমন ক'রে ধোঁকা লাগিয়ে দিতে পারে অদ্রিকে এককথায়। এ সম্পদ্‌ যদি যায় বাঁচার কোনোই অর্থ থাকবেনা অদ্রির কাছে। একমুহূর্ত চিন্তান্বিত দেখা যায় তাকে। তারপর আর কোনো দ্বিধা করেনা—মুহূর্তে মুছে যায় প্রণতি ও প্রদীপের চিন্তা। সে ছোটে—ঘর থেকে বাক্‌সটাকে তুলে নিয়ে যখন ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে অদ্রি নেমে যায় তখন সিঁড়ি পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

বাক্‌সটাকে উঠোনের এক নিরাপদ কোণে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে থাকে, কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কই? প্রণতি প্রদীপকে নিয়ে আসেনা তবু! এবারে বিচলিত হ'য়ে পড়ে অদ্রি, ফের ছোটে বাড়ির ভেতর। আগুন ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে আরো অনেকটা—কাগজের গুদামটাও বেশ জ্ব'লে উঠেছে। কয়েকটা বিস্ফোরণ হয় রঙের গুদামে, আগুনের উত্তাপে রঙে-ভর্তি পিপেগুলো বোধহয় এক-এক ক'রে ফাটছে সশব্দে। বারান্দার কয়েকটা কড়ি আগে থেকেই জ্বলছিলো। এইবারে একটা দিক অবলম্বনহীন হ'য়ে পড়ায় একেবারে বিপজ্জনকভাবেই ঝুলে পড়েছে। ধোঁয়ায় দেখা যাচ্ছেনা কিছুই। দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটাও জ্বলছে। সে একবার চেষ্টা করতে যায়, অন্যসবাই এসে বাধা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, বলে—খেপেছেন মশাই?

সেখানে দাঁড়িয়েই সে চিৎকার করে—প্রণতি! প্রণতি!

ওপর থেকে এর সাড়া আসেনা বা এলেও শোনা যেতে পারেনা এই গোলমালের মধ্যে। বিমূঢ়ভাবে অদ্রীশ শুধু ভাবতে থাকে তার স্বপ্নে দেখা জল কোথায়। তারই একটুখানি পেলেও সে এখন পথ ক'রে ভেতরে ঢুকতে পারে, নিয়ে আসতে পারে ওদের। তলিয়ে যাবার মতো নয়—ভেসে যাবার মতো নয়—শুধু এক বাল্‌তি বা এক ঝলক, নাঃ, হলোনা! কিছুই নেই, কিছুই করার নেই। ওদের আনতে গিয়ে আত্মাহুতি দেবার মতো সুতীব্র প্রেরণাও যেন পায়না সে। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে থাকে ফিরে গিয়ে ব'সে পড়ে বাক্‌সটার পাশে, দম নেয়। ভাবে জল সে তো স্বপ্ন! জল কোথা? জল আছে চোখে কিন্তু তাতে কি এ-আগুন নিববে?

দূর থেকে ছাখে অদ্রি এই আগুনকে—কী বিরাট মহান্‌ লেলিহান শিখা পাবকের! নৃত্যরত জটাধরের উড্ডীন জটাজালের মতো বিস্ফুরিত শিখাজাল। এই বিশাল পূত সমারোহ দেখতে দেখতে একথা অদ্রির মনেও হয়না যে এই আগুনই তার সব

নিয়েছে। বরং সম্ভ্রম হয়। ভালোবাসার ধন বুঝি এর কাছে সঁপে দেওয়া যায়। আমাদের দেশে তাই বুঝি প্রিয়জনকে চিতায় তোলার ব্যবস্থা! তবে কেন সে পারলোনা নিজেকে এর কাছে সঁপে দিতে! তবে কি সে নিজেকে ভালো-বাসেনা? কিংবা কই পারলোনা তো এই লেখাগুলোকে ঐ পাবকের কাছে সঁপে দিতে? প্রণতি কিন্তু বলতো—তুমি ভালোবাসোনা কাউকেই নিজেকে ছাড়া। নিজেকে সব চেয়ে ভালোবাসো তারপর ভালোবাসো তোমার শিল্পকে। আমাকেও না এমন কি তোমার নিজের ছেলেকেও না।

হায় অভিমানিনী, আগুনের পায়ে ওর প্রণতি কি হ'লো শেষ? আর তার ছোট্টো প্রদীপ হয়তো ভাঙাঘর আলো ক'রে এখনো জ্বলছে!

তারপর অগ্নিনির্বাপক দল আসে দমকল সঙ্গে ক'রে তখন আগুনও প্রায় নিবে এসেছে এবং বিশেষ কিছু করার নেই।

তখন ভোর। পুলিস বিভাগ থেকে লোক আসে এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত করতে। বাসিন্দাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে জবানবন্দী নেওয়া হয়, রিপোর্ট লেখা হয়। ভাড়াটিয়াদের কেউ কেউ দেখিয়ে ছায়—এই যে, এই যে এখানে উনি।

তদন্তকার অদ্রির কাছে আসে, জিগেস করে—আপনি থাকতেন দোতলায়?

বিমর্ষমুখে অদ্রি বলে—হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে?

—হ্যাঁ।

নিজে তো বেশ বেরিয়ে এসেছেন। গায়ে তো কোথাও একটা ইন্‌জুরি-ও নেই দেখছি। চেষ্টাও করেননি বোধহয় ফ্যামিলিকে সেভ্ করবার?

অদ্রি নিরুত্তর থাকে।

তদন্তকার পকেট থেকে নোট-বই বের করে। জিগেস করে—মশাইয়ের নাম?

—অদ্রীশ।

—আঃ, পুরো নাম বলুন। মানে উপাধি-সুদ্ধ নাম··

—উপাধি? বাঁড়ুজ্যে বোস, বসাখ কিংবা মুখুজ্যে, মিত্তির, মাইতি কিংবা চাটুজ্যে, চক্কোত্তি, চামার—যা ইচ্ছে লিখে নিতে পারেন। নামের পিছনে উপাধি জোড়ার প্রয়োজন মনে করিনা।

—আপনি মনে না করতে পারেন দেশ-সুদ্ধ লোক এখনো করে যে। অনর্থক সময় নষ্ট করবেননা। আচ্ছা, আপনার বাপের উপাধিসুদ্ধ নামটাই বলুন নাহয়।

—বাবার উপাধি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে কী ক'রে তা এখন আপনাকে বলি বলুন।

—কী জাত ?

—জাত মানিনা।

—কী করা হয় ?

অদ্রি উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে তদন্তকার আরো চড়া স্বরে জিগেস করে—বলি, করেন কী ?

অদ্রি এবার তার সুচিন্তিত জবাব গ্যায়—সুধু নিজেকে ভালোবাসি।

—আপনি তো মহাপাগল লোক দেখছি।

সহকারীটি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারীকে পরামর্শ গ্যায়—রিমার্ক লিখে নিননা যে ভদ্রলোক পাগল, বিশেষ কিছু বলতে পারলেননা।

অদ্রি সত্যই যেন বর্তে গেলো। পুলিস কর্মচারীটি অদ্রীশের মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রমাণ-স্বরূপ কী সব রিমার্ক লিখতে লাগলেন, সে আর দ্বিরুক্তি করলোনা।

একটু বাদেই সকাল হ'লো। জীর্ণ পৃথিবীর পিঠে নতুন প্রভাত এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো তার মুখোমুখি হ'য়ে, হাতছানি দিলো তাকে। অদ্রীশ কী ক'রে অভ্যর্থিত করবে, অভিনন্দিত করবে এই দিনকে ভেবেই পায়না ; এই দিনটাকে সে ভালো ক'রে দেখতে থাকে সুধু। অবান্তর কোনো কিছুর প্রলোভন দিয়ে প্রলুব্ধ করতে আসেনি এই দিন—এ নিয়ে এসেছে অবাধ, নিষ্ঠুর স্বাধীনতা।—দায়িত্বের গুরুভার থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে তাকে এই দিন—এই দিন দিয়েছে তাকে পৃথুল পৃথীর প্রান্তরে প্রান্তরে অবারিত পথের নির্দেশ। এই দিন দিতে এসেছে তাকে অফুরন্ত অবসরের আশ্বাস, সীমাহীন সৃষ্টির অবকাশ।

অদ্রি তার লেখার বাক্সটা বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। তারপর অগ্নিজীর্ণ বস্তি ছেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় রাস্তায়, পথের জনতায় সে অনন্য একা।

গলি পার হ'য়ে বড়ো রাস্তায় পড়বে এমন সময়ে ছোটো একটি মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে মুঠো ক'রে ধরলো তার জামার আস্তিনটা—কাকাবাবু !

অদ্রি ফিরে গ্যাখে আরতি।

—প্রদীপ কোথায়, কাকাবাবু ? বাড়িতে আছে ? আমি যাচ্ছি যে।

অদ্রীশ জামার আস্তিনটা তার কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে—প্রদীপ ? নিবে গেছে। সকাল বেলা প্রদীপ খুঁজিস্ কিরে পাগলী ? যা, বাড়ি যা। পালা। দেখছিস্না, এখন সামনে সকাল ?

অদ্রির কথার কিছুই মর্মবোধ করতে পারেনা মেয়েটি। তার এই অপ্রকৃতিস্থ

উত্তরে এবং আচরণে সে থ ব'নে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু ইতস্তত ক'রে আরতি জিগেস করে—কোথায় যাচ্ছেন, বাজারে?

অদ্রি নঙর্থক ঘাড় নাড়ে, স্থধু দেখিয়ে ছায় সামনে; সূর্য আসে যে-পথে—সেই পথের দিকে।

অবুঝ মেয়েটি আব্দার ধরে—বা রে, আমরা এক জায়গায় যাবো যে আজ। প্রদীপ যাবে তো আমাদের সঙ্গে মরা সোসাইটি দেখতে? সবই ঠিক-ঠাক হ'য়ে আছে সেদিন থেকে। কাকীমা বলেছেন প্রদীপকে দেবেন আমাদের সঙ্গে যেতে। ও যাবে তো?

মাথা নেড়ে পূর্বের মতোই উদাস বিষণ্ণ স্বরে অদ্রি স্থধু বলে—সে আগেই গেছে।

অদ্রিকে আরতির আজ মনে হ'লো অব্যক্ত কোনো অমঙ্গলের প্রহেলিকার মতো। বিমূঢ়া বালিকা ধীরে ধীরে অদ্রীশকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলো। গিরীন-বাবুদের রোয়াক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকলো তার নাম ধ'রে।

কিন্তু দৃক্‌পাতও করলোনা অদ্রি। ভ্রূক্ষেপহীন পথিক চলে গন্তব্যহারা গতির তাড়নায় অনির্দিষ্টের নির্দেশে। তার জগতে আজকে শুধু আছে সে আর তার শিল্প, মাঝে কোনো অবাঞ্ছিত অন্তরায় নেই, যা আজ তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারে। পেছনের এমন কোনো টান, এমন কোনো বন্ধন, এমন কোনো কর্তব্যবোধ নেই যা তার এই অগ্রগতির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এই মুহূর্তে তার স্কন্ধে আর এমন কোনো গুরুভার নেই যা তাকে পথিমধ্যে ক্লান্ত ক'রে দিতে পারে। আজকের এই মহাহোমানলের পূত অগ্নিশিখা সব বাধা-অন্তরায় ভস্মসাৎ ক'রে দিয়েছে।

সামনে তার দিগন্তবিসর্পী পথ—সেই পথেই পা বাড়ায় সে। আত্মরতির সম্মোহ-মরীচিকা তাকে টেনে নিয়ে যায়। নার্সিসাস্‌ চলে।··নিজের প্রেমই উন্মাদ করেছে ওকে। আদর্শের নিথর জলে সে দেখেছে নিজের বিম্ব, তাকেই তার চাই—তাকেই তার পেতে হ'বে। তুচ্ছ হ'য়ে গেছে পরিবার, প্রণয়, সব কিছু।

দেখাই যাক্‌ এই আত্মবলি তাকে কতোটুকু সত্য দিতে পারে।

মেদ, সে তো সবই অমেধ্য পথধুলি

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো বিরূপাক্ষ সেদিন ব্যারাকপুরে মলয়াকে দেখতে গেলো। কিন্তু গিয়ে শুনলো তারা রওনা হ'য়ে গেছে গতকাল। ওখান থেকে ওদের ঠিকানাটা নিয়ে সে ফিরছে কলকাতায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ধাবমান বিরূপাক্ষের মোটরখানা হঠাৎ ব্রেকের শাসনে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে একটা দুর্ঘটনার প্রান্তে এসে থেমে পড়লো।

হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলো বিরূপাক্ষ। মোটরটা সে বেঁধেই ফেলেছিলো, তবু তারই একটা সামান্য ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো পথের মানুষটা। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো বিরূপাক্ষ। দেখা গেলো পথচারী আহত হয়নি, খালি তার বাক্সটি মোটরের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে মাত্র। এই পথচারীটি আর কেউ নয় আমাদের নব্য বাংলার একজন নামকরা লেখক অদ্রীশ চট্টোপাধ্যায়। একমাথা উস্কখুস্ক চুল, ধুলোয় ধুসর ; খালি পা ; পরনে ময়লা ধুতি ততোধিক ময়লা পাঞ্জাবী। সপ্তাহ-খানেকের দাড়িগোঁফ মুখে। মোটরের সঙ্গে সংঘাতের ফলে তার হাতের বাক্সটি খুলে গেছে, ভেতরের কাগজ-পত্র সব ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর।

বিরূপাক্ষ বলে—শেষ হ'য়েছিলে যে, আর একটু হ'লেই দিয়েছিলাম একেবারে, বেঁচে গেছো বড্ডো। ধ্যান করতে করতে চলছিলে নাকি ? অ্যাঁ ? এভাবে পথ হাঁটলে সমাধিলাভ করতে দেরি হ'বেনা।

অদ্রি ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে উঠে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেছে।

টোল-খাওয়া তোবড়ানো বাক্সটায় কাগজপত্র কুড়িয়ে তুলতে অদ্রির সাহায্যে বিরূপাক্ষও লেগে গেলো।

অদ্রীশকে জিগেস করলো বিরূপাক্ষ—এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে এই অসময়ে খালি পায়ে হেঁটে ? কলকাতা ছেড়ে কতো মাইল চ'লে এসেছো খেয়াল আছে ?

অদ্রি ঈষৎ বিমর্ষ হাসির সঙ্গে বলে—কতো মাইল ? কী জানি ? তোমরা কাজের মানুষ তেল পুড়িয়ে দৌড়োও আর ঘড়ি ছাখো, হিশেব করো—তোমাদের সময়ের দাম কতো ! আমরা রক্ত পুড়িয়ে দৌড়োই·· পায়ে তো কোনো মিটার-ফিটার লাগানো থাকেনা তাই ও-সব দুর্ভাবনা আসেই না মনে। আমাদের সময়ের দামও নেই তাই পথের হিশেবও নেই। পথই ঘর, আর ঘরই পথ—তাই ঘরে ফেরার তাগিদও নেই। পথকেই মনে হয় ঘরের চেয়ে ঘরোয়া।

বিরূপাক্ষ গাড়ি থেকে তার ব্যাগটা নিয়ে আসে, বলে—দেখি, কোথা-কোথা লেগেছে ?

অদ্রি বলে—ধুলো লেগেছে, ধুলো। বলো, তোমার ডাক্তারীতে কুলোবে ?

যদি'ও সততার হাসি ওর মুখে তবু প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো মনে হয় ওর কথাগুলো। ওর হাত থেকে কাগজপত্রের ভাঙা বাক্সটা একরকম কেড়েই নিয়ে যায় বিরূপাক্ষ—রেখে আসে মোটরে। তারপর অদ্রির হাত ধ'রে বলে—মোটরেই সব কথা হ'বে। এসো। কাল থেকে তোমাকে কতো খুঁজছি···দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেলো তাই ··

অদ্রি কিন্তু নড়বার কোনো লক্ষণই দেখায়না। শুধু বিড়বিড় করে—ধুলো···ধুলো···তুমি ধুলো···আমি ধুলো, সব ধুলো···ধুলি-প্রতিশ্রুত ধরণীর ঘরনী ছিলো যে, সে আজ এক মুঠো ধুলো। মর-মাংসের পথ চিরদিন ধুলো দিয়েই ঢাকা! প্রণতি ও প্রদীপ ঐ ধুলিসমাচ্ছন্ন-পথ মাড়িয়েই চ'লে গেছে, আমরাও চলেছি—তুমি চলেছো নাহয় মোটরে ক'রে ধুলো উড়িয়ে—আমি চলেছি নাহয় হাঁটা পথে, পা আমার নাহয় ধুলোয় গেছে ভ'রে।—এই যা তফাৎ নইলে গন্তব্য আমাদের এক। আমরা, ওরা, যারা চ'লে গেছে, যারা আসবে—সকলেই এই ধূলি-প্রতিশ্রুত শোভাযাত্রার অংশবিশেষ।

এই যে তুমি যা বুকে পরেছো—এই গোলাপ—

অদ্রি রূঢ় হাতে বিরূপাক্ষের বাটন্-হোল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ফুলটা ফেলে দ্যায় পথের ধুলোয়, বলে—এও ধুলো···মূর্খ···ধুলো···ভুলে যাকে ফুল ভাবো আসলে তা ধুলির বিস্ময় !

কী সব বকছো ? চলো মোটরে। তোমার এখন মাথার ঠিক নেই ভাই—শুনেছি সব তোমাদের কথা।

বিরূপাক্ষ অদ্রিকে অনেকটা জোর ক'রেই টানতে টানতে নিয়ে গেলো মোটরে।

মোটরে এসে অদ্রি একবার জিগেস করে—কোথায় নিয়ে যাবে আমায় ?

বিরূপাক্ষ বলে—বাড়ি।

—কিন্তু আমার তো বাড়ি নেই ভাই।

—আমার তো আছে।

অদ্রি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে বলে—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ভাই।

বিরু বলে—না। এখন থেকে তোমাকে তো আর ছেড়ে দেবোনা। তোমাদের ছেড়ে রেখেছিলাম ব'লেই তো প্রণতি-প্রদীপকে নষ্ট ক'রে ফেল্লে, নিজেও নষ্ট হ'য়ে গেলে।

অপারগ হ'য়ে অদ্রি অগত্যা মোটরের কুশানে ক্লান্তভাবে নিজেকে নিক্ষেপ

করে। বিরূপাক্ষ সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে মোটরে স্টার্ট ছায়। আমাকে যেতে দাও, যেতে দাও।—অদ্রি ছট্‌ফটিয়ে ওঠে।

মোটর তখন চলতে সুরু ক'রে দিয়েছে।

অদ্রি সমান বিড়বিড় ক'রে ব'কে চলে—

'আমার নেই ঘর শুধু ঘরের দিকে যাওয়া।'

সেদিন ঐভাবে অদ্রিকে রাস্তা থেকে ধ'রে নিয়ে আসার পর বিরূপাক্ষ ওকে দিনকতক নিজের বাড়িতে নজরবন্দী ক'রে রাখার ব্যবস্থা করলো। অদ্রির সেবার ভার সে প্রথম দিন থেকেই তুলে দিলো সতীর হাতে। সেইদিনই বিকেলে সতী বিরূপাক্ষকে বললো—ডাক্তারবাবু, এবারে ওঁর দস্তুরমতোই জ্বর ফুটেছে।

এটা অদ্রীশের শ্রমজ্বর। দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ, মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা ও পর্যাপ্ত পানাহারের অভাবে আগে থেকেই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিলো। তার ওপর এতো বড়ো একটা আঘাত। বিরূপাক্ষ অদ্রীশকে পরীক্ষা ক'রে এই মতই প্রকাশ করে। সতীকে ঔষধ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে চ'লে যায়।

অদ্রীশের জ্বর রাত্রে আরো বাড়ে। ভুল বকে। সতী এসে মাথার শিয়রে বসলে ব'লে ওঠে—কে? নতি?

সতী বলে—না। একটু চুপ ক'রে থাকুন আপনি।—আমি সতী।

অদ্রি বলে—নতি, নতি! ··শুনছো? 'তুমি আছ তাই প্রদীপের সনে তারকারা কথা কয়।'

সতী এবারে চুপ ক'রেই থাকে।

জ্বরের ঘোরে অদ্রীশ তেম্নিই ভুল ব'কে যায়—

'তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।'

বুঝেছো? বুদ্ধির বর্বর ক্ষেত্রে ভুল ক'রে তোমাকে টানবোনা আর, সে তোমার স্থান নয়। সেই তোমার স্থান যেখানে হৃদয়ের সুরে হৃদয় কথা কয়ে ওঠে, গেয়ে ওঠে গান—অনুভূতির সেই অমরাবতীতেই তোমার স্বাধিষ্ঠান। চলো, সেইখানে আমরা যাই, সেই অনেক, অনেক, অনেক দূরে—

'সুদূর বিদেশ শেষের মোড়ে
যেখানে তোমাকে কেউ চেনে নাকো—চেনে না মোরে,
যেখানে তারারা সারারাত ভ'রে—আকাশ ভরে!
সারারাত ভ'রে হাহাকার করে বাউল বাও।'

কী বলো ? সেইখানে আমরা যাই ? কী বল্লে ? কবিতা তুমি সইতে পারোনা ? কেন ? কবিতা তোমার সতীন ? ভালোবাসায় কবিতা ভাগ বসিয়েছে ? আগেকার মতো তোমাকে আর ভালোবাসিনা ভাবছো ? লেখাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসি এই বলতে চাইছো ? ভুল নতি, ভুল ! কবিতা দিয়েই যে তোমাকে ভালোবাসি। আমার কবিতাকে নাও তুমি, আমাকে নাও।

'Take them, Love, the book and me together :
Where the heart lies, let the brain lie also.'

সতী যেন তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ ছাখে বিরূপাক্ষ কখন এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। সতী বলে—অনর্গল ভুল ব'কে যাচ্ছেন তখন থেকে—

বিরূপাক্ষ চিন্তিত মুখে বলে—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

দূরে গির্জার ঘড়িতে তখন বারোটা বাজলো। সেইসঙ্গে বেজে উঠলো বিরূপাক্ষের বড়ো ঘড়িটাও পাশের ঘর থেকে বিচিত্র সুরে। ওয়েষ্ট মিনিস্টার চাইমিং না কী-যেন বলে···বড়ো চমৎকার চাইমিং ওটার।

আমি আসছি একটু বাইরে থেকে আপনি ততক্ষণ দাঁড়ান রুগীর কাছে। ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো সতী। অদ্রীশ উঠে বসলো—কই ? কোথা গেলে, নতি ?

তখনি সতী ফিরে আসে ওর শয্যার শিয়রে—এই যে, আমি। শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন।

বিরূপাক্ষ ও সতী দু'জনে মিলে ধ'রে শুইয়ে ছায় ওকে। ও বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'লে চলে—

'With me, my lover makes
The clock assert its chime :
But when she goes she takes
The mainspring out of time.'

খানিক পর অদ্রি শান্ত হ'য়ে একটু চোখ বুজোলো বিরূপাক্ষ সতীকে ইঙ্গিত করলো অর্থাৎ এইবার যেতে পারো।

সতী নিঃশব্দে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বিরূপাক্ষের ঘরে, দাঁড়ালো একটা জান্‌লার ধারে। বাইরে জ্যোৎস্না। উজ্জ্বল নয়, ছায়ায় আবিল জ্যোৎস্না লুটোচ্ছে বাইরের 'লনে'। জান্‌লার ধারে একটা সোফা টেনে নিয়ে তাইতে ক্লান্তভাবে দেহ ঢেলে ছায়। অপরিসীম ক্লান্তিতে, অসীম আলস্যে তার চোখ বুজে আসে।

খানিকক্ষণের জন্য চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রেখে যখন সে চাইলো বাইরের অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নার দিকে হঠাৎ মনে হ'লো তার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে তৃষ্ণায়, অথচ এতক্ষণ সে এটা খেয়ালও করেনি।

ঔষধপথ্যের সু-ব্যবস্থায় ও সতীর সেবাযত্নে দিন দুয়েকের মধ্যেই ওর জ্বর ছেড়ে গেলো। কিন্তু কেন্দ্রচ্যুত মন ওর কিছুতেই আর প্রকৃতিস্থ হ'তে পারলোনা। ওর স্বভাবসুলভ আবেগপ্রবণতা ক্রমশ যেন মস্তিষ্ক-বিকৃতির দিকে ঝুঁকলো। আজকাল অদ্রি আর লিখতেও বসেনা। শুধু ব'কে যায় অনর্গল, অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তবু সেই প্রলাপ থেকেই ওর মনের ছবি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ওর ভাবনার বিমূঢ়তা, আঘাতের প্রচণ্ডতা, বেদনার অপরিমেয়তা, ব্যর্থতাজাত একটা অসহায় দার্শনিকতার সঙ্গে মিশিয়ে থাকে প্রতিভা ও মনস্বিতা। ওর প্রলাপে এ সবেরই একটা সংমিশ্রিত রূপ প্রকাশ পায়।

সতী আজকাল হাসপাতালে যাবার সময়ই পায়না। বিরূপাক্ষ ওকে অদ্রির ভার দিয়েছে, ও তাই নিয়েই আছে। সারাদিন সতী সুধু এই সমস্ত প্রলাপ শোনে আর ভাবে এত বিদ্যা-বুদ্ধি, গুণপনা, প্রতিভা কিছুই কোনো কাজে এলোনা, হায় রে!

বিরূপাক্ষ বাড়ি ফিরলেই, সতী গিয়ে ওর কাছে অদ্রীশের প্রলাপী মনের নতুন নতুন প্রমাদের বিবরণ দ্যায়; শুনে বিরূপাক্ষ বলে—এ আমি জানতাম, সতী। প্রণতি শেষ যেদিন এসেছিলো আমার এখানে, সেদিন আমি ওকে একথার একটু-খানি আভাস দিতে গিয়েছিলাম ও কিন্তু আমাকে ভুল বুঝলো এবং ক্ষুণ্ণ হ'লো। আমার উপদেশ ও অন্যভাবেই নিলো। বলেছিলাম বিজ্ঞান মিথ্যা স্তোক দ্যায়না। শুনে প্রণতি রাগ করেছিলো বটে কিন্তু অদ্রীশ তো অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে এড়াতে পারলোনা। স্বামীর এই অবস্থা যদি প্রণতি সত্যই দেখতো তো কিছুতেই সহ্য করতে পারতোনা।

এমন সময়ে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কোনোকিছু ভঙ্গুর জিনিশের পতনশব্দ হওয়ামাত্রই সতী শশব্যস্তে দৌড়লো। বিরূপাক্ষও এলো সতীর পেছন পেছন।

ওরা এসে দেখলো গ্লাস্-কেসে-ঢাকা প্রণতির আবক্ষ ক্লে-মডেলটি ভেঙে চুরমার হ'য়ে প'ড়ে আছে মেঝেয় আর তারই টুকরোগুলো দুই হাতে তুলে নিয়ে দেখছে অদ্রি আর বিলাপ করছে—

'মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রং দিলে কে তোর গায়ে?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে?

বুক দিলে যে ভুখ দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।'

বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ অদ্রির কাণ্ডখানা দেখলো বিরূপাক্ষ তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো ওর কাছে সতীর নিষেধ সত্ত্বেও এবং ওর কাঁধে হাত রেখে শান্ত অথচ করুণ কণ্ঠে বললো—এ কী করলি অদ্রি? শেষে নিজেই এ কাজ করলি?

বিরূপাক্ষের খেদোক্তিতে অদ্রির চমক ভাঙে, বলে—কে? আমি? কী করলাম আমি? না, না, আমি করবার কে? আমি করবো কেন? অমন কথা মুখে এনোনা বিরু। এখনো জেগে রয়েছে মহাকাল, অতন্দ্র থাকবে চিরকাল; নতির কথা ভাবছো তুমি? কিন্তু কোথায় সে? জানোনা বুঝি 'She is Time's prey and Time consumeth all.'

বিরূপাক্ষ সেখান থেকে স'রে গেলো অন্তরালে।

সতী বললো—অতো যত্নের জিনিশ আপনার—গেলো তো? কাকে বলবেন এবার?

একরকম বিষণ্ণ দার্শনিক হাসি হেসে বিরূপাক্ষ বললো—বলবো আর কাকে? বলবোই বা কী? মানুষই গেলো তা এটা তো নেহাৎ মাটির ঢেলাই! যার জিনিশ সেই যদি নষ্ট করে তো বলার এক্তিয়ার থাকে কার? যে-পথে মানুষটা গেছে সে-পথেই মাটির ঢেলাও যাক্—ভালোই হয়েছে।

এরই দু'একদিনের পর। বিরূপাক্ষ তখন বসেছিলো বাইরের ঘরেই—সেটা তার রুগী দেখবার সময়। বাসবী এসেছিলো একা। বাইরে থেকেই বিরূপাক্ষের সঙ্গে কথা ক'য়ে ওম্নি চ'লে গেলো সে। বললো—থাক, কী আর দেখা করবো? সতী তো এখন ব্যস্ত আছে রুগীকে নিয়ে। শারীও আসতে চেয়েছিলো আমি ওকে ফাঁকি দিয়েই চ'লে এসেছি।

বিরূপাক্ষ বললো—বেশ করেছো। ওকে আনার আর দরকার কী? আমিই যাবো'খন। অদ্রি সময় সময় ভায়োলেণ্ট হ'য়ে উঠছে কিনা তাই ছেড়ে যেতেও পারিনা সব সময়ে।

বাসবী বললো—আর গরমটাও কি তেম্নি পড়েছে? ওঁরও শরীরটা ভালো যাচ্ছেনা—উনি আবার মোটে গরম সহ্য করতে পারেননা। কালই বলেছিলেন চলো কোথাও পাহাড়ে। মসুরী যাওয়ার কথাই হচ্ছিলো, কী বলেন আপনি?

প্রস্তাবটা বিরূপাক্ষ সমর্থনই করলো, বললো—বেশ তো, শারীর পক্ষেও ভালো হবে।

বিরূপাক্ষের বাড়ি থেকে খানিকটা দূর যাওয়ার পর একটা চৌরাস্তার মোড় বরাবর বড়ো একটা মনোহারী দোকানের দোরে দাঁড়িয়ে ছিলো প্যান্সি, হাতে কতকগুলো সদ্য-কেনা জিনিশ-পত্র। চোখোচোখি হ'তেই চ্যাঁচালো, ডাকলো—বাসবীদি!

বাসবীর মোটর থামলো। গাড়ির দরজা খুলে ধ'রে ডাকলো বাসবী—কী, বাড়ি যাচ্ছিস্ তো? আয় না, চল্ পেঁ ৗছে দিই।

উঠলো প্যান্সি।

—কোথা গিয়েছিলে?

—বিরুদার বাড়ি থেকে আসছি।

—অদ্রীশবাবুর সম্বন্ধে যে খবরটা শুনছি সেটা কি সত্যি?

—ও-সব খবর মিথ্যে হয়না।

উনি এখন বিরূপাক্ষবাবুর বাড়িতেই আছেন বুঝি? তুমি ওঁকে দেখে এলে?

—না, দেখা করিনি, ওপরে উঠিনি। তুই বুঝি এখন কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছিলি?

—হ্যাঁ। তোমাদের বাড়ির সব খবর ভালো?

—তেমন ভালো নয়। ওঁর শরীরটা ভালো নয়। যা গরম পড়েছে অসম্ভব।

—অসম্ভব, না অসম্ভব! তোমাদের ভাবনা কি, দার্জিলিঙে তো বাড়ি আছে। মনে করলেই গরম কাটাতে পারো গিয়ে।

—না ভাই, দার্জিলিঙ আর ভালো লাগেনা, একঘেয়ে হ'য়ে গেছে, এবার মসুরীতে যাওয়া ঠিক করেছি। বিরুদাও তাই বল্লেন।

—কবে যাবে?

—এই দু'একদিনের মধ্যেই ঠিক হ'য়ে যাবে আশা করছি।

—আচ্ছা, একটা মজার খবর শুনেছো বাসবীদি?

—কী?

—মৃদুলাদি এখানকার স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পাঞ্জাবে চ'লে যাচ্ছেন।

—সত্যি নাকি?

—হ্যাঁ সত্যিই। দু'দিন আগে কানা-ঘুষায় শুনছিলাম বটে, আজকে শুনে এলাম পাকা খবর। এখুনি স্টেশনারি দোকানে দেখা হলো সুলোচনা-দিদিমণির সঙ্গে। চেনো তো সুলোচনা দিদিমণিকে যিনি আজকাল হেড্ মিস্ট্রেস্ হয়েছেন।

—ও! কিন্তু মৃদুলাদির হলো কী? সব ছেড়ে-ছুড়ে চল্লেন যে বড়ো পাঞ্জাবে? কোনো ভালো অফার পেয়েছেন বোধহয়।

—না গো। উনি চাকরিই আর করবেননা। কী দুঃখে করবেন? সুলোচনা দিদিমণি আমায় চুপি চুপি বল্লেন, মৃদুলাদি নাকি বিয়ে করবেন এইবার। আর তাও বিয়ে হচ্ছে ধনী কোনো পাঞ্জাবীর সঙ্গে। ছি, ছি, কী কেলেঙ্কারী মাগো! লোককে এতো ব'লে ক'য়ে বুড়ো বয়সে মৃদুলাদি শেষটা বিয়ে ক'রে ফেল্লো? তাও একটা দোজবরে পাঞ্জাবীর সঙ্গে? একটা বাঙালীও জুটলোনা?

—তুই থাম্। কেলেঙ্কারী আবার কিসের? বিয়ে ক'রে বেঁচে গেলো বল্! এবারে দেখে নিস্ একেবারে অন্যমানুষ হ'য়ে যাবে মৃদুলাদি।

—হ'তে পারে, কিন্তু সেটা দেখার সৌভাগ্য আমাদের কারো হ'বেনা, বাসবীদি।

বাসবী বলে—এখন মনে পড়ছে শিতিমা একবার বলেছিলো বটে মৃদুলাদিকে প্রায়ই আজকাল একজন প্রৌঢ় পাঞ্জাবীর মোটরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

প্যান্সি বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায়ও বলেছিলো।···এই শোফার বাঁধো, বাঁধো।

প্যান্সির বাড়ি এসে গিয়েছিলো, সে এখানেই নেমে পড়লো।

—মৃদুলাদিকে তাহ'লে কন্‌গ্র্যাচুলেশন্ পাঠাস্।—বাসবী হাসতে হাসতে বলে।

—হি-হি-হি। মন্দ হয়না। কিন্তু ওকে আর পাচ্ছি কোথা?

নেমে গিয়ে বাইরে থেকে দড়াম্ ক'রে দরজাটা বন্ধ করে প্যান্সি।

—আচ্ছা। বাসবীর মোটর ছেড়ে দ্যায়।

ফাল্গুন দেখে দূর মেঘ-মৌসুমী

অনিরুদ্ধ মসুরী পাহাড়ে মলয়াকে নিয়ে এসেছে আজ দিন পনেরো হ'লো। আসার পর দিন কয় মলয়া যেন অপেক্ষাকৃত ভালো আছে মনে হ'য়েছিলো। স্ত্রীর রোগমুক্তি সম্বন্ধে আশা-পোষণ করা যদিও অনিরুদ্ধ বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে তবুও ফের নতুন ক'রে আশান্বিত হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলো। কিন্তু একথা কে তখন জেনেছিলো যে শেষকালে আপাতবীক্ষণে নিরীহ একটা ঘটনা এভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে তার সদ্যজাগ্রত আশা-বল্লরীর মূলোৎপাটন করবে?

পাশের পাহাড়টায় ছবির মতো যে-বাড়িটা ওটারই নাম 'মঞ্জুভিলা'। রোদ্দুর হেলে গেলেই ও-বাড়ির বন্ধ জান্‌লার কাচগুলোও জ্ব'লে ওঠে। ওদিকে চেয়ে চেয়ে মলয়া রোজ বেলার আন্দাজ করে। ছায়া ক্রমশ হেলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। এই আলস্যমন্থর মুহূর্তগুলোর ওপর শুয়ে হঠাৎ যেন তার লক্ষ হ'লো সারি সারি বন্ধ জান্‌লাগুলো আজকে সব খোলা। কারা ভাড়া এলো বাড়িটায়? অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলো দু'একটি মেয়ের মুখ—বাঙালী ব'লেই তো মনে হ'লো—খুব অবস্থাপন্ন নিশ্চয়ই নইলে অমন ভালো বাড়ি নিতে পেরেছে। স্বামীকে মলয়া জিগেস করে—শুনছো? মঞ্জুভিলায় বাঙালী ভাড়া এসেছে, দেখেছো?

অনিরুদ্ধ সংক্ষেপে শুধু বলে—হুঁ।

—বাঙালী-বিরল জায়গায় বাঙালী প্রতিবেশী, হ'লো ভালোই। আলাপ করলে হয়।

—কোরো'খন।...টেবিলে ব'সে মুখ গুঁজে চিঠি না-কী-যেন লিখছিলো অনিরুদ্ধ, বিলম্বিত এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো। এখন ওকে আর আলাপে টানা গেলোনা। মলয়া চুপ ক'রে গেলো।

একটু পরেই চাকর এসে একটা চিঠি দ্যায় অনিরুদ্ধের হাতে, মঞ্জুভিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ও-বাড়ির মা পাঠিয়ে দিয়েছেন এই চিঠিটা। লোক দাঁড়িয়ে আছে, জিগেস করছে জবাব দেবেন কি?

চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখে অনিরুদ্ধ বলে—বল্‌গে যা দেখা করবো'খন আজকেই।

—মঞ্জুভিলায় যারা এসেছে ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে দেখছি যে?

অনিরুদ্ধ গূঢ় হেসে বলে—ভয়ানক।

—তবে একটু আগে যে কেবল 'হুঁ' ব'লেই সেরে দিলে? ভাঙ্‌লেনা কিছু?

অনিরুদ্ধ হাসতে থাকে। বলে—তখন ভাঙ্‌লে সিরিয়স্‌নেস্‌ নষ্ট হ'য়ে যেতো। যাক্‌ ভালোই হ'লো, এতো কাছে বাঙালী —বাঙালীর মুখ তো দেখাই যায়না।

অনিরুদ্ধের কথার পিঠে মলয়া যোগ করে—একে বাঙালীর মুখ, তায় চেনা মুখ—কী বলো?

—যা ব'লেছো। কারা এসেছে জানো তো?...এবার অনিরুদ্ধের প্রশ্নটা যেন শ্লেষের মতো।

মলয়া বলে—কী ক'রে জানবো? বল্লে তো জানবো? ঐটি এড়িয়ে আর সব কিছুই বলছো।

অনিরুদ্ধ আরো হাসে। বলে—সেই যে যার দেখা পাওয়া তোমার চিরজীবনের সাধ—ভাগ্যচক্র তাকেই শেষকালে তোমার পড়শী ক'রে দিলো।

মলয়া ঈষৎ বিবর্ণ মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে ঠিক বুঝতে পারেনা এ-বিষয়ে সে স্বামীর কথা বিশ্বাস ক'রে নেবে কিনা। শেষটায় বলে—ঠিক ক'রে বলোনা।

অনিরুদ্ধ বলে—বল্লাম তো।

মলয়া বলে—আচ্ছা বেশ, দেখি তবে চিঠি?

—উঁহুঁ, ঐটি হ'চ্ছেনা। পরকীয়া প্রণয়িনীর প্রেমপত্র বুঝি স্বকীয়ার সামনে বের করতে আছে?

—আমার কাছে লুকোবে? আমি যেন কিছু দেখিনি? ঐসব বিশ্রী চিঠি-গুলো—যেগুলো পড়তে বিশবার মুখ ঢাকতে হয় লজ্জায় সেগুলোও পর্যন্ত...

—ছিঃ মলয়া! চুপ করো। অপরের মনকেও শ্রদ্ধা করতে শেখো, বুঝলে? অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস।

(২)

পরদিন মঞ্জুভিলার বাসবী আসে অনিরুদ্ধের বাড়ি বেড়াতে। মলয়া এই প্রথম দেখলো বাসবীকে, বাসবীও মলয়াকে। কয়েক মুহূর্ত বাসবী মলয়ার দিকে চেয়ে থাকবার পর ব'লে উঠলো—'কী সুন্দর বৌদি হ'য়েছে, নিরুদা? তারপর মলয়ার দিকে ফিরে বলে—জানো বৌদি, নিরুদাকে কতোবার জিগেস করেছি, বলি কেমন বৌ হ'লো বলোনা নিরুদা? বে-থা করলে, নেমন্তন্নও করলেনা জানালেও না কেমন বৌ হ'লো, দেখালেও না, ফোটোও তো একটা পাঠাতে পারতে? তার জবাবে উনি বল্লেন—'কী আর দেখবে? পাঁচাপাঁচি আর কি—দেখবার মতো কিছু নয়। কালো-কোলো মোটা-সোটা দেখে গৃহস্থের মেয়ে উদ্ধার

করেছি মাত্র, যাতে খাটা-খাটুনিটা পারে। তোমাদের মতো মেমসাহেবকে দিয়ে তো আর তা চলতোনা।' আমিও তাই যুক্তি এঁটে এসেছি যে পেট খালি রেখেই যাওয়া যাক্ গেরস্তঘরের মেয়ে যখন···চা চাইলেই উনোনে আগুন দিয়ে খাবার করতে ব'সে যাবে'খন।

ব'লে বাসবী একাই হেসে ভাসিয়ে ছায় ঘরের গুমোট।

মলয়া বলে—ওঁর ওস্নি কথা! উনি ও-সব ঠাট্টাই করছেন কেবল একটা কথা ছাড়া—যে, দেখার কিছুই নেই পাঁচাপাঁচি। সে তো ভাই বুঝতেই পারছো।

বাসবী সব কথাতেই বিস্ময়ের ঢেউ তোলে, বলে—ও মাগো, ঐটেই যে সব চেয়ে মিথ্যে, অতি-বিনয় কোরোনা বৌদি।

মলয়া চেয়ে থাকে। লিক্‌লিকে গ্রীবা হেলিয়ে দেখতে থাকে উচ্ছলিতা প্রাণবতী বাসবীর অপরূপ দেহশ্রীর দিকে। চলমান জীবনপ্রবাহের উর্মি-মর্মর যেন বাজতে থাকে সংগীতের মতো ওর অঙ্গে অঙ্গে।

—আচ্ছা নিরুদা, এতো পশ্চিমে-পশ্চিমে ঘোরো তবু বৌয়ের স্বাস্থ্য ফিরলোনা? যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে নিশ্চয়ই ··

জীবনের গ্লানি গলার স্বরে এনে অনিরুদ্ধের বদলে মলয়াই উত্তর ছায়—আর ভাই, উনি তো আর কিছু করতে বাকি রাখেননি তবু সারলুমওনা, সরলুমওনা। কী ক'রে যে আজও পর্যন্ত ধুক্‌ধুক্ করছি ভেবেও পাইনা। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে যাবার পরও বছরের পর বছর গুন্‌ছি দেখে তারাও আশ্চর্য হয়, উনিও মনে মনে আশ্চর্য হন, সব চেয়ে আশ্চর্য হই আমি নিজে। এতদিনেও হেস্তনেস্ত হ'লোনা একটা কিছু—কিসে যে আমাকে এমন ক'রে আয়ু দিচ্ছে—তাকি ভেবেও পাওয়া যায়?

অদূর পাহাড়টার দিকে চেয়ে যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো বাসবী, হঠাৎ ব'লে উঠলো—অমৃত। বৌদি, অমৃত।

অনিরুদ্ধের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি ক'রে নিয়ে মলয়ার দিকে ফিরে বাসবী, ব'লে যায়—অমৃতের আস্বাদন করেছো বৌদি, তোমার মরণ নেই ভাই। কেন খালি-খালি মরণের কথা ভাবো? হয়তো দেখবে আমরাই কখন কোনদিন হাসতে হাসতে ম'রে যাবো তোমার আগেই। এখনই এতো অবাক্ হ'চ্ছো—তখন তো আরো অবাক্ হ'বে।

ব'লে অনিরুদ্ধের সমর্থন পাবার আশায় ওর দিকে চেয়ে বলে—কী? তাই নয়, নিরুদা? ব'লে আবার বিমনা দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত ক'রে ছায় পাহাড়ে পাহাড়ে।

অনিরুদ্ধ বলে—নিশ্চয়ই তা হ'তে পারে বৈকি, সবই হ'তে পারে। আমিও তো কতোবার মলয়াকে বলেছি একথা।

স্বল্পপ্রাণ হাসির সঙ্গে মলয়া বলে—থাক্ আর বোঝাতে হ'বেনা শুনলে তো কিসে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে? তবে কেন মিছে ওষুধ-ওষুধ করো? যে ক'দিন বেঁচে আছি ওষুধ-ওষুধ ক'রে মিথ্যে জ্বালাতন কোরোনা, বুঝলে?

—আমার এই কথাটা বৌদিরও খুব মনে লেগেছে, দেখলে তো? সব মেয়েরই মনে ধরবে তুমি কী বুঝবে তার? ব'লে আর একচোট প্রাণের প্রবাহে ঘরখানাকে ভরিয়ে তোলে বাসবী।

—জানো ভাই বৌদি, সে আজ বছর দশ বারো আগে কোনো এক অকপট প্রেরণার মুহূর্তে ওর নামকরণ করেছিলাম—Elixir Vitæ। তুমি ইতিমধ্যে নিরুদার কাছ থেকে শুনে ফেলেছো কি জানিনা। শুনে থাকলেও আমার লজ্জার কিছু নেই এই নেহাৎ সহজ সত্যকথাটা স্বীকার করতে যে ওকে আমার ভালো লাগতো। তা স্বয়ম্বরা তো হইনি কিনা তাই বাবার ভালোর তলায় আমার ভালো তলিয়ে গিয়ে এখন বাবার ভালোই আমার ভালো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

—তোমার বাবা বেঁচে আছেন? মলয়া জিগেস করে।

—না; তাঁর ইচ্ছাশক্তি অমর হ'য়ে আছে শুধু।—বাসবী হেসে জবাব ছায়।

বাহ্যত অধীর আগ্রহে মলয়া জিগেস করে—তারপর?···তুমি ওঁকে বলতে Elixir Vitæ?

এ জায়গায় সামান্য একটু তিক্ত হাসি হাসলো মলয়া তারপর আড়চোখে অনিরুদ্ধকে একবার দেখে নিয়ে বললো—অ, তাহ'লে উনি বুঝি তোমারই অনুকরণে মাঝে মাঝে আমাকে বলেন—Tædium Vitæ? জানিনা ভাই কথাটার কী মানে কিংবা ওটা কোনো আদরের ডাক কি কোনো গালাগাল—

বাসবী অনিরুদ্ধের দিকে চেয়ে শব্দ ক'রে হেসে ফ্যালে, বলে—সত্যি নাকি, নিরুদা? ছিঃ!

উত্তরে অনিরুদ্ধ কঠিন স্বরে বললো—না, না, তুমিও যেমন আবোল তাবোল বকছো মলয়ার কাছে, ও-ও তেম্নি ঠাট্টা করছে তোমাকে। বুঝতে পারছোনা?

বাসবী ব'লে ওঠে—কী করবো, ক্রমাগত আজ খালি ঐ সব কথাই ব'কে যেতে ইচ্ছে করছে যে। কে জানে বাপু, কী যেন আজ হ'য়েছে আমার!

মলয়া সাগ্রহে জিগেস করে—তারপর? বলো ভাই, আমাকে বলো। তুমি তো আমার কাছেই বলছো, ওঁর কাছে তো আর বলছোনা—আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে তোমার গল্প—ঐ সব পুরনো কথা—তারপর?

বাসবী এবার আবার বক্তব্যের পূর্বসূত্র ধ'রে ব'লে যেতে থাকে—ওঃ নিরুদার তখন কী চেহারাই ছিলো! (অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে) কোথায় গেলো সে চেহারা নিরুদা? (তারপর আবার মলয়ার দিকে ফিরে) সুইমিং ক্লাবের ওই তো ছিলো 'ট্রেইনর'—আমাদের সাঁতার শেখাতো। (অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে) মনে আছে নিরুদা, সেই ব্রততীকে—ব্রততী মিটার? আমাদের মধ্যে পুরুষালিয়ানা সব চেয়ে বেশি ঐ মেয়েটার মধ্যেই ছিলো তাই অন্য মেয়েরা ওকে বলতো বেহায়া। সে তো সবার সামনেই নিরুদাকে অ্যাডোনিস্ এরস্, হাইমেন্, কিউপিড্, যখন যা ইচ্ছে তাই ব'লে ডাকতো। অসিতা দে বলতো—নিরুদার ফিগারটা ঠিক যেন অ্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ারের মতো। আমি বলতাম মাইকেল এঞ্জেলোর অ্যাডাম। কী প্রোপোরশন ছিলো ওর দেহের! যেন গ্রীক ভাস্করের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি! ও যখন সাঁতারের পোষাক প'রে জল থেকে উঠে আসতো এমন কোনো মেয়ে ছিলো না যে ওর দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে না নিয়েছে লজ্জায়—কিংবা গালের রঙ না বদলেছে একটু। অকুণ্ঠ যৌবনের অধীশ্বর যেন সামনে এসে দাঁড়ালো, এখুনি হাত পাতবে নাকি? চাইবে নাকি কোনোকিছু তাদের কারো কাছে? ভীরু বুকে রক্ত দুলে উঠতো সবাইয়ের, লজ্জার শিহর লাগতো। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েদের সম্বন্ধে ও বরাবরই খুব উদাসীন!

পুরোনো স্মৃতির রোমন্থনে বাসবী সব কিছু ভুলে গিয়ে আপনার মনে-মনেই যেন স্বগতোক্তি ক'রে চলেছে লক্ষ্যও করেনি অনিরুদ্ধ কখন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে কিংবা ছাখেওনি ভ্রূকুটি কী রকম কুটিল হ'য়ে উঠেছে মলয়ার চোখে।

এম্নি ক'রে সময় যায়, রাতও হয়ে যায় বাসবী ওঠে, বলে—আবোল-তাবোল কতো কী-যে ব'কে গেলাম আপন মনে কিছু মনে কোরোনা, বৌদি। রাত হ'য়েছে, এবার উঠি।

পাশের ঘরে না কোথায় যেন ছিলো অনিরুদ্ধ বাসবীকে যেতে দেখে একটা টর্চ নিয়ে সঙ্গে চললো ওকে বাড়ি পেঁ ৗছে দিয়ে আসতে। পাহাড়ে রাস্তা আঁকা-বাঁকা চড়াই আর উৎরাই। নির্জন পথ, কারো মুখে কোনো কথা নেই তবু মন ভ'রে আছে কানায়-কানায়। দু'জনের ভাবনা দু'জনেই যেন শব্দ না ক'রেও বুঝতে পারে। একটুখানি পথ কিন্তু নির্জনতা অনেকখানি। একটা জায়গায় এসে অনিরুদ্ধ বলে—এইখানটা সাবধানে এসো বাসবী।

বাসবী যেন বালিকার মতো ভয়ের অভিনয় করে, বলে—বড্ডো ভয় কচ্ছে। এইখানটায় একবারটি ধরোনা, নিরুদা।

অনিরুদ্ধ বলে—আজকাল তুমি এত ভিতু হ'য়ে গেছো?

অনিরুদ্ধ বাসবীর দিকে হাতখানা প্রসারিত করে কিন্তু বাসবী অনিরুদ্ধের

কাঁধটাই অবলম্বন করে। তারপর কে জানে কি ভেবে অকারণেই হেসে ওঠে এমন এক অনুনাসিক হাসি যা পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে রেণু রেণু হ'য়ে তুষারের মতো ঝ'রে পড়ে উপত্যকায়।

অনিরুদ্ধ বলে—বেশ আছো; কেমন দিব্যি হাল্কা, বয়স গায়ে মাখোনি।

বাসবী আরো হাসতে থাকে—আহ্লাদেপনা দেখেই বুঝি বলছো, নিরুদা? ওর চোখ-মুখ কী-যে করে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়না, সুধু স্পর্শ অনুভব করা যায়।

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে অনিরুদ্ধ বলে—হ্যাঁগো আহ্লাদী।

বাসবী আরো উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, বলে—বা রে, ভাবের মানুষকে দেখলুম এতদিন পরে, আহ্লাদ হ'বেনা?

বাসবীর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পেঁাছয় ওরা।

বাসবী বলে—ভেতরে ঢুকবেনা একবার?

অনিরুদ্ধ বলে—আচ্ছা, চলো।

শারী এতক্ষণ যেন মুখিয়েই ছিলো, বাসবীর গলা পাওয়ামাত্রই সে প্রায় ছুটে আসে কারণ আজ তাসের আড্ডা ফাঁক গেছে।

—আচ্ছা বৌদি, তুমি রাত-বেড়িয়ে এতক্ষণে ফিরলে? বেশ যাহোক! মঞ্জুর মা এসেছিলেন, মঞ্জু এসেছিলো, এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে এই খানিকক্ষণ হ'লো চ'লে গেলো।

বাসবী হাসতে হাসতে বলে—ননদিনী রায়বাঘিনী ননদ-নাড়া দিস্ পরে। আগে ছাখ্ তো চেয়ে কে এলো।

বাসবীর পেছনে অনিরুদ্ধকে দেখে শারী প্রথমটা থতমত খায়, পরে লজ্জায় হয়তো খানিকটা রং বদলায়।

থিয়েটারী ভঙ্গিতে শারীর প্রতি অনিরুদ্ধ নাটকীয় উক্তি করে—বৃথা গঞ্জ দশাননে, তুমি বিধুমুখী···

শারী মুখে কাপড় দিয়ে হেসেই আকুল হয়, বাসবী বলে—সাবাস্ রে সাবাস্, চুপ করো হে কপিবর···কাব্যোচ্ছ্বাসের চোটে আমাকে একেবারে দশানন বানিয়ে দিলে যে? আর ও হ'লো বিধুমুখী?

অনিরুদ্ধ কপট আপ্শোষে মুখে একরকম শব্দ করে এবং তৎক্ষণাৎ বক্তব্যের সংশোধন ক'রে বলে—তুমি যদি দশানন হও গজানন হোক শারী তবে; তাহ'লে তো খেদ নাহি রবে?

বাসবী হো হো ক'রে হেসে ওঠে। শারীও হাস্য-সংবরণের চেষ্টায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

এইভাবে দু'টি নর-নারীর পূর্বসখ্যের সূত্র ধ'রে বিদেশের স্বাস্থ্য-নিবাসে দু'টি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হঠাৎ যেন দৃঢ়-সম্বন্ধ হ'য়ে ওঠে। অনিরুদ্ধ নিজের বিবাহোত্তর জীবনের দুর্ভাগ্য নিয়ে সুখেই ছিলো এবং বরাবর বাসবীকে পাশ কাটিয়ে চলতেই চেয়েছিলো কিন্তু পাশবদ্ধই হ'লো শেষপর্যন্ত। ঘটনাকে মেনে নিতেই হয়—আর ঘটনাকে মানতে গিয়েই যেন জীবনের বিস্মৃত পূর্বস্বাদ আবার ফিরে পেলো সে। মলয়ার ব্যাধির কিছু উপশম হোক বা না হোক বাসবীর সংস্রবে অনিরুদ্ধের মনটা অনেক হাল্কা মনে হ'তে লাগলো। প্রথম প্রথম স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধ তাকে যেন চাবুক মেরে আরো বেশি ক'রে খাটাতে লাগলো। যতোই রুগ্না স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে সদাজাগ্রত উপস্থিতি দিয়ে সযত্ন সেবা নিবেদন করতে যায় ততোই যেন অনুভব করে মলয়ার মধ্যে একটা চাপা অদৃশ্য আগুন প্রতি-নিয়তই জ্বলছে—যার প্রকাশ নেই, প্রচ্ছন্ন। শিখা নেই, আলো নেই তবু উত্তাপটা যেন অনুভব করা যায়। এই আগুন কি ঈর্ষ্যার? কথাটা ভাবতে গেলেই তার মনটা স্ত্রীর প্রতি আরো যেন বিমুখ হ'য়ে ওঠে।

এরপর থেকে মঞ্জুভিলার বাসবীদের তাসের আড্ডায় অনিরুদ্ধকে দেখা যেতে লাগলো মাঝে মাঝে। অবসর-যাপনের বহুকাল বিস্মৃত অমৃতস্বাদ অনিরুদ্ধ এবার যেন বেশ একটু উদারভাবেই পেতে লাগলো। মলয়ার মনে যাই হোক, মুখে কিন্তু প্রকাশ্য কোনো অভিযোগ ফুটলোনা এ নিয়ে।

(৩)

কয়েকদিন পরেকার কথা।

একটা মানুষে-ঠেলা পাহাড়ী রিক্সায় বাসবী আর শারীকে নিয়ে অজ ল্যাণ্ডোরের দিকে যাচ্ছিলো। ওরা চলেছে তুষারকিরীটিনী নন্দাদেবী দেখতে।

পাহাড়ের ওপর থেকে পুরোদস্তুর ইউরোপীয় বেশধারী একজন ঘোড়সওয়ার নেমে আসছিলো, পরনে তার নী-ব্রিচেস্, গেইটার বুট, চামড়ার বেল্টে আটকানো ঝুলছে চক্চকে রুপোলি তলোয়ারের মতো একটি স্টীলের বিশ্রাম-যষ্টি। সচরাচর পাহাড়ী পথে ওঠার জন্য যে-সব সিট্-স্টিক্ দেখা যায় ঠিক সে রকম নয়—এর কিছু বিশেষত্ব আছে।

ওদের রিক্সার কাছাকাছি এসেই ঘোড়সওয়ারটি তার ঘোড়া সংযত ক'রে নেয়; হাত তুলে বলে—হাল্লো, মিস্টর মুকার্জি!

ঘোড়ার পিঠের সুপুরুষ মানুষটিকে তখনো অজ ঠিক চিনে উঠতে পারেনি তাই স্বীকৃতিজ্ঞাপন করতে ইতস্তত করছিলো।

ইতিমধ্যেই ঘোড়সোয়ার কিন্তু নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের রিক্সার পাশে।

—চিনতেই পারলেননা ? আশ্চর্য !···ব'লে ভদ্রলোক একবার মাথার টুপিটা তোলেন আবার যথাস্থানে স্থাপন করেন।

প্রত্যুত্তরে অজ সৌজন্যসম্মত সামান্য একটু হাসে বটে কিন্তু বোঝা যায় যে ওর স্বীকৃতি তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। এরপর ভদ্রলোক নিজেই ব'লে চলেন—সেকি ? এখনো চিনতে পারলেননা ? আমি তপেশ যে—তপেশ চ্যাক্‌রাভর্টি। সেই যে 'তপশ্চক্র' করেছিলুম। আপনি তো তার একজন প্যাট্রন্‌·· মানে ঐ কী-যে বলে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারপর কতো কী করলাম—সারা ইউরোপ টুর্‌ করলাম প্রায় দু'বছর ধ'রে। এই তো সবে ইণ্ডিয়ায় এসেছি ক'মাস।

অজ এইবার যেন ঠিক চিনতে পারে, বলে—আর বলতে হ'বেনা আপনি সেই চ্যাক্‌রা তো ? প্রথমটা একটু গোলমাল ঠেকছিলো বটে। আচ্ছা···আপনি তো এখন নিচে নামছিলেন আমরা কিন্তু যাচ্ছিলাম ওপরে।

—নন্দাদেবী দেখতে তো ? চলুননা।

তপেশ ঘোড়ায় চ'ড়ে চলতে শুরু ক'রে দ্যায়।

অজভূষণ বিরক্ত হ'চ্ছে কি খুশি হ'চ্ছে সে ওর মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই।

—সত্যি, বড়ো অদ্ভুত ! পাহাড়ের দেয়ালের কোল দিয়ে যেতে যেতে বাঁক ফিরলেই যেন চোখের সাম্‌নে থেকে সব বাধা স'রে যায়, চোখ লাফিয়ে ওঠে, দূরে দেখা যায় বরফে-ঢাকা চুড়োর পর চুড়োর সারি—রোদ্দুর লেগে যেন জ্বলন্ত কয়লার মতো গন্‌গন্‌ ক'রে জ্বলছে ··

অজর সঙ্গে কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে তপেশ আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে দুটি অপরিচিতা সুন্দরী নারীকে যেন দৃষ্টি-রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে !

—হিমালয় আর তাজ ছাড়া ইণ্ডিয়ায় আর কী দেখার আছে বলুন ?···ফাঁক পেলেই তপেশের চতুর চোখ অভীষ্টসিদ্ধি ক'রে চলে। ওরা এতক্ষণেও হয়তো বুঝতে পারেনি কিছুই।

তপেশের কথার উত্তর অজ খুব সংক্ষেপেই সারে—তাতো বটেই।

তখুনি তপেশ আবার বলে—তবে অবশ্য আল্‌প্‌স্‌ যারা দেখেছে তাদের কাছে এসব কিছুই চোখে লাগেনা।

—তাই নাকি ? তবে আবার শুনি তারাই বেশি ক'রে হিমালয় দেখতে ভারতে আসে, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গজয়ের এক্সপিডিশন চালায় আর ব্যর্থ হয়।

—আহা, আপনি ঠিক বুঝলেননা কথাটা। বড়ো মানে বড়ো হ'লেই কি হ'লো ? আচ্ছা, মণ্ট্‌ ব্ল্যাংকের ছবি কয়েকটা দেখাবো'খন আপনাকে, এনেছি। জানেন তো এককালে ফোটোগ্রাফি আমার hobby ছিলো ··

—বটে? তা তো জানা ছিলোনা। আমার জানা ছিলো কী এক চোরা কোম্পানির ইন্‌সিওরেন্স পলিসির ফাঁদ পেতে স্থবিধে পেলে মানুষ ধ'রে বেড়ান। কী করবো বলুন, এর চেয়ে ভালো কিছু পরিচয় আপনি এতদিন তো আমাদের দেননি।

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আম্‌তা আম্‌তা করেন, টুপিটা খোলেন আবার মাথায় পরেন, ব্রিচেসের ভোঁতা হয়ে যাওয়া ক্রীজ্‌টা আবার তীক্ষ্ণ ক'রে তোলেন; একবার বাসবীর দিকে, একবার শারীর দিকে চান, তারপর বলেন—আপনার কিছু গেছে নাকি তাতে? ও···হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, সত্যি সেজন্য বড়োই লজ্জিত। সেকথা ব'লে আর লজ্জা দেবেননা। সে-সব এখন চুকে-বুকে গেছে। এখন আমি আর্টিস্ট। ব'লে নির্লজ্জের মতো সগর্বে একগাল হাসেন।

—আরে, আর্টিস্ট? তবে তো গুণীলোক দেখছি! আপনার কেরিয়ার বড়ো বিচিত্র তো? প্রথমে ইন্সিওরেন্সের দালাল তারপরে ফোটোগ্রাফার তারপরে আর্টিস্ট ··পরে আরো কি হ'তে ইচ্ছে আছে—ফ্লার্টিস্ট?

তপেশ এতেও নির্লজ্জের মতো হাসে, বলে—তা আপনি বলতে পারেন। বয়সে বড়ো—দাদার মতো, ঠাট্টা আপনি করতে পারেন নিশ্চয়ই। কী বলেন আপনারা?

ততক্ষণে রিক্সা থেকে নেমে বাসবী আর শারী অজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরিচিতের প্রথম সম্ভাষণের উত্তরে ওদের মুখে ঠিক কথা জোগায়না, ওরা মৃদু হাসে।

—হ্যাঁ ভালোকথা, মিস্টর মুখার্জি—এঁরা আপনার কে কে? কই, পরিচয় করিয়ে দিলেননা? তপেশ লোভীর মতো চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

অজ বলে—ইনি আমার স্ত্রী, আর এ আমার বোন।

তপেশ দন্তবিকশিত ক'রে নমস্কারটা করতে পেরে নিজে-নিজেই যেন কৃতার্থ হয়। ওরাও প্রতিনমস্কার করে।

কই দাদা, এঁর তো কিছু পরিচয় আমাদের দিলেননা?—শারী বলে।

অজ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো, মুহূর্তে সজাগ হ'য়ে ব'লে ওঠে—ওহো এঁর পরিচয় দেওয়া হয়নি বটে—ইনি হচ্ছেন তপেশ চ্যাক্‌রাভর্টি উচ্চারণটা অবশ্য ঠিক হ'লোনা সেটা এঁকে জিগেস করলেই শুনতে পাবে এতদিন এঁকে ইন্সিওরেন্সের ঘটক ব'লেই জানতাম, এখন শুনছি ইনি আর্টিস্ট কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌!

শারী বলে—ওহো! আর্টিস্ট মানে পেইণ্টার? ছবি আঁকেন? বেশ তো

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কেউ আর্টিস্ট নেই—সত্যি, ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ আছে। ছবি আঁকেন আপনি?

তপেশ এক কথায় গদ্‌গদ হ'য়ে পড়ে, স্বীকারসূচক ঘাড় নাড়ে এবং জিগেস করে—আপনিও ছবি-টবি আঁকেন বোধহয়। অন্তত আঁকবার ইচ্ছে আছে নিশ্চয়ই।

শারী বলে—আমাদের কথা ছেড়ে দিন। শিল্পীদের জাতই আলাদা—শিল্পবোধ জিনিশটা সহজাত, ঈশ্বরদত্ত জিনিশ—যার থাকে তার থাকে—চেষ্টা করলেই কি হয়? ও-সব সূক্ষ্ম জিনিশ কী আর আমাদের দ্বারা হ'বে?

—কেন হবেনা? এই দেখুননা আমিই কি প্রথমে ছবি কখনো আঁকতে পারবো ভেবেছিলাম? ফোটোগ্রাফি আমার hobby ছিলো—তাই থেকে খেয়াল-খুশি মতো আঁকতে আঁকতে আজ আর আমি নেহাত অখ্যাতনামা আর্টিস্ট নই।

ব'লেই তপেশ একবার ঘাড় কাত ক'রে দেখে নেয়, বাসবী আর অজ কিছুটা দূরে স'রে গিয়ে কথা বলছে। সুতরাং নির্ভয়ে ব'লে ফ্যালে—আজকে আমার বহু ছবিই বহু আর্ট এক্‌জিবিশনে বহু প্রাইজ পাচ্ছে এবং বেশ চড়া দামেই বিকোচ্ছে।

শারী বলে—তবে তো এ-বিষয়ে আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সাহায্য পেতে পারি। সত্যি এক-একসময়ে এমন ইচ্ছে করে যে শিল্পী হই, কিন্তু সে শক্তি কোথা?

—কে বল্লে আপনাকে যে, সে-শক্তি নেই আপনার? তবে এটা হ'তে পারে যে, আপনি এখনো সে-শক্তির সন্ধান পাননি—সে-শক্তির সন্ধান আপনাকে কেউ একবার পাইয়ে দিলে তখন বুঝবেন যে তা দিয়ে কতো কি সম্ভব হ'তে পারে। আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকেই ভালো ক'রে জানুন—নিজেকে এখনো ভালো ক'রে জানতে পারেননি তাই অমন কথা বলছেন।

এ যেন নতুন কথা শুনলো শারী। শুনতে শুনতে তার দু'টি চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে পড়ে, দু'টি ঠোঁট একটু ফাঁক হ'য়ে যায়, তাকে এমন কথা এভাবে কেউ তো কখনো বলেনি। তার মধ্যে কী আবার নতুন শক্তি সুপ্ত রয়েছে? সেই রুদ্ধ শক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়ে নতুনতরো সম্ভাবনার পথ মুক্ত ক'রে দিতে পারে নাকি কেউ? তা আবার কখনো হয় নাকি? এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দাদার আজকের ব্যবহারটা বড্ডো যেন রূঢ় মনে হ'য়েছিলো শারীর। ভদ্রলোক কী এমন খারাপ? এঁর স্যুট্‌টা বিলেতের করা নিশ্চয়ই—বড়ো চমৎকার মানিয়েছে! কথাবার্তা বেশ তো কেমন মার্জিত, ভদ্র, চোস্ত। ব্যবহারও সপ্রতিভ—বিলেত ঘুরে না এলে মানুষের চাল-চলন দোরস্ত হয়না।

শারী, চলো এবার।···বাসবীর ডাক আসে।

প্রজ্ঞর সঙ্গে বাসবী এগিয়ে যাচ্ছে। শারীও যায় ওদের সঙ্গে মিলতে, ডেকে যায়—তপেশবাবু আসুননা।

তপেশও চলে।

পাহাড়ের আর একটা বাঁক ফিরলেই অম্নি দেখা গেলো চির-তুষারাবৃত নন্দা-দেবীর শৃঙ্গ তার পাশেই কেদার-বদরী। শারী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—উঃ কী চমৎকার বৌদি! ছাখো, ছাখো। দাদা, ক্যামেরাটা আনলেননা কেন? আনলে হ'তো।

বাসবীও বলে—সত্যি, আনলে হ'তো।

তপেশ বলে—ক্যামেরা ফেলে এসেছেন তো কী হ'য়েছে, আমার ক্যামেরা আছে। অনুমতি করেন তো নিইনা ছু'একটা স্ন্যাপ্-শট্?

অজ্ঞ তখন সরকারী সাইন-বোর্ডে আঁকা তুষারশৃঙ্গগুলোর মানচিত্রটায় মন দিয়েছে।

বার ছুই ক্লিক্ ক'রে ওঠে তপেশের ক্যামেরা। লেন্সের অভিক্ষেপ তুষার-কিরীটিনী নন্দাদেবীর দিকে নয়, ছু'টি তরুণীর দিকেই।

তপেশ তার ক্যামেরা নিয়ে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়েছে এমনই এক ফাঁকে বাসবীর কাছে এসে শারী খুব নিচু গলায় বললো—জানো বৌদি, তপেশবাবু একজন ভালো আর্টিস্ট?

—শুনছি তো তাই।

—শুনছো কি গো, তুমিও বিশ্বাস করোনা নাকি? আর শোনবার দরকারই বা কী? দেখলেই তো বোঝা যায়। বলো—বোঝা যায়না?

—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ—সত্যি ভালো, রংটাও প্রায় নিরুদার কাছাকাছি। কী বল্? চেহারাটা ভালো নয়?

—তুমি যেন একটা কী! লজ্জাশরম কিচ্ছু কি নেই তোমার?

—তোর যে ও-জিনিশটা বড্ডো বেশি আছে তাই আমার ওটা কিছু কম থাকাই তো ভালো রে? ভদ্রলোকের কতো বয়স হ'বে আন্দাজ করতে পারিস্?

—কে জানে বাপু—তুমি রাজ্যসুদ্ধু লোকের বয়সের হিসাব রাখোগে যাও।

—আহা লজ্জায় গেলেন যেন—বল্না কতো মনে হয় দেখলে?

—পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে?

—উঁহু যা ভাবছো তা নয়—দেখতে ঐ রকম বটে।

—তবে কতো?

—শুনো'খন দাদার কাছে।

তপেশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে এ-প্রসঙ্গ এখানেই চাপা প'ড়ে যায়।

অজ্ঞ এসে বলে—দশটা তো বেজে গেলো, চলো এইবার।

ওরা তিনজন রিক্সায় গিয়ে বসে। এতক্ষণ যে-খবরটি নেওয়ার জন্যে তপেশ উশ্‌খুশ্‌ করছিলো সেটা আর হ'লোনা। তাই ওকেও রিক্সার দিকে এগিয়ে আসতে হ'লো, জিগেস করতেই হ'লো—এখানে কোথায় আছেন আপনারা?

অজ্ঞই উত্তর দিলো—কুল্‌রীবাজারের কাছেই—ঐ যে মঞ্জুভিলা আছে ঐটেই আমরা নিয়েছি। কেন বলুন তো? যাবেন নাকি?

তপেশ একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলে—হ্যাঁ, না, মানে যদি বলেন যেতে তবে একদিন আসতে পারি বৈকি। তবে হ'য়েছে কি জানেন বিলেতে ঘুরে আসার পর থেকে আমি আবার বড্ডো বেশি ফর্‌ম্যালিটিটা মানি। তা যাক্‌ আপনাদের সঙ্গে অবশ্য অন্যকথা।

শারী ব'লে ওঠে—বেশ তো, যাবেন মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে। যেদিন যাবেন একেবারে আপনার আঁকা ছবি কয়েকটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

ওদের রিক্সা তখন চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

(৪)

বাসবীদের বাড়ি দুপুরের দিকে তাসের আড্ডা বসে, বিকেল পর্যন্ত চলে। আজকাল অনিরুদ্ধও এসে যোগ দিচ্ছে তাতে—আর কিছু না হোক এখানে এলে ঘরের গুমোট থেকে কিছুক্ষণ মুক্তি পেয়ে কৃতার্থ হয় অনিরুদ্ধ। বাসবী আর শারীর পক্ষেও নিঃসঙ্গ বেলাটা এইভাবে কাটে ভালোই। কারণ অজ্ঞ কাজের মানুষ—এসব বিষয়ে তার ঔদাসীন্য এতই সুবিদিত যে বাসবী ও শারী তাকে টানতেও চায়না, সেও তফাতে থাকলেই ভালো থাকে। এখানে এসেও কাজ তাকে ছাড়েনি। এমনও এক-একদিন হয় যখন অনিরুদ্ধ ছাড়া আর কেউ না আসায় অনেক খেলা সম্ভবই হয়না পার্টনারের অভাবে। তাস-খেলা জিনিশটা বাসবীর কোনোদিনই তেমন ভালো লাগতোনা কিন্তু এখানে এসে ক্রমে ক্রমে তাকেও যেন তাসের নেশায় পেয়ে বসছে।

ল্যাণ্ডোরের পথে আলাপ হওয়ার দু'একদিনের মধ্যেই এম্নি একটা পার্টনার-সমস্যাপূর্ণ দুপুরে বাসবীদের বাড়ি এসে পড়লো তপেশ। যেন মুখস্থ ক'রেই এসেছিলো এম্নিভাবে ঘরে ঢুকেই বললো—আরে, আপনাদের কী হ'চ্ছে? আজকের দুপুরে একটু সময় ছিলো ভাবলাম যাই একবার আলাপ ক'রে আসি। বলুন, অন্যায় করেছি?

বাসবী বলে—সেকি? অন্যায় করবেন কেন?

অনিরুদ্ধ একবার বাসবী ও শারীর দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর জিগেস করে—ইনি কে ? এঁর সঙ্গে আগে তো কখনো আলাপ হয়নি।

তপেশের পরিচয়টা বাসবীর আগে শারীই দিয়ে ফ্যালে, বলে—সেদিন ল্যাণ্ডোরের পথে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিলো। ইনি একজন বড়ো আর্টিস্ট। দাদার সঙ্গে আগে থেকেই অবশ্য এঁর আলাপ ছিলো আমরা কিন্তু এঁকে সেদিনই প্রথম দেখলাম।

অনিরুদ্ধের সঙ্গে তপেশের নমস্কার-বিনিময় হয়।

বাসবীর দিকে ফিরে শারী বলে—বেশ ভালোই হ'লো ; না বৌদি ? আমরা তিনজন ছিলাম। একজন পার্টনার কম পড়ছিলো। তপেশের দিকে ফিরে জিগেস করে শারী—আপনি তাস খেলা নিশ্চয়ই অপছন্দ করেননা ?

তপেশ বলে—অপছন্দ কি বরং ভীষণ পছন্দই করি।

তাস-খেলার সময়ে সেদিন ওদের তিনজনকেই স্বীকার করতে হ'লো যে ওদের পরিচিতদের মধ্যে তাস খেলায় তপেশের জুড়ি মেলাই ভার ! সুতরাং যাবার সময়ে শারীর কাছ থেকে তাদের রোজকার দুপুরের তাসের আড্ডায় যোগ দিতে আসার আমন্ত্রণ খুব সৌজন্যের সঙ্গেই গ্রহণ করলো তপেশ।

(৫)

তপেশকে রোজ দুপুরের দিকে তাসের আড্ডায় আসতে দেখে অব্জভূষণ মনে মনে চিন্তিত হ'লো বটে কিন্তু মুখে বললোনা কিছুই।

একদিন সকালের দিকে একটা কুলির মাথায় স্যুট্‌কেস্ চাপিয়ে তপেশ এসে হাজির হ'লো মঞ্জুভিলায়। অব্জ শুধুই আশ্চর্য নয় শঙ্কিতও হ'লো, বল্লো—কী ব্যাপার ? একেবারে মালপত্তর নিয়ে যে ?

—যেখানে থাকতাম মানে সেই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আজই একটা Scene হ'য়ে গেলো ওখানে আর আমার থাকা চললোনা। ভাবলুম একেবারে নিরাশ্রয় তো নই। এখানে আমার দাদা রয়েছেন যখন মস্ত জোরই রয়েছে। কী বলেন দাদা ?

অব্জ একবার বাসবীর দিকে চেয়ে তারপর সেখান থেকে স'রে যায়—যার অর্থ হ'চ্ছে তুমি যা বোঝো করো আমি এর মধ্যে নেই কিংবা আমার সম্মতিও নেই।

এই গায়ে-পড়া লোকটিকে আজ যতটা বিসদৃশ লাগলো এর আগে আর কোনোদিনও এতটা বিসদৃশ লাগেনি বাসবীর। কিন্তু ভদ্রতা যখন একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায় তখনই বিপত্তি ঘটায় সব চেয়ে বেশি। এটা দুর্বলতারই নামান্তর। এই দুর্বলতা সময়মতো জয় করতে না পারলে অনেক দুর্জনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি

পাওয়া যায়না এবং অনেক অবাঞ্ছিত পরিণতিও এড়ানো যায়না। বাসবীও বোঝে সেকথা, জানে এতে স্বামীর মত নেই, তবু ভদ্রতার মিথ্যে মুখোশটা খসাতে পারলোনা। আর তাছাড়া শারীকেও সে ক'দিন থেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা। শারী হয়তো খুশি থাকতে পারে শিল্পচর্চায় ও শিল্পীর সান্নিধ্যে। সেটাও ভাববার কথা।

আর এম্নি সময়ে শারীও জুটলো এসে। তপেশ তখন বলছিলো—ছোট্টো একটা ঘর হ'লেই চলবে আমার। দোতলায় অসুবিধে হ'লে একতলাতেই হ'বে। সংস্পর্শে এলে বুঝবেন আমি নির্বিবাদী লোক, ছবি আঁকা, ফোটো তোলা এই সব নিয়ে থাকি।

শারী তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, বলে—তাহ'লে খুব ভালো হয় বৌদি, নয়? তাহ'লে আমিও ছবি আঁকা শিখতে পারি তপেশবাবুর কাছে।…

অম্নি বাসবীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—সেকি কথা? এখানে থাকলে আপনি নিচেই বা থাকবেন কেন? আপনি একে অতিথি তাতে আবার পরিচিত—বিদেশে এসে বাসস্থানের অসুবিধেয় পড়েছেন—ওপরেই আপনাকে জায়গা ক'রে দিতে হ'বে।

ওপরের তলায়ই একখানা ঘর নির্দিষ্ট হয় তপেশের জন্য।

(৬)

দিন কয়কের মধ্যেই দেরাদূন শহর থেকে ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কিনে এলো—তুলি, রং, কাগজ, ক্যান্‌ভাস্, ইজেল ইত্যাদি। শারী ছবি আঁকা শিখবে, শেখাবে তপেশ। তপেশের ঘরটাকেই একটা স্টুডিও বানিয়ে ফেলা হ'লো। সব দেখে-শুনে অজ্ঞ বাসবীকে একান্তে ডেকে একবার জিগেস করলো—এসব কী?

বাসবী বল্লো—শারীর ঝোঁক। হোক্‌গে বাপু, যা হয় করুকগে, তুমি অমত কোরোনা।

অজ্ঞ তিক্ত হাসি হেসে একবার বললো—অমত তো আমি তোমাদের কোনো কিছুতেই করিনে, শুধু জেনে নিচ্ছি ব্যাপারটা। শারীকে ছবি আঁকা শেখাবে কে? তপেশ?

—হ্যাঁ, উনি তো একজন ভালো আর্টিস্ট।

—বটে? তোমরা অন্তত তাই ঠাউরেছো ওকে। ছবি আঁকা শেখাবার চেয়ে অন্য জিনিশই শেখাবে বেশি—সেটা কি তোমাদের মাথায় আসেনি?

—তোমার ওর ওপর আক্রোশ আছে। আমাদের তো তপেশবাবুকে এমন কিছু খারাপ মনে হয়নি এই ক'দিন দেখে-শুনে।

—না হ'লেই ভালো। কিন্তু ছবি আঁকার ঝোঁকটা হঠাৎ হ'লো কেন ওর ?

—সে আমি কী ক'রে বলবো বলো ? আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই বোধহয়।

—সেটাই তো ভাববার কথা। কলকাতায় গিয়ে যদি এ-ঝোঁকটা হ'তো তাহ'লে শহরের সেরা আর্টিস্টকে মাইনে ক'রে রেখে দিতাম ওর জন্য। নিছক আর্টের জন্যই আর্ট যদি ওর কাছে মূল্যবান হ'তো তাহ'লে তো বলার কিছুই থাকতোনা। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে তা তো নয়; কোনো একজন বিশেষ আর্টিস্ট বলবোনা, ব্যক্তির জন্যই আর্ট ওর কাছে মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে—এটাই তো আপত্তির। বিশেষ ক'রে সেই ব্যক্তি যদি তপেশের মতো আর্টিস্ট হয়। এটা অসুস্থতার লক্ষণ। মনে নেই, দিনকতক আগে বিরূপাক্ষ ডাক্তার ওর সম্বন্ধে যে সত্যকথাটা ব'লেছিলেন যে পথেঘাটে প্রেমে পড়ার একটা বাতিক আছে শারীর—মুখে কিছু বোলোনা যাতে ও মনে আঘাত পেতে পারে। কিন্তু সজাগ থেকো। ওকে সাবধানে রেখো।

বাসবী বলে—বিরুদার কথা ভুলিনি। সব মনে আছে। কিন্তু তুমি দেখো তপেশ এখানে থাকবেননা বেশিদিন। যে রকম বল্লেন তাতে মনে হ'লো বড়ো জোর দিন পনেরো কি একমাস থাকতে পারেন। ওঁরও তো একটা আত্মসম্ভ্রম আছে।

অজ বলে—পনেরো দিনটা পনেরো মাসও হ'য়ে যেতে পারে তোমরা যদি সমানে এভাবে ওকে প্রশ্রয় দিয়ে যেতে পারো।

—যাক্, প্রথমটা ভদ্রতা ক'রে দেখাই যাক্না, ক'টা দিনের আর ব্যাপার ? পরে চক্ষুলজ্জার মাথা খেলেই চলবে।

অজ এর পর আর কিছু বলেনা।

(৭)

পনেরো দিন পার হ'য়ে গেলো তপেশ যাবার কথা উচ্চারণও করেনি। বাসবী ভাবে মানুষের গায়ের চামড়া এত পুরুও হয় ? তপেশের মতো অতিথি যে এ-বাড়িতে অবাঞ্ছিত এই কথাটুকু বাড়ির মালিক যখন প্রতিটি আচারে-আচরণে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন সে-রকম জায়গায়ও লোকটি কী ক'রে যে কোনোকিছু গায়ে না মেখে থাকতে পারে এবং অম্লানমুখে চাটুকারিতার হাসি হাসতে পারে ভেবেই পায়না বাসবী। এতোটুকু আত্মসম্মানজ্ঞান যার নেই, যে এই রকম মনুষ্যত্বে ন্যূন, তাকে শারীই বা কী ক'রে প্রশ্রয় দিতে পারে ? হ'লোই বা সে শিল্পী ?

ভদ্রতার মুখোশ খসাতে পারেনা বাসবী। দিনের পর দিন যায়। তাছাড়া শারীর মনকেও তো সম্মান করতে হয়। অজ একদিন হেসে বললে—কী খবর তপেশের ?

বাসবী একটু বিষণ্ণ মুখে বলে—কী বলবো বলো ? মুখে আটকাচ্ছে···আর শারীই বা কী ভাববে বলো তো ? তার চেয়ে তুমিই যা হয় কোরো।

অজ হেসে বলে—আমি তো কালকেই কলকাতায় চল্লুম।

—সেকি ? কেন ? কালকে কলকাতায় যাওয়ার কথা কখন ঠিক করলে ?

—আজকে এখুনি। আজকের চিঠিতে জানলুম যে আপিশের ব্যাপারে বড়ো গণ্ডগোল বেধেছে যেতেই হবে অন্তত দশ পনেরো দিনের জন্যেও। আমি একাই যাবো।

—তাহ'লে তুমি ফিরলেই যাহয় হ'বে, কী বলো ?

—কী যেন ভাবছিলো অজ, এর কোনো উত্তর দিলোনা। কিন্তু একটু পরেই বাসবীকে আরো বেশি চমকে দিলো যখন বললো—কলকাতার বাড়ি ক'টা এবার তোমার নামে ক'রে ফেলবো ভাবছি।

শোনামাত্রই বাসবী যেন এক পা পেছিয়ে আসে, বলে—না, না, কেন ? এ তোমার কী রকম বুদ্ধি।

—নইলে সবই যে যাবার সম্ভাবনা আছে। কেন ? এতে তোমার আপত্তি কী ? তুমি তো আর আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছোনা। আর যদিই বা দাও তো নাহয় বেরিয়েই যাওয়া যাবে। কী বলো ?

—আঃ, তুমি কী যে বলো, ভালো লাগেনা।

বাসবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অজ ডাকলো—শুনে যাও। চ'লে যাচ্ছো যে ? চটলে নাকি ?

—না, চটবার কী আছে এতে ? তবে আমায় তুমি এ-সব থেকে বাদ দাও বুঝলে ?

—কেন বলো তো ?

—এম্নি বলছি। কেন তুমি আমায় এতটা বিশ্বাস করবে ? এদিকে সকলে তোমায় জানে এতো বড়ো হুঁশিয়ার ব্যবসাদার ব'লে—আর তুমিই কিনা এমন কাঁচা কাজ করবে ?

—তোমাকেই যদি না বিশ্বাস করতে পারবো তো আর কাকে বিশ্বাস করবো ব'লে দাও। জগৎ-সুদ্ধ লোক তো তা-ই ক'রে এসেছে এবং তা-ই ক'রে থাকে।

—তাহোক, তুমি তা কোরোনা।

—এ যে বড়ো অদ্ভুত কথা বললে তুমি।

—সত্যিই তাই। আচ্ছা, তার চেয়ে শারীর নামে করতে পারোনা?

—এইবার ঠিক বলেছো! তার চেয়ে তপেশের নামে···?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বাসবী বলে—এ-সবের আমি আর কী বুঝি বলো? তোমারই তো সব, তুমি যা ভালো বুঝবে, যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। সব কথা আমায় জিগেস করো কেন? জিগেস কোরোনা, আমার মনে অনেক গ্লানি।

—একবার স্ত্রীভাগ্যেই ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, আবার আশা করছি স্ত্রীভাগ্যে শিগ্‌গিরই সাম্‌লে উঠবো। তাই বলছি, বুঝেছো তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে বাসবী বলে—বেশ, তবে তাই কোরো। তবে দয়া ক'রে অতো অনুমতি নাই বা নিলে?

—অনুমতি নেওয়ার আছে বৈকি। একটু মন খুলে বলোইনা।

—বলছি তো—হ্যাঁ। বেশ, তুমি তাই কোরো। উকিল এ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ কোরো।

—সে তো করবোই। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো পরামর্শ কানে-কানে ক'রে যাই, শোনো।

বাসবীর হাত ধ'রে অজ নিজের কাছে টেনে আনে। বাসবীও বাধা ছায়না। ওর মুখ আশ্চর্য ফ্যাকাশে! পূজার্থিনীর পূজার সাজিতে আর একটিও ফুল নেই—স্বধু রিক্ততার বেদনা কিন্তু দেবতা বুঝি আশুতোষ, এতেই পরিতুষ্ট!

—নিজের মনের গ্লানিতে অনেক সময়ে এমন কথা ব'লে ফেলি যাতে তুমি হয়তো মনে-মনে দুঃখ পাও কিন্তু ··

বাসবীকে কথাটা শেষ করতে দেবার আগেই অজ ব'লে ওঠে—আরে, না, না, দুঃখ পাওয়ার বিলাস আমাদের জন্য নয়। আমাদের সে অবসরই বা কোথা! অন্তত আজকে তো আমার মরবার মতোও ফুরসত নেই। আমার তো মনে হয় দুঃখ-পাওয়া ও দুঃখ দেওয়ার লীলা-খেলা কল্পনাপ্রবণ কুঁড়েদের জন্য। ধরো যদি কাজের চাপে নিজেকে অলস কল্পনার দু'দণ্ড অবসরও না দিই তাহ'লে আমরা অনেক বাজে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। তাই না?

অজ এমন হাসতে হাসতে বলে কথাগুলো যে, বাসবী তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনা, স্বধু বলে—সত্যি, তাই তুমি জীবনে সাফল্য পেয়েছো, উন্নতি করেছো এবং আমার বিশ্বাস আরো তুমি করবে।

স্ত্রীর ঘর-আলো-করা রূপের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে অজ বলে—তুমি প্রসন্ন থাকলে হ'তে পারে বৈকি। সবই হ'তে পারে।

পরদিনই অজ কলকাতায় চ'লে যায়।

(৮)

অজ চ'লে যাওয়ার পরেও ক'দিন ওদের তাসের আড্ডা অব্যাহত রইলো। অনিরুদ্ধ রোজ আসতো। ওদের খেলায় যোগও দিতো বাসবীর অনুরোধে। সেদিনের খেলায় তপেশ শারীকে পার্টনার করেছে; বাসবী করেছে অনিরুদ্ধকে। তাসে তপেশের মতো পটুতা বাসবীর না থাকলেও বাসবী খেলে মন্দ না। সেদিন কিন্তু প্রত্যেক দানেই বাসবীর হার হ'তে থাকলো।

শারী দুয়ো দেবার ভঙ্গিতে বললো—কী বৌদি, আমাদের কাছে তো খুব ফুটুনি মারতে, এবার কী হচ্ছে? তোমার গুমোর এবার ভাঙলো…আর গুমোর কোরোনা।

—যা, যা, তোরা তো চোরামি করিস্, আবার বাহাদুরী নিতে চাস্ কী রে?

শারী কিন্তু অল্পে ছাড়েনা, আরো দুয়ো ছায়। ধুন্ধুমার বেধে যায়।

বলে—ইস্, চোরামি বৈকি! তুমিও কি কিছু কম করেছো? তপেশবাবুর সঙ্গে তুমি কী ক'রে পারবে বৌদি? ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার শহরগুলোয় মাসের পর মাস যিনি এ-কাজেই কাটিয়ে এলেন, Monte Carloতে থাকাকালীন যিনি কন্টিনেণ্টের নাম-করা খেলোয়াড়দের সঙ্গে বাজি রেখে খেলে এলেন তার সঙ্গে তুমি পাল্লা দিতে চাও, কী দুঃসাহস তোমার!

শারীকে ব্যঙ্গ করতে হাত তালি দিয়ে ওঠে বাসবী, বলে—কন্টিনেণ্টের নাম-করা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেই এলেন স্বধু? জিতে এলেন বল্…গল্পই করছিস্ যখন অল্প করবি কেন? এখুনি থাম্লি যে?…ব'লে যা।

তপেশের দিকে ফিরে বাসবী বললো—দেখছেন তো, কী রকম Her Master's Voice রপ্ত ক'রে রেখেছে শারী?

তপেশ হেসে দন্তবিকশিত করে।

অনিরুদ্ধ বলে—মন্টি কার্লো-তে আপনি কিছুদিন ছিলেন বুঝি? আপনার কাছ থেকে ওখানকার গল্প শোনা হয়নি তো।

বাসবী বলে—দোহাই, তুমি আর তপেশবাবুকে ঘেঁটিও না, নিরুদা। শারীর মুখে শুনলেই তো, সেখানকারই পাপ এ-সব। Monte Carlo আর Nice-এর জুয়ার আড্ডা থেকেই এ-সব বিদ্যা উনি অর্জন ক'রে এনেছেন। স্বধু এ-বিদ্যাই নয়, এ ছাড়া আরো অনেক বিদ্যাই…ওখানকার Casino-গুলো ঝাঁট দিয়ে কতো জঞ্জাল কুড়িয়ে এনেছেন তা আর নাই শুনলে।

অমি তপেশ গদ্‌গদ হ'য়ে বলতে শুরু ক'রে ছায়—ওঃ…হোঃ! অনিরুদ্ধবাবু,

যাননি কখনো 'মন্টি কার্লো'তে? বড্ডো ভুল করেছেন। সে জাদুর দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'বে যে, মর্ত্যে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তো তা বুঝি এখানেই, এখানেই, এখানেই।

এ জায়গায় বাসবী একটু টিপ্পনী কাটলো—জন্ম-জুয়াড়ীদের তাই মনে হ'তে পারে বটে! কিন্তু আপনি যে ভুল করলেন তপেশবাবু, নিরুদা কোনো জুয়াড়ী নন।

তপেশ বাসবীর কোনো কথা কানে না তোলার ভান ক'রে ব'লে চললো—জায়গাটার যেমন স্বাস্থ্য, তেম্‌নি সৌন্দর্য!

বাহ্যত গম্ভীর মুখে বাসবী এ-জায়গায় আবার টিপ্পনী কাটে—অর্থাৎ কিনা তপেশবাবুর মতে জায়গাটা অনেকটা আমারই মতো, বুঝেছো তো, নিরুদা? তবে কেন মিছে আর সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পারে যাওয়া? দরকার নেই, বুঝলে?

সকলেই উচ্চরোলে হাসে। শারী বলে—বৌদি এত ভাঁড়ামিও করতে পারে!

বাসবী ধমকের স্বরে ব'লে ওঠে—চুপ কর্, শারী। ফুল হাতে ক'রে তপেশবাবুর কথকতা শোন্ দেখি, মুখস্থ ক'রে রাখ্, আখেরে কাজ দেবে।

তপেশ ফের শুরু করে—ফরাসী রিভিয়েরায় বেশ একটা চক্কর দেওয়ার সময়ে মোটরের কিংবা ট্রেনের জান্‌লা দিয়ে যখন যেদিকে চোখ ফেরাবেন সেখানেই হয় সবুজ পাহাড়, নয় সুনীল সমুদ্রের ঝিলিমিলি। এমন জায়গা আর হয়না। মন্টি কার্লো শহরে তো বারোমাসই উৎসব! কী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, হৈ-হল্লা নাচগান, সামান্য দামে এমন উৎকৃষ্ট ভোজ্য-পানীয়, ব্যালে, রিভ্যু, কার্নিভাল, Fancy Fair Fiesta লেগেই আছে। সে অমৃতের স্বাদ একবার পেলে, সে-স্বর্গের জাদুতে একবার মন মজলে সে-দেশ ছেড়ে আসতে প্রাণ আর চাইবেনা।

বাসবী এখানেও আবার একটু টিপ্পনী কাটে—বিশেষ ক'রে ব্যালেরিনাদের আকাশের দিকে লাথি-ছোঁড়া cancan নাচ দেখলে! নয়? ঠিক বলিনি?

শারী এবার বিরক্ত হ'য়ে ব'লে ওঠে—আঃ, তুমি কী বৌদি! নাও, খেলবে তা খেলো। এবার তোমার তাস দেবার পালা!

শারী বাসবীর হাতে তাস তুলে দ্যায়। কিন্তু বাসবী তাস আছড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে।

—কী, আর টেঁকতে পারলেনা বুঝি? উঠে পড়লে যে?···শারী বিদ্রূপ করে।

—উঠবোনা তো কী করবো? তোরা ঠারে-ঠোরে ইসারায়-ইঙ্গিতে যা চোরামি শুরু করেছিস্···খেলবে কে তোদের সঙ্গে?

শারী বলে—ইস্, খেলবেনা কি পারবেনা তাই বলো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ পারবো না-ই তো। দেখলি-ই তো হেরে গেলুম। এবার তোরাই খেল বাপু, আমার আর ভালো লাগছেনা। ব'লে বাসবী একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে এবং একটু ক্লান্তভাবে টেবিল থেকে একখানা বই টেনে নেয়।

এমন সময়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন।

দেখতে পাওয়ামাত্রই শারী ব'লে ওঠে—অই 'মঞ্জু'-র মা এসে গেছে আর ভাবনা নেই। আর দরকার নেই বৌদিকে টানাটানি করার।

বাসবী বলে—যাক্, তবু ভালো! সুবুদ্ধি হোক তোদের! আমি বাঁচি। ততক্ষণ একটা কবিতা পড়ি, কী বলেন তপেশবাবু? তপেশবাবু বড়ো তারিফ করেন আমার কবিতা পড়ার।

বাসবী এবার ডাগর একটি স্কুলের মেয়ের মতোই সুর ক'রে কবিতা পাঠ শুরু ক'রে ছায়—

Macavity's a Mystery Cat: he's called the Hidden Paw—
For he's the master criminal who can defy the Law.

অতো তলিয়ে না বুঝেই তপেশ এতেও তার অভ্যস্ত চাটুকারিতার হাসি হাসে।

শারী বলে—মানে? এ থেকে তোমার বক্তব্যটা কিংবা বক্তব্যের লক্ষ্যটা তো ঠিক ধরা গেলোনা। Macavity-টি কে?

বাসবী তার পরবর্তী স্তবক আবৃত্তি ক'রেই শারীর প্রশ্নের উত্তর ছায়—

Macavity's a ginger cat, he's very tall and thin;
You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in.
His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed;
His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed.
He sways his head from side to side, with movements like a snake;
And when you think he's half asleep, he's always wide awake.

শারী বলে—আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু তারপর?

—তারপর আরো চাই? বেশ, পড়ছি মিলিয়ে নে। এর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাস্ কিনা ছাখ্। ব'লে হাসতে হাসতে বাসবী আবার আরম্ভ করে—

He is outwardly respectable. (They say he cheats at cards.)
And his footprints are not found in any file of Scotland
Yard's.
And when the larder's looted, or the jewel-case is rifled,
Or when the milk is missing, or another Peke's been stifled,
Or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair—
Ay, there's the wonder of the thing! "Macavity's not there!"

অনিরুদ্ধ হেসে ওঠে।

বাসবীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যটা বোধহয় বুঝতে পেরেই শারী হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, বলে—তোমার কথার কিছু মাথা-মুণ্ডু নেই বৌদি, ছিঃ!

বাসবী বলে—আমার কথার মর্ম তুই কি বুঝবি? তপেশবাবুকে জিগেস কর্। কী বলেন তপেশবাবু? অমৃতং মন্তাষিতম্, তাই না?

তপেশ তার স্বভাবসিদ্ধ রীতি-অনুসারে এতেও দাঁত বের ক'রে হাসে।

অনিরুদ্ধ বলে—নাঃ, বাসবী, এ তোমার অন্যায়—শারীর গায়ে লেগেছে কিন্তু।

শারীর দিকে ফিরে অনিরুদ্ধ বলে—আমি কোনো দলে নেই ভাই, আমি তৃতীয় ব্যক্তি, বলবো কে ম্যাকাভিটি?

শারী বলে—বলুন।

অনিরুদ্ধ পুরোদস্তর বৈহাসিক ভঙ্গিতে একেবারে সরাসরি হাত প্রসারিত ক'রে দ্যায় বাসবীর দিকে। তর্জনী তুলে দেখায়, বলে—ঐ ম্যাকাভিটি ব'সে আছে! বুমার‍্যাং যে ছুঁড়েছে ফুস্‌মন্তরের চোটে তার কাছেই ফিরে গেলো—দেখলে তো?

সকলেই হাসে খুব। কিন্তু বাসবীর হাসিটাই সকলকে ছাপিয়ে যায়।

হাসির হিড়িক থেমে গেলে শারী বলে—আসুন তপেশবাবু, বৌদিকে বাদ দিয়েই খেলি আমরা। 'মঞ্জুর মা'-কে পাওয়া গেছে ভাবনা কী? বৌদির এখন সাংঘাতিক রকম কবিতা পেয়ে গেছে।

নিছক শারীর জেদেই খেলা আবার বসলো বটে কিন্তু জমলোনা আর তেমন।

(৯)

নিজের ঘরে বাসবীর আজ একা-একা ঠেকছিলো বড়ো। ক'দিন হ'লো অনিরুদ্ধ আসেনা। শেষ যেদিন বাসবী গিয়েছিলো অনিরুদ্ধের বাড়ি সেদিন মলয়ার কয়েকটা বাঁকানো শ্লেষ বাসবীর বিশেষ ভালো লাগেনি। সেইজন্যে বাসবী আজ ওদের ওখানে যাবে কি যাবেনা ঠিক করতে পারছিলোনা—তাছাড়া যেতেও কেমন যেন লজ্জা করছিলো। কিন্তু নিরুদাই বা কেন আসেনা? শারী

এবার সত্যিই বদলে গেছে। দিনের মধ্যে শারীর সঙ্গে তার দু'একটা কথাও হয় কি-না-হয়। সবসময়ে ছবি-আঁকা নিয়েই মেতে রয়েছে। তাদের আড্ডা তাই আর বসেনা। সবাই কি যুক্তি ক'রে তাকে ছেড়ে দিলো? স্টুডিও-ঘরে তপেশের সঙ্গে শারী করছেই বা কী? বাসবীর কি একবার দেখে আসা উচিত নয়? তপেশের সঙ্গে মিশে শারীর সাহসও যেন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। যে-সব ছবি নিয়ে ওদের আলোচনা চলে সেগুলো যতো উঁচুদরের শিল্পই হোক এরকম খোলাখুলিভাবে আলোচনার বিষয় নয়। যতো রকম লজ্জার কুসংস্কার থেকে মুক্ত এ-হেন যে বাসবীর মন—সেও যেন ওদের আলোচনা বেশিক্ষণ সইতে পারেনা। অথচ সে অজর কাছে সবটা খুলে বলতেও পারেনি। এতে নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয় তার সবসময়ে। আজ সে ওদের স্টুডিও-ঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেলো, দোরের বাইরে থেকেই ডাকলো—শারী, ঘর থেকে একটু বেরোনা বাপু।

চাপা গলায় কানে এলো শারীর তিরস্কার—আঃ, সব ছবি ছড়িয়ে-মেলে রাখা কী-যে স্বভাব আপনার!

মেলে-রাখা ছবিগুলো সব জড়ো ক'রে সরিয়ে ফেলছিলো তপেশ এমন সময়ে বাসবী ঘরে ঢুকলো।

—আহা, থাক্না তপেশবাবু। মূর্ছা যাবোনা। শারীর মতো লজ্জাবতী লতা যদি সইতে পেরে থাকে তো আমাকে কি এমনই অধম মনে করেন? কী বলিস্ শারী?

শারী যেন শুনতেই পায়নি এমনই তন্ময় হ'য়ে ছবি আঁকতে থাকে। তপেশ বলে—আরে, না, না, কী-যে বলেন। এগুলো সব আমার ছবির কলেক্শন্ ইউরোপ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছি। পৃথিবীর যতো বড়ো বড়ো শিল্পীর বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি। শিল্প সম্বন্ধে আপনারও কি আগ্রহ আছে নাকি?

—শিল্প সম্বন্ধে যতোটা থাক আর না থাক অ্যানাটমি সম্বন্ধে তো আছে। সকলেরই তো তা থাকে, তাই না?

তপেশ একেবারে আকর্ণ দন্তবিকশিত ক'রে ফ্যালে।

চারিদিকে চেয়ে বাসবী বলে—এঃ, একেবারে লাসকাটা ঘর বানিয়ে ফেলেছেন যে! আপনার বাহাদুরী আছে তপেশবাবু।

—সব আর্টিস্টকেই কিছুদিন অ্যানাটমি শিক্ষা করতে হ'য়েছে। লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি তো মেয়েদের লাস কেটে তবে মায়ের পেটের ভ্রূণের ছবি জগৎকে সর্বপ্রথম দেখাতে পেরেছিলেন। মানুষের দেহের প্রতিটি অস্থি, প্রতিটি পেশী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষকে আঁকতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। মাইকেল এঞ্জেলো, রুবেন্স, টিশিয়ান, রাফাএল, ভেলাস্কাই, রেমব্রান্ট্ কতো নাম করবো?

গ্রীক ভাস্করদের অ্যানাটমির জ্ঞান দেখলে নতুন কিছু করতে যাওয়াই দুরাশা মনে হয়। কতোকালের সেই ভিনাস্-ডি-মিলো সেদিন যখন লুভারে দেখলাম···

বাসবীর বড়ো ক্লান্তিকর লাগছিলো তপেশের কথাগুলো, সে শারীকে ব'লে উঠলো—আচ্ছা শারী, তুই কি স্টুডিও-বাসিনী উর্বশী হ'য়ে থাকবি; ঘর ছেড়ে বেরোবিনা? চল্‌না কয়েক দান তাস খেলা যাক্। বাসবী গিয়ে দাঁড়া একেবারে শারীর পাশে। শারী বিরক্ত হ'য়ে বলে—আঃ, তুমি আবার এখানে জ্বালাতন করতে এলে কেন, বলো তো? আর কি কোনো কাজ নেই?

শারীর একখানা হাত হাতে নিয়ে বাসবী বলে—সত্যি রে, আর কাজ নেই।

—কাজ নেই তো নিরুদার বাড়ি যাওনা।

—বেশ, যেতে পারি তুইও চল্।

—ওখানে আমি গিয়ে কী করবো?

—তবে থাকগে। আয়, খানিক তাস খেলা যাক্।

—না, তোমরা তাস খেলোগে। নিরুদাকে ডাকিয়ে নিয়ে এসো। মঞ্জু মাকে ডাকাও। ছবিটা শেষ না ক'রে উঠবোনা আমি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্ মুখার্জি···তপেশ ব'লে ওঠে—আপনি ওটা ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে শেষ ক'রে ফেলতে চেষ্টা করুন। অ্যাট্-এ-সিটিং ওটা শেষ ক'রে ফেলাই ঠিক। আমরা ও-ঘরে যাচ্ছি; (বাসবীর দিকে) চলুন মিসেস্ মুখার্জি কিন্তু মিসেস্ মুখার্জিটা আর যেন ভালো শোনাচ্ছেনা কী বলেন, এবার থেকে বাসবীদি বলতে পারি?

বাসবী ছলনা-ভরা চোখ দিয়ে মুহূর্তে তপেশকে বিমূঢ় ক'রে ফ্যালে তারপর একচোট হো হো ক'রে হেসে ওঠে—আপনি বুঝি তাই বলতে চাইছেন? বেশ তো। শারী পছন্দ করে কি বলতে পারবোনা, আমি কিন্তু খুব পছন্দ করি। নামের শেষে দাদা কিংবা দিদি যোগ করলে দোষটাও খণ্ডে যায় অথচ নাম ধ'রে ডাকার স্বাদটাও পাওয়া যায়, মন্দ কি? শারী, তুই কী বলিস্?

শারী তুলি চালাতেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, ফিরেও পর্যন্ত ছাখেনা বাসবীর দিকে। খুন্‌সুটি, ঠাট্টা, শ্লেষ কোনো কিছুতেই শারীকে টানতে না পেরে শেষটায় বাসবী বলে—তাহ'লে তোর গুরুমশাইকে নিয়ে চললুম। তুই মড়া কাটতেই মত্ত হ'য়ে থাক্। আমরাও পাশের ঘরে মড়া কাটাকাটি করিগে, খবরদার, তুই যেন উঁকি মারতে আসিস্‌নে।

বাসবীর দিকে শারী ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে থাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বাসবী বলে—অমন ক'রে চাস্‌নে শারী, ভস্ম হ'য়ে যাবো যে। আসুন তপেশবাবু।

বাসবীর পেছন পেছন তপেশও বেরিয়ে যায়।

শারীর হাতের তুলি থেমে যায়, বাসবীর কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপগুলো খনো তাকে ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে। জান্‌লার বাইরে চেয়ে অনেকক্ষণ াটায়—ইচ্ছে করে এখুনি উঠে গিয়ে বাসবীর মিষ্টি-মিষ্টি খোঁচাগুলোর বেশ মিষ্টি-ষ্টি জবাব দিয়ে আসে। ওর ছবি-আঁকা আর এগোয়না। একটু পরেই তপেশ াবার ফিরে আসে স্টুডিও-ঘরে, ঢুকেই জিগেস করে—কই, কতোদূর হ'লো? বি তো আর একটুও এগোয়নি আপনার?

শারী শুধু সংক্ষেপে বলে—না। কী হলো? আপনি এখুনি যে ফিরে লেন? তাস খেলা হ'লোনা?

তপেশ বলে—না। বাসবীদি একটু কাজের বরাত দিলেন। মানে কিছু কনা-কাটার ফরমাজ আছে আর কি! এখুনি দেরাদুনে যেতে হ'বে একবার।

শোনামাত্রই শারীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে, সে শুধু বলে—তবু ভালো।

হ্যাট, ওভারকোট ও ছড়িটা নিয়ে তপেশ বেরিয়ে যায়, ব'লে যায় কয়েক ঘণ্টায় স ফিরে আসবে অর্থাৎ বিকেলের আগেই। ফিরে এসে শারীর ছবিটা যেন শেষ 'য়ে গেছে দেখতে পায়।

শারী কিন্তু ততক্ষণে আবার ছবির মধ্যে ডুবে গেছে!

তপেশকে বাজার করার ছুতোয় দেরাদুন পাঠিয়ে দিয়ে সেই অবসরে বাসবী ারীকে খানিক একা পেতে চায়। কারণ শারী আজকাল কেমন যেন বাসবীকে ড়িয়ে চলতে চায়।

তপেশ বেরিয়ে যাবার পরই বাসবী আবার স্টুডিও-ঘরে এসে ঢোকে। াসবীকে দেখামাত্রই শারী ছবি ছেড়ে উঠে পড়ে, বলে—উঃ বৌদি, আবার তুমি সেছো জ্বালাতন করতে?

—আমি এলেই খালি তোকে জ্বালাতন করি, না রে?

—করোই তো।

—না, জ্বালাতন আমি আর মোটেই করবোনা শুধু কয়েকটা কথা জিগেস বা। তোকে তো আজকাল একা পাওয়াই যায়না।

—এখানে না, আচ্ছা চলো। তোমার ঘরে তুমি যাও। আমি যাচ্ছি এগুলো ছিয়ে রেখে।

স্টুডিও-ঘর থেকে বাসবী যেম্নি বেরিয়েছে অম্নি শারী ভেতর থেকে দোরটা বন্ধ ক'রে ছায়। বাইরে থেকে বাসবী ঠেলাঠেলি করে, কতোবার খোলবার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু শারী দোর আর খোলেনা।

অগত্যা বাসবী একাই নিজের ঘরে ফিরে যায়—তার আর ভালো লাগছে
কিছুই। ঘরে জিনিশপত্রের গোছ-গাছ করে কিন্তু তাতেই বা কতোক্ষণ কাটে
আর আকৈশোর প্রিয় শ্বেতপাথরের ভিনাসের প্রতিমূর্তিকে কাপড় খসিয়ে ফে
ফের নতুন ক'রে কাপড় পরায়, আবার সাজায়। সাজানো হ'লে আদর ক'
কানে-কানে বলে—যখন নতুন প্রণয়স্বপ্নে বালিকার বুক ভ'রে দিয়েছিলে, যখ
তুমি নিরুদার ঘরের টেবিলে অকুণ্ঠিত লাবণ্যে অধিষ্ঠিত ছিলে তখন সদ্য-জা
কিশোরীর চোখে তোমার লাবণ্যের দিকে মুগ্ধ চোখে কী ভাবে যে চেয়েছি তুমি
দেখেছো সব। তারপর প্রথম যৌবনের ব্যথার উচ্ছ্বাস নিয়ে তোমার এই মু
দিকেই চেয়ে-চেয়ে কতোবার ম'রে যেতে চেয়েছি, তুমি তো বুঝেছো সব। ত
মরণ তুমি তো আমায় দাওনি। নতুন নতুন জীবন দিয়ে মরণ ভুলিয়ে রেখেছে
তারপর নিরুদার টেবিল থেকে যখন তোমায় চুরি ক'রে এনেছি, তুমি তো জেনে
সব। সারা পৃথিবী যখন মুখ ফিরিয়েছে তুমি তবুও মুখ ফেরাওনি কখনো-
তোমাকেই মেনেছি তাই আমার শেষ আশ্রয় ব'লে। দেখেছি তুমি বদলাও
একটুও আর সবই বদলেছে, কিছুই আর তেমন নেই। আজ তাই আবার তোমা
দিকেই ফের চাইছি—আমায় আবার মরণ-ভিক্ষা ভুলিয়ে দিতে নতুন কি
দাও—নতুন কোনো স্বাদ, নতুন কোনো জীবন-সঙ্কেত। যেমন নগ্ন হ'য়ে তু
একদিন এসেছিলে আমার কাছে তোমায় আবার আমি তেম্নি ক'রেই রাখবো-
এনে দেবো তোমায় একটি মনের মতো অ্যাডোনিস্।

…কিন্তু এ নিয়েই বা আর কতো সময় কাটে—বাইরের দিকে চেয়ে দেখে
দুপুরের সূর্য ততক্ষণে কিছুটা হেলে পড়েছে। শারীর স্টুডিওর দোর এখনে
তেম্নিই বন্ধ। আজ কতোদিন আসেনি অনিরুদ্ধ—ওদের বাড়ি একবার খোঁজ
খবর নিতে গেলে হয়। শাড়িটাও সে আর বদলায়না শুধু শাল একটা জড়িয়ে
বেরিয়ে পড়ে।

তীরে তীরে আজো তরঙ্গ তর্কিত

বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস হ'তে পারে কিন্তু মফস্বল শহর তো। বিশেষ ক'রে যে
শহরকে কেবল মোটর ট্রান্সপোর্টের ওপরই নির্ভর ক'রে থাকতে হয়—
ন বাসি খবরের ডাক এডিশনও গিয়ে পেঁাছয় অনেক বেলা ক'রে। এম্নি
কাদন দেরিতে-আসা কাগজখানায় অনিরুদ্ধ সবেমাত্র চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলো;
াৎ মলয়াকে ডাকলো—শুনছো?

—কী? বলো?

—কাগজে আজ একটা বড়ো দুঃসংবাদ আছে। বিরুদা অ্যারেস্টেড্ হ'য়েছেন।

—সেকি গো? কেন? আহা!

—নাও না, কাগজখানা পড়ো।

খবরের কাগজটা সে এগিয়ে দিলো মলয়াকে, মলয়া পড়লো: "কলিকাতার
টি সুপরিচিত মানসিক চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক
বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্যকে কোনো একটি সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ
া করার ও উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করার অভিযোগে গতকল্য নিজ
াভবন হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার বাসভবন তল্লাস করিয়া
াত্তিকর কোনোকিছু পাওয়া যায় নাই, বলিয়া প্রকাশ।"

মলয়া তখন সবেমাত্র সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছিলো আর অনিরুদ্ধ তখন
মনস্ক হ'য়ে ভাবছিলো এই তো কয়েকমাস আগে কলকাতা থেকে আসার আগে
াষদার দেওয়া কাগজপত্রের তাড়াটা সে বিরুদার বাড়ি পেঁাছে দিয়ে
ছিলো। সত্যি, বিরুদা চিরটা কাল শুধু পরের ঝক্কি ব'য়েই বেড়ালো, নিজের
ই করলোনা কোনোদিন। এবার ওর কী হ'বে কে জানে? ওর বাড়িটা
বলতে গেলে একরকম ধর্মশালাই। যেন সদাব্রত খোলা আছে সব সময়ে, যে
ছে সকলেরই জায়গা বরাদ্দ, আটুকে বাঁধা। মাস গেলে যে এতটাকা রোজগার
কিন্তু থাকে কতো শাদাসিধে। ওর টাকা যেন ওরই নয়, পরেরই জন্য।
বড়ো উদার অন্তঃকরণ—আমরা যে কতোদিনের জন্য হারালাম কে জানে?
সময়ে বাইরের দোরে কে যেন আওয়াজ দিলো।

—এবাড়িতে কে আছেন?

ওর চাকরটা যেন গিয়েছিলো কোথায়, অনিরুদ্ধ নিজেই জানলা থেকে মুখ
য় সাড়া দ্যায়—কে? কী চান? কাকে চান?

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক প্রায়-নিখুঁত বাংলায় উত্তর দেন—আ
আপনাকেই। আপনিই তো অনিরুদ্ধবাবু?

অনিরুদ্ধ বেরিয়ে আসে বাইরে। সবিস্ময়ে বলে—আপনি আমাকে চেনেন
আমি তো আপনাকে এর আগে কখনো দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছিনা

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক হেসে বলেন—চিনতামনা, ফোটো দিয়েই এখন আপনা
চিনলাম। কারণ একটা সিক্রেট্ মিশন নিয়ে এসেছি বন্ধুদার কাছ থেকে—মানু
টাকে ভালো ক'রে না চিনে তো আর বন্ধুদার চিঠি হাতছাড়া করতে পারিনা

—কোথায় আছেন বন্ধুদা?

—উপস্থিত দেরাদুনে। এই চিঠিতেই সব পাবেন। ভদ্রলোক চিঠিটা বে
ক'রে অনিরুদ্ধের হাতে দেন। বন্ধুদার হস্তাক্ষরে সংক্ষিপ্ত চিঠি:

দেরাদুনে আমি কাল এসেছি। আজই অন্যত্র চ'লে যাচ্ছি কাজে। খবরাখ
কিছু কিছু রাখো নিশ্চয়ই। দিন দশেক পরে দেরাদুনেই ফিরে আসবো আবা
এসে এখানে হয়তো থাকবো হপ্তাখানেক। তখন একবার তোমার দেখা পে
চাই, সুবিধে ক'রে এসো। আমার যাওয়ার অসুবিধে আছে তাই তোমাবে
আসতে লিখলাম। বোনটি কেমন আছে, এলে তোমার মুখেই শুনবো'খন।

চিঠিটা অনিরুদ্ধের পড়া শেষ হ'য়ে গেলে ভদ্রলোক জিগেস করলেন—কী বল
বন্ধুদাকে? আপনার যাওয়ার সুবিধে হ'বে তো?

অনিরুদ্ধ বলে—বলবেন, উনি ফিরে এলে নিশ্চয়ই দেখা করবো। এই তে
আর কিছু কথা আছে?

—না। ওঁর দেরাদুনের ঠিকানা চিঠিতে যেটা আছে ওটাই। আচ্ছা, অ
দেরি করতে পারবোনা।

ভদ্রলোক বিদায় নেন।

আজ থেকে দশদিন। কী তারিখটা পড়বে? ক্যালেণ্ডারে লাল পেন্সি
দাগ দিয়ে রাখে অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢোকামাত্রই মলয়া জিগেস করে—কে এসেছিলো? মঞ্জুবি
থেকে বেয়ারা বুঝি?

গম্ভীর মুখে অনিরুদ্ধ বলে—হ্যাঁ, কী ক'রে জানলে?

—এটুকু আন্দাজ করা আর শক্ত কি? ক'দিন যাওনি যে! এখুনি বে
যাবে তো?

অনিরুদ্ধ কোনো উত্তর দ্যায়না এ-কথার।

মলয়া বলে—যাওয়ার সময়ে চাকরটাকে ব'লে যেও যেন ঘরের পাশেই হাজির থাকে, ডাকলে যেন পাওয়া যায়।

অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ। হয়তো প্রথমটা ভাবলো নিজের ত্রুটির কথাই, অনুভব করলো আত্মগ্লানি, তাতেই আজ যেন আরো খানিকটা তিক্ত হ'য়ে উঠলো তার মন, সে বললো—আঁচ করেছো ঠিকই, বেরিয়েই পড়বো এবার। বেরিয়ে পড়লে তোমার কি কিছু সুবিধে হয় মলয়া?

অনিরুদ্ধের মেজাজটা আজ বড়ো বেশি ভালো নেই সেটা মলয়া স্বামীর দিকে চেয়েই বুঝতে পারে এবং চুপ ক'রে যায়।

অনেকদিন পর মূর্ছিত স্তব্ধতার পর্দা একটু যেন সরতে চাচ্ছিলো ওরা নিজেরাই তাতে আবার দৃঢ় হাতে যবনিকা টেনে ছায়। আজকাল প্রায়ই এমন দিন যায় যে মলয়ার সঙ্গে অনিরুদ্ধের নেহাৎ প্রয়োজনীয় দু'চারটে কথা ছাড়া আর কথাই হয়না। অবশ্য ঔষধপত্র দেওয়া ও সেবা-পরিচর্যা করার পক্ষে যা দু'একটা কথা, দু'চারটে মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ অপরিহার্য মাত্র সেইটুকুই ছাড়া আর যা কিছু কথাবার্তা ওদের কাছে এখন অবান্তর হ'য়ে উঠেছে। মৃত্যুর মতো স্তব্ধতার একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান মাঝখানে খাড়া ক'রে রেখে একই ঘরে দু'জন রাত কাটিয়ে যাচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গ-সান্নিধ্যের মধ্যেও যেন ওরা নিজ নিজ আন্তর নিঃসঙ্গতা কেউ কারো কাছে অনাবৃত ক'রে দেখাতে পারেনা। কেবল দুপুরের দিকে যেদিন অনিরুদ্ধ বাসবীদের তাসের আড্ডায় বেরিয়ে যায় মলয়ার সেটুকুই মুক্তি মনে হয় আজকাল। কোনো কড়া চোখের পাহারা নেই, যা ইচ্ছে করার, যা ইচ্ছে ভাবার, নিজেকে নিয়ে থাকার একটা অবাধ স্বাধীনতা মেলে। অনিরুদ্ধ এখনো গেলোনা বাসবীদের বাড়ি? ক'দিনই যাচ্ছেনা বটে কিন্তু কেন? সূর্য্যি হেলে পড়লো, ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে, মঞ্জুভিলার কাচগুলো জ্ব'লে উঠেছে পড়ন্ত রোদে, ঝাড়ুদার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে—ধূমের স্তম্ভ খানিক দূর সরল রেখায় উঠে তারপর ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে—পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে বেয়ে উঠছে ওপরে, আরো, আরো ওপরে। এই শান্ত সূর্যাস্তচ্ছবির দিকে চেয়ে-চেয়েও যেন অনিরুদ্ধের মনের অশান্তি কিছুতেই মাথা নত করেনা। জীবনের এতগুলো বছর ধ'রে তুমি কী ক'রে গেলে অনিরুদ্ধ? একটা জড়ের সেবা? এ কি কোনো একটা বৃত্তি হ'তে পারে পুরুষের জীবনে? আপ্রাণ ক'রে একটা জড়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় নিজেও জড়ের মতো হ'য়ে রইলে? প্রেমের তৃষ্ণা কি মিটলো তাতে? তিক্তভাবে হেসে ওঠে অনিরুদ্ধের মন। প্রেম কোথায়? তবু কর্তব্য তো ক'রে যেতে হ'বে স্বীয় পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি। প্রেম না থাকলেও কি কর্তব্য থাকে? আর যদি তা থাকতোও তবে

দেশের প্রতি কর্তব্য, দশের প্রতি কর্তব্য কি একের প্রতি কর্তব্যের চেয়ে বড়ো নয়? মূঢ়! কী পেলে তুমি? ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক ক্রমে উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে।

ঠিক এই রকম মুহূর্তে হাস্যমুখী বাসবী ঘরে ঢুকে অবাক্ ক'রে দিলো অনিরুদ্ধকে। অনিরুদ্ধ এতক্ষণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলো এবার একটু স্বস্তির শ্বাস ফেললো। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই বাসবী অভিযোগ করলো—তুমি ক'দিন যাচ্ছোনা কেন, নিরুদা?

অনিরুদ্ধ শুধু চেয়ে রইলো বাসবীর দিকে, জবাব দিলোনা কিছু। অনিরুদ্ধ দেখে একটু অবাক্ হ'লো যে, বাড়িতে থাকার শাদাসিধে বেশবাসেই চ'লে এসেছে বাসবী। আটপৌরে একটা ডুরে শাড়ির ওপর একটা শাল, তাতেই আরো যেন মহীয়সী মনে হ'লো ওকে। মিহি তাঁতের ডুরে শাড়ির প্রতি পক্ষপাত বাসবীর চিরকাল—ভগবানদত্ত সুন্দর রং, সুন্দর চেহারা, সুন্দর গড়ন, ডুরে শাড়িতে মানায় আরো ভালো, বয়স আরো কম দেখায়, দেখায় আরো ছিপ্‌ছিপে। ফিকে ফিরোজা ডুরে শাড়ির সমান্তরাল রেখাগুলো এমন পেঁচিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে সুন্দর দেহখানা যে, মনে হয় যৌবনের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে এই যেন সবেমাত্র বিশ্বজয় করতে বেরিয়ে এলো। বয়সের হিশেব মনে হয় মিথ্যে। ওর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতেও মনে থাকেনা। মলয়ার দিকে ফিরে বাসবী বলে—তোমার কী খবর বৌদি, কেমন আছো?

বাসবীর এই কুশল-প্রশ্নের জবাবে মলয়া খুব বিনীত ও বিমর্ষভাবে কী যেন বললো, বোঝা গেলোনা কিছুই।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ গায়ে কোটটা চড়িয়ে এবং পায়ে জুতোটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো—তুমি তা'হলে বোসো, বাসবী। আমি একটু বেরোই।

এখুনি ফিরছো তো?—মলয়ার এই প্রশ্নটা বুঝতে না পারা কিংবা শুনতে না পাওয়ার ভান ক'রে বেরিয়ে গেলো অনিরুদ্ধ।

মলয়া এইবার বাসবীর দিকে চেয়ে বললো—ওঁকে তো আজ যেতে বল্লাম তোমাদের ওখানে কিন্তু গেলেন আর কই। যাহোক তুমি তো তবু এলে। কে জানে কেন ওঁর মন-মেজাজ আর ভালো নেই সে হয়তো তুমি ওঁকে দেখেই বুঝতে পারছো। তোমাদের ওখানে গেলে ওঁর মেজাজটা তবু কিছুটা ভালো থাকে—এটা বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। সে তো তুমি জানোই, বোঝোই তো সব। সব সময়ে রুগীর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে থাকা—একি কারো ভালো লাগে?—তাও দু'একমাস নয়, দু'এক বছর নয়, বছরের পর বছর। উনি ব'লে তাই ··অন্য কেউ হ'লে···মলয়ার কথা এখানে এসেই বেধে যায়।

আর কতোদিন বাঁচবো বলো তো ভাই? মলয়া শেষ করে এম্নি একটা বেদনার্দ্র প্রশ্ন দিয়ে।

—যতোদিন আমি বাঁচবো।...বাসবী মলয়ার একখানা হাত তুলে নেয় নিজের হাতের মধ্যে। সে সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে মলয়ার চোখ ফেটে যেন জল আসতে চায়। সে প্রাণপণে সাম্‌লে নেয়।

সেই বাসবী—যাকে মলয়া কোনোদিন ভালো চোখে দেখতে পারেনি তার কাছেই কি শেষে দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলছে ..ছিঃ! স্বামীর ওপর তার মুঠি যে কতোটা শিথিল সেকথা স্বীকার করতে প্রত্যেক স্ত্রীরই আত্মমর্যাদায় বাধে—বিশেষ ক'রে স্বামীর প্রাক্তন প্রিয়পাত্রী বাসবীর কাছে তার সেই গোপন সত্যটি প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক লজ্জায় মলয়ার প্রথমটায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো। মলয়ার আহত গর্ব এখানেই যেন তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে ছায় পাছে সে আরো দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফ্যালে।

বাসবী বলে—নিরুদার সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি? বুঝেছি। বাবাঃ, ঘরের কী গুমোটই তোমরা তৈরি ক'রে রেখেছিলে!

বাসবীর কথাটা গায়ে না মেখে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে মলয়া, বলে—এর ওপর তুমিও আবার তোমার নিরুদার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বোসোনি তো? তুমিও ঢুকলে উনিও বেরোলেন। কী ব্যাপার? এমন তো হবার কথা নয়।

—ঝগড়ার কথা কী বলছো, বৌদি! আগে আগে রাগ হ'লে মারামারি আঁচড়াআঁচড়ি ক'রেও যাহোক ক'রে মীমাংসা ক'রে ফেলেছি কিন্তু দু'দণ্ড মুখভার ক'রে ব'সে থাকতে পারিনি। কথায় কথায় মনান্তর হ'লে হয়তো এখন তোমরা দু'জনে দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ ব'সে থেকে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারো কিন্তু তখন আমরা যা ছিলাম তাতে ও-রকম বুড়োটে ঝগড়া মোটেই আমাদের ধাতে সইতোনা। নিরুদা উপস্থিত থাকলে ভজিয়ে দিতাম কথাটা সত্যি কি মিথ্যে। সেই নিরুদা এখন যদি বদলে গিয়ে থাকে তো তোমার হাওয়া গায়ে লেগেই বদলে গেছে।

বাসবী হাসতে হাসতে বলে কথাগুলো—মলয়াও ওর হাসিতে যোগ দিতে চেষ্টা করে কিন্তু কোথায় যেন বাধা পায়, বুকে একটা কাঁটা ক্রমাগতই যেন খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে।

বাসবী বলে—আমার ননদটিও তোমার মতো বড়ো বিমর্ষ, বিষণ্ণ। সেইজন্যেই আমার সঙ্গে প্রায় খিটিমিটি লাগে কিন্তু ওকে নিয়ে এমন ক'রে তুলি যে আমার ওপর রাগ ক'রেও থাকতে পারেনা বেশিক্ষণ।

সূর্য বিম্ব তখন চ'লে গিয়েছে পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে, ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, বাসবী যখন উঠলো। তখনো ফেরেনি অনিরুদ্ধ।

মলয়ার যে চোখের বালি, বুকের কাঁটা—সেই বাসবীকেই মলয়া নিমন্ত্রণ ক'রে ফ্যালে, বলে—তুমি আসোনা কেন ভাই—এত কাছে থাকো? দু'দণ্ড তবু গুমোটটা কাটে। আসবে তো?

মলয়া আজ বাসবীকেও চায়, বাসবীকেও আমন্ত্রণ করে। ঘুমভাঙা থেকে আবার ঘুম না-আসা পর্যন্ত ঘরের স্তব্ধতার গুমোট আর স্বামীর অন্ধকার মুখ তারও আর সহ্য হয়না। এখন বাসবীকে জানিয়ে দিতেও মলয়ার বাধলোনা যে, সে নিজের স্বামীকে সুখী করতে পারেনি, স্বামীর সব অভাব মেটাতে পারেনি, প্রেমে মন ভরিয়ে তুলতে পারেনি। অনিরুদ্ধের মনের যেখানটায় মরু জেগে রয়েছে সেখানে খানিকটা মৌসুমী মেঘের ছায়া ফেলতে পারবেনা বাসবী? একমাত্র বাসবীই যে তা পারে!

মলয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময়ে বাসবী ব'লে আসে—আসবো বৈকি বৌদি, রোজ আসবো, দিনের মধ্যে যতবার বলবে ততবার আসবো। অবশ্য তাতে তুমি যদি কিছু মনে না করো কিংবা নিরুদা যদি কিছু রাগ না করে। সময় সময় নিরুদাকে দেখে আমারও কেমন যেন ভয় করে। কী হ'লো বলো তো ওর? এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

এর জবাব আর কী দেবে মলয়া? নিজেই তা জানে কি?

মলয়াদের বাড়ি থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে বাসবী, দেখতে পেলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে অনিরুদ্ধ। বাসবী ওর কাছে এসে বলে—একি! নিরুদা এখানে দাঁড়িয়ে যে?

হাতের সিগারেটটায় লম্বা একটা টান দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া উড়িয়ে দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে অনিরুদ্ধ বলে—দেখছি ঘর ভালো না পথ ভালো—আমার পক্ষে পথই ভালো, বাসবী।

বাসবী বলে—তবে এসো পথ ধ'রেই ঘুরে আসি খানিক। কোন দিকে যাবে?

—কোনোদিকেই যাবোনা, তোমাকে বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিই এসো। আমার পক্ষে যেমন পথ, তোমার পক্ষে তেম্নি বাড়িই ভালো। আজকের কাগজটা পড়েছো?

—না, এখনো পড়িনি। কেন বলো তো?

—বিরুদা ধরা পড়েছেন। অভিযোগ হ'লো সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ-সাহায্য করা।

—সেকি? ইস্! অমন নিঃস্বার্থ মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। অদ্রীশবাবুকে আবার বাড়িতে এনে রেখেছেন, সতী একা কী করবে, বলো তো?

প্রবোধদা-বন্ধুদার দল এতে খুব বড়ো রকমের একটা ঘা খেলো। সত্যি, শুনে মনটা এত খারাপ হ'য়ে গেলো।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ এর কোনো উত্তর দিলোনা তারপর বললো—তুমি কী মনে ক'রে হঠাৎ আজ এলে আমাদের বাড়ি ?

—কিছু মনে ক'রে তো আসিনি। এম্নি এসেছিলাম। তুমি যাওনি কেন ক'দিন ? ভালো লাগছিলোনা বাড়িতে, সত্যি বিশ্বাস করো। বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেনা কিন্তু আমিও তোমারই মতো বড়ো একা। এতদিন শারীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি খুনসুটি ক'রে দিন কাটতো এখন আর তারও উপায় নেই। ও যেন দিন-দিন বদলে যাচ্ছে। এখন সবসময়ে সে তার স্টুডিওতেই থাকে। আমার ঘরে আসেনা বেশি, এলেও বেশিক্ষণ থাকেনা।

—তাহ'লে তাসের আড্ডা বসছেনা ক'দিন ?

—না। আজকাল তাসখেলায় ঝোঁক নেই। আজকাল ও তপেশবাবুর কাছে ছবি-আঁকা শিখছে। ওর জন্যই তো তাসের আড্ডা বসতো। আর বসলেই বা কী ? তুমি কি মনে করো তাসখেলার প্রতি আমার সত্যি কোনো আকর্ষণ ছিলো ? তুমি যেতে তাই আমিও বসতাম।

—বেশ, আমিও যাচ্ছি চলো।

—না, তোমার আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই। তাসখেলা মোটেই ভালো লাগবেনা আর। তার চেয়ে চলো বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা দূর যাই। অনিরুদ্ধের হাত ধ'রে বাসবী টান দ্যায়, বলে—এসো, চলো।

অনিরুদ্ধকে ওর সঙ্গে যেতেই হয়।

—আচ্ছা ক'দিন থেকে তুমি এতো মুখভার ক'রে থাকো কেন বলো তো ? সত্যিকথা বলবে, লুকোবেনা। কী হ'য়েছে ? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছো বুঝি ?

—ওসবের মধ্যে তুমি ঢুকতে যেওনা বাসবী, তোমাকে অনুরোধ করছি। ও-সব কথা বাদ দাও। অন্যকথা কও।

—না। এতদিন এ নিয়ে কি কোনোকথা জিগেস করেছি তোমাকে ? আজ কিন্তু আমার কথার উত্তর তোমাকে দিতেই হ'বে। সাহস ক'রে এ প্রশ্ন করিনি এতদিন, আজ করতেই হ'লো ! বলো, আজো কি তুমি অসুখী ?

—মাপ কোরো বাসবী, এমন অর্থহীন প্রশ্ন কোরোনা। এর উত্তর দিতে পারবোনা। তার চেয়ে তুমি আর এসোনা আমার বাড়ি। কেন আসো ? বুঝতে পারোনা কিছু ? এর পরে এলে তুমি তোমার নিজেরই সম্ভ্রম নষ্ট করবে, তখন আমার ওপর রাগ কোরোনা।

—কেন ? একথা কেন বলছো ? এমন কথা বোলোনা তুমি, নিরুদা ! এ তোমার মনের কথা নয়—আমি জানি এ তোমার মিছে কথা—একথা তুমি এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করবোনা, করবোনা, করবোনা। আজ তুমি শুধু শুধু আমার ওপর এতো রাগ করছো কেন বলো তো ? রাগ কোরোনা। আমি রোজ আসবো, দেখি তুমি কতো তাড়িয়ে দিতে পারো। আমি বৌদির কাছে আসবো—বৌদি আমায় ব'লে দিয়েছে যে রোজ আসতে। রোজ আসবো, দিনে যতবার ইচ্ছে আসবো, দেখি তুমি আমাদের দু'জনের সঙ্গে কতো ঝগড়া করতে পারো। দেখি তুমি কী রকম তাড়িয়ে দিতে পারো ?

অনিরুদ্ধ হেসে ফ্যালে, বলে—তোমাকে তাড়াবো কী ? তার চেয়ে তো নিজে বেরিয়ে যাওয়াটাই আমার পক্ষে সোজা হ'বে। সেটা জানো ব'লেই তো বাসবী তোমার এত জোর। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে—আমার জন্যে নয় বাসবী, তোমার বৌদির জন্যেই বলছিলাম তুমি আর এসোনা। উনি তোমাকে বিশেষ পছন্দ করেননা।

—ওমা ! এই কথা ? আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো এমন নতুন কিছু শোনাবে যাতে অবাক্ হ'য়ে যাবো। তাই তো আমি বৌদিকে অতো পছন্দ করি—বৌদি বেচারীকে তুমি বড্ডো ঠকিয়েছো, আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি। ওকে আমি কাছে টেনে নেবো। ওর হ'য়ে আমি তোমার সঙ্গেও ঝগড়া করবো। বেচারী বড়ো ভালো মানুষ।

অনিরুদ্ধ শ্লেষ করে—তবু ভালো ! এতোটা টান শেষ পর্যন্ত থাকলে বাঁচি ! তোমার সম্বন্ধে তোমার বৌদির ধারণা যে কী তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার পরও যদি তোমার এই সহানুভূতি বজায় থাকে তখন বাহবা দেবো। যাক্ অনেকটা চ'লে এসেছো, এবার ফেরো। অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আজকে বেশ শীত পড়েছে, শীত-শীত লাগছেনা, বাসবী ?

রাস্তার প্রান্তেই ব'সে পড়ে বাসবী। এক ফুট দূর থেকেই ঢালু নেমেছে—গভীর খদ।

বাসবী বলে—তুমি ফিরে যাওনা নিরুদা, তোমাকে তো বেঁধে রাখিনি।

—আমি তো যাবোই, তুমিও চলো।

—না। তুমি যাও। বাসবী ওঠার কোনো লক্ষণ দেখায়না। তখন প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে।

—বেশ তবে থাকো তুমি।

বাসবীকে ফেলে খানিকটা রাস্তা চ'লে যায় অনিরুদ্ধ, বাসবী অতলগহ্বর খদের

দিকে চেয়ে ব'সে থাকে অন্ধকারে। আবার ফিরে এসে বাসবীর হাতখানা সে তুলে নেয়, বলে—ইস্ তোমার হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা যে—স্থধু একখানা শাল জড়িয়ে কেন এতদূর এলে? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়? না, না, চলো তুমি। একি কাঁপছো তুমি বাসবী?

বাসবী বলে—শীতে নয়।

হাত ধ'রে টেনে ওকে উঠিয়ে নিয়ে আসে অনিরুদ্ধ। বাসবী হেসে ওঠে আবার সেই পাহাড়-কাঁপানো হাসি। অতো রোখ্ করে চ'লে গেলে আবার ফিরে তো আসতে হ'লো, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হ'লো। আচ্ছা, এবার একটা কথার জবাব দেবে?

—কী?

—আচ্ছা এখনো তুমি আমার জন্যে ভাবো? ভেবে কী লাভ? ভেবে দেখেছো কী?

—তুমি কেন ভাবছো এত আমার জন্যে, বলো আগে।

—কী জানি! না ভেবে পারিনা যে।

একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে পড়েছিলো ওরা। বাসবীর মুখ আশ্চর্য ফ্যাকাশে মনে হয়।

হাতখানা বড্ডো হিম হয়ে গেছে। তোমার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলি নিরুদা? গ্লাভ্সের কাজ হ'বে।

কুলায়-প্রত্যাশী ভীরু সন্ধ্যার পাখির মতো—রবীন্দ্রনাথের লাইনটাই খালি খালি মনে আসে অনিরুদ্ধের। বাসবীর শীতার্ত হাতখানা অনিরুদ্ধের কোটের পকেটের উষ্ণ বিবরে আত্মহত্যা করে। অনিরুদ্ধের এতে আপত্তি হ'তেই পারেনা।

—আচ্ছা ধরো, বৌদি যদি সেরে ওঠে, আমি যদি ম'রে যাই তাহ'লেও কি তুমি সুখী হ'তে পারোনা?

অনিরুদ্ধ পথ চলতে থাকে, যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো।

—বলো, চুপ ক'রে থাকলে হ'বেনা, বলো।

—কী বল্লে? তোমার বৌদি যদি সেরে ওঠে? তুমি যদি ম'রে যাও? আমি যদি পাগল হ'য়ে যাই, কি আত্মহত্যা ক'রে বসি? কিংবা নীহারিকার মালা ছিঁড়ে মসুরীর উপত্যকায় এই দণ্ডে ঝর ঝর ক'রে এক পশলা উল্কা বৃষ্টি হয়, কিংবা হিমালয়ের চুড়ো ধ্ব'সে শহরটা এক দণ্ডে মানচিত্র থেকে মুছে যায় কিংবা পৃথিবীর যে-ক্রেটারে দাঁড়িয়ে আজ আমরা কথা বলছি হঠাৎ কোনো একটা বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে আমরা সবাই শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হই, ভারত মহাসাগর যদি এই

মুহূর্তে বন্যার সৈন্য নিয়ে উঠে আসে হিমালয়ের গিরিসানু বেয়ে, গ্রাস ক'রে ফ্যালে নন্দাদেবী, গৌরীশৃঙ্গ। শনিগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর নিজকক্ষায় হঠাৎ ঠোকাঠুকি লেগে জ্ব'লে ওঠে কিংবা গুঁড়ো হ'য়ে যায় আমাদের এই পৃথিবী।···সব তাতেই আমি সুখী হ'বো কিংবা যদি ··

বাসবী এবার অনিরুদ্ধের মুখে হাত চেপে ধরে, বলে—আর থাক, চুপ করো, ভাবতেও যে ভয় করে, অমন ক'রে ব'লে যেওনা, সইতে পারিনা। বলো তুমি কিসে সুখী হ'তে পারো?

বাসবীর কাঁধে হাত রাখে অনিরুদ্ধ, বলে—তোমার প্রেমই কি তোমায় আজো রানীর মতো ক'রে রেখেছে, বাসবী? মুখের কাছে মুখ এনে অনিরুদ্ধ বাসবীকে ছাখে। বাসবী হেসে ফ্যালে, বলে—কী দেখছো? আমাকে কি কিছু বলবে?

অনিরুদ্ধ বলে—আশীর্বাদে যদি আমার আস্থা থাকতো তাহ'লে বলতাম তুমি যেন জরা জয় করতে পারো। আর কী বলবো?

আবেগাতিরেকে অনিরুদ্ধ বাসবীর হাতখানায় প্রচণ্ড একটা চাপ ছায়। বাসবী বলে—এ তোমার সেই পুরোনো খেলা! যতোই লাগুক তবু ভালো লাগছে। আরো, আরো চাপ দাও, হাতটা ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাক। দেখো, আজ আর আমি চ্যাঁচাবোনা, উঃ পর্যন্ত করবোনা, কাঁদবোনা, কিছুতেই কাঁদবোনা আজ। আজ যখন এত ঘন হ'য়ে কুয়াশা ঘিরে ধরেছে আমাদের চারিদিক থেকে, কোলের মানুষ চেনা যাচ্ছেনা, আজ যখন দূরের বাতিগুলোর চোখে কুয়াশার রং ঘনিয়েছে, বলো, আজকে কি কিছু বলবে? কোনো হুকুম? এমন কোনো আদেশ? যতোই কঠোর হোক যে-আদেশ মনপ্রাণ দিয়ে সারাজীবন পালন করতে পারবো তোমার মুখে হাসি ফোটাতে?

—না বাসবী। তুমি অমন ক'রে বোলোনা; আমার সব জোর চ'লে যায়। তোমার শুভই যেন আমার জীবনের ব্রত হোক। ইচ্ছার সঙ্গে সে-সংগ্রাম যতো দুঃসহ হোক তাই আমি করবো।

বাসবী বলে—এখনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছেনা, যাবে কোনো সিনেমায়? পথেই তো পড়বে? কিংবা কোনো রেস্তর্াঁ-য়।

অনিরুদ্ধ বলে—কাজ নেই। তোমার বাড়ি ফিরতে দেরি করা উচিত হ'বেনা বাসবী।

বাসবী বলে—অতো উচিত-অনুচিত জানিনা, নিরুদা। দিন-দিন তুমি অতো হিশেবী হ'য়ে উঠছো কী ক'রে? আমার আজ কিন্তু কোনো হিশেব নেই—হয়তো ভাবছো রাত ক'রে বাড়ি ফিরলে কী কৈফিয়ৎ দেবো স্বামীর কাছে—হয়তো কিছুই

দিতে পারবোনা, নয়তো দেবোওনা কিংবা প্রয়োজনও হ'বেনা। যার ভরসাও নেই, তার ভয়ও থাকেনা। আমার ওপর খুব রাগ হ'চ্ছে, না?

—হুঁ, ভীষণ!

—আচ্ছা তুমি আমায় মেরে ফেলতে পারো?…বালিকার সরলতা বাসবীর চোখে।

—পারি বৈকি।…হেসে ফ্যালে অনিরুদ্ধ।

—তাহ'লে আমায় নিয়ে তোমার যতো ভাবনা-চিন্তে সব শেষ হ'য়ে যায়।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বাসবী। স'রে যায় রাস্তার একধারে, যার এক হাত তফাতে অতলস্পর্শী খদ। সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? কী দেখছো?

—ছাখো না, দেখে যাও নিরুদা—ঐ খদে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঠিক যেন হাত বাড়াচ্ছে কালো, পরুষ, রোমশ হাত। ঐ হাতের কাছে সঁপে দিতে পারো আমাকে? তাহ'লে তুমিও নিশ্চিন্ত হও, আমিও নিশ্চিন্ত হই।—নাঃ, পারিনা, পারিনা নিরুদা, তুমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে বাঁচার জন্যে লোভ হয়। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিনা ঐ কালো হাতের মধ্যে। তুমি আমায় ঠেলে দিতে পারোনা ঐ কালো হাতের কাছে? একটি ঠেলা শুধু! ব্যস! বলো দিতে পারবে তো এসো।

অনিরুদ্ধ এসে স্বধু বাসবীর হাতখানা ধরে; হাত দু'খানা তখনো থরথর ক'রে কাঁপছে, বলে—এসো, এদিকে স'রে এসো। এই তো সে কালো হাত যার বুকে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো অথচ পারছোনা, এই তো সে অন্ধকার যার বুকে নিজেকে নিঃশেষে মুছে দিতে চাইছো অথচ পারছোনা।

অনিরুদ্ধ বাসবীকে বুকের সঙ্গে চেপে ধ'রে বলে—মাপ করো বাসবী, আমি বড়ো হতভাগ্য কোনোদিক থেকেই তোমার যোগ্য নই, রানী। তুমিও কি তবে সুখী নও?

—কেন সুখী নই? বাইরে থেকে সুখের উপকরণ বলতে সকলে যা বোঝে তার মধ্যে কোনটার অভাব আছে আমার, বলতে পারো? কিছুরই অভাব নেই। ঘর-সংসার, স্বামী, অর্থ, দাস-দাসী, মান-সম্ভ্রম কি নেই আমার? সুতরাং নিশ্চয়ই আমি সুখী। আর দেখতেই তো পাও কী রকম হাসি ছিটিয়ে বেড়াই চারিদিকে? ঐ যে তুমি এখুনি যা কবিত্ব ক'রে বলছিলে যে, যে-ক্রেটারে দাঁড়িয়ে আমরা আজ কথা বলছি যদি কোনো একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে আমরা মহাশূন্যে ছিটকে পড়ি তবুও আমার এ সুখের বীজাণু গ্রহে, নক্ষত্রে ছায়াপথের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে প'ড়ে হা হা ক'রে উন্মাদের হাসি হেসে-হেসে ফিরতে থাকবে। বলো, আমাকে কি তুমি অসুখী বলতে পারো?

—তুমি কবি বাসবী, আমি কি তোমার যোগ্য? ভাবতেও অবাক লাগে একদিন কেমন ক'রে আমার মতো হতভাগ্যকেও ভালোবেসে ফেলেছিলে। তোমার অনিন্দ্য দেহের মতোই তোমার মন, হৃদয়!

—অমন কথা তুমি বোলোনা নিরুদা, আমার সে কুমারীচোখের গ্রীক-দেবতাটির আজো তো জোড়া খুঁজে পাইনি—চারপাশের ভিড়ে তো কতো মুখ চোখে পড়ে, কতো দেহের ছবি পাই কিন্তু এমনটি তো আর পাইনি। এত সুন্দর দেহের মধ্যে এত সুন্দর মন! আমি যে পাইনি ব'লেই আমার এত আপশোষ, ঠিক তাও নয়। যে-কোনো মেয়ে পেলে বর্তে যেতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারো ভোগেই এলোনা। যে পেলো তার নেবার শক্তিই নেই। ভগবানের রাজত্বে এ রকম অপচয়ও হয়? আপ্‌শোষ হয় তোমার জন্যে। তোমার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করবার লোক রয়েছে, তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে তোমার স্ত্রী, কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। আমি বুঝি তোমার দুঃখ, নিরুদা।

—আমার দুঃখ বুঝে মিছে তুমি কষ্ট পাও, বাসবী। অনিরুদ্ধের বাহু বাসবীর পিঠ বেষ্টন ক'রে ওকে কাছে টেনে আনে। বাসবী অনিরুদ্ধের মুখের দিকে মুখ তুলে চায়। তার দেহ কাঁপছে।

অনিরুদ্ধ বলে—একি, কাঁপছো তুমি বাসবী? কাঁদছো? না না শান্ত হও। আমার গলার মাফলারটা তোমার গলা মাথা ঢেকে জড়িয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও। নিজের গলার মাফলারটা খুলে মাথা-গলা ঢেকে দিচ্ছিলো বাসবীর—সেই স্নেহস্পর্শে এক ফোঁটা তপ্তজল পড়ে অনিরুদ্ধের হাতের ওপর। অনিরুদ্ধ চিবুকস্পর্শ ক'রে বাসবীর মুখখানা তুলে বলে—একটু আগে না বল্লে তুমি কাঁদবেনা কিছুতেই? এখন একি হ'চ্ছে?

—এ কান্না নয়, নিরুদা।

—তবে কী?

—আনন্দ। সে আনন্দ তোমারও চোখে; এসো মুছিয়ে দিই। সুরভিত শাড়ির প্রান্ত দিয়ে বাসবী মুছিয়ে দ্যায় অনিরুদ্ধের চোখ। শাড়ির মোলায়েম সুগন্ধ স্পর্শে আর উদগ্র আদরের সেই মত্ত মুহূর্তে ম'রে যেতে ইচ্ছে করে অনিরুদ্ধের।

বাসবী বলে—অসহ্য আমার সুখ নিরুদা, অসহ্য আমার দুঃখ, তারো চেয়ে অসহ্য আমার প্রেম। তোমার দু'টি বাহুর মধ্যে আমাকে পিষে ফেলতে পারোনা? দলিত একটা মাংসপিণ্ড ক'রে শেষে নাহয় ফেলে দিও ঐ অতল গভীর খদের তলায়—কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না, তার শব্দে শুধু রাত্রি হয়তো একবার শিউরে উঠবে তারপর সব শান্তি। সেই শান্তি আমি চাই, সেই শান্তি আমি তোমায় দিতে

চাই। এত সহজ ক'রে বলতে পারিনি কোনোদিন, আর কখনো পারবো কিনা তাও জানিনা। এমন ক'রে হৃদয় মেলে ধরতে পারিনি কোনোদিন, আর কখনো সুযোগ হ'বে কিনা কে বলতে পারে? তবে তুমি শুধু এই সত্যটুকু জেনে রাখো যে, এ-জগতে অন্তত আরো একটি নারীহৃদয় আজো জেগে আছে তোমার সুখ, তোমার দুঃখ যার কাছে জীবন, মরণ। অথচ সব চেয়ে করুণ পরিতাপ কিংবা অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের বিষয় এই যে, সেই নারী তোমার স্ত্রী নয়, অপরের।

পথ চলতে চলতে একটা 'কাফে'র সামনে এসে পড়েছিলো ওরা। অনিরুদ্ধ বলে—চলো ভেতরে, আজ তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে খুব, গরম পানীয় কিছু···

—কিছু দরকার নেই নিরুদা, ওখানে বড্ডো আলো। আমার এই অন্ধকারের নেশা অতো কড়া আলোর তলায় গিয়ে যদি ছুটে যায়। তখন যে হায়-হায় করতে হ'বে। তুমি ভেবোনা নিরুদা, অতো সহজে আমার কিছুই হয়না, ঠাণ্ডাও লাগেনা। ভুলে যাচ্ছো কেন আমি বৌদির মতো নয়, আমি তোমারই মতো—তোমারই হাতে গড়া যে। আর তাছাড়া সবার সেরা গরম পানীয় তুমি রয়েছো পাশে···তুমিই আমার মদ। একটি চুমুক দিয়ে এসো পাগল করো, মাতাল ক'রে দাও। আস্তে চলো, আরো একটু আস্তে, নইলে এক্ষুনি পথ ফুরিয়ে যাবে। তুমি আমায় ছুঁয়ে থাকো নিরুদা। দেখি তোমার হাত। কতোদিন পর এই তোমাকে ছুঁতে পেলুম।

অনিরুদ্ধের মনেও রুদ্ধ আবেগের আকুলি-বিকুলি। সুধুই কি আবেগের বেগ?—স্পর্শের বিদ্যুৎ—তৃষ্ণার পাতাল দোলে। দোলে রাত, প্রবৃত্তির প্রাকার, অন্ধকার·····পাহাড়ের ভূমিকম্প। শ্রীঅরবিন্দের লাইন দু'টো ওর কণ্ঠে কেঁপে ওঠে—

Love, a moment drop thy hands;
Night within my soul expands.

বাসবীর হাতখানা একবার বুকের কাছে তুলে ধ'রেই ছেড়ে দ্যায়। তফাতে স'রে যায়, বলে—আজকের সন্ধ্যার এই শান্তি চিরকাল মনে থাকবে, বাসবী। আগের দিনের উগ্রতা নেই এর মধ্যে—কিন্তু এর মাধুর্যেরও তুলনা নেই।

বলতে বলতে অনিরুদ্ধ একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো হঠাৎ ব'লে উঠলো—তোমায় হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিনাস্ হারিয়েছিলো অ্যাডোনিস্, মনে আছে?

—খুব মনে আছে। আজো সেই শ্বেতপাথরের মূর্তিটা আমার সঙ্গের সাথী। এখানেও এনেছি সেটাকে। যেখানে যাই নিয়ে যাই। নইলে ঘুম

আসেনা রাত্রে। আজ তোমার এখানে আসার আগেও কত আদর ক'রে এসেছি সেটিকে।

—এতদিন তোমাদের ওখানে যাচ্ছি কই দেখাওনি তো কখনো।

—না দেখাইনি নিরুদা, ভয় হ'য়েছে যদি তুমি ফিরে চেয়ে বোসো ওটাকে। শেষ স্মৃতির সূত্র যদি তুমি নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চাও এভাবে? তাহ'লে আমি কী নিয়ে থাকবো?

—ওটা আমি আর ফিরে চাইবোনা বাসবী—ওটা তোমার, ওটাই তুমি, তুমিই আমার ভিনাস্। তোমার দাবিই ছেড়েছি যখন···

—আর তুমি? তুমি যে আমার অ্যাডোনিস্। আমার কিশোরী চোখের কাজল—আমার কোটী রক্তকণার কামনা—আমার প্রাণের অন্তর্পণীয়ের তৃপ্তি—ছাখো সেই পুরোনো দিনের কথাই আমরা আজ বলছি অথচ যেন পুরোনোই নয়।···অনিরুদ্ধের খেদ চাপা দিয়ে ছায় বাসবী।

—এবার যেদিন যাবো আমায় একবার দেখিও কিন্তু।

—আচ্ছা দেখাবো। ওটা আমার টেবিলেই আছে—অতোটা হয়তো লক্ষ্য করোনি তাই দেখতে পাওনি। তা ছাড়া ওকে আজকাল আমি শাড়ি পরিয়ে রাখি তাই বোধহয় চিনতেও পারোনি।

—কেন? এ কী খেয়াল?

—বা রে, ওকি চিরকাল বেহায়া থাকবে? ওর কি লজ্জা হ'তে নেই?

অনিরুদ্ধ হেসে ফ্যালে, বলে—ও-সব বালাই আজকাল তোমার খুব হ'য়েছে বুঝি?

বাসবী উত্তর এড়িয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

—তোমার ঐ শ্বেতপাথরের পুতুলটির মতো সুন্দর পুতুল আমি তো আর দেখিনি। আচ্ছা, ও-দুটো কি কিউপিড্-সাইকি না অ্যাডাম্-ইভ্ না ভিনাস্-অ্যাডোনিস্? তুমি যখন যা ইচ্ছে তাই তো বলতে।

—সত্যিই তাই। আজো ঠিক জানিনা, তাহ'লে শিল্পীকে জিগেস করতে হয়, সে কী ভেবে গড়েছিলো।

বাসবী বলে—আমি ওকে রোজ রাত্তিরে শোবার আগে কতো আদর করি তা তো জানোনা? ওর কানে-কানে রোজ কতো কথা ব'লে তারপর শুতে যাই, তবে তো ঘুম আসে।

—কী কথা বলো ওর কানে-কানে?

—বলি, 'তুমি দেবীই হও, কি মানবীই হও, যেই হও—বুক ভ'রে শান্তি দিও,

আজ রাতটুকুর মতো ঘুম দিও, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দিও—আমার অ্যাডোনিসের স্বপ্ন। আমার অ্যাডোনিস্‌কে আমি হারিয়েছি, তোমারটি তুমি যদি দেবী হও তো ফিরিয়ে দিও আমার অ্যাডোনিস্‌কে; আমিও শহর চুঁড়ে এনে দেবো তোমার যোগ্য একটি অ্যাডোনিস্—যতো টাকা লাগে। নইলে তোমারও বিরহ আমারই মতো চিরন্তন হ'য়ে রইলো।' মনে আছে নিরুদা, ওটা যেদিন তোমার ওখান থেকে এনেছিলাম সেদিন তোমায় জানিয়ে আনিনি, চুরি ক'রেই এনেছিলাম তারপর তুমি যখন জানতে পারলে তখন আর চাইতে পারোনি। জোড়া-ভেঙে পুতুলটা তোমার কাছ থেকে এনে হয়তো ভালো করিনি—এখন এক-এক সময়ে মনে হয় একথা।

অনিরুদ্ধ বলে—ভালোই করেছিলে বাসবী—নইলে ওটিও এতদিনে ভেঙে যেতো। আজ ওর জুড়িটির যে-দশা হ'য়েছে ওটিও সেই দশা পেতো।

—কেন, তোমার কাছে যে ওর জোড়া পুরুষমূর্তিটি ছিলো সেটি কি আর নেই?

—না, সেটি তোমার বৌদির হাত থেকেই ভেঙে গেছে।

খবরটা শুনে প্রথমটা বাসবী চমকে ওঠে তারপর সখেদে বলে—ছি, ছি! কাজটা ভালো হয়নি বৌদির। ছাখো নিরুদা, বৌদিরও সুখ হ'লোনা।

অনিরুদ্ধ বলে—সুখ তো কারোই হ'লোনা। তুমি ভাঙোনি বটে কিন্তু ওদের জোড়া তো তুমিই প্রথম ভাঙলে। ওদের বিরহ তুমি যেমন কায়েম ক'রে দিলে, তুমি নিজেও তার অভিশাপ এ-যাবৎ বহন করছো। কেন তুমি ওটাকে লুকিয়ে আমার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলে, বলো তো? এর আগে কথাটা কখনো জিগেস করিনি আজকেই প্রথম জিগেস করছি তোমায়, বলো।

বাসবী বলে—ছেলেমানুষী নিরুদা, ছেলেমানুষী। তুমি কেন পুতুলটাকে অতো ভালোবাসতে, কেন পুতুলটার দিকে অমন ক'রে তাকাতে? সেটা আমার সইতোনা। আচ্ছা, গ্রীক্ পুরাণের গল্পে শুনেছি কি নাম ঠিক মনে নেই—কে নাকি একটা নিজের গড়া স্ট্যাচুর প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো?

অনিরুদ্ধ বলে—পিগ্‌ম্যালিওনের কথা বলছো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। তারপর ভিনাসের বরে সেই পুতুলের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার হ'লে পরে তাকেই বিয়ে করেছিলো, নয়?

—হ্যাঁ।

—তোমারও যদি ঐ রকম কিছু ঝোঁক হয়—সেই ভয়ে··

—সেই ভয়ে? কিন্তু আমার ভিনাসের বর পাবে কোথায় সেই পুতুলটা?

তুমিই তো আমার সেই ভিনাস্‌···কিন্তু পুতুলটা যে Galatea হ'তে পারলোনা ভিনাসের বর পায়নি ব'লেই।

বাসবী হাসে তার চোখে মুখে কী যে লীলা-বিভ্রম! প্রথম যৌবনের বসন্ত-রাত্রিগুলোর সকরুণ ক্রন্দন আজ যেন ওর কণ্ঠস্বরে অস্ফুট রোল তুলেছে।

—প্রাণ পেয়েছি আর পুতুল নিয়ে কাব্য করবো কেন বাসবী? পাথরের পুতুলটা আমি তো প্রায় ভুলেই গেছি। তোমার এই দেহ—এই তো আমার ভিনাসের মন্দির—একে তুমি যেন এম্নিভাবে অম্লান রাখতে পারো—অনেক, অনেক দিন। এই যেমন আজ ত্রিশের চূড়ায় দাঁড়িয়েও সদ্য-সতেরোকে লীলা-কিশোর হাতছানি দিতে পারছো, যতদিন বাঁচবে এই ভাবেই যেন বেঁচো। জরার দুঃখ তুমি সইতে পারবেনা কোনোদিন। আমার বড়ো সাধের এই মন্দিরের চুড়োটুকু দেখবার জন্যে অন্তত আমার মতো নিষ্প্রয়োজন মানুষেরও বেঁচে থাকতে লোভ হয়। যদিও জানি এসব কোনো কিছুই আমার জন্যে নয়। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমায় যেন এম্নিভাবেই দেখতে পাই।

—ওকথা বোলোনা নিরুদা, এখনি যেন আমি মরি। কার কী কাজে এলুম বলো তো? সারাজীবন যাকে ভালোবেসে এলুম তারও কোনো কাজে আসতে পারলুম কি? এর আপসোস তোমরা হয়তো ঠিক বুঝবেনা। মনে-প্রাণে সতী যাকে তোমরা বলো, তাও হ'তে পারলুমনা স্বামীর কাছে। আমার শ্যামও সইলোনা, কুলও রইলোনা, দুই-ই গেলো। এ কি কম দুঃখ?

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে অনিরুদ্ধের। সে ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—অনেক রাত হ'য়ে গেছে বাসবী, আর নয়। ইস্‌, এত রাত করলে কেন বলো তো?

কিন্তু বাসবীর শরীরে কোথাও কিছু তাড়া নেই, সে বলে—বোসো। হোক্‌ গে রাত। স্বামীর কাছে কী ভাবে জবাবদিহি করবো তাই ভেবে এত ভয় পাচ্ছো তো? জেনে রাখো জবাবদিহি আমায় করতে হয়না। তাছাড়া তিনি এখন বৈষয়িক কাজে কলকাতায় গেছেন।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ যেন বড়ো বেশি সন্ত্রস্ত উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে ওঠে—এমন সময়ে কেন তুমি আমায় জানালে একথা? না, না, তুমি শিগ্‌গির পালাও বাসবী, পালাও।

—কেন? আঃ, বোসো।···বাসবীর হাই ওঠে। ঘুমঘুম চোখের দীর্ঘপক্ষ্মের ছায়া পড়ে তুষারাভ গালের ওপর।

—না, না, জানো না তুমি। এখনো বলছি পালাও। শয়তান পিছু নিয়েছে আমাদের।

—ততোধিক আলস্যভরা কণ্ঠে বাসবী বলে—নিকগে। সত্যি নিলে বাঁচতাম।

—না, না, তুমি আমায় আর অতোটা বিশ্বাস কোরোনা, বাসবী। তুমি আমাকে যা ভাবো, আমি তা নই। যদিও আমি তোমার শুভ চাই তবুও আমি দেবতা নই, আমি মানুষ। এবং মানুষ সহজেই ভুল করে···

বাসবী বলে—চুপ করো। জানি দেবতা নও—তুমিও মানুষ। আমিও দেবী নই আমিও মানবী। তাই মানুষকেই চাই। দেবী বানিওনা আমাকে, দোহাই তোমার।

অনিরুদ্ধ বলে—দেবী হ'লেই কি পার পাওয়া যায় নাকি? মরণশীল মানুষের প্রেমে প'ড়ে অলিম্পিয়ান প্রাসাদ ছেড়ে নেমে আসতে হয়নি ভিনাস্‌কে? অমর-মণ্ডলে তাঁর প্রণয়পাত্রের এমনই কি অভাব ছিলো তবু তিনি তো চাইলেন মরণশীল অ্যাডোনিস্‌কে। স্বর্গলোকে তো তাঁর স্বকীয় Vulcan থাকা সত্ত্বেও পরকীয় Mars ছিলো আরো কতো কি কাহিনী তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে—যে-গুলোকে আমাদের নীতির নিয়মে সতীত্ব লঙ্ঘন বলতেই হয়।

বাসবী বলে—তবে? ভুল করা তাহ'লে কাকে বলছো? প্রেমের মর্যাদা দেওয়াই কি তাহ'লে ভুল? সমাজে প্রেমের মর্যাদা দিতেই তো সতীত্ব-প্রথার উদ্ভব। যে-সতীত্বে প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'লো সে-সতীত্বের মূল্য কী? প্রেমের মূল্যেই তো সতীত্বের মূল্য। যেখানে প্রেম নেই অথচ ব্যবহারিক সতীত্ব আছে তার চেয়ে ভয়ংকর বিড়ম্বনা আর কিছু হ'তে পারেনা। তার চেয়ে অশুভ জিনিশ আর নেই। কোনো ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যে ব্যবহারিক সতীত্ব বজায় রাখতে গিয়ে নিজের বিবেকের সঙ্গে ছলনা করা, জীবনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা, প্রেমের সঙ্গে প্রতারণা করার মতো অসতীপনা আর নেই। অথচ আমরা এমনই প্রথান্ধ যে, এই সহজ সত্যটাও বুঝতে চাইনা যে, ব্যক্তির কাছে আনুগত্যই সতীত্ব নয়,—প্রেমের কাছে আনুগত্যই প্রকৃত সতীত্ব। বারবার সতীত্বলঙ্ঘন ক'রেও তাই ভিনাস্‌ আজো পবিত্রতার প্রতীক হ'য়ে রইলেন। আজো পর্যন্ত মানুষ তাই তার সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে পেগানদের সেই দেবীকেই অর্ঘ্য দিয়ে আসছে, স্মরণ ক'রে আসছে যুগে যুগে।

অনিরুদ্ধ বিমুগ্ধ অন্তরে এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিলো বাসবীর কথা, এইবার ব'লে উঠলো—তোমাকে ভিনাস্‌ ব'লে ডাকা আমার সার্থক হ'য়েছে।

কোলের ওপর হাত দু'টি জড়ো ক'রে বাসবীর ব'সে থাকার কমনীয় ভঙ্গিটি অপলকে অনিরুদ্ধ দেখতে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বাসবী বলে—কালকে আমার সঙ্গে ক্যাম্প্‌টি ফল্‌স্‌ যেতে পারোনা।

—বেশ, তাই হ'বে।

সোফার ওপর একটু এলিয়ে পড়েছিলো বাসবী সে আরো বেশি আলস্য কণ্ঠস্বরে ঢেলে দিয়ে জড়ানো গলায় বল্লো—এসো। বোসো এখানে, তুমি যে পালাতে পারবেনা, সেকথা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। এখন তো সবে নটা—অতো তাড়া কিসের ?

দোর পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে অনিরুদ্ধ, বলে—তোমার শরীরে কি ভয় নেই বাসবী ?

—ভয় কেন ? তোমার কাছে আমার বুঝি আর কিছুই নেই। আমরা ক'দিন আর বাঁচবো বলো তো ? বঞ্চনা ও আত্মনিগ্রহ ছাড়া জীবনের কাছ থেকে আমরা আর কী পেলাম ? একথা ভেবে দেখেছো কখনো ?

অনিরুদ্ধেরও বহুবার মনে হ'য়েছে একথা। সেও বাসবীর হাত দু'খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, সত্যি, খুব সত্যি।

বাসবীর কথায় আজ তার মনের সামনে যেন নতুন পথ খুলে গেলো—এই পাহাড়ের ঢালু বেয়ে সেই পথ অন্ধকারে কোথায় যে নেমে গিয়ে মিলিয়ে গেছে তার শেষপ্রান্ত দেখা যায়না। হঠাৎ চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ।

উর্দিপরা বাবুর্চি চায়ের সাজ-সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে আসে। ট্রেটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বলতে চায় এ রকম ভাবখানা ক'রে থমকে দাঁড়ায়। অনিরুদ্ধ জিগেস করে—কী ?

লোকটা অশুদ্ধ ইংরাজীতে বলে—মেমসাহেব জিগেস করলেন যদি আপনারা ইচ্ছে করেন তো···এ-জায়গায় একবার ঢোক গিলে কথাটা শেষ করে—রাত কাটাবার বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। ভেতরে ভালো ঘর আছে, ভাড়া কম, আব্‌রু আছে, ব্যবস্থাও ভালো।

অনিরুদ্ধ ও বাসবী সহাস্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অনিরুদ্ধ বলে—মেমসাহেবকে ধন্যবাদ জানাওগে। আমরা এখুনি উঠবো, প্রয়োজন নেই।

বাবুর্চি চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসবী আগের মতোই উচ্ছ্বসিত হেসে ওঠে। আর হাসলেই বাসবীর চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে ঠিক আগের মতো—অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করে একটুও বদলায়নি বাসবী দেহে, মনে, আচরণে।

বাসবীর দিকে ফিরে অনিরুদ্ধ বলে—হ'লো তো ? ছি, ছি, ও কী মনে করলো বলো তো ?

বাসবী ভ্রূক্ষেপও করেনা, বলে—করুকগে। বরং হেসে বলে—ও যে-প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিলো সেটা হ'তে পারলে মন্দ কি হ'তো অ্যাডোনিস্ ?

বাসবী কথাগুলো ঠাট্টার ছলে বলছে কি সেটা ঠিক বোঝা যায়না।

অনিরুদ্ধ বলে—অমৃতে আর অরুচি কার আছে বলো ? কিন্তু অমৃতে অধিকার একমাত্র দেবতারই, দানবের নয়, এমন কি মানুষেরও নয়, এটাই যা মুস্কিল।

আবিষ্ট সলজ্জ চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বাসবী বলে—তোমার মতো সংস্কার-ভীরুর মুস্কিল চিরদিনই।

—সত্যি বলছো, না ঠাট্টা করছো ?

—সত্যি নয়তো কী ? তুমি না পুরুষ ? কোথায় পুরুষকার ? 'হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর—অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?'

বাসবীর মুখে শেষ লাইনটা মিনতির মধুতে ভ'রে ওঠে।

মুগ্ধ চোখে অনিরুদ্ধ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। সলজ্জ বাসবী বলে—কী দেখছো অ্যাডোনিস্ ?

—দেখছি একটা অভাবনীয় অপরূপ দৃশ্য। ভাবছি এমন কথাও আছে জগতে যা বলতে ভিনাসের চোখও মাটির দিকে নেমে যায়, মুখে লজ্জার আভা লাগে।

বিমুগ্ধ অনিরুদ্ধ বাসবীর চিবুক স্পর্শ করে। দুই মুখই সন্নিহিত হয়। অনিরুদ্ধের নিশ্বাস বাসবীর গালে লাগে। বাসবী ঠোঁটটা একবার গোল করে, সংকেতটুকু অনিরুদ্ধ সহজেই ধ'রে নেয়। সুদীর্ঘ একটি চুমার তলায় জগৎটা যেন তলিয়ে যায় কিছুক্ষণ—আলোগুলো সব নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে—বাসবীর দেহও যেন অবশ হ'য়ে আসে, চোখ দুটো আপনা থেকে বুজে আসে।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো অনিরুদ্ধ ছিট্‌কে দূরে স'রে যায়। স্বপ্নভঙ্গের আক্ষেপে দুজনেই জেগে ওঠে হঠাৎ।

—কী হ'য়ে গেলো বলো তো ?

—কী আবার হ'লো, আমরা তো বাড়ি ফিরছি, তাই না ?

অনিরুদ্ধ নিজের ওভারকোটটা খুলে পরিয়ে দ্যায় বাসবীকে, বলে—তোমার শালটা আমি নিচ্ছি। এখনো এক ফারলং যেতে হ'বে হিমের মধ্যে।

বাসবী বলে—আমরা নিশ্বাসের গরমে পরস্পরকে ঘিরে রাখবো অ্যাডোনিস্, এটুকু পথ ঠাণ্ডা আর বুঝতেও পারবোনা।

ওরা বেরিয়ে পড়ে 'কাফে' থেকে।

সেদিন বাসবীকে যখন অনিরুদ্ধ মঞ্জুভিলায় পৌঁছে দিলো তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

সেরাত্রে বাসবী বাড়ি ঢুকে দেখলো সব ঘর অন্ধকার, কেবল আলো জ্বলছে স্টুডিও-ঘরে ; দোর ভেজানো। সে একেবারে নিজের ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ্‌টা টিপে দিলো। জুতোর শব্দে আর আলোর সুইচ্‌ টেপার শব্দে তপেশ অনুমান করেছিলো যে বাসবী ফিরলো। স্টুডিও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তপেশ বাসবীর পেছন পেছন ঢুকলো বাসবীর ঘরে।

—ফিরলেন বাসবীদি ? আপনার সব জিনিশ ক'টাই পাওয়া গেছে কিন্তু। ওগুলোর জন্যে অনেক ঘুরতে হ'য়েছে অনেক খুঁজতে হ'য়েছে, এই যা।

বাসবীর দেহ-মনে তখন একটা আবিষ্ট অবসাদ—আজকের সন্ধ্যার মধুর স্বাদে সে তখনো কানায় কানায় ভ'রে আছে—এবার একটু নিভৃত অবসর চায়—একটু বিশ্রামের অবসর, রোমন্থনের অবসর, একটু শয্যার উষ্ণতা। এ-সব ছাড়া তখন আর তার কিছুই ভালো লাগছিলোনা তাই সে তপেশের এই আলাপ করতে আসার উৎসাহে যেন খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়ার মতো ক'রেই বললো—থাক্ রেখে যান, কাল সকালে দেখবো'খন।

কিন্তু তপেশের উৎসাহ দুর্দমনীয়। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজে থেকেই ব'সে পড়ে। অজু থাকতে এ-ঘরে তার প্রবেশাধিকার ছিলোনা—এই প্রথম সে ঢুকলো এ-ঘরে। চারিদিকে চাইতে চাইতে তপেশ একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর হাতীর দাঁতের কারুকার্য-করা একটা দামী ফ্রেমের মধ্যে সাঁতারের স্লিপ আর ব্রেসিয়ার-পরা বাসবীর ছবি চোখে পড়া মাত্রই সে উৎসাহে যেন লাফিয়ে ওঠে, বলে—মাই গুড্‌নেস্! আপনার ছবি না? অদ্ভুত, অদ্ভুত, সত্যই অদ্ভুত সুন্দর! নীল ড্যানিয়ুব-এর Waltz-এর ছন্দ এবং সুর যেন রক্ত-মাংসের রূপ নিয়ে এসেছে। জোহান স্ট্রসের অমর কীর্তিও যেন ম্লান হয় এই এক ফোঁটা চিত্রকাব্যের কাছে। এমন ডিভাইন ফিচার্স্, এ-রকম এঞ্জেলিক গ্রেস্ এ-দেশের মাটিতে কী ক'রে তৈরি হলো—বিশ্বাসই হয়না যে!

তপেশ একবার ছবির দিকে চায় আর বাসবীর দিকে চায় যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানুষটাকে মিলোচ্ছে ছবিটার সঙ্গে। ওর দৃষ্টি মানুষের গায়ে বেঁধে।

বাসবী জুতো খুলতে ব্যস্ত ছিলো সে কোনো উত্তরই দ্যায়না তপেশের কথার। আর তাছাড়া বহুবার বহুলোকের কাছ থেকে তাকে শুনতে হ'য়েছে এ-ধরনের প্রশংসা তাই এখন আর তার এতে একটুও আত্মপ্রসাদ আসেনা।

তপেশ তখনো ব'লে চলে—এদেশে-ওদেশে রূপ আমি অনেক দেখেছি বাসবীদি—কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে এই রং, এই গড়ন, এই সুমিত অনুপাত কী ক'রে সম্ভব হয়, ভেবে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। এ-রকম প্রোপোর্‌শনেট্ বাস্ট লাখে একটা চোখে পড়েনা—রং-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম। এই রূপ রেখায় ফুটিয়ে অমর ক'রে রাখবার জন্যে এম্নি একটি মডেল যে-শিল্পী পেয়ে যান তাঁর সৌভাগ্যকে আমি ঈর্ষ্যা করি, বাসবীদি।

বাসবী হাই তোলে, বলে—আপনাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হ'য়ে গেছে তো?

—সে অনেকক্ষণ। আপনার জন্যে দেরি ক'রে ক'রে শেষটা সেরেই নিলাম।

—বেশ করেছেন এইবার শুয়ে পড়ুন গে যান। রাত অনেক হ'লো। এখন আর মডেল খুঁজে খুঁজে রাত্তিরের ঘুম কেন মাটি করবেন?

—আমার ঘুমের কথা ছেড়ে দিন। রাত্তিরে আমার ঘুম আসতে বড়ো দেরি হয়।

—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি কিন্তু এবার শুয়ে পড়বো ··আর দেরি করতে পারছিনা; কাল কথা হ'বে।

—বেশ তো, শুয়ে পড়ুননা। আপনি বোধহয় বড়ো ক্লান্ত? খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।

—প্রয়োজন হ'বেনা। বাসবী ঘরের দোরটা মেলে ধ'রে ছিট্‌কানিতে হাত দিয়ে দাঁড়ায়, তপেশের দিকে চায় অর্থাৎ বেরিয়ে যেতে বলার ইশারা।

অগত্যা তপেশকে উঠতেই হয়। দোরটা সশব্দে বন্ধ করে ছায় বাসবী।

রাত্তিরের ঢিলে গরম পোষাকটা পরছিলো বাসবী তখুনি তপেশ ফিরে এসে বন্ধ দোরের বাইরে থেকেই জিগেস করে—শুয়ে পড়েছেন নাকি?

রুদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে বাসবী কাপড় বদলাতে বদলাতে বলে—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তবে থাক্‌গে। আমি আমার ছবির অ্যাল্‌বামটা বোধহয় আপনার ঘরে ফেলে এসেছি···যাক্ এমন জরুরী কিছু নয় অবশ্য। আপনাকে আর উঠতে হ'বেনা এজন্য।

বাসবী পোষাক বদলে তপেশের ইচ্ছে-ক'রে ফেলে-যাওয়া ছবির অ্যাল্‌বাম্‌টা তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে দেখতে থাকে। প্রথমেই একজন আধুনিক কবি থেকে উদ্ধৃতি :

> Nude bodies like peeled logs
> Sometimes give off a sweetest
> Odor, man and woman......
> A sonnet might be made of it.

তারপর ছোটো-বড়ো বাঁকা-সোজা চোদ্দটা রেখার টানে রিরংসায় রণিত নরনারীর মিথুনমূর্তি! পাতা উল্টে যায়—সেই চিরপরিচিত এঞ্জেলোর অ্যাডাম্—অকুণ্ঠিত আদিম পুরুষ, উদ্দাম পেশীর পৌরুষ! বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায়না, আপনা থেকেই চোখ নেমে আসে। যদিও ঘরে কেউ নেই তবু…লজ্জা আসে। নিরুদার একটা বইয়ের পাতায় একে সে প্রথম দেখেছিলো সেই লজ্জা আজো যেন চোখে জড়িয়ে আছে। পাতা উল্টে যায়: দা ভিঞ্চির মোনা লিসা-র অদ্ভুত হাসির রহস্য—আজো পর্যন্ত যার ব্যাখ্যা হ'লোনা। ওয়াল্টার পেটারের লাইনগুলোর অস্ফুট গুঞ্জন যেন ঘিরে আছে মুখখানাকে। ভারজিন্ অব্ দি রক্স্ সেন্ট্ অ্যান্ মেরী…রুবেন্সের ভিনাস্…জজমেণ্ট্ অব্ প্যারিস্ ইত্যাদি কতো ছবি…স্থূল ও নগ্নদেহের প্রতি অযথা পক্ষপাত। কল্পনা ও চিত্রণশক্তি সব নিয়ে সত্যই অতুল্য প্রতিভা তবু কেন যে এত বেশি স্থূল শ্রোণির প্রতি পক্ষপাতিত্ব—নিশ্চয়ই শিল্পীর কোনো ব্যক্তিগত কারণ ছিলো। বাসবী আরো পাতা উল্টে যায়—টিশিয়ানের টয়লেট্ অব্ ভিনাস্—চমৎকার ছবি কিন্তু শয্যাশায়িনী ভিনাস্‌টি উঃ! অ্যাল্‌বাম্‌টা ঠেলে রেখে খানিকক্ষণ বালিশে মুখ লুকোয়। তাঁর সময়ে তাঁর দেশে কি এমন মেয়ে ছিলোনা যে শিল্পীর হাত দুটো একবার জড়িয়ে ধ'রে বলে—এইখানেই থামো শিল্পী, আর না। বিশ্বের লোক জড়ো ক'রে একটা মেয়ের দেহ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায় নাকি? পুরুষদের কাছে চিত্রপটটাও কি তাঁদের কেলিকুঞ্জের অর্গলিত কক্ষ? ভেলাস্কাইয়ের ভিনাস্ এণ্ড কিউপিড্‌কেও তবু সহ্য করা যায়। শিল্পীর সাহস হয়তো কিছু কম। তাহোক। আরো পাতা ওল্টায়: রাফাএলের মাদোনা—নোংরা সরু গলির মধ্যেকার ফাঁক থেকে এই যেন প্রথম উদার নীলকাশ উঁকি মারলো—কী স্নিগ্ধ, সুন্দর, স্বর্গীয়! অনেকক্ষণ ধ'রে ছবিখানাকে দেখার পর বাসবী আরো পাতা ওল্টায়। লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি-র Swan and Leda। অদ্ভুত শক্তি কিন্তু সহ্য করা দুষ্কর। স্নানার্থিনী Leda-র উন্মত্ত হংসমৈথুন। স্নানার্থিনীর রূপলুব্ধ জুপিটার রাজহংসের রূপধারণ ক'রে এসেছিলেন এই কাহিনী নিয়েই ইয়েট্‌সের লেখা অবিস্মরণীয় লাইনগুলো ওর মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—

> A shudder in the loins engenders there
> The broken wall, the burning roof and tower
> And Agamemnon dead.........

বাসবী ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় অ্যাল্‌বামটা খাট থেকে কৌচের ওপর। অসহ্য এর উত্তাপ, সারা দেহের স্নায়ুতন্ত্রী যেন ঝন্‌ঝন্ ক'রে বাজতে থাকে। অধীর একটা

করুণ আগ্রহ তার দেহ ঘিরে কাঁদতে থাকে, কাঁপতে থাকে থরথর। মনের মাঠের কোথা থেকে যেন গুঞ্জন ওঠে—কাল সে আর অনিরুদ্ধ যাবে ক্যাম্প্‌টি জলপ্রপাত দেখতে। চোখ বুজিয়ে কল্পনায়, ধ্যানে, স্বপ্নে সে আজ মনে-প্রাণে অসতী হবার চেষ্টা করে। বাস্তবে যেটা এত শক্ত, কল্পনায় সেটা কতো সহজ!

শূন্য বিছানার ছায়াকে বাসবী মনে-মনে ডাকে—অ্যাডোনিস্‌ এসো, তোমার সারা জীবনের ত্যাগ ক'দিনের ভোগে ভরিয়ে তুলি; নতুন জীবন দিয়ে ভ'রে তুলি ভবিষ্যৎ। আমার অ্যাডোনিস্‌, আমার কিশোরী চোখের কাজল—তার অনিন্দ্য দেহকান্তিতে বয়সের ছাপ পড়বে—সেটা অসহ্য; আমার সমস্ত দেহের সুধা নিঙড়ে ধুয়ে-মুছে আগেকার মতো নবীন ক'রে নেবো আমার অ্যাডোনিস্‌কে। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে শ্বেতপাথরের পুতুলটার সঙ্গে কানে-কানে কতো কি মন্ত্রণা ক'রে আসে। বাসবী রোজকার মতো ঘুমের প্রার্থনা জানিয়ে, আলোটা নিবিয়ে এতক্ষণে ঘুমের জন্য শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম আসতে চায়না। বালিশে মুখ গুঁজে কতো কথা ভাবে—এই তো, এইখানটায় নয়? এই খানটাই তো। ঠোঁটের এই পাশটা, গালের এইখানটা, একটুখানি জায়গা এখনো যেন সোনা হ'য়ে আছে। কোথা থেকে গুঞ্জন ওঠে—'কী হ'য়ে গেলো বলো তো?' বাসবী বলে—'আহা, হ'বে আবার কী? আমরা তো এইবার বাড়ি ফিরছি তাই না, নিরুদা?' অন্ধকারের মধ্যেও তার মুখে একটুখানি হাসি ফোটে—সেই হাসির আলোয় তার কল্পনা অনেকখানি আলোকিত হ'য়ে ওঠে। এভাবে পাশের বালিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ মন্ত্রণার পর বাসবীর চোখে কোন সময়ে অতর্কিত ঘুম আসে রোমাঞ্চের ঘুম, ঘুমের স্বপ্ন!

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে মধুর আলস্যে খানিক গড়িমসি ক'রে বাসবী যখন তার শয়নকক্ষের দোর খুলে বাইরে এলো তখন শীতের বেলা সাড়ে আটটা হ'য়ে গেছে। শারীর এবং তপেশের চা খাওয়া হ'য়ে গেছে। আগে বাসবী না হ'লে শারীর প্রাতঃকালীন চা খাওয়াটা মঞ্জুর হ'তোনা কিন্তু এখন সে আর বাসবীর তোয়াক্কা করেনা বরং বাসবীর সঙ্গ এড়াতেই চায়। শয্যা-ত্যাগের পর বাসবী একেবারে বাথরুমেই ঢোকে। প্রাতঃকৃত্য ও প্রসাধন সেরে বাসবী যখন বেরিয়ে এলো তখন বাড়িতে কেউ নেই। চাকর দরোয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো যে তপেশ শারীকে নিয়ে বেরিয়েছে এই কিছুক্ষণ হ'লো।

দু'একদিন হ'লো ওরা নিয়মিতই বেরোচ্ছে এই সময়ে—জিগেস করলে Out-door class না কী-যেন বলে—অছিলাটা যুক্তিসহ মনে হয়না বাসবীর, তবু সে চুপ ক'রেই থাকে। প্রকৃতিকে আঁকতে গেলে নাকি প্রকৃতিকে আগে ভালো ক'রে দেখা চাই। ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকাই যখন ঠিক করেছে শারী এতে বাসবীর কী আর বলার থাকতে পারে? শারী তো আর ছেলেমানুষটি নেই—বড়ো মেয়ে, নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে। তাছাড়া শারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কী অধিকার আছে বাসবীর? তা করতে গিয়ে মিছে শক্রতাবৃদ্ধিও সে করতে চায়না। বাসবী তো নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ নয়। সেজন্য সে আরো সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করে শারীকে এবং শারীর প্রতি তার বোধহয় এই কারণেই একটা আন্তরিক অনুকম্পা হয়। প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ শেষ করতেই প্রায় দশটা বেজে যায়। নিরুদা এইবার এসে পড়বে হয়তো। দুপুরের বেশ কিছু আগেই বেরোতে হ'বে তবে তো বেলাবেলি ফিরতে পারা যাবে। সে তৈরি হ'য়ে নিতে থাকে। আরশির সাম্‌নে একবার গেলে আর শিগ্‌গির স'রে আসতে পারেনা বাসবী, কেমন যেন নেশা লাগে—ও বরাবরই অমন। নিজেকেই নিজে একটু বেশি ক'রে ছাখে। ছাখে ওর স্বভাবতই প্রদীপ্ত রূপের শিখা কেমন ক'রে আরো প্রদীপ্ততর হ'য়ে ওঠে—নেশাও ওর প্রবল থেকে প্রবলতর হ'তে থাকে। সেজন্যই প্রসাধনের সংকল্প নিলে ওর একটু বেশি দেরি হ'য়ে যায়। গাঢ় মেরুন্ রঙের শালের শাড়ি যেখানা সে একবার কাশ্মীর থেকে এনেছিলো সেখানাই বেছে রেখে দিয়েছে আজকের জন্য। এটা তার বড়ো প্রিয়—এখানে এসে পর্যন্ত এটা সে একদিনও পরেনি। সায়েব-বাড়ি থেকে করানো ফারের ওভারকোট দু'টো নিয়ে সে পড়েছিলো একটু মুস্কিলে। ঠিক করতে পারছিলোনা কোনটার রং শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ্ করবে। এমন সময়ে অনিরুদ্ধ এসে পড়লো।

—শুভদিন ভেল আজু মঝু! প্রায় তৈরি যে? বাঃ, রানীর মতোই হয়েছো এবার। বাসবীর দিকে চেয়ে অনিরুদ্ধ নিঃশব্দে হাসতে থাকে। প্রসাধনের সুগন্ধে ঘরটুকুই নয় সারা বাড়িটাই আমোদিত হ'য়ে আছে।

বাসবী বলে—তুমি দেরি করছো দেখে ভাবছিলুম হয়তো আর এলেনা আমাকেই যেতে হ'বে তোমার অভিসারে। মন তাই কেবলই গুন্‌গুনিয়ে উঠছিলো—একলি যাওব তুঝ অভিসারে!

অনিরুদ্ধ একটু ভাঁড়ামি ক'রে বলে—আরে দূর, এ কী রকম রানী? রানী যায়, না নফর আসে? ডিগ্‌নিটি জ্ঞান নেই।

বাসবী বলে—তাহ'লেই বোঝো কী রকম রানী। চাকরানীর মতো রানী যায়, আর নফর তাকে তাড়িয়ে দেবে ব'লে শাসায়।

—আর রানী হ'য়ে নফরের এরকম বেয়াদবি তুমি সহ্য করো? গরদান নাও না?

—নেবো দাও।...বাসবী হেসে ফ্যালে।

অনিরুদ্ধ হাড়কাঠে গলা দেবার মতো ক'রে হেঁট হ'য়ে গলাটা বাড়িয়ে ছায় বাসবীর সামনে। বাসবীও বাহুবেষ্টনে ক্ষণেকের জন্য জড়িয়ে ধ'রেই আরশির দিকে চেয়ে কী ভেবে যেন ছেড়ে ছায়, চকিতে স'রে দাঁড়ায়। আরশিটা বুঝি দেখছে সব, যেন ওদের ছায়া চুরি ক'রে রেখে দিচ্ছে নিজের স্বচ্ছ বুকের মধ্যে, যাতে এ-ঘরের মালিকের কাছে একদিন সব কথা ফাঁস ক'রে দিতে পারে। দেয়ালেরা যেন কী মন্ত্রণা করছে। সে এই প্রথম ভয় পেলো। একবার স্বামীর প্রশান্ত মুখ ছবিটার দিকে চাইলো তারপর বললো—আচ্ছা, দাঁড়াও, চলো আগে, সেখানেই গর্‌দানটা নেবো কিন্তু। ছাখো তো এই দুটোর কোনটা তোমার ভালো লাগে, কোনটা পরতে বলো?

অনিরুদ্ধ ওভারকোট দুটোর মধ্যে একটা তুলে নেয়, বলে—এইটে।

বাসবী বলে—আমিও ভাবছিলুম ওটার কথাই তুমি বলবে।

অনিরুদ্ধ ডাকে—এসো তাহ'লে পরিয়ে দিই।

বাসবী স'রে যায় আরশির সামনে থেকে ঘরের একটা কোণে যে-কোণটা অপেক্ষাকৃত অন্তরাল।

কোটের বোতাম ক'টাও দিয়ে ছায় অনিরুদ্ধ, তারপর মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে ব'লে ওঠে—জয় হোক্ রানীজীর!

তারপর বলে—জুতাবর্‌দারও হুজুরে হাজির—নফরকে হুকুম হোক্ কোন জুতোটা পরা রানীসাহেবার মর্জি?

শাসন ভ্রূকুটিত হ'য়ে ওঠে বাসবীর মুখে চোখে, বলে—ঠাট্টা কোরোনা বলছি এক্ষুনি ছেড়ে ফেলবো সব। কালকের মতো বেরিয়ে পড়বো আটপৌরে শাড়িতেই।

—নফরের বেয়াদবি মাপ করতে আজ্ঞা হয়, রানীজী। হাসি নয়, ঠাট্টা নয়, তোমায় আমি জুতো পরিয়ে দিতে চাই, তোমার পা দু'খানি ছুঁতে পারবো তো তবু এই ছুতোয়।

—না, না, সেও কি হয় কখনো? তুমি খেপেছো?...জুতো জোড়াটা নিয়ে বাসবী নিজে নিজেই পরতে শুরু ক'রে ছায়। কিন্তু উল্টো-পাল্টা হ য়ে যায় আবার খুলে ফ্যালে।

দেখে অনিরুদ্ধ হাসতে হাসতে বলে—রাই সাজে, বাঁশি বাজে, না বাঁধিল চুল,

কি করিতে কি করে রাই সবই হৈল ভুল।' সেইজন্যেই দেরি ক'রে এসেছি বুঝেছো এবার? রানীর মতো যেমন সোফায় বসেছিলে তেম্নি ব'সে থাকো, আমি পরিয়ে দিই। তোমার উদার পদপল্লব আমার হাতে ছেড়ে দাও রানী, এই ভিক্ষাটুকু মঞ্জুর করো।

অনিরুদ্ধের মিনতিপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বাসবী ওর এই প্রার্থনাটুকু মঞ্জুর না ক'রে পারেনা। রাজেন্দ্রাণীর মতোই বাসবী সোফায় গিয়ে বসে, সব ভয়-ভাবনা ভুলে যায়। অনিরুদ্ধ হাঁটু গেড়ে মেঝেয় ব'সে পড়ে, বাসবীর পা দু'টো নিয়ে জুতো পরিয়ে ছায়। বলে—মনে রাখবার মতো আজ তুমি সত্যি কিছু দিলে। আরশিতে নিজেকে ছাখো একবার—তাহ'লেই বুঝবে আমার মতো সামান্য মানুষ কেন স্বয়ং অনঙ্গদেবও যদি একবার অঙ্গধারণ করে উঁকি মেরে তোমাকে দেখে যেতেন তাহ'লে তিনিও বোধকরি তাঁর পুষ্পধনু-পঞ্চশর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমারই মতো করজোড়ে হাঁটু গেড়ে স্তব করতে ব'সে যেতেন।

বাসবী বলে—আঃ, সবাই তো ঐ রকমই বলে, তুমিও বলবে?—না, না, তুমিও বোলোনা। সাধারণের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ ক'রে নাও। তুমি যে আমার অ্যাডোনিস্, তোমাকে দিয়ে জুতো পরিয়ে নিলাম এতে আমার অপরাধ হ'লোনা, বলো তুমি?

—কিচ্ছু নয় রানী, কিচ্ছু নয়। ওকথা ভাবছো কেন? আমাকে আজ তোমার স্তুতি-বন্দনা করতে দাও। এতদিনের রুদ্ধ আবেগ আমার আকণ্ঠ হ'য়ে আছে, কিছুটা তার বেরিয়ে যেতে দাও। আজ অনর্গল তোমার রূপবন্দনা করি, আশ মিটিয়ে রানী ব'লে ডাকি, সিংহাসনে বসাই—রানীর মতোই সাজাই, এতে বাধা দিতে পারবে তুমি? তোমায় নাহয় নাই পেয়েছি বাকি জীবন হা-হুতাশ করতেও তো পাবো—তাতেই আমার শান্তি। সেটুকু শান্তি থেকে বঞ্চিত করবার মতো নিষ্ঠুর কি হ'তে পারবে তুমি? তুমি না আমার ভিনাস্?

বাসবী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—কী রানী নারাজ হ'লে? ··অনিরুদ্ধের উৎসুক প্রশ্ন।

বাসবী ধরা-ধরা গলায় বলে—উঃ, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, নিরুদা। পায়ে পড়ি তোমার।···ব'লে খাটের ওপর গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে অনেকটা অকারণেই ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে বাসবী। এই কান্নার না আছে হেতু, না আছে অর্থ। অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয় কিন্তু কিছু বলেনা; আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। আবেগে আজ ওরও চোখে জল আসে। সেদিনকার সেই হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল মেয়ে আজ এমন ক'রে কাঁদছে? ওর কান্নায় বাধা ছায়না আর।

মিনিট কয়েক পরে বাসবী আপনি উঠলে পর অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকলো। কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললো—এঃ, ছিঃ, বেরোবার আগে হঠাৎ একি ক'রে ফেললে, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার? আমি কী এমন বলেছি তোমায় বলো তো?

বৃষ্টি-ধোয়া মাঠের মুখে শরৎকালের রোদ্দুর আবার যেন ফুটে উঠলো; বাসবী টল্‌টলে চোখে বিষণ্ন একটু হাসলো। কালকে রাত্রির রাস্তার আব্‌ছা আলোয় এই রকম হাসিই সে দেখতে পেয়েছিলো। আজকে আবার সেই হাসিই দেখলো দিনের সুস্পষ্ট আলোয়, পালিশ করা মুখে, আর্‌শিতে-আসবাবে-ঠাসা ঝল্‌মলে ঘরের মধ্যে। একটু হাসির স্পর্শ পেলে দু'টি গালের সেই দু'টি সুপরিচিত টোল চুমার নীড়ের মতো বারেকের জন্য ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়।

—এতক্ষণে যা পালিশ করলে নিজেই আবার নষ্ট ক'রে ফেললে তো? 'নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে' আবার সেরে নিতে হ'বে যে!

মেক্‌-আপের ছোঁয়ায় কলঙ্কী চাঁদ আবার নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে উঠলো তারপর মুছে-যাওয়া কাজলের রেখা আবার ঠিক ক'রে নিচ্ছিলো বাসবী, অনিরুদ্ধ বললো—যে-রমণী স্বভাবতই সুন্দরী তার কমলনয়নে কাজলের ব্যবস্থা করেননি মহাজন পদকর্তা বরং বলেছেন—

সহজহি সুন্দরী বড়ি রাহী
কি করবি অধিক পসাহি
উজর নয়ন নলিনা
কাজরে ন কর মলিনা।

কাজল আঁকতে আঁকতে হাত কেঁপে যায় বাসবীর, ধমকের সুরে সে ব'লে ওঠে—আচ্ছা, চুপ করো তো, মশাই। আবার সব নষ্ট ক'রে দিলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রসাধনের খুঁতটুকু আবার সেরে নিলো বাসবী, কাজলের রেখা আবার নিখুঁত ক'রে এঁকে নিলো। ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে অনিরুদ্ধ এবার ব'লে উঠলো—সত্যিই এবার—

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়॥

বাসবী কপট রাগের অভিনয়ে একটু ঠোঁট উল্টোয়, বলে—ইন্দীবর না ছাই! তারপরই ফিক্‌ ক'রে হেসে ফ্যালে, বলে—দশানন ইন্দীবর-আঁখি কোথা পাবে বলো? সেই যে প্রথম দিন এ-বাড়ি এসে দাঁড়ালে অম্নি আমার একটি অভিনব

নামকরণ হ'য়ে গেলো। তাতেই আমি বেশি খুশি এসব আবার কেন? আর সময় নষ্ট কোরোনা, চলো। কিন্তু যা ার আগে একটা কাজ ভুলে যাচ্ছো।

—কী বলো তো?

—বলবো কেন, নিজেই মনে করো।

বোকার মতো চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধ, ভেবেই পায়না।

বাসবী বলে—নাঃ, সত্যিই তুমি ওকে একেবারে ভুলেছো। ঐ ছাখো··· তোমার সেই ভিনাস্।

—এঃ, চেনাই যায় না যে! একে কী ক'রে ফেলেছো তুমি শাড়ি পরিয়ে?

পুতুলের শাড়ি খসিয়ে দিয়ে বাসবী বলে—নাও, এবারে চিনতে পারছো তো?

—পারছি বৈকি। এই তো ভালো। কেন একে তুমি জবরজঙ্গ সাজিয়ে রাখো?

—ও আমায় কানে-কানে বলেছে যে, ওর অ্যাডোনিস্ কাছে না থাকলে ও শাড়ি প'রেই থাকবে। হু'জনেই এক চোট হেসে নেয়।

—ও এমন কথা বলেছে নাকি? ওর যতো প্রাণের কথা তোমাকে সব বলে বুঝি?

—হুঁ-উঁ, বলে বৈকি। আমিও আমার সব কথা ওকে বলি।···বাসবী চোখ-মুখ ঘোরায় কথাগুলো বলতে।

কাছে গিয়ে পুতুলটাকে একটা চুমু ছায় বাসবী, ওর কানে-কানে বলে—চল্লুম দেবি! অ্যাডোনিস্‌কে আবার পেয়েছি এবার তোমারও একটি জুড়ি এনে দেবো। (অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে বলে—) অ্যাডোনিস্, তুমিও একটা চুমু দাও ওকে, ওর কাছে বিদায় নিয়ে এসো।

অনিরুদ্ধ পুতুলের গালে একটি চুমু দিয়ে বলে—চুমোটা কার গালে পড়লো কে জানে! তুমি জানো রানী?

—জানি। বলবো'খন এসো।

বাসবীর পেছন পেছন অনিরুদ্ধও নেমে পড়ে রাস্তায়। কুলরী-বাজার রিক্‌সাস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত হেঁটে গিয়েই ওরা রিক্সা করবে।

নির্জন ক্যাম্প্‌টির পথ পাইন-দেবদারুর ছায়াবীথির মধ্য দিয়ে। রিক্সায় যেতে অনেকক্ষণ লাগে। দূরে সোনাজ্বলা তুষারশৃঙ্গের সারি দেখতে দেখতে চললো ওরা। হু'জনের মনই ভ'রে আছে। কথা বিরল হ'য়ে আসে। মুখ চাওয়া-চাওয়িতেই কাজ চ'লে যায়। পাইন-বীজ, ঘূর্নিফল, বুনো আমলকি জায়গায় জায়গায় বিছিয়ে আছে পথের ধারে। রিক্সা-কুলিদের শব্দ পেয়ে কাঠবেড়ালীরা দ্রুত পালায় শাখামৃগদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। বৃটিশরাজ্য পার হ'য়ে তারা

ঢুকেছে অনেকক্ষণ সামন্তরাজ্য তিহ্‌রীর এলাকায়। কোথা থেকে যেন ঘণ্টার চন্‌চন্‌ শব্দ আসছে। রিক্সা-কুলিদের জিগেস ক'রে জানলো তারা যে, ও-শব্দ বলদের গলঘণ্টার। পাহাড়েও চাষ হয়। পাশের খদের ওপারের যে-পাহাড়টা তারই সানুদেশ যেন সিঁড়ির পৈঠার মতো ক'রে খনন করা হ'য়েছে। পাহাড়ীরা অসম্ভব পরিশ্রমী। পাহাড়ের শিলাস্তৃত পিঠেও তাদের ফসল ফলাতে হয়।

রিক্সায় চলতে চলতে একসময় অনিরুদ্ধ মৌনভঙ্গ ক'রে বলে—তোমাকে আমার সঙ্গে দেখে রিক্সাকুলিগুলো কী ভাবছে, জানো তো?

—কী?

—ভাবছে রাজার সিন্দুক লুঠ ক'রে নিয়ে চলেছে এই চোর ভিখিরিটা।

—ইস্‌, তাই বটে। তুমি ছাই জানো। আমি বলবো ওরা কী ভাবছে? ভাবছে যে, কোনদেশের রাজপুত্তুর বন্দিনী রাজকন্তের শাপমোচন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে আপন দেশে।

অনিরুদ্ধ হেসে ওঠে—বা রে, ছেঁড়াজামার রাজপুত্তুর! বলিহারি যাই! এই ছাখো···ব'লে একটা হাত তুলে সে বাসবীকে দেখায় যে চেস্টারফিল্ডের বগলের সেলাইটা খুলে গেছে।

—তাহোক তবুও রাজপুত্তুরই।

—কিন্তু ব্যাঙ্কে একটা টাকা নেই, দেনা ছাড়া।

—হোকগে। তবুও···

—এমন কি বাড়িটাও বন্ধক, দেনার দায়ে হয়তো বিকিয়ে যাবে কোনদিন।

—হোক, হোক, সব হ'লেও যে রাজপুত্তুর সে রাজপুত্তুরই কোটালপুত্তুরও নয়, সওদাগরপুত্তুরও নয়। দয়া ক'রে যদি বসতে চায় তবে সিংহাসনই এনে দিতে হয়। বুঝেছো মশাই?

—তুমি এবার হাসালে।

—বেশ তো প্রাণভ'রে হেসেই নাওনা আয়ু বেড়ে যাবে। বাড়িতে তো মুখ অন্ধকার ক'রে থাকো। সত্যি বলছি, কালকের চেয়ে তোমার যেন বয়সে ক'মে গেছে অন্তত পাঁচ বছর। তোমাকে লাগছে অনেকটা আগের মতোই। বাড়ি গিয়ে আরশিতে নিজেকে একবার দেখো, নাহয় বৌকেই জিগেস কোরো।

—সদ্য চুল ছেঁটে এসেছি তাই বোধহয় তোমার মনে হ'চ্ছে অমন।

—না গো না। কখ্‌খনো না। তুমি স্বীকার করো আর নাই করো। সেটুকু জোর আমার আছে, নিজের ওপর সেটুকু আস্থা আমার আছে যে, এমিভাবে সব সময়ে সবার কাছ থেকে এমন কি তোমার বৌয়ের কাছ থেকেও যদি তোমাকে

আড়াল ক'রে সর্বদা ঘিরে থাকতে পারি তাহ'লে সেই পঁচিশ বছরের অ্যাডোনিস্কে আবার ফিরে পাবো। সবসময়ে সবার কাছ থেকে আড়াল ক'রে ঘিরে রাখবো তোমায় প্রেমে, অনুরাগে, হাসিতে, গল্পে, গানে—আমার বড়ো সাধ যে অ্যাডোনিস্। জীবনকে তো আমরা ভোগ করিনি, আপসোস হ'বেনা, কী বলো তুমি?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয় অনিরুদ্ধ। এই আক্ষেপ অনিরুদ্ধেরও বাসবীর চেয়ে কম নয়—তারই মনের নিভৃত কথাগুলো কী ক'রে যেন জানতে পেরে গেছে মেয়েটা। নাকি ওর মনেরও এই একই কথা? মুহূর্তের জন্য অনিরুদ্ধের ইচ্ছা হয় ওকে একবার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। রিক্সাকুলিরা দেখবে দেখুক তবু বুকের জ্বালা তো জুড়োবে। তাদের চারিদিক থেকে সব বন্ধন যেন শিথিল হ'য়ে খ'সে প'ড়ে গেছে। অধীর আবেগে অনিরুদ্ধ ধরা গলায় বলে—বাসবী, তুমি যে আমার প্রথম যৌবনের অর্জন—আমার সকল ক্ষুধার ক্রন্দন ··

বাসবী বলে—আর তুমি? তুমি আমার এই সবই এবং এছাড়াও আরো অনেক···তুমি আমার শেষ যৌবনের উদ্‌যাপন—তুমি আমার এতদিনের সবকিছুরই সমর্পণ।

ক্যাম্প্‌টি জলপ্রপাত খুব কাছে এসে পড়েছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। রিক্সাকুলিদের জিগেস ক'রে জানলো যে আর এক ফারলংও নয়। সুতরাং এখানেই ওরা রিক্সা থামাতে বললো। এখান থেকে ওরা হেঁটেই যাবে।

পরিশ্রান্ত রিক্সাকুলিরা একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করতে ব'সে যায়। ওরা দু'জন হেঁটে চলে। ঢালু পথ তারপর একটি বাঁক। হয়তো কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ কোথাও নেই—বাঁকের মুখে বিশ্রাম-রত রিক্সাকুলিরা অন্তরালে চ'লে যায়। ওদের মনের অন্তরাল তো বহুক্ষণই খ'সে পড়েছে। দুপুরের রোদ্দুর হেলে গেছে—শীতের আমেজ, সোনালি রোদ্দুরে আলো আছে, উত্তাপ নেই। উত্তাপ আছে ওদের বুকের রক্তে—তাতেই চলবে। প্রশস্ত একটা পাথরের ওপর বসলো ওরা। বাতাস তখন জেগে উঠেছে—ঝরাপাতাদের সমাজে সরব চাঞ্চল্য। বাসবীর দু'একটা রেশমের মতো চুল উড়ে এসে লাগছে অনিরুদ্ধের গালে। হাতে হাত, চোখে চোখ, মনে মন কথা কয়ে যায় কিন্তু মুখে কারো কথা ফোটেনা। অনিরুদ্ধ হয়তো ভাবছিলো সেদিনের সেই দুরন্ত, চঞ্চল, দুষ্টুমিভরা মেয়েটি আজো ঠিক তেমি রয়েছে। ঝর্না ছিলো আজ হ'য়েছে নদী, সামান্য কিছু শান্ত বটে কিন্তু জোয়ার আরো বেশি; সহজেই দুকূল ভাঙতে পারে। একবার সে একটু আক্ষেপের সুরেই ব'লে ওঠে—আশ্চর্য শান্তি, বাসবী। তোমার দেহ-মনের এত ঐশ্বর্য কী ক'রে তুমি আজো অক্ষয় ক'রে রাখতে পেরেছো, বলো তো?

—কী জানি। সে তো তুমিই জানবে, অ্যাডোনিস্। এই সেদিন না তুমি আমায় বললে যে, আমার প্রেমই আজো আমায় এমন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। প্রেম যে আমার পরিণতি পায়নি, অ্যাডোনিস্, এরি মধ্যে যৌবন ছুটি পাবে কী ক'রে। মন আমার তাই আজো বয়সকে স্বীকার করেনা।

বাসবী তার ফারের ওভারকোটটা খুলে অনিরুদ্ধের কোলের ওপর ফেলে দিলো। মনে হ'লো কে যেন স্প্রে ক'রে খানিকটা পারফিউম্ অনিরুদ্ধের চোখে-নাকে-মুখে ছিটিয়ে দিলো।

—বড্ডো গরম লাগছে, নিরুদা। আর একটু ঠাণ্ডা পড়লে পরা যাবে'খন। কী বলো?

অনিরুদ্ধ তখন সদ্য-ছেড়ে-ফেলা বাসবীর ফারের ওভারকোটটা থেকে সুগন্ধি গরম ঘ্রাণ নিজের দেহে শোষণ ক'রে নিচ্ছিলো; কখনো হাত বুলোচ্ছিলো, কখনো গালের সঙ্গে চেপে ধরছিলো, কখনো খেলা করছিলো সেইটে নিয়ে। দেখে বাসবী হেসে ওঠে, বলে—ওকি হচ্ছে?

—তোমার গায়ের সুগন্ধি গরমটুকু হাওয়া এসে মুছে নেবার আগে আমিই সেটুকু শুষে নিচ্ছি নিজের শরীরে, সত্যি বড়ো চমৎকার অনুভূতি।

শোনামাত্রই বাসবী খুব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে ওঠে, বলে—সত্যিই যদি অনুভূতি চাও তো মিছে আর ঐ মরা জিনিশটাকে নিয়ে কেন? ওটাকে রেহাই দিয়ে মন দিতে তো পারো পাশের স্পন্দমান জীবনটার প্রতি।

বাসবীর সেই উচ্চহাসি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফেরে পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে। অনিরুদ্ধ মুহূর্তখানেক একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেও পরক্ষণেই বাসবীর উচ্চ হাসিতে প্রাণখুলে যোগ ছায়।

সরু সর্পিত পথের পাশে পাথর-মেশানো মাটিতেও গাছ জন্মায় প্রচুর। ছোটো ছোটো নাম-না-জানা বুনো ফুলের গাছ। কোনোটার বা কেবল রূপ আবার কোনোটার রূপ এবং গন্ধ দুই-ই ভালো। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা পাইনের মাঝে মাঝে ফার্জ-জাতের চির-হরিৎ গুল্ম হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। বুনো ব্রায়ার-জাতের কাঁটাওয়ালা লতানে কাঠগোলাপও এখানে-ওখানে রয়েছে—ফুলও ফুটিয়েছে বিস্তর। যদিও সেগুলোর কোনোটাই নাম-করা উদ্যানপুষ্প নয়,—নাই বা হ'লো, ফুল তো!

সুন্দর সুবাস। চেয়ে-চেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো বাসবী—ছাখো, ছাখো—ফুল এখানেও। বুনো ফুল তো অথচ কী সুন্দর!

ফুলের স্তবকগুলি ভাঙতে শুরু ক'রে ছায় বাসবী; নাকের কাছে ধ'রে ঘ্রাণ নেয়, যদিও বুনো ফুল তা হোক দিব্যি মিষ্টি গন্ধ। বলে—আমি এগুলো ভেঙে নিয়ে যাবো, রাখবো ফুলদানীতে।

অনিরুদ্ধ বলে—কিন্তু কাঁটা লাগবে যে হাতে—সাবধান। পথে আসতে আসতে ছাখোনি চেয়ে কতো ফুলই তো ফুটে আছে সারা পথটার দু'ধারে? এই ধাঁজের হলদে ফুল, লাল ফুল, নীলচে ফুল, গোলাপী ফুল··

—নাম জানো তুমি ওগুলোর? একটু আহ্লাদে সুরেই প্রশ্ন করলো বাসবী।

বেশ একটু বিজ্ঞোচিতভাবেই উত্তর দিলো অনিরুদ্ধ—এগুলোকে বলে Find-me-if-yon-may তোমার বাগানে তুমি খুঁজে পাবেনা এঁদের; এদের খোঁজ পেতে গেলে এখানেই আসতে হয়···

—আর ঐ নীলফুলগুলোর?

—আমি না তুমিই বলো। ··হাসতে হাসতে বললো অনিরুদ্ধ।

—এবার তাহ'লে তোমার বিছে বেরিয়ে গেছে, স্বীকার করো।

—স্বীকার করছি একশো বার।

—এটুকুও জানোনা হাঁদাগঙ্গারাম?···কপট রাগে নীলচে ফুলগুলো সজোরে অনিরুদ্ধের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাসবী বলে—এগুলোকে বলে Catch-me-if-you-can.

ব'লেই অম্নি হাসতে হাসতে দে ছুট্।

পিছন পিছন অনিরুদ্ধও ছোটে।

বাসবী ছুট ছায় লীলা-চপল কিশোরীর মতোই; এক ছুটে চ'লে যায় অনিরুদ্ধের নাগালের বাইরে। অনিরুদ্ধও ছোটে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ধ'রেও ফ্যালে বাসবীকে কিংবা হয়তো বাসবী ইচ্ছে ক'রেই ধরা ছায় ওর কাছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাসবী বলে—আমি যদি তেমন ক'রে ছুটতাম তুমি ধরতে পারতেনা কিছুতেই। ধরা দিলাম ব'লে।

—মুখে বলছো তেমন ক'রে ছোটোনি কিন্তু এদিকে হাঁপাচ্ছোও তো।

—কী করবো, অনভ্যাসে দেহ ভারী হ'য়ে গেছে যে। একটুতে হাঁপ ধরে।

অনিরুদ্ধ বাসবীর দু'টি গোলাপী গালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—আর ঐ যে দু'টি গোলাপী রঙের ফুল যা ফুটে আছে তোমার গালে, ওর নামটা কী বলো দেখি?

আহ্লাদী মেয়েটি বিস্ময়ের ভান ক'রে ব'লে ওঠে—ওমা, কোথা যাবো গো, হাঁদাগঙ্গারাম এও জানোনা? ছি ছি কী বোকা! আরো একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে স'রে এসে বললো—এর নাম হচ্ছে—Kiss-me-if-you-dare শোনোনি আগে এমন সুন্দর নামটাও?

বাসবীর মুখের দিকে অনিরুদ্ধ তার নিজের মুখ আনত করতে গিয়েও যেন সরিয়ে আনে। 'অধরা তখনো ডাকে সুধাসঙ্কেতে'—কিন্তু না, অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে ছেড়ে ছায় বাসবীর হাত, বলে—আর দুষ্টুমি করেনা, বসবে চলো কোথাও; আমিও হাঁপিয়ে গেছি বড্ডো।

ওরা বসলো আবার পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে।

—আমার ভয়-ভাবনা সব চুকিয়ে দিলাম। আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ, আমার ইহকাল, আমার পরকাল তোমারই হাতের মুঠোয় দিলাম তুলে। এইবার নিশ্চিন্ত আমি।…অনিরুদ্ধের কোলের ওপর মুখ রেখে কিছুক্ষণ নীরবে প'ড়ে রইলো বাসবী। অনিরুদ্ধও ওর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। দেখতে থাকে ওর দীর্ঘ ঝাঁপালো ঘনকৃষ্ণ চোখের পাতার মন্থর উন্মীলন-নিমীলন…যার কম্পিত ছায়া পড়ছে চোখের কোলে মসৃণ গালের ওপর। অদ্ভুত একটা আলস্য যেন ক্লান্তির লেখা লিখে দিচ্ছে সেখানে আর সারা শরীরময় যেন একটা ঘুমের মতো অবসাদ আর মদির প্রতীক্ষা জেগে আছে।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ছায় অনিরুদ্ধ—ওর গালে, থুৎনিতে হাত দিয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ছাখে। বাহুর অনাবৃত অংশটুকুতে হাত বুলোয়, হাত দু'খানা নিয়ে খেলাচ্ছলে নাড়াচাড়া করে, বলে—তুমি আদর নিতে জানো, বাসবী, এটাই তোমার উপজ্ঞা। তাই তোমায় আদর ক'রে আর আশ মেটেনা কিছুতে। তাই আরো আদরে আদরে তোমার দেহ চন্দনের মতো লেপে দিতে ইচ্ছে করে, পরিচ্ছদের মতো ঢেকে দিতে ইচ্ছে করে—তবু অতৃপ্তি জেগে থাকে অন্তরে, আশা আর মেটেনা।

বাসবীর মুখে আর কথা নেই—চোখ স্তিমিত, মুখখানা মিলিয়ে যাওয়া হাসির আভায় তখনো উজ্জ্বল।

শরৎ কালের রোদ্দুরের মধ্যে হঠাৎ যেমন বৃষ্টির পশলা নামে—ঠিক তেমি…তেমি উন্মাদ এক পশলা চুমোর বৃষ্টি নামলো বাসবীর সর্বশরীরে। তারই ধারাস্নানে ভিজে পিচ্ছিল হ'য়ে উঠলো বাসবী। সৌন্দর্য-সৌধের পাদপীঠতলে পূজারীর

কামনার এই উপঢৌকনে স্বীকৃতির প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো সম্রাজ্ঞীর মুখে। বাসবী একাই শুধু এরকম হাসি হাসতে পারে কিংবা হাসতে জানে—জগতে বোধহয় আর কোনো মেয়েই এর গোপন রহস্যটুকু এমন ক'রে আয়ত্ত করতে পারেনি—একথাই বারে বারে মনে হচ্ছিলো অনিরুদ্ধের। ওর গড়ানো কপালে, পুষ্পিত গালে, চিক্কণ চিবুকে কঞ্চুলীশাসিত কঠিন উরোজ-শিখরে, পশমের শাড়িতে ঢাকা নাভিপদ্মের পল্লবে পল্লবে, উন্মাদ অজস্র বৃষ্টি! মনের দিগন্তে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমা হ'য়ে ওঠে, ঝড়ের আভাস। এই ঝড়ের ঝাপ্‌টায় বাসবীর অঞ্চল যাবে নাকি খ'সে, বসনাবরণ যাবে নাকি উড়ে? গেলেও যেন কিছুই করবার নেই—এমনই এক নিশ্চিন্ত নির্ভরে, মদির অবসাদে শিথিল অসতর্ক হ'য়ে প'ড়ে থাকে বাসবী। মন্থর একটা আলস্যে ওর চোখ দু'টি উত্তরোত্তর স্তিমিত, ছোটো হ'য়ে আসে।

খুব মৃদু অস্ফুট স্বরে বাসবী এবার বলে—যতোদিন আমরা এখানে আছি—ততোদিন ঘর-পালিয়ে এখানে এসে আমরা মিলতে পারিনা, অ্যাডোনিস? আমাদের কুঞ্জ নেই, ফুলশেজ নেই, আমাদের ক্যাম্প্‌টি আছে, বন্ধুর শিলাশয্যা আছে। কী বলো?

—কিন্তু তাতে তো তোমার কোনো বিপদ হ'বেনা বাসবী?

বাসবী হাসতে হাসতে বলে—আমার বিপদও তুমি, সম্পদ্‌ও তুমি। বিপদকে এড়াতে গিয়ে সম্পদ্‌কে তো হারাতে পারিনা।...আচ্ছা বিদ্যাপতি না জ্ঞানদাস কার যেন লাইনটা খালি খালি মনে আসছে—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'—পরের লাইনটা তোমার মনে আছে অ্যাডোনিস্? মনে থাকলে আমার কানে-কানে একবার বলোনা।

অনিরুদ্ধ বাসবীর কানে গুঞ্জন তোলে—তব প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। আবেশে দু'জনেরই মন ভ'রে আসে। হঠাৎ অনিরুদ্ধের খেয়াল হ'লো যে, রানীর মতো এই মেয়ে—ঘরেও যার পায়ের ধুলো পড়েনা দামী আর্টফ্লোরের বুকে সেই মেয়েরই দেহ-প্রতিমা আজ এই ঠাণ্ডা, কঠিন শিলাশয্যায় ধূলি-ধূসরিত হ'চ্ছে ব্যথায় অনিরুদ্ধের মনটা টন্‌টন্ ক'রে ওঠে। সে হঠাৎ অধীর হ'য়ে বলিষ্ঠ বাহু দু'টির মধ্যে তুলে নেয় বাসবীকে, বলে—এমন ক'রে ঠাণ্ডা কঠিন পাথরে ধুলোয় আর শুয়ে থাকেনা, ওঠো। Prefer my cloak unto the cloak of dust পাউণ্ডের কবিতার লাইনটা যেন মিনতিতে ভিজে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

বাসবীর বারণ মানলোনা অনিরুদ্ধ, নিজের চেস্টারফিল্ডটা পেতেই বসালে ওকে। বাসবী বললো—বেশ তাহ'লে তুমিও এসো এখানে।

বাসবী অনিরুদ্ধকে টেনে নেয়। অনিরুদ্ধ তখন কাঁপছিলো, বললো—নিজের

সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি হেরে গেছি বাসবী—এবার তুমি আমায় সাহায্য করো, নিজে বাঁচো, আমাকে বাঁচাও। নইলে আমি যে পারিনা। আর পারছিনা আমি।

বাসবী হাসলো হয়তো লজ্জার ঈষৎস্পর্শ ছিলো সে হাসির মধ্যে—সহস্র চুম্বনের মধুতে পুষ্ট ওর মসৃণ গালে কতো পরিচিত দু'টি টোলের রেখা পড়ে—নিজেকে সে আরো ঢেলে ছায় অনিরুদ্ধের কাছে, বলে—কাকে বলছো? পারছিনা যে আমিও।

বাসবীর দৃষ্টির আলস্যে, ভঙ্গির আবেশে ও অবসাদে আর শরীরের স্পর্শবেত্ত প্রতীক্ষায় অনিরুদ্ধ নিজেও অনুভব করলো যে এতগুলো দীর্ঘ বৎসর অপেক্ষা ক'রে ওর নিজেরও যৌবন আজো প্রতীক্ষা হারায়নি।

অনিরুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে একবার নাম ধ'রে ডাকতে যায়—বাসবী!

বাসবী বলে—চুপ। কথা কয়োনা। শুনতে পাবে যে—

—কে?

—কেন, জানোনা? এই উপত্যকাতেই যিনি ঘুরে বেড়ান একা-একা, পিঠে তূণীর, হাতে ধনু, এই নিসর্গেরই সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে। বুঝলেনা? সেই যে আর্টেমিস্ গো। যিনি এই বন-ঝোপগুলো বৃষ্টি দিয়ে ভরিয়ে তোলেন, যে বৃষ্টি বাচাল; বার্চ গাছের ডাঁটাগুলোয় রঙের তুলি বোলান, যে রং শ্যামল।

অনিরুদ্ধ হেসে ফ্যালে, বলে—আমার মুখ বন্ধ করতে চাও?

বাসবী উষ্ণ হাতের তালু চেপে ধরে অনিরুদ্ধের মুখে। লজ্জা পেয়েছে বাসবী, বুঝলো অনিরুদ্ধ। সেই মেয়ে যার মনের কথাগুলো আবেগের এম্ফ্যাসিসে আণ্ডার-লাইন করা, ইটালিক্সে ভাবে আর কোটেশনে কথা কয়, এমন মেয়েও লজ্জা পায়? আশ্চর্য। আর আরো আশ্চর্য এই যে, লজ্জার আবীর মাখলে বাসবীর অতো ফর্সা মুখখানা কী সুন্দর দেখায়!

··সেদিন বাসবী বাড়ি ফিরে শয্যার নিভৃত পরিসর চাইলো, চাইলো খানিকটা রোমন্থনের, অনুচিন্তনের অবসর—সদ্য-মন্থিত প্রাণের অমৃত তার আকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই সে নগ্নিকা শিলাময়ী মূর্তিটাকে আদর করলো, তার কানে কানে কতো কী ব'লে গেলো, বললো—'আমি জানতুম, দেবি, আমি জানতুম যে, তুমি আমায় ছলনা করবেনা কখনো। তুমি এবার নতুন কিছু দেবে। যখনই তোমার কাছে লুকিয়ে-লুকিয়ে মাথা খুঁড়ে মরণ চেয়েছি তুমি দিয়েছো নতুন জীবন, নতুন স্বাদ, নতুন শিহর, নতুন ক'রে জীবন চাইবার, নতুন ক'রে বাঁচবার নতুন-নতুন প্রেরণা। আপাতত তা-ই আমাকে দাও। এতদিনে আমার অ্যাডোনিস্‌কে

মিলিয়ে দিয়েছো যখন ভোগ করবার মতো যৌবন দাও—যৌবনের আয়ু। প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করবার মতো মন, উপঢৌকন দেবার মতো রূপ। আজকে আমি বাঁচতে চাই, আজকে আমি সাজতে চাই, আজকে আমি সাজাতে চাই তাকেই—যে আমাকে পেলে বাঁচতে পারে, যে আমাকে পেলে ধন্য হ'য়ে যেতে পারে, যে আমাকে পেলে পাগল হ'য়ে উঠতে পারে, যে আমাকে একটুখানি ছোঁয়া দিয়ে পাগল ক'রে দিতে পারে। তবে যদি কোনোদিন আমার পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য অ্যাডোনিস্‌কে হারায় কিংবা আমাদের অনুভূতির পাত্রে শিগ্‌গিরই তলানি এসে ঠেকে তাহ'লে···না, না, এসব আমি কী ভাবছি,—এ কখনো হ'তেই পারেনা···তবু যদি হয় তবে এই ভরা জোয়ারের মাঝখানেই ফুটো ঘটের মতো জীবন আমার ডুবিয়ে শেষ ক'রে দিও। এই রূপের মধ্যেই, এই যৌবনের মধ্যেই আমায় সমাধিস্থ কোরো। দেবি, তুমি তো জানো এই আমার প্রথম···তুমি তো জানো মনে-মনে বাসবী আজো অনূঢ়া···তুমি তো জানো প্রেম আমার পরিণতি খুঁজে খুঁজে দেহ-দেহলীর সীমান্তে সীমান্তে যুগ যুগ ধ'রে কেঁদে-কেঁদে ফিরেছে, মাথা খুঁড়ে মরেছে অ্যাডোনিসের জন্যই। সেই অ্যাডোনিস্‌—তোমার, আমার, সকল লোকের, সকল কালের, সেই অ্যাডোনিস্‌কে আমি যখন পেয়েছি একটি মানুষের মধ্যে—তার সঙ্গে আমার এই প্রেম, এ তো আমার পাপ নয়। এ পাপ হ'তেই পারেনা। সারাজগতের কাঠ-গড়ার সাম্‌নে দাঁড়িয়েও আমি এই কথাই ব'লে যাবো।' ··প্রাণের উচ্ছ্বাসে আরো কতো কী ব'লে গেলো বাসবী। পুতুলটাকে বুকে ক'রে নিয়ে বিছানায় সে শুলো। মনে-মনে বললো—এমনও যদি হয় মরার সময়ে মাথার শিয়রে অ্যাডোনিস্‌কে যদি না পাই তাহ'লে তোমাকে বুকে ক'রেও যেন চোখ বুজতে পারি। আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছেনা কিংবা কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করছেনা। আজকে সারাদিনটার ছোটোখাটো খুঁটিনাটি নানাকথাই ভাবতে ইচ্ছে করছে। শারী তপেশের সঙ্গে কখন কী করলো, কোথায় গেলো, কিংবা এখন ওরা কী করছে সে-সম্বন্ধে আজ সে আর কোনো ঔৎসুক্য বা আগ্রহ অনুভব করলোনা। যাহয় করুকগে। তার আজ কিছুতেই আর প্রয়োজন নেই—

সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সকলের আগেই শুয়ে পড়লো বাসবী। কিন্তু বিছানায় জেগে কাটালো অনেকক্ষণ।

ভুল হ'লো ধুল পরিমাণ

Nature does not often say 'See!' to a poor creature at a time when seeing can lead to happy doing; or reply 'Here!' to a body's cry of 'Where?' till the hide-and-seek has become an irksome and outworn game. —Thomas Hardy

এম্নি ক'রে তার পরদিন ··তার পরদিন···রোজ রোজ। নতুন নেশার দুর্নিবার আকর্ষণে ওরা এইভাবে মেলে। এইটুকু মহামূল্য সময়ের জন্য যেন ওরা সারাদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে। সন্ধ্যায় ও রাত্রে, ঘুমে ও জাগরণে ওরা মনে-মনে অশ্রান্তভাবে কথা সাজায় যাতে আবার পরদিন পরস্পরকে কাছে পেয়ে কী ভাবে বলবে কথাগুলো, কী করবে ওরা পরস্পরকে নিয়ে তারই একটা মহড়া দিয়ে রাখে। কিন্তু সত্যি যখন ওরা পরস্পরকে পায় তখন আর তাদের হিশাব মতো কিছুই করা হ'য়ে ওঠেনা, কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যায়, সব ভুল হ'য়ে যায়, সব এলোমেলো হ'য়ে যায়। অনিরুদ্ধ একটা বাজলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করে ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাকের বাঁকটার কাছে। কখন বাসবী আসবে? কতোদিন বাসবী আগে এসেই ওর অপেক্ষা করে। আজ কেন দেরি হ'চ্ছে? অনিরুদ্ধ যাবে নাকি ওদের বাড়ি? অজবাবু ফিরে এলেন হয়তো। অনিরুদ্ধ যখন এই রকম দ্বিধায় দুলছে তখন দূরে দেখা গেলো বাসবীকে। বাসবী অনিরুদ্ধকে দেখে প্রায় দৌড়েই এসে হাজির হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—ইস, এই আজ প্রথম দেরি ক'রে ফেলেছি। তোমাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলো তো?

অনিরুদ্ধ হিশেব ক'রে বলে—১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মানে দশ বছরেরও বেশি। ব'লে হেসে বাসবীর হাতখানা হাতের মধ্যে নেয়, বলে—চলো; আজ কোথায় যাওয়া যায়, বলো তো? ক্যাম্প্‌টি যাওয়ার সময় তো কুলোবেনা।

বাসবী বলে—কাজ নেই অন্য কোথাও গিয়ে। আমাদের সেই 'কাফে'-তে ব'সেই সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কী বলো? কোথাও গেলে সময় ফুলিয়ে উঠতে পারা যায়না। সময় আজকাল কতো কম ব'লে মনে হয় বলো তো?

সেই কাফে-তেই ঢুকলো ওরা। আড্ডার জন্য এটাকেই ওরা পছন্দ করে কারণ এটাই অপেক্ষাকৃত ছোটো, নিতান্ত ঘরোয়া এবং একেবারেই ভিড় নেই।

সেই 'কাফে'-তে ব'সেই ওদের গুঞ্জনে-গল্পে সময় কেটে যায়।

একসময়ে অনিরুদ্ধ ব'লে ওঠে—আজ তোমায় যেন কিছু বিমনা দেখাচ্ছে বাসবী?

বাসবী চমকে ওঠে অনিরুদ্ধের কথায়, বলে—হ্যাঁ, ধরেছো ঠিকই। মন আমার আজ কয়েকদিন থেকেই কিছুটা অশান্ত আছে। তোমায় আজ যে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলুম, কেন জানো? কই, জিগেস তো করলেনা, কেন এত দেরি হ'লো?

—কেন?

—শারী আর তপেশের পেছনে খানিক গোয়েন্দাগিরি করলাম।

—তাই নাকি? কেন ওকাজে তুমি হঠাৎ এত উৎসাহ পেলে? ওরাও যদি আমাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে সেটা কি খুব ভালো লাগবে?

হাসির উত্তরে বাসবী যদিও হাসে তবু ওর মুখের ওপর থেকে উৎকণ্ঠার ছায়া নড়েনা। সে বলে—তাহোক আমাদের কথা আর ওদের কথায় অনেক তফাৎ। প্রেম তো খারাপ জিনিশ নয় নিরুদা, নইলে আমরাই বা দাঁড়াতাম কোথা? কিন্তু এ যে প্রেম নয়, ক্ষণিকের মোহ, তাই বিপদজ্জনক। প্রেম কি এতই সহজে মেলে? The man to love rarely coincides with the hour for loving. প্রেমের পাত্র নির্বাচনে ভুল করাটাই সর্বনাশ আনে মেয়েদের জীবনে। আমার বিশ্বাস শারী সেই ভুলটাই করছে···

—ওসব ব্যাপারে ভুল করলে সে-ভুল বাধা-নিষেধ যুক্তি-তর্ক দিয়ে ভাঙানো যায়না, যতক্ষণে ভুল আপনিই না ভাঙে। সুতরাং সহানুভূতির সঙ্গে অপেক্ষা করো। কী আর করবে?

—কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতে গেলে তপেশ অবাধে এতটা ক্ষতি আমাদের সংসারের ক'রে ফেলতে পারবে যে, পরে আর তার কোনো প্রতিকার হ'বেনা। তুমি তো জানোই শারীকে আমি কতোটা ভালোবাসি। ছোটোবোনের মতোই ও আমার প্রিয়। এ-বাড়ি যখন আমি প্রথম এলাম শারী তখন কতোটুকু মেয়ে কিন্তু সম্প্রতি ও যেন দিন-দিনই আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে শুরু করলো— ভাবলুম এ তো হবেই, ও বড়ো হচ্ছে ক্রমশ, আমার সখিত্বেই কি চিরদিন ওর মন ভ'রে থাকতে পারে? থাকতেই পারেনা—প্রকৃতি তার কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নেবেই, ছাড়ান পায়না কেউ। কিন্তু···তাই ব'লে কি তপেশ? অসহ্য! আচ্ছা তুমিই বলো, তোমার কী রকম ধারণা তপেশের ওপর?

—তপেশের সম্বন্ধে আমার ধারণা উঁচু নয় নিশ্চয়ই কিন্তু তাতে তো শারীর পক্ষে কিছুই আসবে যাবেনা। হ্যাঁ, ভাখো একটা কথা বলতে ভুলেছি—কাল

তপেশের সঙ্গে ডাঃ মালহোত্রের ডিস্‌পেন্‌সারীতে হঠাৎ দেখা। জানোই তো আমাকে প্রায়ই যেতে হয় ওখানে মলয়ার ওষুধ আনতে। আমিও ঢুকছি আর তপেশও বেরিয়ে যাচ্ছে—কথা কইতে গেলাম। ওম্নি না চেনার ভান ক'রে তপেশ আমাকে আড়চোখে দেখলো তারপর সটান বেরিয়ে গেলো।

ডাক্তার মালহোত্র বললেন—আপনি ওঁকে চেনেন নাকি?

ওঁর প্রশ্নের জবাবে বলতেই হ'লো—হ্যাঁ। এখানে এসে আলাপ। উনি কি আপনার এখানে প্রায়ই আসেন?

—আসেন। ওঁর নিজের জন্য, ওঁর স্ত্রীর জন্য।

—ওঁর স্ত্রী? আমি যতদূর জানি, ওঁর তো স্ত্রী নেই—উনি অবিবাহিত।

—কিন্তু আমার কাছে উনি বিবাহিত ব'লে পরিচয় দিলেন। ভগবানই জানেন। ভি. ডি-র রোগী শতকরা ৯৯ জনই মিথ্যা বলে।

—ওঁর কী চিকিৎসা করছেন আপনি?

—ওই তো বললাম অর্থাৎ মুখ দিয়ে তো বেরিয়েই গেলো। যদিও বলাটা আমাদের পেশার নিয়মবিরুদ্ধ। উনি ওঁর স্ত্রীকেও সংক্রামিত ক'রেছেন। সেই জন্য উপদেশ নিতে আসেন যাতে রোগটা প্রকাশ পাবার আগেই অর্থাৎ জানাজানি হবার আগেই সেটা সারিয়ে ফেলতে পারা যায়। লোকটি এতো বেশি কথা কন আর রাজা-উজীর মারেন যে, সত্য বলছেন কি মিথ্যা বলছেন বোঝাই দুষ্কর। বলছিলেন কলকাতার কোন মস্ত বিজ্‌নেস্ ম্যাগ্‌নেট্‌-এর বোনকে উনি নাকি বিয়ে করেছেন সম্প্রতি—কী মুখার্জি যেন···নামটা ঠিক মনে পড়ছেনা।

বিনা মন্তব্যে মালহোত্রের কথাগুলো আমি শুধু শুনে গেলাম। আর তাছাড়া বলারই বা কী আছে?···ব'লে অনিরুদ্ধ চাইলো বাসবীর দিকে।

অস্বাভাবিক আতঙ্কে বাসবী ব'লে ওঠে—কিচ্ছু মিথ্যে নয় নিরুদা, সব সত্যি। এইবার আমি বুঝতে পারছি সব। ক'দিন হ'লো কেন আর শারী ওঠেনা বিছানা ছেড়ে, কেনই বা বেরোয়না কোথাও কিংবা কারো সামনে। সব সময়ে শুয়ে থাকে। নিজের জীবনের গ্লানি নিয়ে একা-একাই থাকে আড়ালে-আব্‌ডালে। দিন-দিনই কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা বন্ধ ঘরে। সাহস ক'রে ওকে তো কিছু বলতেও পারিনা যে অভিমানী মেয়ে! তাছাড়া বিরুদার নিষেধও আছে, সামান্যতম আঘাত পেলেও ওর মাথা আবার আগের মতো বিগড়ে যেতে পারে।

সেদিন অনিরুদ্ধের কাছ থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময়ে বাসবীর মনে হ'তে লাগলো যে, এই কয় দিন যে-স্বরগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের মুগ্ধ মনের সুর বেঁধেছিলো কেমন ক'রে আজকে যেন তারই সুর কেটে গেছে। হিংসুক নিয়তি

মানুষের এতটুকু সুখও কি সহ্য করতে পারেনা? অন্তত অজও ফিরে আসুক তাহ'লে যে বাসবীর ঘাড় থেকে অনেকখানি দারিদ্র নেমে যায়। আজ মনে পড়লো স্বামীর কথা—সেই কথা-বিরল আত্মস্থ কাজের মানুষটিকে।

বাড়ি ঢুকেই শ্বশুরের আমলের পুরাতন দরোয়ান বৃদ্ধ রামকিষণকে জিগেস ক'রে জেনে নিলো, শারী বাড়িতেই আছে, কোথাও বেরোয়নি আজ। তপেশও কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে। গত কয়েকদিন হ'লো কোথাও বেরোচ্ছেনা শারী।

সিঁড়ির আলোটা জ্বালা নেই কেন, রামকিষণ?—বাসবী জিগেস করলো।

তপেশবাবু যখন এলেন সিঁড়ির আলো তো তখন জলছিলো।—রামকিষণ উত্তর দিলো।

বাসবী অন্ধকারেই সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে হঠাৎ কার গায়ের ধাক্কা লেগে আচমকা চমকে ওঠে অন্ধকারে। বাসবী নিজেও কোনোমতে টাল সামলে নেয়, তা ছাড়া যার ধাক্কা লেগে পদস্খলন হ'তে পারতো সেই অন্ধকারের মানুষটাও ধ'রে ফেলে বাসবীকে। কিন্তু ধ'রে ফেলাটা কি শুধু বাসবীকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করার জন্যে? এটা যে প্রায় অশিষ্ট জড়িয়ে ধরা! অস্ফুটে ব'লে ওঠে বাসবী—কে, অন্ধকারে?

অন্ধকারের শ্বাপদটা তখনও তাকে বুকে জড়িয়ে আছে, কী স্পর্ধা! সেই অন্ধকারের শ্বাপদটার উত্তপ্ত নিশ্বাস বাসবীর গালে এসে লাগছে। উগ্র মদের গন্ধ।

—ইস্, আপনি প'ড়ে যেতেন যে আর একটু হ'লেই।···তপেশের মতো গলা না?

মুহূর্তে প্রথম-যৌবনের দুর্ধর্ষ শক্তি আনে বাসবী তার দুই বাহুতে সেই ঘৃণ্য আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেতে। একটি প্রবল ধাক্কায় কয়েক ধাপ নিচেয় গড়িয়ে পড়ে লোকটা। খুব শব্দ হয়।

—রামকিষণ, আলো। এই বাহাদুর আলো আন, শিগ্‌গির।···বাসবী হাঁক ছাড়ে।

রামকিষণ ছুটে আসে।, নিজরন্ধননিরত নেপালী চাকর বাহাদুর ছুটে আসে হারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে।

কালো স্যুটপরা অন্ধকারের শ্বাপদটা তখন গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠেছে।

—আরে, তপেশবাবু যে! আমি ভেবেছি বুঝি বা কোনো দাগী বদমায়েস, মাতাল হ'বে। বাবা রে! যে-রকম অন্ধকারে ওৎ পেতে ছিলেন··বাসবীর কথাগুলোর মধ্যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ব্যঙ্গ সবকিছু ওতপ্রোত হ'য়ে মিশে থাকে।

গোলমাল শুনে শারী ততক্ষণে এসে দোতলার বারান্দার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছে—কী বৌদি!

রামকিষণ বলে—ছি, ছি, ভদ্দর আদমি শরাব পীনা বহুৎ বুরা কাম হ্যায়। ক্যা কিয়া বহমা কুছ নুকশান তো নহী কিয়া ?

তপেশ তখন হেঁট হ'য়ে তার স্যুটের ধুলো হাতের চাপড় মেরে-মেরে ঝেড়ে ফেলছিলো আর বলছিলো—ইস্ !

বাসবী তার নির্বাক্ দৃষ্টি একবার ফেরায় তপেশের দিকে আর বারান্দায় দাঁড়ানো শারীর দিকে। শারী নেমে এলো সিঁড়িতে।

শারীর দিকে চেয়ে রামকিষণ বলে—শরাবী আদমিকো রাতমে রহনে দেনা বহুৎ মুস্কিল হ্যায়, দিদি। স্রিফ্ একঠো বাত্ কহ্ দিজিয়ে তো ইন্‌কা জিম্মা হম্ লে লে'।

শারী বলে—কখন এসেছেন ? কই, কিছুই জানিনে তো ?

রামকিষণ বলে—করীব আধাঘণ্টা।

বাসবী বলে—কেন ? এসে উনি ওপরে মোটে ওঠেননি ? তুই দেখিস্‌নি ?

শারী বলে—না। আমার কাছে মুখ দেখাবার পথ আর উনি রাখেননি।

বাসবী বড়ো আশ্চর্য হ'য়ে চেয়ে থাকে তপেশের দিকে, বলে—সিঁড়ির আলো নিবিয়ে দিয়ে আধঘণ্টা ধ'রে অন্ধকারে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কখন আমি ফিরবো ? ধন্য ধৈর্য তো আপনার। নেশার ঝোঁকে কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে মানুষ যদি একটা কাণ্ড ক'রে বসে তো তাকে তবু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু আপনি যা করেন সজ্ঞানেই করেন এবং বহুদিন ধ'রে মতলব এঁটেই করেন। তাই আপনার সম্বন্ধে ক্ষমার প্রশ্নই ওঠেনা। এমন কেন করলেন বলুন, আমাকে কী ভাবলেন ?

বৃদ্ধ রামকিষণ কর্ত্রীর আদেশ চায়, বলে—কহিয়ে বহু-মা, হুকুম দিজিয়ে তো হম্ আভি উনকা খোপ্‌ড়ী উতার লে'।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসবী শারীর দিকে চায়। বাসবীর বদলে শারীই বলে—বাড়ির বাইরে ওঁকে নিয়ে যাও রামকিষণ, ভদ্রবাড়িতে জায়গা পাবার মতো লোক উনি নন। কাল দিনের বেলায় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এসে ওঁর মালপত্র নিয়ে যাবেন।

ব'লেই শারী আর সেখানে দাঁড়ায়না, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

রামকিষণ কিছু বলার আগেই তপেশ সেই দুর্জয় শীতের রাত্রে টলতে টলতে মঞ্জুভিলা থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্জুভিলার ফটক বন্ধ হ'য়ে যায়।

বাসবী ওপরে এসে দেখলো শারী এসে বিছানা নিয়েছে। শারীর খাটের প্রান্তে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে বসলো বাসবী। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললো—তুই কি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলি—না গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলো ? নাকি জেগেই ছিলি গোলমাল শুনে উঠে গেলি ?

—না বৌদি, জেগেই ছিলাম।

—জানিস্ সব কথা? যা যা ঘটেছে…?

—না বৌদি, জানতেও চাইনা। ও-সব ঘেন্নার কথা তুমি আর তুলোনা।

তবু বাসবী শারীকে পরীক্ষা করার জন্য বলে—আজকের রাতটা থাকতো নাহয়—নিচেই নাহয় থাকতো। রামকিষণকে বের ক'রে দিতে বললি কেন? কোথায় যাবে এই দুর্জয় শীতের রাত্রে? যতোই হোক মানুষ তো!

—মানুষ আবার কোথা? অমানুষ তো। ভালোই হ'য়েছে বৌদি।…শারী পাশ ফিরে শোয়।

—এই সত্যটুকু তুই কিন্তু আগে বুঝতে পারিস্নি বোকা মেয়ে।

শারীর একখানা হাত বাসবী নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে গিয়ে বলে—ইস্, তোর হাত যে একেবারে হিম হ'য়ে আছে শারী, দস্তানা ব্যবহার করতে পারিস্নে?…শারীর হাতখানা বাসবী বুকের গরমের মধ্যে টেনে নেয়, তারপর বলে—অকৃত্রিম ভালোবাসা, প্রেম এ-সব কিছু নিন্দনীয় জিনিশ নয়, লুকোবার জিনিশ নয়। প্রেম স্বর্গীয় কিন্তু তাই ব'লে ভালোবাসার পাত্র নির্বাচনে ভুল করার চেয়ে বিড়ম্বনাও জীবনে আর কিছু নেই। সাময়িক মোহকেও অনেক সময় প্রেম ব'লে ভুল হ'তে পারে কিন্তু সে-ভুলের দণ্ড দিতে হয় সমস্ত জীবন দিয়ে।

শারী চুপ ক'রে থাকে বটে কিন্তু ওকে দেখে বাসবীর মনে হ'লো যে, এতদিন বুকের কাঁটা লুকিয়ে রাখার ক্লান্তিকর প্রচেষ্টায় শারী ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হ'য়ে উঠছে।

সে-রাত্রে অনেক পেড়াপীড়ির পর বাসবী শারীকে নিজের ঘরে আনে এবং পাশে নিয়ে শোয়।

বিছানায় শুয়ে বাসবী জেগে কাটায় অনেকক্ষণ। প্রথমটা ভেবেছিলো শারী বুঝি ঘুমিয়েছে কিন্তু না, শারী ঘুমোয়নি।

জেগে-জেগে বেশ কিছুক্ষণ উস্খুস্ করবার পর বাসবী বলে—শারী জেগে আছিস্? ঘুম আস্ছেনা, নয়?

শারী বলে—না। কী? বলছো কিছু?

বাসবী বলে—না, বিশেষ কিছু নয়। হ্যাঁ রে, একটা কথা জিগেস করবো ঠিক সত্য জবাব দিবি? লুকোবিনা কিছু?

বাস্তব বিরক্তির স্বরে শারীর জবাব শোনা যায়—আঃ, তোমার খালি ঐ সব।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

একটু পরেই বাসবী বলে—তুই রাগ করলি আমার ওপর?

শারী বলে—না। বলো, কী জানতে চাও?

বাসবী বলে—তপেশকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন মন কেমন করছে তো?

শারী নিরুত্তর।

হঠাৎ বাসবী প্রশ্ন ক'রে বসে—আচ্ছা, তুই তপেশকে ভালোবাসিস্, না রে?

একথার কিন্তু কোনো উত্তর আসেনা শারীর কাছ থেকে।

বালিশ থেকে মাথা তুলে বাসবী শারীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়না।

হঠাৎ শারী দু'হাতে বাসবীকে জড়িয়ে ধ'রে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আহা কাঁদুক। শিশুর মতো ওর মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে বাসবীর মনে হ'তে থাকে যে, চোখের জলে ধুয়ে শারী আবার ফুলের মতোই পবিত্র হ'য়ে উঠেছে; যতো কিছু ক্লেদ সমস্তই সেই শয়তানটার গায়ে।

পরদিন তপেশ আসবে-আসবে ক'রে দুপুর কেটে গেলো, সময় আর কাটতে চায়না দু'টি নিঃসঙ্গ নারীর। একটি অখণ্ড দুপুরের নিঃসঙ্গতাকে দ্বিখণ্ড ক'রেও সেই নিঃসঙ্গতার ভার ওরা কেউই যেন আর বহন করতে পেরে উঠছেনা। একা-একা, ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। বারে বারেই বাসবী শারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বারে বারে শারীও বাসবীর কাছে আসে, কথাও হয় দু'একটা কিন্তু কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে, পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য যেন বেশিক্ষণ সইতেও পারেনা—অন্তরালে স'রে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে বাঁচে। ইদানীং শারীর কেবলই মনে হয় সে যেন বড়ো বেশি অনাবৃত হ'য়ে পড়েছে বাসবীর কাছে—এ-বেশে যেন আর ওর সামনে বেরোনোই যায়না, বড়ো লজ্জা করে। বাসবীও অনুভব করে শারী যেন ইদানীং নিজেকে বড়ো বেশি ক'রে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে তার কাছ থেকে এবং তা পারছেনা ব'লেই যেন বড়ো অস্বস্তি অনুভব করছে।

বাসবীর বসার ঘরের পশ্চিম দিক্‌কার জানলাটা যেখানে দাঁড়ালে অনিরুদ্ধের বাড়ির পূব পাশটা দেখা যায় বাসবী ঘুরে-ফিরে বারবার সেই খানেই গিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কাউকেই দেখতে পায়না। এতদূর থেকে দেখলেও নিরুদাকে সে ঠিক চিনতে পারবে।

—একা-একা তোরও তো ভালো লাগছেনা। যাবি নিরুদার ওখানে? বৌদি কতোবার বলে, তুই কিন্তু যাস্‌না একটিবারও।…শারীর মন জানতে চায় বাসবী।

শারী বলে—আজকে থাক্। তুমি যাও। আমার এখন কিছুই ভালো লাগছেনা বৌদি।

তবু বাসবী বলে—আরো তো সেইজন্যেই বলছি রে। একা-একা আরো তো খারাপ লাগবে।

শারী বলে—না, একাই আমি থাকি। আমি এখন একটু শোবো।

বাসবী বলে—তবে আমিও যাবোনা। তপেশ তার মালপত্তর নিয়ে যেতে এখন যদি আসে।

—আসে তো কী হবে? মালপত্তর নিয়েই যাবে। পাহারা দেবার জন্যে তুমি থাকতে চাও নাকি?

—না রে না, তুই বড়ো ভুল বুঝিস্, শারী। তোদের পাহারা আমি কখনো দিয়েছি, বল্ তুই? দিলে হয়তো খারাপ করতামনা। একথা পরে বুঝবি আচ্ছা, আমি তবে যাই। তুই একাই থাক্।

বাসবী অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হ'য়ে নেয়, বাড়ি থেকে বেরোতে পেয়ে একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অন্যান্য দিনের মতো আজো সে একেবারে বাইরের ঘর পার হ'য়ে অবাধে বিনাদ্বিধায় মলয়া-অনিরুদ্ধের শোবার ঘরেই ঢুকে পড়তো কিন্তু বাইরে থেকে মলয়ার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কলহের স্বর শুনে সে দরজার বাইরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

মলয়া তখন বলছে—যাও, যাও, এক্ষুনি যাও মঞ্জুভিলায়। বাড়িতে আসার আর দরকারই বা কী? এবার থেকে তুমি আর এসোনা রাত্তিরেও। বেশ, সেই ভালো—আমার যা হবার হ'বে। ওষুধও আর আনতে হ'বেনা ব'লে দিচ্ছি—আনলেও খাবোনা, ফেলে দেবো।

অনিরুদ্ধ যতোই থামিয়ে দিতে যায় কিন্তু থামতে চায়না মলয়া।

অনিরুদ্ধ বলে—আঃ, এসব কী হ'চ্ছে? চুপ করোনা। এতক্ষণ এত কিছু ব'লেও তবু তোমার হ'লোনা? কেলেঙ্কারী কোরোনা।

—কেলেঙ্কারীর ভয় আছে তোমার? কেলেঙ্কারী আমি করছি, না তুমি?

—সে তো নিঃসন্দেহ আমি। যে যেখানে আছে জেনে গেছে সেকথা, এবার থামো। আর পাগলামি করোনা ছিঃ, জ্বর বাড়বে। ওষুধটা খাও।

ওষুধের গ্লাস্‌টা অনিরুদ্ধের হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মলয়া; চুরমার হ'য়ে যায়।

অনিরুদ্ধ প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই কঠিনস্বরে বলে—বড়ো বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে। পাগলামিরও একটা সীমা থাকা দরকার, আর ভালো লাগছেনা, এইবার অসহ্য হ'য়ে পড়ছে।

মলয়া শ্লেষ করে—আমার পাগলামি আর ভালো লাগবে কী ক'রে? সেই মেয়েটার ছেনালী এখন ভালো লাগছে যে। সর্বক্ষণ মশ্‌গুল হ'য়ে আছো তাতেই···দেখো এবার সে এখানে এলে কী করি···!

দরজার অন্তরালে একটা দারুণ অস্বস্তিতে ও ধিক্কারে মুহূর্তকাল অস্থির হ'য়ে ওঠে বাসবী। এক পা এগোয় আবার দু'পা পেছোয়, শেষপর্যন্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়। নিরুদার সঙ্গে দেখা না ক'রে চ'লে যাবেনা বাসবী।

মলয়ার অশিষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ শাসানিটা কানে যাওয়ামাত্রই অনিরুদ্ধের মুষ্টি মুহূর্তের জন্য দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ হয় কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত ক'রে নেয়। শুধুমাত্র আক্ষেপ ক'রে বলে—এ নিয়ে তোমাকে দোষ দেওয়া বৃথা, মলয়া। তোমার যেমন শিক্ষাদীক্ষা সেই মতোই তো তুমি বলবে। এটা জানা কথাই। তবে যাকে লক্ষ্য ক'রে তুমি ও-সব কথা বললে তার রূপের, গুণের, শিক্ষার, সহবতের, রুচির, শালীনতার, ধনের, সম্ভ্রমের কণামাত্রও যদি তোমার মধ্যে থাকতো তাহ'লে এতটা ছোটো, এতটা সংকীর্ণ হ'তোনা তোমার মন আর তোমার মুখ দিয়ে তাহ'লে এরকম নীচের মতো কথাও বেরোতোনা। এখানে পেলে অপমান করবার মতলব আঁটার চেয়ে বরং তার পায়ের ধুলো নিতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতে।

শুনতে-শুনতে দরজার আড়ালে বাসবী আরো অস্থির হ'য়ে ওঠে। মলয়ার কটূক্তিতে সে যতো না বিচলিত হ'য়েছিলো এবার সত্যসত্যই তার চোখে জল এসে পড়ে। নিরুদা কেন তাকে এতো ভালোবাসে? কেন তাকে এমন চোখে ভাখে? এ-ভালোবাসার কতো সামান্য প্রতিদান সে দিয়ে যেতে পারবে এ-জীবনে? ঐ তো চাকরটা এদিকে আসছে—আঁচলে চোখ মুছে নেয় বাসবী। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা বড়ো বিসদৃশ। অগত্যা সে ঘরেই ঢুকে পড়ে, ডাকে—বৌদি!

সাড়া আসেনা মলয়ার কাছ থেকে। মলয়া তখন খাটের এক কোণে ব'সে আছে হেঁট মুখে আর অনিরুদ্ধ একটু তফাতে জানলার বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থম্ থম্ করছে ঘরের আব্‌হাওয়া। বাসবীর গলা পেয়ে অনিরুদ্ধ মুখ ফিরিয়ে দেখলো একবার, দ্বিধাজড়িতপদে ওর দিকে একটু এগিয়ে এলো মাত্র।

এই দম-আটকানো স্তব্ধতা ঠেলে বাসবী ভয়ে-ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালো মলয়ার পাশে, বললো—আবার এসেছি বৌদি। হায় রে আমার কপাল! করমবিপাকে গতাগতি পুন পুন।···তারপর সে তার নিরুদার দিকেই ফিরে করুণ মিনতির মতো ক'রে কথাটা শেষ করলো, বললো—মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে, মাধব!

চোখের জল মুছে আসতে পেরেছে বাসবী কিন্তু গলার আবেগ তো আর মুছে আসতে পারেনি।

লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে, বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে কিছুদূরে দাঁড়িয়েছিলো অনিরুদ্ধ ঠিক করতে পারছিলোনা এবার কী করবে সে, কী বলবে।

—আমার ওপর খুব রাগ করেছো তো বৌদি ?...বাসবীর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ নয় যেন জননীর স্নেহ ঝরছে, অনিরুদ্ধ আরো বিস্মিত হয়।

মলয়ার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে সে তুলে নিতে যায়, মলয়া টেনে সরিয়ে নেয়। চোখোচোখি হ'তেই মলয়া মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। তার দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণ তখনো ক্ষান্ত হয়নি।

বাসবীর জুতোর তলায় অসহিষ্ণু কাচের টুকরো সশব্দে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যায়।

—একি কাচ বুঝি ? নিরুদা, চাকরটাকে বলোনা এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।

অনিরুদ্ধ চাকরটাকে একবার চেঁচিয়ে ডেকেই ক্ষান্ত হয়। সেখান থেকে নড়েনা।

মলয়া একবার মুখ ফিরিয়ে চাইলো বাসবীর দিকে। তখনো মলয়ার চোখে আগুন কিন্তু বাসবীর চোখে জল। বাসবী বলে—হতভাগীর সঙ্গে বুঝি কিছুতেই কথা কইবেনা ?

পেছন থেকে কঠোর কণ্ঠের ডাক আসে—বাসবী !

বাসবী ফিরে ছাখে অনিরুদ্ধ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কী নিরুদা ?

—তুমি এখন যাও তো।

—তোমাদের কী হয়েছে বলো তো ? ঝগড়া-ঝাঁটি আমি মোটে সইতে পারিনা—বড়ো কষ্ট হয়।

—কিছু না। কিছুই হয়নি। তুমি যাও।

বাসবীকে আর প্রশ্নও করতে ছায়না কিংবা বাসবীর প্রশ্নের জবাবও ছায়না, কেবল বলে—যাও, এক্ষুনি তুমি যাও। এখান থেকে পালাও। বড়ো বিশ্রী হাওয়া এখানকার। এই ইত্রামির মধ্যে আর একটুও থেকোনা। তোমার আসার মতো জায়গা কি এটা ? নিজের মর্যাদা তুমি ইতিমধ্যে অনেকখানি নষ্ট করেছো আমার এখানে এসে ; এর পরেও আমি তা আর হ'তে দিতে পারিনা।

এক রকম প্রায় হাত ধ'রেই বাসবীকে অনিরুদ্ধ ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যায়।

বেরিয়ে আসার পর বাসবী বলে—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কিছু কথা ছিলো—সেটা কি আর হ'বেনা, নিরুদা ?

—হ'বে বৈকি। নিশ্চয় হ'বে। না হ'বার হ'য়েছে কী ? যাচ্ছি এক্ষুনি। চলো।

—না, এখন থাক। মন ভালো নেই তোমার।

অনিরুদ্ধ বলে—মন আমার খুব ভালো আছে। তুমি কিছু মনে করোনি তো ?

আমার এখানেই তোমার অপমান হ'লো এবং সেটা আমায় সহ্য করতে হ'লো এই যা আমার দুঃখ। তুমি ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাকে অপেক্ষা করো আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

—আচ্ছা, তুমি আমার জন্যে দুঃখ কোরোনা, নিরুদা। তোমায় পেয়েছি যখন এটুকু আমার সইবে।

ব'লে অনিরুদ্ধের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বাসবী।

গায়ে একটা জামা গলিয়ে নিতে যেম্নি অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকেছে, মলয়া বললো—কই, তুমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেনা? যাও বলছি শিগ্‌গির। নইলে ভয়ানক কাণ্ড করবো।

অনিরুদ্ধ অসহায় দৃষ্টিতে তখন চেয়েছিলো দেয়াল ক্যালেণ্ডারটার দিকে, দেখছিলো লাল পেন্সিলে দাগানো তারিখটাকে, মুখ না ফিরিয়েই সে অপরিসীম ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তিক্তকণ্ঠে উত্তর দ্যায়—সবুর করো মলয়া, যাবো, যাবো, একেবারেই যাবো।

ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি বাসবীকে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অনিরুদ্ধ এসে হাজির হ'লো, বললো—চলো এবার।

—দাঁড়াও একটু, একটা জিনিশ দেখাবো। ঐ দ্যাখো নিচের রাস্তায়···

বাসবী আঙুল দেখায় দূরে কালো স্যুট-পরা এক ভদ্রলোকের দিকে।

—চেনো ওঁকে? ঐ যে মুখে টুপি আড়াল দিয়ে চলেছেন—দেখতে পেয়েছো?

অনিরুদ্ধ বলে—কে বলো তো? তপেশ?

—ঠিক ধরেছো।···কাল অনেক কিছু ব্যাপার হ'য়ে গেছে। চলো, বলবো সব।

বাসবী পথ চলতে-চলতে কালকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে ক্যালে।

তারপর ওরা ওদের সেই 'কাফে'তেই ঢোকে। কিন্তু সেদিন ওদের কথাবার্তায় অন্য দিনের সুর লাগেনা। জীবনের বাস্তব সমস্যার ঘোর সাংসারিকতায় ওরা এখন ধাঁ-ধাঁ লেগে ঘুরছে। শারী-তপেশ সম্বন্ধে দারিত্ব আর সে-সম্বন্ধে স্বামীর কাছে জবাবদিহি—এই সব বাসবীর সমস্যা; আর মলয়াকে নিয়ে, এবং নিজ বিবর্ণ জীবনের দুর্বহতা নিয়েই অনিরুদ্ধের সমস্যা।

—গৃহই আমার কারা। কারাবাস এর চেয়ে কী আর এমন দুঃসহ হ'তো? সে তো তুমি বুঝতেই পারছো, বাসবী! তাই সময়ে-সময়ে মনে হয় বিরুদার মতোই যদি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় পেতে পারতাম সেও ঢের সুখের হ'তো। কিছুটা তবু সৎকাজের সান্ত্বনা পেয়ে যেতাম জীবনে। যাকে কাছে পেলে জীবনে আর কিছু চাইনা তাকে পেয়েও তারই হাতে হাত রেখে একথা কেন বলছি, জানো বাসবী?

—কেন ?

—তার কারণ আমি জানি তোমাকে আমার এই যে পাওয়া—এতো শুধু দু'দিনের সত্য কিন্তু চিরদিনের স্মৃতি। মসুরীর দিন ফুরিয়ে গেলে আমার কাছে আবার হয়তো তুমি স্বপ্ন হ'য়েই থাকবে। তখন আর কি তোমার নাগাল পাবো ?

—কেন পাবেনা, অ্যাডোনিস্ ? এখন থেকে আমায় তুমি চিরদিনের সত্য ক'রে নিও। যতদিন আমার প্রাণ থাকবে, যতদিন আমাদের প্রেম থাকবে, যতদিন তোমার প্রয়োজন থাকবে স্বপ্ন হ'তে চাইনে অ্যাডোনিস্, একেবারে জলজ্যান্ত সত্যই হ'য়ে থাকবো।

—কলকাতায় গিয়েও ? সে কি সম্ভব হ'বে তোমার পক্ষে ?…অনিরুদ্ধের প্রশ্নে বিস্ময়।

—নিশ্চয়ই হ'বে, হতেই হ'বে। লজ্জা, লোকভয় কিছুই কিছু নয় তোমার ডাক এলে। দেখো তুমি। কেন, এখনই কি দেখতে পাও না ?

—পাই বৈকি, বাসবী। কিন্তু এখন ওকথা যাক্। এখানকার দিনগুলো তে এখন দু'হাত ভ'রে নিই।

—তা-ই নাও। আর শুধুই কি নেবে, দু'হাত ভ'রে আমাকেও দাও।

বাসবী অঞ্জলি ভ'রে অনিরুদ্ধের করভিক্ষা করে।

সে-সন্ধ্যায় বাসবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন অনিরুদ্ধ বাড়ি ফিরলো তখন অনিরুদ্ধের চাকরটা মশলা পিষছিলো না কী-যেন করছিলো। অনিরুদ্ধকে দেখেই সে ডাকলো—বাবুজী, এখানে মায়ের একটা চিঠি আছে, ঐ যে মঞ্জুভিলার ভদ্রলোকটি এসে দিয়ে গেছেন। আমার হাত অপরিষ্কার, আপনি তো ওপরে যাচ্ছেন চিঠিখানা নিয়ে যাবেন, দিয়ে দেবেন মাকে। ঐ চিঠির বাক্সে রেখেছি, ভুলে গেছি নিয়ে যেতে।

চিঠির বাক্সে অনিরুদ্ধ একটা খামে-আঁটা চিঠি পেলো শিরোনামায় মিসেস্ মলয়া ভট্টাচার্য লেখা। অপরিচিত হস্তাক্ষর। মঞ্জুভিলার ভদ্রলোকটি কে ? তপেশ ? হঠাৎ তপেশ চিঠি দিলো অপরিচিতা মলয়াকে ? মঞ্জুভিলায় বর্ত্তমানে তপেশ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ তো নেই। ও ছাড়া আর কে হ'তে পারে ? তবুও আর একবার জিগেস ক'রে নেয় চাকরটাকে। চাকরের বর্ণনা শুনে আর তার কোনো সন্দেহ থাকেনা। সে জিগেস ক'রে জানতে পারে তপেশ একটু আগে এসে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে এবং আরো জানতে পারে যে কালকেও সে এসে এই রকম একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছিলো। অনিরুদ্ধের কৌতূহল ঘনীভূত হয় আরো।

অন্তঘরে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে পড়ে :

কালকের চিঠিতে আপনার স্বামী সম্বন্ধে যা লিখেছি সেগুলো আপনি যদি বিশ্বাস না ক'রে থাকেন তবে এই মুহূর্তেই আপনি আমার সঙ্গে আপনার চাকর কিংবা অন্য যে-কোনো বিশ্বাসী লোককে পাঠিয়ে খবর নিতে পারেন যে, অজবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার স্বামী 'কাফে ড প্যারী'তে বিশ্রম্ভালাপে মশ্‌গুল হ'য়ে আছেন কিনা। শিকারিনী ব'লে অজবাবুর স্ত্রীর খ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি কলকাতার সমাজে যে অত্যন্ত সুবিদিত—সেকথা বলাই বোধহয় বাহুল্য।

জনৈক শুভার্থী

গতকাল তার সঙ্গে মলয়ার অহৈতুকভাবে কলহ করার এবং অকারণে বাসবীর প্রতি অযথা কটূক্তি করার হেতু যেন এবার অনিরুদ্ধের কাছে খুব স্বচ্ছ হ'য়ে এলো।

চিঠিটি নিয়ে সে মলয়ার কাছে যায়, বলে—এই নাও। যে-ভদ্রলোক ইদানীং তোমায় প্রত্যহ একটি ক'রে চিঠি দিচ্ছেন তিনি আজকেও আবার চিঠি দিয়ে গেছেন। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই তিনি আসেন—বড়ো মজার ব্যাপার তো?

প্রথমটা মলয়া চমকে ওঠে। যেন তার গোপন কোনো তথ্য প্রকাশ পেয়ে গেছে! কিন্তু পরক্ষণেই সে-চিঠিটা নিয়ে পড়তে থাকে।

পড়া শেষ হ'লে বলে—যে ভদ্রলোক আমায় রোজ এরকম চিঠি দিচ্ছেন জানিনা তিনি কী রকম লোক—তা তিনি যেমন লোকই হোন—এ অভিযোগগুলো কী তুমি অস্বীকার করতে পারো?

অনিরুদ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণমুখে বলে—অস্বীকার করতে পারলেও অস্বীকার করার প্রয়োজন অনুভব করতামনা। এর পরদিন ভদ্রলোক যখন আবার চিঠি দিতে আসবেন ঘরে ডেকে এনে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো বুঝলে? কয়েক লাইন চিঠিতে সব কিছু জানানোও যায়না, জানাও যায়না।

ব'লে অনিরুদ্ধে অন্য ঘরে চ'লে যায়।

তার মনে তখন কেবলই লাল পেন্সিলে দাগানো দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের তারিখটা ঝিল্‌মিল্‌ ক'রে কাঁপছে। ঐ সম্ভাবনাময় ক্যালেণ্ডারের পাতার পরপারে নতুন জীবনের নতুন ঊষার প্রথম আলোক-সংকেত মাঝে মাঝে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

অসহ্য এই অবস্থা। তার আজীবন বাঞ্ছিতাকে ফিরে পাওয়ার সুখের মাঝখানেও ঘরে ফেরার আতঙ্কটা যেন কাঁটার মতো বিঁধে থাকে সর্বক্ষণ। সেই

একটি মাত্র কাঁটাই তার সকল সুখ-সম্ভাবনাকে যেন পলে পলে বিষিয়ে তুলছে। এর থেকে সে রেহাই পাবে কবে? লাল-পেন্সিলে-দাগানো তারিখটার দিকে সে বার বার অসহায় চোখে চায়। বন্ধুদা তাকে স্মরণ করেছেন, তাঁকে খুলে বলতে হবে সব কথা—ভিক্ষা চাইবে এমন কিছু কাজ যা তার এখনকার পর্যুষিত চিত্তবৃত্তিকে আবার বিকীর্ণ ক'রে দিতে পারবে বাধাহীন মুক্তির খোলা হাওয়ায়। তিনিই হয়তো নিতে পারেন অসহ্য এই পরজীবীটার ভার। মলয়াও তখন হয়তো একটা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে, হয়তো চিরদিনের জন্য বদলে যাবে, আরো কত অঘটন ঘটতে পারে কে বলতে পারে সেকথা? আগামী কালই—কালকেই সেই বহু-প্রত্যাশিত তারিখ—বন্ধুদা তাকে চেয়েছেন। সে যাবেই।

শেষ হ'লো বুঝি প্রতীক্ষা মুক্তির

অনিরুদ্ধ পরদিনই সকালে রওনা হয় দেরাদুনে বন্ধুদার উদ্দেশে। পল্টন-বাজারে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি গুড়ের আড়তে সন্ধান মেলে বন্ধুদার।

মৌমাছি-বোলতার চক্রব্যূহের পাশ কাটিয়ে একটি স্যাঁৎস্যাঁতে প্রায়ান্ধকার ছোটো খুপরীর মধ্যে পাওয়া গেলো বন্ধুদাকে। তিনি তখন খুব অস্পষ্টস্বরে একজন স্থানীয় ব্যবসাদারের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। অনিরুদ্ধকে বসতে বল্লেন। কিছুক্ষণ পর সে ভদ্রলোক বিদায় হ'লে তখন বন্ধু বল্লেন—কী নিরু-ভাই, কেমন আছো ?

সেকথার আর কোনো উত্তর না দিয়েই অনিরুদ্ধ জিগেস করে—আমায় আপনি ডেকেছেন, বন্ধুদা ?

—হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। কাজ আছে। বলছি। বোনটির খবর কী ?

—মলয়া সেই রকমই। ভালো কিংবা মন্দ কোনো দিকেই ওর কোনোকালে পক্ষপাত নেই। যথা পূর্বং তথা পরং। কোনো এক দিকেও যদি ও যেতো তাহ'লেও তো বুঝতাম। ওর দুর্বহ ভার বইতে আর পেরে উঠছিনা, বন্ধুদা। আমার কি কোনোদিনই রেহাই নেই ?

অনিরুদ্ধের শেষের কথাগুলোর মর্মন্তুদ আক্ষেপের সুর বন্ধুর কানে বাজে। বন্ধু প্রথমটা বিস্মিত হন পরক্ষণেই স্বভাব সরল হাসির সঙ্গে বলেন—রেহাই ? কেন রেহাই চাও ?

—এতো বড়ো গুরুভার ঠেলে-ঠেলে আর যে পেরে উঠছিনা বন্ধুদা, রেহাই চাই। ওকে ওর ভাগ্যের কাছে সঁপে দিয়ে এবার আমি মনে-প্রাণে মুক্ত হ'তে চাই। যতোদিন অন্তরে অন্তরে আমি দুর্ভারভারেই শৃঙ্খলিত রয়েছি দেশের স্বাধীনতার কথা আমি ভাববো কী ক'রে, বলুন তো ? স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোধা আপনি, আপনার কাছে তাই আমার ভিক্ষা আমাকে প্রথমে স্বাধীনতা দিন পরে কাজ। শৃঙ্খল যদি খসে না পড়লো তো কাজ করবে কে ?

অনিরুদ্ধের কথায় বন্ধু হেসে ওঠেন তারপর নারীসুলভ কোমলকণ্ঠে বলেন—স্বাধীনতা তো কই ভিক্ষা ক'রে মেলেনা নিরু-ভাই ! স্বাধীনতা যে অর্জনযোগ্য জিনিশ। ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি স্বাধীনতা চাও ? তা হয়না, আত্মিক দৃঢ়তা দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। মনে-মনে তুমি যদি অনুভব ক'রে থাকো যে, তুমি স্বাধীন তাহ'লে তোমার অন্তরের, বাহিরের যতো শৃঙ্খল সব আপনি খ'সে

প'ড়ে যাবে। ব্যষ্টির চেয়ে তখন সমষ্টিই তোমার চোখে সত্য হ'য়ে উঠবে। আর যদি তুমি সংঘের কর্মী হ'তে চাও নিরু-ভাই, তাহ'লে তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি নির্ভরযোগ্য কিনা। আজ যাঁরা সংঘের মধ্যে আছেন তাঁদের সকলকেই একদিন এইভাবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছিলো।

—বেশ আজই আমাকে পরীক্ষা করুন, বন্ধুদা।

বন্ধু বলেন—হ'বে। ব্যস্ত হ'য়োনা। সংঘে যখন সৎকর্মীর বড়োই অভাব হ'য়ে প'ড়েছে, ঠিক তখনই তুমি এলে। এখন তুমি সংঘকে ত্যাগ না করলে সংঘ তোমায় ত্যাগ করবেনা।

অনিরুদ্ধ বলে—সংঘ যদি আমায় আশ্রয় ছায় তো আমিও সংঘের স্বার্থে আমার জীবন পণ করলাম, বন্ধুদা।

বন্ধু অনিরুদ্ধের পিঠ চাপ্ড়ান—ব্রাভো! নিরু, ভয় নেই, সে প্রয়োজনও হ'তে পারে বৈকি। এখনকার ফাঁকা আওয়াজ তখন আবার ধরা না প'ড়ে যায়। কর্মীর কাছে কোনো ত্যাগই খুব বেশি নয়।

কী-যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলেন বন্ধু, বলেন—তাহ'লে বোনটির কী ব্যবস্থা করবে?

বন্ধুর প্রতি একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে অনিরুদ্ধ বলে—সে আর আমি কী বলবো বন্ধুদা, এখন থেকে সে-ভার আপনার।

বাইরে থেকে ঘুরে এসে অনিরুদ্ধ তখন সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে মলয়া জিগেস করলো—কোথায় গিয়েছিলে?

—কেন? বাসবীর ওখানে।

—না, বাসবীর ওখানে তো যাওনি।

—কে বললে? তোমার সেই শুভার্থী ভদ্রলোক এসে ব'লে গেলেন বুঝি? তাঁর সঙ্গে দেখা হয়? বেনামী চিঠিগুলো আসে?

—না। বাজেকথা রাখো। বলবে আবার কে? আমিই বলছি। আমি জানি। ক'দিন 'মঞ্জুভিলা' থেকে লোক আসে তোমায় খুঁজতে, পায়না। ফিরে যায়। তাতেই জানলাম।

—মঞ্জুভিলা থেকে লোক আসে? বাসবীর চিঠি নিয়েই আসে বোধহয়, আর সে-চিঠিগুলো তোমার হাতেই পড়ে নিশ্চয়। তুমি সেগুলো পড়ো, কী বলো?

—না, ভয় নেই। বাসবী চিঠি দেখেনি। চিঠি থাকলে তুমি পেতে।

—গেছাম ? বলো কী ? তাহ'লে সম্প্রতি তোমার ঔদার্যের বহরখানা তো খুব হ'য়েছে দেখছি।

—দেখবার চোখ থাকলে আরো অনেক কিছুই দেখতে পেতে। কিন্তু যাক্ ওকথা।. কোথায় গিয়েছিলে এই সামান্য প্রশ্নটা করেছিলাম তাতে যতো কথা বললে কোনোটাই তার উত্তর নয়। বোঝাই যাচ্ছে যে আমায় তুমি অনর্থক কতকগুলো পাল্টা প্রশ্ন ক'রে আমার প্রশ্নের জবাব এড়াতে চাইছো। এতো কথার চেয়ে স্পষ্ট বললেই পারো 'কোথায় গিয়েছিলুম বলবোনা'।

—হ্যাঁ তাই। তোমায় সব কথা বলার ইচ্ছে আমার নাও থাকতে পারে। সেকথা না বুঝে পেড়াপীড়ি করো কেন ?

মলয়া চুপ ক'রে থাকে।

—তোমার সঙ্গে আমার এমন কোনো চুক্তি হ'য়েছিলো কি কখনো যে সদা-সর্বদা তোমার খিদ্‌মতে হাজির থাকতে হ'বে, বিনা অনুমতিতে কোথাও গেলে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হ'বে ?

—আমি তো সেকথা বলিনি।

—সেই ধরনের কথাই তো বলছো।

—আমি শুধু বলছি সব স্ত্রীরই এটুকু অধিকার থাকে।

—প্রাপ্যের বেশি যেখানে এম্নিতেই পাওয়া যায় সেখানে জবরদস্তি অধিকার সাব্যস্ত করতে গেলে একেবারেই ফাঁক পড়তে হয়। সম্প্রতি তোমার আচরণে মনে হচ্ছে এই সহজ সত্যটুকুও তুমি জানোনা।

—হয়তো সত্যই তাই।

মলয়া আর কথা বলতে পারেনা। ওর বুকের তলা থেকে যেন কান্না জেগে উঠতে চায়। মনে হ'তে থাকে এতদিন যে-অনিরুদ্ধকে সে সর্বক্ষণ রোগশয্যার পার্শ্বে পেয়ে এসেছে এই নিষ্ঠুর লোকটির সঙ্গে তার কোনোকিছু মিল কোথা ? মলয়া আজো তার শয্যাপার্শ্বে অনিরুদ্ধকে তেম্নি ক'রেই চায় কিন্তু অনিরুদ্ধ এসে দাঁড়ালে আজকাল যেন আর সওয়া যায়না। কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে। ওর চোখের দিকে চাইলে মলয়ার মনে হয় কোনো বিরাট একটা দুষ্টগ্রহ বুকের মধ্যে উল্কার আগুন ঢেকে রেখে মৌন অভিসন্ধি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

পাশের ঘরে বহুক্ষণ একা-একা কাটিয়ে এসে অনিরুদ্ধ যখন তার শোবার ঘরে এলো তখন যেটুকু বেলা ছিলো সেটুকুও প'ড়ে গেছে। এই অসময়েও মলয়া আজ ঘুমোচ্ছে। আজকের মধ্যেই মলয়ার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া ক'রে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। পরস্পরকে আঘাত দেওয়ার আত্মঘাতী

অবস্থাটা কোনোক্রমেই আর চলতে দেওয়া যায়না। ও এখন নিশ্চিন্তনির্ভরে ঘুমোচ্ছে। ওকে দেখে অনিরুদ্ধের দুঃখ যে হয়না, তা নয়। তবু সংকল্পে আর তার দ্বৈধ নেই।

নিদ্রিত মলয়ার কপালের ওপর আস্তে আস্তে হাত রাখলো অনিরুদ্ধ। মলয় ধীরে ধীরে চোখ মেললো।

—এমন অসময়ে আজ ঘুমোচ্ছো যে? শরীর ভালো আছে তো?

—যদি বলি ভালো নেই—সেটা শুনতে তোমার ভালো লাগবে কি? তবে কেন মিছিমিছি বারবার ওকথা জিগেস করো?

মলয়ার মাথায় অনিরুদ্ধ তেমনই হাত বুলোতে বুলোতে বলে—আর জিগেস করবোনা। এবার থেকে তুমি ভালোই থাকবে কারণ এখন থেকে তোমায় ভালো থাকতে হবেই। হ্যাঁ, জানো? সৌভাগ্যক্রমে একটা দৈব ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে—শুনছি একজন অলৌকিকক্ষমতা-সম্পন্ন সন্ন্যাসী এসেছেন হরিদ্বারে—চলো তোমায় নিয়ে তাঁর কাছে যাই। দৈবে তোমার তো খুব বিশ্বাস। কাল চলো।

—কে? আমি?

—হ্যাঁ তুমিই। কেন শুনে অমন আঁৎকে উঠলে যে?

—আমি কি পারবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারবে। কেন পারবেনা? ডাঃ মালহোত্র রোজ তোমার একটু ক'রে বেড়াতে বলেছেননা? তুমি তো শোনোনি তাঁর কথা, কতোবার বলেছি তোমায়। এখানে এসে ইস্তক একবারও কি বেরোতে নেই? কাল চলো আমার সঙ্গে।

—গিয়ে কী হবে?

—এখানে ব'সে থেকেই বা কী হ'চ্ছে? ট্যাক্সিতে যাবে, ট্যাক্সিতে আসবে কোনো কষ্ট হ'বেনা। একটুও পরিশ্রম হতে দেবোনা।

—আচ্ছা, তুমি যদি তাতে খুশি হও তো চেষ্টা ক'রে দেখবো।

—হ্যাঁ, চেষ্টা করলেই পারবে। আমি বলছি তুমি পারবে। কাল সকাল সকাল তৈরি হ'য়ে নিও। আজকেই ট্যাক্সি ঠিক ক'রে রাখছি।

তখনই ঠিক হ'য়ে যায় কালকে ট্যাক্সি ক'রে দেরাদুন গিয়ে সেখান থেকে হরিদ্বারের টিকিট কিনে নিলেই হ'বে।

পরদিনই অনিরুদ্ধ [illegible] বাড়ির জিম্মায় রেখে মলয়াকে নিয়ে পাড়ি [illegible] ঘণ্টাখানেকে ওরা দেরাদুন স্টেশনে পৌঁছয়।

—প্ল্যাটফর্মটুকু হেঁটে যেতে পারবে, না একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করবো ?

—চেয়ার ? না বাপু। এতোলোকের মাঝখান দিয়ে সং-এর মতো চেয়ারে চেপে যেতে পারবোনা। হেঁটেই যাই। এখন মনে হ'চ্ছে যেতে পারবো।

ওয়েটিং রুমে স্ত্রীকে বসিয়ে অনিরুদ্ধ ছুটি চায়, বলে—তুমি বোসো টিকিটটা ক'রে নিয়ে আসি।

বেশ কিছুক্ষণ পর হন্তদন্ত হ'য়ে ফিরে আসে অনিরুদ্ধ, বলে—চলো। মাল-পত্তর সব উঠে গেছে। গাড়ি ছাড়তেও আর দেরি নেই।

মলয়ার পা দুটো এবার কেমন যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

ছোটো একটা সেকেণ্ড ক্লাস কুপে। অনিরুদ্ধ ও মলয়া ছাড়া বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকও ছিলেন কামরায়। জানলার বাইরে চেয়ে বসেছিলেন তিনি। মুখে দাড়ি, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌।

—হরিদ্বার ক'টা স্টেশন ?

অন্যমনস্কতায় বধির ছিলো অনিরুদ্ধ ; স্ত্রীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলোনা।

—হরিদ্বার এখান থেকে ক'টা স্টেশন ?···মলয়ার আবার প্রশ্ন।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে অনিরুদ্ধের, বলে—দেখতেই পাবে।

এই রকম সংক্ষিপ্ত কাটা-ছেঁড়া জবাবের পর মলয়া আর স্বামীর সঙ্গে কথা কইবার ভরসা পায়না।

হরিদ্বার স্টেশনে গাড়ি থামতেই অনিরুদ্ধ কুলি ডাকার অছিলায় প্লাটফর্মে নেমে যায়।

--বোসো, একটা কুলি ডেকে নিয়ে আসছি।

সেই যে অনিরুদ্ধ যায়, গাড়ি ছাড়ার সময় হ'তে চললো তখনো ফিরে আসেনা। ক্রমশ ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে মলয়া। বেশিক্ষণ গাড়ি থামেনা হরিদ্বারে। গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি প'ড়ে যায়। মলয়া এখন কী করবে ভেবে-চিন্তে কিছুই ঠিক করতে না পেরে দেহটা জান্‌লা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে—কই কোথা ? অনিরুদ্ধ তো নেই কোথাও। প্রাণপণে চেঁচায়—কুলি ! এই কুলি !

কেউ শোনেনা। তার সর্বশরীর কাঁপছে। গাড়ি চলতে শুরু ক'রে দিলো, দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলো। মলয়ার এবার কান্না পাচ্ছে। দুর্গম পথের মধ্যিখানে তার নির্ভর-যষ্টি হঠাৎ যেন ভেঙে গেছে। সে অশক্ত, অসহায়, একা। তবু ক্ষীণ আশা, পরের স্টেশনে হয়তো তার স্বামী আবার এসে হাজির হ'বে, হয়তো বলবে এমন গল্প, দেবে এমন বিবরণ যে এখনকার এই ভয়

পাওয়াটাই মনে হবে ছেলেমানুষী। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই আশঙ্কা—যদি অনিরুদ্ধ আর না আসে কিংবা যদি তার কোনোরকম কিছু ঘ'টে থাকে। আর ভাবতেও পারেনা—এইবার ম'রে যাবে মলয়া। ট্রেনের গতি বেড়ে উঠেছে—ট্রেনের শব্দ যেন ভূমিকম্পের মতো মনে হ'তে থাকে তার—সে-শব্দ উত্তরোত্তর আরো যেন বাড়তে থাকে, আরো, আরো, আরো—'অ্যালার্ম চেন' টানবে নাকি? বলবে নাকি সহযাত্রী ঐ ভদ্রলোকটিকে? কিন্তু কী ভাববেন উনি? ভদ্রলোকটির দিকে চাইতেই মনে হ'লো তিনি যেন মলয়াকে খুব মন দিয়েই লক্ষ্য করছেন। তার স্বামী যে তাকে ফেলে পালিয়েছে একথা যদি সত্যিও হয় তাহ'লেই বা সে একথা মুখ ফুটে বলবে কী ক'রে একজন অপরিচিতের কাছে? কাউকে একথা জানানোর লজ্জার চেয়ে মরণও যে ঢের ভালো। শুনলেই বা কি কেউ বিশ্বাস করবে তার কথা? তার চেয়ে মরুক মলয়া, তার চেয়ে ছুটুক এই ট্রেন। এই ট্রেন যেন আর কোথাও না থামে, এ-পথ যেন আর না ফুরোয়, এই ট্রেন পৃথিবী পরিক্রমণ করুক তার বুকের নিশ্বাস নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

কান্না চাপার শতচেষ্টা ব্যর্থ ক'রেও মলয়ার দু'চোখ জলে ভ'রে আসে। ওদিকে ও-বার্থের পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি উঠে এবার মলয়ার কাছে এসেছেন মলয়ার হাতও সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেয়েছে 'এ্যালার্ম চেন্'টা।

—উঁহুঁ, অমন কাজও করবেননা।—আশ্চর্য কোমল ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর।

—কোথায় যাবেন?…পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন। আপনার মুখের ভাবে মনে হয় আপনি বড়ো ভয় পেয়েছেন, ভয়ের তো কিছু নেই।

অ্যালার্ম চেন থেকে মলয়ার হাতটা আপনা থেকেই খ'সে যায়।

—আপনি বাঙালী? ··বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে মলয়া।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি আবার পরিষ্কার বাংলাতেই এর উত্তর দেন—শুধু বাঙালীই নই বোন, তোমার পরিচিতও।

মলয়া আরো বিস্মিত হয়, বলে—কই, আপনাকে দেখিনি তো কখনো।

—দেখেছো। তবে এই বেশে ছাখোনি কখনো। পুরীতে যখন ছিলে তখন একদিনের জন্য তোমাদের আতিথ্য নিয়েছিলাম, মনে আছে?

মলয়া চমকে ওঠে—বন্ধুদা!

—হ্যাঁ আমিই। ভয় কী, তুমি আমার সঙ্গেই যাবে।

—কোথায়?

—বাংলার মেয়ে তুমি বাংলাদেশেই যাবে। নিরু-ভাই তোমার ভার যে আমার ওপরেই দিয়েছে।

—এ-সব তবে আপনারই কাজ ?

বন্ধু হাসতে হাসতে বলে—আমার কাজ নয় বোন, তবে আমি সব জানি। একমাত্র ইংরেজ সরকার আর তাঁদের আমলাতন্ত্র ছাড়া আর সকলেই আমায় বিশ্বাস করে, তুমিও আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

—কিন্তু এই যে প্রতারণা—একি আপনি সমর্থন করেন ? ছি, ছি, এই প্রতারণার মধ্যে আপনি ?

—প্রতারণা আমাদেরও করতে হয় বৈকি কিন্তু তা মেয়েমানুষ আর ছেলে-মানুষের সঙ্গে নয়। ছোটো ছোটো প্রতারণা দিয়েও যদি বড়ো প্রতারণার অবসান ঘটানো যায় তাই তো প্রতারকের ছদ্মবেশ নিয়েছি, দেখছোই তো। মিথ্যে তো বলোনি বোন, প্রতারণাও আমাদের সমর্থন করতে হয় বৈকি। তাই নিরু-ভাই যখন তার একান্ত ব্যক্তিগত সাংসারিক ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইলো এবং বললো—'একদিনের প্রতারণা দিয়েই সারাজীবনের প্রতারণা শেষ ক'রে দিই, বন্ধুদা আপনি সম্মতি দিন। আপনি ওর ভার নিন।' তাতে আমি কিছুতেই অসম্মতি দিতে পারিনি। আশা করি তোমার স্বামীকে তুমি হয়তো বুঝেছো এখন। বর্তমানে সে আমাদেরই সঙ্ঘকর্মী। সুতরাং সঙ্ঘ তোমারও ভার নেবে। তুমি ভেবোনা বা দুঃখ কোরোনা, বোন। তোমার সেবা-যত্নের ভার আমি এমন মানুষের ওপর রাখবো যেখানে তুমি কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ্যই অনুভব করতে পারবেনা।

—কে সে ?

—আমাদের সঙ্ঘের রঙ্গিলাদির নাম শুনেছো ?

—শুনেছি।

—তাঁর ক্যাম্পেই তোমাকে রেখে আসছি আপাতত। সেখানেই আমার দেখা পাবে মাঝে মাঝে।

মলয়া বলে—সে যেন হ'লো—কিন্তু আমার স্বামী ?···ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

বন্ধু বলে—নিশ্চয়ই তোমার স্বামী তাতে আর সন্দেহ কী ! কিন্তু এককালে ছিলো এখন সে যে স্বামিত্বে ইস্তফা দিয়ে গেছে। আর কি তাকে তুমি দাবি করো ?

—তাহোক তাকে আমি চাই, আমায় ফিরিয়ে এনে দিন।

—ফিরে আসার হ'লে সে আপনিই আসবে। আর যদি ধরো না-ই আসে তো তার জন্তে তোমার এত দুঃখই বা কী ? যে গেছে কিংবা যাবে তাকে যেতে দেওয়াই শ্রেয়। জোর ক'রে ধ'রে রাখার মধ্যে দু'জনের পক্ষেই কোনো শুভ

নেই। তুমি বড়ো বোকা মেয়ে মলয়া, বড়ো বোকা! লৌকিক বন্ধনটারই আট-ঘাট আগলে প'ড়ে আছো, আত্মিক বন্ধনটা কবে যে খ'সে গেছে সেদিকে নজর রাখতে পারোনি। তাই তোমার এমন হ'লো। নিরুকে তো হৃদয়হীন, অত্যাচারী, খল, অসরল মনে করতে পারিনে—সে তার জীবনের সকল কথাই আমার কাছে অকপটে বলেছে। এতদিন সে তোমার ভার মুখ বুজে বয়েছে অনন্যসাধারণ যত্নের সঙ্গে, অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে; এবার আর পারছেনা, রেহাই চাইছে। নিজের দিকটাই কি তুমি কেবল দেখবে? তার দিক্‌টাও দেখো। মসুরী আসার পর থেকে একদিনও কি তোমার একথা মনে হয়নি?

—মনে হ'য়েছে, বন্ধুদা। অনেকদিনই মনে হ'য়েছে। তবু মন মানেনি, এখনো তাকেই আমি চাই।

—তাকে তোমার কাছে এনে দিলেও কি তুমি আর তাকে পাবে?

—তা জানিনা তবু সব কথা সে নিজে এসে ব'লে যাক্।

—বেশ, তাই হ'বে। সে এখন সঙ্ঘের কাজে গেছে, ফিরতে হয়তো ক'দিন দেরি হ'বে। তারপর তুমি তার সঙ্গে কথা কইতে পারো। তুমি তার ওপর অবিচার কোরোনা, বোন। হ'তে পারে নিরু মানুষটা হয়তো কিছু দুর্বল কিন্তু তাই ব'লে অসৎ নয়। প্রথম ও যেদিন শুকনো মুখে আমার কাছে এলো, কী বললো জানো? বললো—বন্ধুদা, গৃহই আমার কারা। এই স্বরচিত কারার মধ্যে ঘোর অগৌরবে জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে গেলুম তাতে না পেলুম কিছু প্রতিদান, না পেলুম কোনো সান্ত্বনা, না দেখলুম কোনো আশা-ভরসা—এর চেয়ে স্বাধীনতার সৈনিক হিশেবে সত্যিকারের কারাবাস করতে পারলে তাতে গৌরব থাকতো, তাতে আত্মপ্রসাদ থাকতো, সান্ত্বনা থাকতো যে, হাঁ, দেশের কাজ তবু খানিকটা এগিয়ে দিতে পারছি। আর সহ্য হচ্ছেনা—আমার ঘরের চেয়ে জেলই ভালো—আমায় কিছু কাজ দিন, বন্ধুদা। মলয়ার ভার আপনাকে দিলাম।

মলয়া ব'লে ওঠে—বেশ, তাই হোক, তাই হ'বে বন্ধুদা। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়ার প্রয়োজন নেই।

অনেকটা শিশুর মতো বন্ধু হো হো ক'রে হেসে ওঠে—এই তো বীরাঙ্গনার মতো কথা, এই তো চাই। না জাগিলে আর ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।...ত্মাখো তো বোন, এই হাত, এই কাঁধ, নিরু-ভাইয়ের চেয়ে এমন কিছু কম সবল নয় যে, তোমার মতো এতটুকু একটা বোনের বোঝা বইতে পারবোনা, ফেলে দেবো। তোমার কী মনে হয়? ভয় পাচ্ছিলে কেন, বোকা মেয়ে!

সজল চোখে মলয়া বন্ধুর প্রকাণ্ড হাতখানা দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরে, বলে—সে জানি বন্ধুদা।

তখন জানলার বাইরে দিয়ে ছোট্টো একটা স্টেশন চকিতে পার হ'য়ে গেলো।

বন্ধু জানলার বাইরে চেয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো তার পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে মলয়া হঠাৎ কাঁদতে লাগলো—আমায় মাপ কোরো, বন্ধুদা। তোমার কথার ওপর কথা কইতে গিয়েছিলুম। এবার বুঝেছি কেন তোমার সঙ্গে তর্ক করা যায়না, মেনে নিতে হয়। স্বহস্তে তুমি যার ভার নাও তার আবার দুঃখ কিসের? আমায় মাপ কোরো।

মাদুরে বেড়ালছানাটিকে আমরা যেভাবে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিই ঠিক সেই ভাবে বন্ধু মলয়াকে তুলে নিয়ে ফের বার্থে বসিয়ে দ্যায়। বলে—ছি: এমন কি করতে আছে? অবাধ্য হ'য়োনা, লক্ষ্মী বোনটি আমার। তোমরা যে মায়ের জাত, তোমাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি আমরা কখনো পারি? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে যেদিন থেকে আমরা তোমাদেরই পেটে জন্ম নিচ্ছি সেইদিন থেকে যে তোমাদের কাছে আমাদের হার চিরদিনের মতো কায়েম হ'য়ে গেছে।

খর হ'লো আবর্ত কুটিল

বাসবী আজ তিন চারদিন বহুবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনিরুদ্ধের দেখা পায়নি। আগে হ'লে বাসবী খোঁজখবর নিতে অনিরুদ্ধের বাড়ি এসেই হাজির হ'তো কিন্তু সেদিনের সেই ব্যাপারের পর অনিরুদ্ধের নিষেধ সে অগ্রাহ্য করতে পারলোনা। ক্যামেল্‌স্ ব্যাংকে বিকেলের দিকে সে অপেক্ষা করেছে, ওদের বাড়ির সাম্‌নে দিয়ে কতোবার অসময়ে অকারণে চ'লে গেছে, চিঠি পাঠিয়েছে চাকরকে দিয়ে কিন্তু অনিরুদ্ধের দেখা পায়নি। পত্রবাহক ফিরে এসে বলেছে—বাবু বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়েছেন।

ক'দিন ধ'রে বাসবী যতোবার আশাহত হ'য়েছে ততোবারই তার মনে হ'য়েছে মসুরীর দিনগুলো এবার যেন বিবর্ণ হ'তে শুরু ক'রে দিয়েছে। ইতিমধ্যে শারী সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু সে জেনেছে যা নিয়ে একবার অনিরুদ্ধের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। নিরুদাকে না জানালে তার আর স্বস্তি নেই কিন্তু আশ্চর্য, আজ ক'দিন ধ'রে অনিরুদ্ধের দেখা নেই। এমন তো কখনো হয়না। তবে কি নিরুদা বাড়িতে আর কোনো সময়েই থাকেনা? বিস্ময়ে, বেদনায় বাসবী অন্য কোনো কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চেয়েছে কিন্তু কোনো কিছুতেই মন লাগেনি। এমন সময়ে তার নেপালী চাকরটা ফিরে এসে বাসবীকে বললো—ও-বাড়িতে কেউ নেই দেখে এলাম, শুধু চাকরটা ছাড়া। ও-বাড়ির বাবু গিন্নি-মাকে নিয়ে সেই সকালে বেরিয়েছেন; ফেরেননি এখনো।

—কোথা গেছেন কিছু কি জানতে পারলি?

—না, ওঁদের চাকর তো কিছুই বলতে পারলোনা। তবে বিকেলের মধ্যে ফেরার কথা ছিলো কিন্তু কই? রাত্তির হ'তে চললো এখন, আর কখন ফিরবেন! ও-বাড়ির চাকরটা আমায় বলছিলো—গোটা কয় ভালো তালা মঞ্জুভিলার মায়ের কাছ থেকে আনতে পারিস? ঘর-দোর সব খোলা হাট প'ড়ে রয়েছে বন্ধ করা দরকার।

বাসবী বলে—আচ্ছা তুই যা, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

চাকরটা বলে—বলতে ভুল হ'য়ে গেছে আজ সকালে আপনি তখন বাড়ি ছিলেননা ওঁদের লোক এসে আপনার নামে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিলো। চিঠিটা আপনি ছাড়া আর কারো হাতে দিতে মানা আছে তাই আমি ঐ টেবিলের ওপর বই চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। পেয়েছেন তো?

—কই ? না। কোথা রেখেছিস্ ?

টেবিলের ওপরের একটা বইয়ের তলা থেকে চাকরটা চিঠিখানা বের ক'রে বাসবীকে ছায়। বাসবী চিঠিখানা ছিঁড়ে পড়লো :

বাসবী, জীবনের সব চেয়ে বড়ো ভুল ক'রে যে অভিশপ্ত বন্ধন একদিন স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম, সেই বন্ধন এতদিনে ছিন্ন করতে চলেছি। অনেক ভেবে-চিন্তেই তা করতে হচ্ছে। এবার মলয়ার নিজের ভাগ্যই ওকে সাহায্য করুক, আমি ছুটি নিই। ঠিক এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে দেখা করার অদম্য ইচ্ছাকেও এই আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি যে, এবার যখন তোমাতে-আমাতে দেখা হ'বে তখন আমি যেন অনুভব করতে পারি যে, মনের মধ্যে কোথাও আর শৃঙ্খলিত নই—সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত। ঘটনাচক্রে যদি তা নাও হয়, তাহ'লেও আমাদের তো মসুরীর কিছু সম্বল রইলো। ছাখো বাসবী, এই দিনগুলোকে ছাখো। ছুটিতে-খেলায় হাসিতে-কান্নায় এই উজ্জ্বল দিনগুলো মনের মধ্যে পুষে রাখো। উতলা হয়োনা, ভেবোনা কিছু, আমাদের নিরুদ্দেশযাত্রার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে দোরে—মলয়াকে তুলে বসিয়ে রেখে এসেছি তাতে। আর সময় নেই, চল্লুম।

অনিরুদ্ধ

বাসবী শারীর কাছে গিয়ে বলে—শুনেছিস্ শারী ?

—কী ?

—বৌদিকে নিয়ে নিরুদা আজ সকাল থেকে নিরুদ্দেশ ; জিনিশপত্রে-ঠাসা ঘর-দোর সব খোলা হাট হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। এক্ষুনি খবর পেলুম। তুই তোর দাদার বাড়ি আগ্‌লে থাক্, আমি ও-বাড়ি চললুম। সাবধানে থাকিস্।

—কী বললে ? আমার দাদার বাড়ি ? তোমার স্বামীর বাড়ি নয় ?

মুখের ওপর তীব্র একটা চাবুকের ঘা খেলে বেদনায় আমরা যেমন মুখটা ফিরিয়ে নিই, বাসবী তেম্নি ক'রেই মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময়ে অনেকটা নিজমনেই ব'লে গেলো—এখন আমি আর অতো-শত ভাবতে পারিনা, তোর যা ইচ্ছে করিস্। আমি চল্লুম। আমি জানি ওদের আবার ফিরতেই হ'বে, যাবে কোথা ? যে-পর্যন্ত ওরা না ফিরছে সে-পর্যন্ত যখের ধন আমাকেই আগ্‌লাতে হ'বে। আর কে আছে ?

যখের ধনের প্রহরায় যক্ষিণীর মতো সেই রাত্রি থেকে বাসবী বাসা নিলো অনিরুদ্ধের পরিত্যক্ত শূন্য গৃহেই। প্রতীক্ষার প্রেমেই যেন বাসবীর এই তপস্যা।

পরদিন সন্ধ্যায় শারী এসে বললো—আজো কি বাড়ি যাবেনা? চলো না, বৌদি। রাত হ'লো যে।

বাসবী শুধু বলে—কী ক'রে যাই বল্। যাদের বাড়ি তারা ফিরলে তাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে তবেই না যেতে পারি? তা যতক্ষণ না হ'চ্ছে যখের ধন আগ্লাতেই হ'বে।

কিন্তু কখন আসবে ওরা, কবে আসবে? আদৌ আসবে কিনা কেউ বলতে পারেনা, কেউ জানেনা কিন্তু বাসবী যেন জানে সব। আজ আসতে পারে, কাল আসতে পারে এম্নি ক'রে নিত্যই জাগরণের চূড়া থেকে সকালের আশার শিশু দুপুরের সানুদেশ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যার অতলে নামে, নিদ্রার সমতল সীমান্ত দেশে। সেই আশা-আশঙ্কায় লালিত প্রতীক্ষার শিশু প্রৌঢ় হয় সেদিনকার মতো—যার নবজন্ম হ'বে আবার পরদিন অরুণোদয়ে। কিন্তু কেউ আসেনা, শূন্য ঘর স্তম্ভিত মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়েই থাকে তবু কোথায় যেন অনিরুদ্ধের পায়ের ধ্বনি-মর্মর শুনতে পায় বাসবী—হয়তো বহুদূরে, জ্ঞাত দূরত্বের শেষ-সীমায়··· আর আশায় ফের বুক বাঁধে। অজও আর এসে পৌঁছয়না কিন্তু তার চিঠি এসেছে আজ। কলকাতার কাজ মেটেনি এখনো। এই কাজের অর্থ—অজর কাছে হয়তো অনেকখানি কিন্তু বাসবীর কাছে আজ এই সব কাজের অর্থ—মনে হয় বিরাট একটা শূন্য যার ক্রমবর্ধমান পরিধি বাড়তে বাড়তে গিয়ে মিশেছে দুজ্ঞেয়র দিগন্তের সঙ্গে।

এদিকে মঞ্জুভিলায়ও দিন আর যেন কাটতে চায়না শারীর একা-একা।

কয়েকদিন পরেকার কথা।

এক অপরিচিত আগন্তুক এলেন শারীর দর্শন-প্রার্থী। শারীও দেখা করলে তাঁর সঙ্গে।

—কোত্থেকে আসছেন?

—তপেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। আপনার নামে চিঠি আছে।

চিঠি ছিঁড়ে শারী পড়লো তপেশ লিখছে:

সে-রাত্রে হিমে-শীতে নিরাশ্রয়ভাবে মসুরীতে কাটাবার পর জর নিয়ে দেরাদুন আসি। সেজন্য পরদিন তোমাদের ওখান থেকে আমার মালপত্র নিয়ে আসতে পারিনি। উপস্থিত আমি রীতিমত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছি। পত্রবাহকের হাতে যদি দয়া ক'রে আমার জিনিশপত্রগুলো দিয়ে দাও তো খুব

উপকার হয়। যা কিছু ঘটেছে, সে-সব ভুলে যেও, ক্ষমা কোরো। বাসবীদিকে শুভেচ্ছা জানাই, তাঁর নতুন প্রেম জয়যুক্ত হোক। আমার বিরুদ্ধে বাসবীদি যতকিছু বিষোদ্গার করেন সে-সব কিছুই কি তুমি নির্বিচারে হজম করো? এমনই কি ব্যক্তিত্বহীন তুমি? সব বাধা দু'পায়ে মাড়িয়ে এই সংকটকালে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারোনা? কয়েক মাস চলার মতো কিছু অর্থ আর পাশে তোমাকে পেলে নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে পারি। সে কি তুমি পারবে? সকলের সবকথা বিশ্বাস ক'রে আমার ওপর অযথা অবিচার কোরোনা, ভুল কোরোনা। আমার কাছ থেকে তুমি তো কিছুই শোনোনি—আমারও অনেক কিছু বলার থাকতে পারে সেটা না-শোনা-পর্যন্ত একতরফা রায় মুলতুবী রেখো। সাক্ষাৎ পেলে সব কিছু বলতে পারি। পত্রবাহক আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, এঁকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। উপস্থিত আমি নিঃস্ব, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় হাসপাতালে রোগযন্ত্রণা ভোগ করছি। সম্ভব হ'লে এঁর সঙ্গে তুমি যাত্রা করতে পারো।

তপেশ

পড়তে পড়তে তপেশকে বিচার করার বা অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই শারীর মনে আসেনা, মন ভিজে ওঠে, চোখের পাতাও আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। তবে যে সেদিন বৌদির মুখে শুনলো তপেশকে এখনো মসুরীর রাস্তায় 'মঞ্জুভিলা'র আশে পাশে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখা যায়। বৌদির সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় এই তো সেদিন টুপিতে মুখ আড়াল ক'রে তপেশ গা-ঢাকা দিলো।—সেটা কি তাহ'লে সত্যি নয়? হ'তে পারে বৌদি হয়তো ভুল দেখেছে। আর তাছাড়া সেদিন রাত্রির ব্যাপারটা সম্পর্কে তো তপেশের কাছ থেকে কোনো কথাই শোনা হয়নি। ওরও তো কিছু বলার থাকতে পারে। হ'তেও তো পারে ব্যাপারটা নিছকই একটা অ্যাক্সিডেন্ট্—কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। বৌদি সত্যিই তপেশবাবুকে পছন্দ করেনা। এও তো হ'তে পারে যে সামান্য একটা অ্যাক্সিডেন্টের সুযোগ নিয়ে বৌদি ঐভাবে তপেশবাবুর ওপর মিথ্যা দোষারোপ ক'রে এ-বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু তপেশ সেদিন কেন কোনো প্রতিবাদ করেনি? কিছুই প্রতিবাদ করার ছিলোনা, তাই কি? না, এতো বড়ো একটা মিথ্যার প্রতিবাদ করতেও তাঁর ভদ্র মন ঘৃণায় মূক হ'য়ে গিয়েছিলো, তাঁর সম্ভ্রমে বেধেছিলো, তাই? শারীর মনের মোড় ফিরতে থাকে—সামনের বিপজ্জনক

বাক্যটার মুখে এলেও সে ইতস্তত করেনা ; বলে—ওঁর জিনিশপত্র আজ এখনই কি নিয়ে যেতে চান ?

—বেশ তো আজ এখনই নিয়ে যেতে পারি।

তপেশের সমস্ত জিনিশপত্র একটি কুলির মাথায় ক'রে আগন্তুকটি যখন শারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন তখন কেমন যেন একটা অভাবনীয় চাঞ্চল্য ও প্রবল উদ্বেগ শারীকে অস্থির ক'রে তুললো।

সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনে হ'তে লাগলো তপেশের যতো অপরাধ তা যেন আর অপরাধই নয়, সমস্তই যেন দুর্ঘটনা, নিয়তির কারসাজি। হঠাৎ মনে হ'তে লাগলো আজকের মসুরীর বন্ধুর শিলাসানু, এর আকাশ, এর বাতাস—সবই যেন একটি ব্যথিত আবেদনে আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে। তার সমস্ত হৃদয়ের সুধা মন্থন ক'রে কেবল একটি করুণ আর্তি যেন তার গলা পর্যন্ত উঠে আসছে। একটা কথা বারবার আবৃত্তি ক'রেও তার তৃপ্তি মিলছেনা যে, তপেশ তাকে পাশে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করছে। নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিরাশ্রয় অবস্থায় সে এখন হাসপাতালে প'ড়ে আছে। সেখান থেকে সে এখন শারীর সাহায্য চাইছে।

··ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়, শারীর মন শান্ত হ'তে চায়না কিছুতে।

একবার মনে হয় বাসবাকে একথা জানিয়ে আসবে কিন্তু তার মন শেষপর্যন্ত সে-প্রস্তাবে সায় দায়না। কার কাছে সে আবার জিগেস করতে যাবে ? তপেশকে দেখতে যাওয়া না-যাওয়া যে কারো অনুমতিসাপেক্ষ ভাবতেও তার ঘৃণা হয়। যাওয়া না-যাওয়ার দ্বন্দ্বের দোটানায় প'ড়ে শারী আর বেশিক্ষণ দুলতে পারেনা, শেষপর্যন্ত ঠিক ক'রে ফ্যালে সে যাবেই। কিন্তু টাকা ? সে তার হাতখরচ বাবদ যা কিছু পেতো তাই সে জমিয়ে রাখতো। সেই সঞ্চয় আজ সে বের ক'রে গুনতে বসলো। গোনা শেষ ক'রে তার মনে হ'লো আজকের এই মুহূর্তে কপর্দকহীন তপেশের কাছে এ সম্বলও সামান্য নয়। এ নিয়েই সে আপাতত বেরিয়ে পড়তে পারে। সঙ্গে কিছু টাকা, একটা অ্যাটাচি কেসের মধ্যে দু'চারখানা কাপড়—এই তো শুধু। এখানকার আর কোনো জিনিশই সে নিয়ে যাবেনা সঙ্গে।

সেদিন সারা রাত ঘুম এলোনা শারীর চোখে, জেগে কাটালো। কী যেন একটা অনির্দিষ্ট পথ তাকে হাতছানি দিচ্ছে—নতুন জীবন ডাকছে—কী যেন অজানা সম্ভাবনায় গর্ভবান ভবিষ্যৎ তার সামনে প'ড়ে রয়েছে, কেমন যেন দ্বিধা, কেমন যেন দ্বন্দ্ব, কেমন যেন ভয়-ভয় তবু তার মধ্যেই রোমাঞ্চ।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লো শারী। বুড়ো রামকিষণ দেখলো সব, কী ভাবলো একটুখানি, তারপর শারীর পেছন পেছন এলো খানিকটা পথ,

ওর সঙ্গ নিতে চাইলো, নিতে চাইলো শারীর হাতের অ্যাটাচি কেস্‌টা, শারীকে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইলো ওর গন্তব্যস্থানে। শারী কিন্তু ওর কোনো সাহায্যই নিলোনা শেষপর্যন্ত বরং একটু কঠিন স্বরেই বললো—ফিরে যাও রামকিষণ, ঘরে-ঘরে তালা লাগাও, যে-পর্যন্ত-না আমি আসি।

—আজকেই ফিরে আসছেন তো ?

অন্যমনস্ক শারী একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললো—হ্যাঁ।

মঞ্জুভিলায় ফিরে এসে শূন্য ঘরগুলোয় তালা লাগাতে লাগাতে বৃদ্ধ ভাবতে লাগলো—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তবে কেন আর এই বুড়ো বয়সে চাকরি করা ? বাবু এলে এবার সে ছুটি নিয়ে গিয়ে বসবে দেশে—আর ভালো লাগেনা। ঢের দিন হ'লো !

নিজহাতে ভাঙে খেলাঘর

দেরাদুন শহরের জনারণ্যে এসে শারী প্রথমটা বড়ো অসহায় বোধ করলো। এই তার প্রথম একা-একা বেরোনো। যেদিন তপেশ লোক মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে নিজ মালপত্তর নিয়ে গেলো শারী তখন সেই লোকটার কাছ থেকে তপেশের ঠিকানা ব'লে একটা ঠিকানা টুকে নিয়েছিলো—মানে দেরাদুনের অমুক হাসপাতাল অমুক ওয়ার্ডে, এত নম্বর বেড্—এই সব। শারী এখন নিজেই সে-ঠিকানা ধ'রে উক্ত হাসপাতালে যতদূর সম্ভব খোঁজ করলো কিন্তু তপেশ চক্রবর্তী ব'লে কোনো রোগীর সন্ধান মিললোনা। হস্‌পিট্যাল রেকর্ডেও দেখা গেলোনা যে, উক্ত নামের কোনো রোগী উক্ত হাসপাতালের কোনো একটি ওয়ার্ডেও কিছুদিনের মধ্যে ভর্তি হ'য়েছে ব'লে।

তবে কি খবরটা ভুয়ো? পত্রবাহক সেজে তবে কি একজন প্রতারক তপেশের মালপত্রগুলো আত্মসাৎ করলো? ব্যাগ থেকে তপেশের চিঠিটা বের ক'রে আর একবার পড়ার পর কিন্তু তার আর সন্দেহ রইলোনা যে এ লেখা তপেশেরই হাতের। তবে এই মিথ্যাচারের মধ্যে তপেশও নিশ্চয়ই আছে তার দৃঢ় ধারণা হ'লো। কিন্তু অকারণে এতখানি মিথ্যাচার তপেশ তার সঙ্গে কেন করলো? হাসপাতালের ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে অনুসন্ধান শেষ ক'রে যখন সে রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এবার সে কী করবে—মসুরী ফিরে যাবে কিনা ঠিক এমন সময়ে একটি খালি টাঙ্গা তাকে ডাকলো। এতক্ষণে সে যেন একটা মস্ত আসন্ন বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে গেছে ঠিক এম্নিতরো ভাব ক'রে একেবারে গিয়ে টাঙ্গায় চ'ড়ে বসলো। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধ'রে একরকম উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা শহর ঘুরে শেষে একটা হোটেলের দরজায় শারী টাঙ্গা থামাতে বললো। তখন বিকেল।

ছোট্টো হোটেল। ছোট্টো ঘর। রাত্তিরটা কোনোমতে কাটানোর জন্যে সামান্য একটা আস্তানা—এই ঢের। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত একটি ঘরের সামান্য খাটে শুয়ে শারী অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়ে কতো কি ভাবলো। এতদিনের জীবন থেকে এ এক স্বতন্ত্র জীবন। একে সে কী-ভাবে গ্রহণ করবে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়লো দিন তিন, চার আগে তপেশের নামে ডাকযোগে একখানা খামের চিঠি মঞ্জুভিলায় এসেছিলো। সেখানা সে সঙ্গেও এনেছে তপেশকে দেবার জন্যে। চিঠিখানার শিরোনামাটা দেখে মেয়েলি হাতের ব'লে সহজেই মনে হয়। লেফাফাটার ওপরে ডাকঘরের

ছাপ দেখে বোঝা গেলো আগ্রা থেকে আসছে। কিন্তু কে লিখছে চিঠিখানা? আজ ক'দিন ধ'রেই সে তার কৌতূহল কোনোমতে দমন ক'রে রেখেছিলো কিন্তু এবার স্থির ক'রে ফেললো যে ওটা সে খুলে পড়বেই—ওর মধ্যে থেকে যদি কোনো সন্ধানসূত্র পাওয়া যায়। ব্যাগের মধ্যে থেকে শারী খামখানা বের ক'রে জল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে ফেললো :

T—Hotel
Agra

THY DAMNATION SLUMBERETH NOT.

রূপেশ

সব সত্ত্বেও তোমাকে আবার আমি চিঠিই পাঠাচ্ছি। চিঠির বদলে তোমাকে বুলেট পাঠানোই আমার উচিত ছিলো—যার ভাষা তুমি তবু খানিকটা বুঝতে। তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও আমি তা' পারিনি, স্বীকার করছি আমার দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি বেঁচে বেড়াচ্ছো। কতোদিন হ'লো সেই যে তুমি ডুব মেরেছো তারপর তোমার আর কোনো খবর নেই, ভেবেছো হয়তো এ-ব্যাপারের এখানেই যবনিকা পড়েছে—কিন্তু তা নয়। আমি খবর রাখছি তোমার প্রতিটি গতিবিধির। কয়েক মাস আগে আমাকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে সেই যে তুমি চ'লে গেলে তারপর আমার কী ক'রে যে দিন কেটেছে একমাত্র ভগবানই জানেন আর আমি জানি। কিন্তু তা নিয়ে আর আজকে তোমার কাছে নালিশ করছিনা, তোমার করুণার উদ্রেক করতেও ঘৃণা হয়; দয়া, মায়া, কর্তব্য, করুণা, প্রেম, সহানুভূতি ও-সব উঁচু দরের গুণ তোমার হৃদয়ে নেই, সেকথা জানি। এমন কি তোমার হৃদয়ও নেই—এও অজানা নয়; ভগবান তোমায় শুধু ইন্দ্রিয়ই দিয়েছেন, হৃদয় দেননি। নইলে একজন সম্ভ্রান্ত মেয়েকে, যে তোমার জন্য সর্বস্বপণ করলো তারই এমন সর্বনাশ ক'রে এ-রকম অমানুষিক পাঁকের মধ্যে তাকে ফেলে রেখে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতেনা। আমি বলিনা কিংবা প্রত্যাশাও করিনা যে, তুমি আমার ভরণ-পোষণের ভার নেবে—কারণ আমি জানি তোমার সে যোগ্যতা নেই। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রে নিয়েছি। তুমি তো জানোই যে, আমার আর বাড়ি ফেরার মুখ নেই তাই আমিও সে চেষ্টা আর করিনি। দেহ-পসারিণীর ঘৃণিত বৃত্তি গ্রহণ ক'রেই আমার বাঁচার সংস্থান ক'রে নিয়েছি। এখন আর আমার আর্থিক অভাব নেই। আজ আর তোমার কাছে কিছু অর্থের প্রত্যাশা করিনা বরং তোমার অর্থের প্রয়োজন থাকলে আমার কাছে তুমি তা করতে পারো। কিন্তু তাহ'লে তোমাকেও আমারই স্তরে নেমে এসে দাঁড়াতে হবে, নইলে নয়।

তুমি যে ভদ্রতার গৌরব নিয়ে অবস্থ শাড়ী-বীজ শৌখিন পোষাকে ঢেকে অভিজাত সমাজের ফুলে ফুলে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়াবে—এটা অসহ্য। তোমাকে তাই ডেকে নিতে চাই আমার কাছে। যে-নরকে তুমি আমাকে টেনে নামিয়েছো সেই তোমার ঠিক জায়গা। এখানেই তোমার মতো সুকৃতি মানাবে ভালো। তোমার প্রতি একটা আকর্ষণ আজো হয়তো আমার আছে; সেটা কিসের তা বলা শক্ত, সেটা কি ভালোবাসার? সেটা কি বিজাতীয় বিদ্বেষের? সেটা কি অপরিসীম ঘৃণার? ভালোবাসার দোহাই পেড়ে তোমাকে আমি ডাকতে চাইনা কারণ ভালোবাসার মতো মহৎ ভাব তোমার ধারণারও বাইরে—ও-সব তুমি বুঝবেনা। তোমার জন্য আমার অন্য প্রলোভন আছে—যেটা তুমি তবু বুঝবে—সেই প্রলোভন দেখিয়েই তোমাকে আমি ডাকছি আমার বিছানায়; তুমি এসো যেমন ক'রে নিত্য নূতন দেহ-পন্থী আসে আমার সান্ধ্য বাসরে। তোমার সকল অপরাধ তাহ'লে আমি ক্ষমা করতে পারি। এটাই তোমার সব চেয়ে যোগ্যস্থান এবং নিরাপদ। আমার এ-ডাক উপেক্ষা ক'রে আমার ঘৃণাকে মিছিমিছি আরো উদ্রিক্ত কোরোনা। তা হ'লে সেই ঘৃণার আগুনে তুমি নিশ্চয়ই পুড়ে মরবে, কিছুতেই তা থেকে তোমার রক্ষা নেই। আমার এই চিঠি পাওয়ার দিন তিনেকের মধ্যে যদি তুমি না আসো কিংবা যদি আমি খবর পাই যে তুমি ঠিক তোমার অভ্যস্ত লম্পটবৃত্তি স্বচ্ছচিত্তে ও বাহাল তবিয়তে অন্যত্র চালিয়ে যাচ্ছো তাহ'লে ঠিক চতুর্থ দিনে তুমি যেখানেই থাকো না কেন কোনো প্রকাশ্য জায়গায় তোমার শব দেখতে পাওয়া যাবে। সেই তোমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত। এই দুটোর মধ্যে যে-কোনো-একটা পরিণাম তোমাকে বেছে নিতে হ'বে।

সোনালি সমাদ্দার

সোনালির চিঠিখানার মধ্যে তপেশের যে গোপন চেহারাটা হঠাৎ শারীর চোখের সামনে ফুটে উঠলো তা দেখে সে ভয়ে, আতঙ্কে, ঘৃণায় প্রথমটায় কিছুক্ষণ মুহ্যমান হ'য়ে রইলো। তপেশ তাহ'লে আসলে এই? এরই জন্যে সে তার সব কিছু ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর জনারণ্যে নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছে? শতবার ধিক্কার দিলো নিজেকে। ইচ্ছে করলো যেন সে ছুটে যায় আবার মহুয়ারীতে, গিয়ে তার বৌদিকে খানিক জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে, অপরাধ স্বীকার করে, ক্ষমা চায়। তপেশকে নিয়েই তো সে বাসবীর প্রতি অবিচার করেছে। বৌদি ওকে ঠিকই চিনেছিলো। হঠাৎ শারীর মন বাসবীর প্রতি অনুরাগে, শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো। হোটেলের ছোট্টো ঘরের দেয়ালগুলো যেন হঠাৎ বড়ো কাঁপছে,

কাপড়ে-কাঁপতে যেন তার ঘাড়ে এসে পড়তে চায়। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সে তার মনটা ঠিক ক'রে নেয়—না, না, সে আর ফিরবেনা মঞ্জুভিলায়। এর মধ্যে দাদা যদি ফিরে এসে থাকেন তাহ'লে কী ক'রে সে মুখ দেখাবে তাঁর কাছে ? তাকে যেতে হবে আগ্রায় সোনালির কাছেই—সেখানে নিশ্চয়ই সে এমন অনেক কিছু সন্ধান-সূত্র পাবে যাতে তপেশের মূর্তি আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। যে-শঠের প্রতারণায় সে সব খুইয়েছে, আজ আর তার কিছু নেই—তার মন দূষিত, তার দেহ কলঙ্কিত—এমন কি ঐ নীচলোকটা কলুষ-সংসর্গে তার রক্তও বিষিয়ে দিয়েছে ব্যাধিতে, লজ্জাকর মারী-বিষে ; তপেশের ওপর প্রতিহিংসা যদি সে না নিতে পারে তবে নিজের ওপরেই তা নেবে। এই দুরপনেয় লজ্জা সে কিছুতেই জানাতে পারবেনা অজভূষণকে—না, সে আর ফিরবেনা কিছুতেই। ওরা জানুক শারী নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে, ওরা জানুক শারী ম'রেছে। কালই সে আগ্রা রওনা হ'বে। বারবার শপথ নিলো সে, জীবন থাকতে যে-শপথের আর খণ্ডন নেই।

আগ্রায় এসে দু'দিন অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে 'চক'-এর ব্যবসায়-অঞ্চলে একটা অপরিচ্ছন্ন হোটেলের সন্ধান পেলো। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

T-হোটেলের একতলায় দোকান ঘর—কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ীর আনাগোনা। দোতলা এবং তিনতলায় হোটেল। পাশের গলি দিয়ে অন্ধকার সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে শারী দোতলায় এলো। সিঁড়ির ধারের বারান্দা বরাবর সারি সারি খুপ্‌রি খুপ্‌রি ঘর চ'লে গেছে। প্রতিটি ঘরই ভর্তি। প্রথম যে শারীর সাম্‌নে পড়লো তাকেই শারী জিগেস করলো সোনালি সমাদ্দার ব'লে কেউ এখানে থাকে কিনা। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে শারী জিগেস করলো কথাগুলো। কিন্তু কারো কাছ থেকেই সন্তোষজনক উত্তর পেলোনা।

শেষে তদ্দেশীয় এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক যিনি কী যেন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন তিনি শারীকে তাঁর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেরিয়ে এলেন। শারী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু ভদ্রলোক প্রায় শুদ্ধ বাংলাতেই বললেন—আপনি বাংলাতেই বলুন। আমি বাংলা বুঝি, অনেকদিন কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি।

—আপনি এখানে কতোদিন আছেন ?···শারী জিগেস করে।

—প্রায় ছ'মাস। কী করবো, এখানে বাধ্য হ'য়ে আছি, জায়গা মিলছেনা ; কিন্তু এ-জায়গা ভালো না।

শারী জিগেস করে—কেন ?

ভদ্রলোক বলেন—তুমি আমার মেয়ের বয়সী, সেকথা তোমার কাছে কী আর বলবো। তুমি কি এখানে জায়গা চাও?

—হ্যাঁ চাই।

—তুমি যদি ভালো মেয়ে হও তাহ'লে তোমাকে এখানে থাকতে বারণ করি. অন্য কোথাও জায়গা পাও তো সেখানেই যাও।

শারী ক্ষণকাল বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইলো—বৃদ্ধকে তার বেশ লাগলো।

শারী বললো—না, আমি এখানে থাকতে চাইনা যদি আপনি একজন লোকের সম্বন্ধে কিছু সন্ধান দেন। তপেশ চক্রবর্তী ব'লে কোনো বাঙালী কি এখানে এসেছে ক'দিন আগে? সে কি এখনো আছে এখানে? জানেন?

—এ নামের কেউ এখানে আছে ব'লে তো জানিনা। তবে বাঙালী একজন এসেছে ক'দিন হ'লো। তিন তলায় খোঁজ করতে হ'বে। তিন তলায় রণ্ডী থাকে কিনা তিন তলায় আমরা যাইনা।

শারী জিগেস করে—আচ্ছা, এখানে সোনালি সমাদ্দার ব'লে কোনো বাঙালীর মেয়ে থাকে?

—বাঙালীর মেয়ে? হ'তেও পারে। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পাবে ওপরে একজন সোনৈলা, বাঈ ব'লে রণ্ডী থাকে শুনেছি। যতো শরাবী, বদমাস, লোচ্চা ওপরে আসে, যায়, সারা রাত গোলমাল করে। তোমাকে দেখে তো ভালো মেয়ে ব'লে মনে হয় তবে তুমিও আবার ও-সব খোঁজ নিচ্ছো কেন?

অকারণেই শারীর চোখ জলে ভ'রে ওঠে, সে ধরা গলায় বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধ'রে বলে—আমিও খারাপ মেয়ে, পণ্ডিত-জী। আমাকে মাপ করুন।

শারীর অকপট স্বীকারোক্তিতেও বৃদ্ধের বিশ্বাস হয়না তিনি কিছুক্ষণ নির্নিমেষে শারীর দিকে চেয়ে থাকেন।

শারী বলে—আমার সম্বন্ধে আর কোনো কথা জিগেস করবেননা পণ্ডিত-জী, আমি বড়ো হতভাগিনী।

স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ বলেন—আচ্ছা মা, আমায় আর কিছু বলতে হ'বেনা, ওদের সম্বন্ধে যা যা তুমি জানতে চাইছো আমি তোমায় সব কিছু খবরই দিতে পারবো। কাল তুমি সকালে এসো।

আশার ঈষৎ আভা শারীর ম্লান মুখখানাকে আবার যেন কিছুটা প্রদীপ্ত ক'রে তোলে। বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পায়ে হেঁটেই শারী সারা 'চক'টা ভালো ক'রে দেখে-শুনে বেড়ায়। তার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কলকাতার অভিজাত সমাজের অভিশপ্ত গণ্ডির বাইরে এ এক আশ্চর্য ছুটির

জীবন—তাই এ-রকম মানসিক পীড়ার মধ্যেও খানিকটা সময় তার বেশ কেটে যায়। কতো দোকান-পসার পরদেশী জনতা, কতো ব্যবসায়ী, কতো ক্রেতা—এখানে সে হাজারো জনের একজন হ'য়ে অনায়াসে ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বেড়াতে পারে—কেউ তাকে চিনবেনা। স্থানীয় শিল্পের শৌখিন শৌখিন কতো আশ্চর্য পণ্য। মর্মর-শিল্পের এমন আশ্চর্য পণ্য-সম্ভার থরে থরে সাজানো রয়েছে যে সারা দোকানটাই কিনে ফেলতে ইচ্ছে করে। ঘুরে-ঘুরে সব কিছু জিনিশই সে দেখলো, কিছুই কিনলোনা, শুধু কেনার বেলা কিনলো একটি মাঝারি ছোরা অস্ত্রের দোকান থেকে। দেখামাত্রই যেন তার চোখ দুটো প্রলোভনে দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। ছোরাখানা নিয়ে হাতে ক'রে নেড়ে-চেড়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। কই, এমনটি তো কখনো কলকাতায়ও সে দ্যাখেনি। ৮ ইঞ্চি কী সুন্দর বাঁকানো ফলা, চকচকে আর তীক্ষ্ণ। কী সুন্দর গড়নের হাতীর দাঁতের হাতল, কী চমৎকার কারুকার্য করা! সোনালি কাজ-করা পিধানটিও কী সুন্দর! সে ছোরাটির দাম জিগেস করলো। দোকানী যে দাম বললো সেই দামেই সে তৎক্ষণাৎ ওটা কিনে ফেললো, মিছিমিছি দরদস্তুর করতেও আর ইচ্ছা হ'লোনা তার।

ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হ'য়ে সে যখন তার আস্তানা অর্থাৎ হোটেলের ঘরখানিতে ফিরে এলো তখন রাত ন'টা। ছোরাখানি বুকে ক'রেই আজকের রাতটুকু সে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবে। তারপর কাল সকালেই তাকে আবার যেতে হবে 'চক'-এ T-হোটেলের সেই বৃদ্ধের কাছে। তার ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ তাকে কতোটুকু কী খবর দেবে কে বলতে পারে?

পরদিন সকালে শারী ঠিক কথামতোই এসে হাজির হয় T-হোটেলের বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধ তাকে বললেন যে তিনি অনুসন্ধান ক'রে জানতে পেরেছেন সোনেলা বাঈ বাঙালী। আর একজন বাঙালী তাঁর কাছে এসেছেন তার নাম—চক্রবর্তী সাহেব।

এইটুকু শোনামাত্র শারীর পূর্বধারণাই আরো দৃঢ়, আরো স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। এর বেশি কিছু খবরের আর তার প্রয়োজন নেই। সে ধন্যবাদ দিয়ে বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিচ্ছে এমন সময়ে তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে এক স্যুট-পরা ভদ্রলোক নেমে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ির কাছেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো শারী। পায়ের শব্দে সিঁড়ির দিকে চোখ ফেরাতেই একবার যেন চোখোচোখি হ'লো। ভদ্রলোক কিছু ব্যস্ততার ভান ক'রে মুখে টুপি আড়াল দিয়ে সবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। শারী এক মুহূর্ত হয়তো একটু ইতস্তত করেছিলো কিন্তু বুকের ছোরাটা খুব শক্ত

মুক্তিতে হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সেও খুব দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তায় এলো। কিন্তু কই? এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলো কোথাও নেই।—নাঃ, সে পারলোনা। কখনো পারবে কিনা কে জানে?

তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে যখন সে নিজের আস্তানায় ফিরলো তখন দুপুর প্রায় চ'লে যেতে বসেছে। নিজেই ভেবে অবাক হয় যে, যে-মানুষ কখনো মোটর ছাড়া এক পাও চলতোনা সেই এখন অজানা প্রবাসে অচেনা মানুষের ভিড়ে মিশে পায়ে হেঁটে ঘুরছে সারাদিন। সুতীব্র মানসিক পীড়ায় তার শারীরিক বেদনাবোধ প্রায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

হোটেলের ঘরটিতে ঢোকামাত্রই সে ঘরের দোরটি বন্ধ ক'রে দিয়ে একেবারে সটান হ'য়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। এই প্রথম অনুভব করলো তার গায়ে-হাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত বেদনা। আয়নায় নিজের চেহারা চোখে পড়তেই তার মনে হয় এই ক'দিনে তার বয়স যেন আরো দশ বছর বেড়ে গেছে। চুল রুক্ষ. রং-এর সে ঔজ্জ্বল্য নেই—যেন একটা কলঙ্কের ছোপ তার স্বাভাবিক বর্ণের উজ্জ্বলতাটুকুকে বহুলাংশে ম্লান ক'রে দিয়েছে। চোখের নিচে কালি। ব্যাধির করাল হাত যেন দিন-দিন তাকে ঘিরে ধরছে আরো দৃঢ় ক'রে। অতীতের অনুচিন্তনে ও ভবিষ্যতের বিভীষিকায় তার দুপুরের দুঃখ বোঝাই ঠেলা-গাড়ি প্রাণপণে ঠেলে-ঠুলে বিকেলের ঢালুতে গড়িয়ে ছায়। এরই কোনো ফাঁকে তার শ্রান্ত দু'চোখের পাতা এক হ'য়ে আসে।

তার সেই দুপুরের ঘুম যখন ভাঙলো তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। মনে হ'চ্ছে যেন কতো রাত। উঠে আলো জ্বাললো। হাতঘড়িতে সময় দেখলো মাত্র সাড়ে আটটা। বন্ধ ঘর, মনে হ'লো যেন দম বুঝি আট্‌কে যাবে। প্রথমেই সে রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিলো—হাওয়া। সদ্যোজাত চাঁদ এসেছে আকাশের কোলে। গত কয়েক শতাব্দীর মৌন বিষাদ যেন ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো ছায়াচ্ছন্ন প্রেতায়িত কালো রেখায় আলোয়-ধোয়া আকাশের পশ্চাৎ-পটে। পরিখা-বেষ্টিত প্রাকারের বিশালত্বে ও ঊর্ধ্বশিখ গম্বুজগুলোর সৌন্দর্য-মহিমায়, আরো দূরে, অক্ষয়যৌবনা তাজ-সুন্দরীর মর্মরস্বপ্ন শততন্ত্রী বীণার মিড়ের মতো করুণ হ'য়ে জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে যেতে হয়—বুকের অমৃত যেন উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ উঠে আসে।

শারী তার ডায়েরিটা হ্যাণ্ড্‌ব্যাগের মধ্যে নিয়ে ঘর বন্ধ ক'রে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় নেমেই একটা টাঙ্গা ডাকলো—এই টাঙ্গা, চলো তাজগঞ্জ।

নিয়তি খেলছে শারীর সঙ্গে নিদারুণ নির্মম খেলা। অপরপক্ষে শারীও

বেপরোয়া ; নিজভাগ্যকে নিয়ে কী-এক আত্মঘাতী ছিনিমিনি খেলতে সেও বদ্ধপরিকর—নিবৃত্ত হ'বেনা, শেষপর্যন্ত ফেলবে পাশা। কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করবেনা সে ; অবিচলিত তার সংকল্প ; স্থির ও অভিনিবিষ্ট তার লক্ষ্য হঠাৎ কে বুঝি ডেকে গেলো—আয়, চ'লে আয় ! ইয়েট্‌স্ লিখলেন—

She is playing like a child
And penance is the play,
Fantastical and wild
Because the end of day
Shows her that some one soon
Will come from the house, and say—
Though play is but half done—
'Come in and leave the play'.

শারী সে-রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলো তখন রাত দশটা। হোটেলের অরুচিকর আহার্য থেকে যৎকিঞ্চিত গ্রহণ ক'রে সে নিজের ঘরের দোর বন্ধ করলো। হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে তার ডায়েরীটা বের ক'রে কোলের ওপর রেখে চুপচাপ নিশ্চল হ'য়ে কতো কি ভাবতে লাগলো। ছবির পর ছবি আসতে লাগলো উত্তাল প্রবাহে—কতো মিষ্টি-মধুর দুঃখ-বিধুর দিন—কতো প্রসন্ন স্রোত, কতো কুটিল ফেনিল আবর্ত, কতো প্রায়-বিস্মৃত শৈশব স্মৃতি—ধূসর অতীত ; কতো অত্যন্ত-স্মৃত যৌবন-স্বপ্ন—সদ্য-অতীত ; দিনের পর দিন ভিড় ক'রে এলো প্রপাতের মতো, আপতিত হ'লো তার মনের কঠিনায়িত শিলাস্তরে। জীবনের কতো চিত্র, চেনা চরিত্র, দাদা, বৌদি, বিরুদা, সতী, কতো বন্ধন, আত্মীয়তার ক্রন্দন—এসব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে পদাঘাতে ফেলে দিয়ে সে চলে যেতে পারে? কতো চেনা-চরিত্রের উচ্ছ্বসিত শোভাযাত্রা হাতছানিতে তাকে ডাকে, কতো মধু-স্মৃতির প্রসন্ন প্রবাহ তাকে তার শপথ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়—এই সব আবেদন থেকে সে আজ প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা ক'রে যায়। পাষাণে বুক বেঁধেছে সে : ভেসে গেলে চলবেনা।

নিজের কোল থেকে ডায়েরীটা তুলে নিয়ে সদ্যলেখা পাতাটি সে আবার পড়লো : জ্যোৎস্না এসে মিনতির মতো লুটিয়ে পড়লে শাদা পাথরের পায়ে তুমি যে নামে ডাকো মমতাজকে,—সেই নাম—সেই নামের ছোঁয়া কাঁদছে আমার বুকে, সেই নামের ছোঁয়া কাঁপছে আমার প্রাণে—শোনো বৌদি,শোনো…'—এ পর্যন্ত প'ড়েই হঠাৎ কান্নায় যেন ভেঙে পড়লো শারী বালিশের ওপর ; খানিক পরে সে মাথা তুললো, আবার পড়লো : মখ্‌মলের আস্তরণে ঢাকা মক্‌বরা থেকে ঐ জেগে উঠলোনা সাজাহান? নিষুতি রাতের বাতাস বুঝি জাগিয়ে দিলো জাঁহাপনাকে? জ্যোৎস্নার সুরভিতেই মমতাজের কবর বুঝি উঠলো ন'ড়ে? মমতাজ জেগেছে, জেগেছে জাঁহাপনা, নিষুতি রাতের হাওয়া—উঠে বসেছে ওরা দু'জন ; সেই চিরন্তন কাছে-পাওয়া,—কাছে পাওয়ার গান…যমুনায় বান… শোনো বৌদি বুঝবে তুমি, তোমার আছে প্রাণ। বাতাসে আজ ভেসেছে কথা, মমতাজ কথা কয়—শারী শুনছে, রাত শুনছে যমুনায় ঢেউ—মমতাজ কথা কয় শুনছে নাকি কেউ? মমতাজ জাঁহাপনাকে ডাকে াঁহাপনা সাড়া দায় শুনে এসেছি আজ—জানো বৌদি, চাঁদের আলোয় দেখে এসেছি তাজ। ঘুম নেই কোয়ারাদের, আর

কেউ জাগেনা, একা চাঁদ জাগে, খাদিমেরা ঘুমোয় শরাবের ঘুম—ঝিলের রাঙের সোজা সিধে পথ তোরণের ছায়া ছুঁয়ে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে কোথায়,—যমুনাও জাগে, বৌদি, চাঁদের ছবি বুকের কাছে পায়। আজকে রাতের সমস্ত বুক জুড়ে অভিসারিকাকে জাঁহাপনা ডাকে। যাই। যাই, জাঁহাপনা যাই। মমতাজ যাচ্ছে ডেকে নাও বাঁদীকে—প্রেমের সেই দাসখৎ আজো রক্তের মধ্যে জ্বলছে।'

শারীর সেই বিনিদ্র রাত্রি অনুচিন্তনে, রোমন্থনে, কান্নায়, অভিমানে, জ্বালায় ভোর হয়। বিছানা ছেড়ে সে এবার খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়—প্রথম উষার আলোয় সে দেখছিলো এই ঐতিহাসিক শহরটাকে। তখন ভোরের হাওয়া দিয়েছে অত্যন্ত মৃদু—হাওয়ার স্নেহ-শীতলস্পর্শে তার আতপ্তকপাল কিছুটা জুড়িয়ে যায়—গতরাত্রির জ্বর-বিকার এবার যেন ছাড়লো। ভাবনার পালা কাল রাত্রি পর্যন্ত সে যেন কড়ায়গণ্ডায় সব চুকিয়ে নিয়েছে—আজ আর তার ভাবনার কিছুই নেই—এবার সে মুক্ত। আগ্রায় আসা পর্যন্ত এই যেন প্রথম সে একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি অনুভব করলো।

এইবার হাত-মুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য ও প্রসাধন সেরে তৈরি হ'য়ে নিতে হ'বে তাকে। আজ তার অনেক কাজ। বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে সিক্ত মুখে সে যখন আয়নার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, চোখ পড়লো নিজের অনাবৃত বাহুতে, ঘাড়ের কাছে, গালের দু'এক জায়গায়, কপালের দু'এক জায়গায় কী রকম যেন দাগ কালকেও এতটা নজরে পড়েনি, আজ কিন্তু বেশ পরিস্ফুট হ'য়েছে। গায়ের ত্বক বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশ ক্রমশ। তার গায়ে আবার যেন জ্বর এলো। কতোবার ক্রীম ঘষলো পাউডার দিলো প্রসাধনের প্রলেপ জমে উঠলো মুখে তবু সে দাগগুলো মিলোলোনা কিছুতে। এক একবার যেন একটা অবোধ্য আক্রোশে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আবার নিজেকেই সে বহু চেষ্টায় দমন করে। তার সঙ্গের সাথী সেই সুন্দর ছোরাখানি ব্লাউজের মধ্যে শাড়িতে ঢেকে নেয়। হ্যাণ্ড্‌ব্যাগটার মধ্যে তার ডায়েরিটা, ফাউন্টেন পেন্‌টা ঢুকিয়ে নিয়ে যখন জুতা পরছে তখন পূর্বদিগন্তে সূর্যবিম্ব সবটাই দেখা যাচ্ছে।

অতো ভোরে রাস্তায় লোক চলাচল তখন খুব ক্ষীণ, টাঙ্গাও বেশি বেরোয়নি। টাঙ্গা স্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো শারী এমন সময়ে সেই T-হোটেলের বৃদ্ধটি তিলকচন্দন-চর্চিত হ'য়ে কমণ্ডলু হাতে বোধহয় কোনো দেবদর্শনে যাচ্ছিলেন। তিনি শারীর সম্মুখীন হওয়ামাত্রই বললেন—একটা নতুন খবর দেবো তোমাকে মেয়ে। আমাদের হোটেলের তিনতলায় সোনৈলা বাঈ-এর কাছে যে বাঙালী-বাবুটি এসেছিলেন—সেই চক্রবর্তী সাহেব, তাঁর সম্বন্ধেই তো জানতে চেয়েছিলে?

শারীর তখন কোনো কথাই ভালো লাগছিলোনা, সে বললো—হ্যাঁ, জানতে চেয়েছিলাম বটে কিন্তু এখন আর জানতে চাইনা। কেন? নতুন খবরটা কী তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলুন আমি একটা কাজে যাচ্ছি, সময় নেই।

বৃদ্ধ বলেন—সে চক্রবর্তী সাহেব কাল থেকে ফেরার হ'য়েছেন।

শারী নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে—ও তাই নাকি? আচ্ছা।

ব'লে তার হ্যাণ্ড্ব্যাগটা খুলে টাকার থলিটা বৃদ্ধকে দিতে যায়, বলে—এটা আপনি এখন রাখুন। এতে আমার আর দরকার নেই কিছু।

—ওকি করো? ওকি করো? টাকা? কেন? বৃদ্ধ যেন সাত হাত পেছিয়ে যান টাকা দেখে। কিন্তু শারী ওঁকে ছাড়েনা কিছুতেই, বলে—এ টাকা আপনাকে রাখতেই হ'বে। এটা আপনার কাছে গচ্ছিত রাখলুম। পরে প্রয়োজন হ'লে আমি চেয়ে নেবো আপনার কাছ থেকে। নইলে যা ইচ্ছে আপনি করবেন, নিজে যদি না ব্যবহার করতে চান তো বিলিয়ে দেবেন গরিব দুঃখীকে। আমার সময় নেই, চললুম।

ব'লে অনেকটা জোর ক'রেই বৃদ্ধের চাদরের একটা খুঁট নিয়ে ব্যাগটা বেঁধে দিলো তারপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে শারী হন্ হন্ ক'রে চ'লে যায় টাঙ্গা স্ট্যাণ্ডের দিকে—পিছন দিকে একবার ফিরেও চাইলোনা।

বৃদ্ধ বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর পথ চলতে-চলতে ভেবে স্থির করলেন মেয়েটা নিশ্চয়ই আজ প্রকৃতিস্থ নেই।

সেই সকালেই শারীর টাঙ্গা যখন তাকে তাজে পৌঁছে দিলো দর্শকদের ভিড় তখনো হয়নি।

পথের দু'পাশের লাল পাথরের লম্বা লম্বা দালানগুলো পিছনে ফেলে রেখে বিশাল তোরণ পার হ'লে সোজা শ্বেতপাথরের পথ, দু'পাশের মর্মর-মণ্ডিত কৃত্রিম ঝিলগুলোয় তখন জল নেই, সাম্‌নেই বিরাট মর্মর-শৈলের মতো তাজমহল।

সিঁড়িতে জুতো রেখে শারী উঠে গেলো চবুতরার ওপর, ঢুকলো ভেতরে: কারুকৃত অলিন্দ দিয়ে প্রদক্ষিণ ক'রে নিলো সম্রাট্ ও সম্রাট-মহিষীর সমাধি—তারপর নামলো প্রায়ান্ধকার গর্ভগুহায় যেখানে রক্ষিত রয়েছে প্রকৃত কবর দু'টি হাঁটু গেড়ে বসলো সেখানে—সকল যুগের সব প্রেমিকের তীর্থভূমির স্পর্শ নিলে কপালে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠলো একটি মিনারে—হাতে ওর হ্যাণ্ড-ব্যাগ্‌টি।

মিনারের ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো ওপরে একা—মাঝে মাঝে অন্ধকার, মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে আসে বাইরের আলো—ওপরে, আরো ওপরে···আরো···যতই ওঠে ততই আরো হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়, তবুও ওঠে শারী। শেষে উঠে আসে একেবারে চুড়োয়, দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে গোল বারান্দায়। কতো উঁচু, কতো হাওয়া, কতো আলো। সেইখানে ব'সে অনেকক্ষণ কাটায়, প্রাণ ভ'রে নিশ্বাস নেয় অজস্র হাওয়ায়, মিনারের তলা দিয়ে যমুনা বয়ে চলেছে। অদূরে যমুনার ওপর রেলের ব্রিজ, এদিকে আগ্রা ফোর্ট, ওদিকে ইৎমাদ উদ্দৌলার সমাধি। মিনারে, গম্বুজে, কারুকৃত গর্বিত চূড়ায়, ধনাঢ্যতায় ও বর্ণাঢ্যতায় মহিমময়ী রানীর মতো আগ্রানগরী যার সবটুকুই দেখা যায় এই মিনার-শিখর থেকে। কিছুক্ষণ রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলো; কতো দর্শক আসছে, যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে, কিন্তু এই মিনারে উঠছে ক'জন? কই একজনও তো নয়? দল বেঁধে কী দেখতে আসে ওরা? কীই বা দেখে চ'লে যায়?—কী-যে বোকা লোকগুলো—শারী শুধু এই ভেবেই অবাক্ হয়। নিরিবিলিই তো চেয়েছিলো শারী, পেয়েছেও তাই। ব্যাগ খুলে ডায়েরিটা বের করে। এইখানে ব'সে আজ কিছু লিখবে সে ডায়েরির পাতায়। লিখলো সে: এত উঁচু, এত হাওয়া, কী চমৎকার দিন! ··এই প্রেম-প্রতীক মর্মর-স্বপ্ন! এই তো ঠিক জায়গা। মিনারের তলা দিয়ে যমুনার কালো জল। দূরে দেখা যাচ্ছে আগ্রা ফোর্ট। গা তুলতে ইচ্ছে করছেনা এখান থেকে, মনে হচ্ছে চিরকাল এখানে ব'সে থাকি। মরতে ইচ্ছে করছেনা। বাঁচতে চাই, কিন্তু বাঁচার সম্বল পাইনা। আর বেশি দেরি করলে হয়তো মরতেও পারবোনা, হয়তো মরতেই চাইবোনা। এই ঠাণ্ডা শাদা পাথরকে বুকে জড়িয়ে হয়তো যুগ যুগ প'ড়ে থাকতে চাইবো। কিন্তু তা'হ'লে তো আমার চলবেনা, মরতে যে আমাকে হ'বেই। ভুল বুঝো না বৌদি, তপেশের জন্য নয়। ঠিক আজকের এই মুহূর্তে তপেশের মতো কতো ক্রিমি-কীট, কতো খল জগতের কোথায় কোথায় কতো বিবরে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে সেকথা আমি ভুলেই গেছি কিংবা অন্তত মনেও রাখতে চাইনা। জানি তপেশ খল, শঠ, বিশ্বাসঘাতক, প্রয়োজনমত্ত দেহসর্বস্ব মানুষ। যদিও এমনটি এর আগে আর দেখিনি। তবু বলছি, ওর জন্যে নয়—ও যে আমায় অনপনেয় লজ্জা দিয়ে স'রে পড়েছে তার জন্যেও নয়—এটা অনেকটা আমার নিজের জন্যই।

মনে পড়ে দাদা একবার তোমাকে কী যেন বলেছিলেন—জ্যোতিষী আমার সম্বন্ধে কী যেন একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন তোমরা অমি তাই শুনে আমাকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করতে উঠে প'ড়ে লেগে গেলে। আর একদিন

আমার আড়ালে তোমায় ডেকে দাদা বলছিলেন কানে এলো—জ্যোতিষীর কথ নেহাৎ উড়িয়ে দিওনা, বাসবী। আমার কাছে বিরুদাও বলেছিলেন পথে-ঘাটে প্রেমে পড়ার একটা বাতিক আছে শারীর—ওকে সাবধানে রেখো। অথচ ওর মনে অযথা কষ্ট দিওনা শুধু ঝোঁকটা কাটিয়ে দিও। ও ছেলেমানুষ—নিজের ভালো-মন্দ ও এখনো বোঝেনা, অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে মিশতে দিওনা।'

···একথা কানে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে নিজে অনেকবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি—কথাটা একেবারে মিথ্যে হ'লে নিশ্চয়ই মনকে এতটা নাড়া দিতোনা. কথাটা হয়তো নিষ্ঠুরভাবেই সত্য নইলে আজ আমার এ-দশা হবে কেন?

বৌদি, কতোবার আমার ডায়েরি চুরি ক'রে পড়বার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু পারোনি। এইবার পারবে। শেষপর্যন্ত ডায়েরিটা যেন তোমার হাতেই পড়ে—এই আমার শেষ ইচ্ছা। এখন আমার মনের সামনে তুমি আর দাদ ছাড়া কেউ নেই—সত্যি, তোমাদের বড়ো কষ্ট দিয়ে গেলুম, তোমাদের প্রতি বড়ো নিষ্ঠুরতা ক'রে গেলুম। না ক'রে থাকতে পারলে করতুমনা।···কিন্তু তার যে আর উপায় নেই। ডাক এসেছে আমার—আমি যে শুনেছি জাঁহাপনার ডাক, আমি যে শপথ নিয়েছি যাবার, তাঁর ডাকে সাড়া দেবার। ডাকে···ডাকে··· ডাকে···আমার দেহ-মনের অধীশ্বর প্রেমিকশ্রেষ্ঠ ডাকে।—যাই, জাঁহাপনা যাই. মমতাজ যাচ্ছে, ডেকে নাও বাঁদীকে···প্রেমের সে দাসখৎ যে রক্তের মধ্যে জ্বলছে।

···ডায়েরিটা মুড়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে শারী রেলিং ধ'রে দাঁড়ায়, প্রাণপণে ঝুঁকে দেখতে থাকে নিচের দিকে—অস্ফুট স্বরে যেন কাল্পনিক ডাকের সাড়া দিতে থাকে—যাই, জাঁহাপনা, যাই। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হ'লো আশ্চর্য লঘু, আশ্চর্য বায়ব তার দেহ—শূন্য দিয়ে এবার সে যেন উড়ে উড়ে চলেছে কোনো অজ্ঞাত নক্ষত্রের দিকে। এক পলকস্থায়ী বায়ব লঘুতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুমহান্ যন্ত্রণার আবর্তে একটিবার চারিদিক ঘুলিয়ে ওঠে—মুহূর্তে সব ঝাপ্সা হ'য়ে যায়—হোক অসহ্য আরো···আরো···আরো···কিন্তু কতোক্ষণ আর? এর ওপারে তো আর কোনো অনুভূতি নেই ··শান্তি!

তাজের একটি মিনারের তলদেশে তখুনি একটা সোরগোল প'ড়ে গেলো. দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ এসে জুটলো, তাজমহলের রক্ষীদের মধ্যে দু'একজনও এলো। শারীর মৃতদেহটা নিয়ে যখন সবেমাত্র সোরগোল শুরু হচ্ছে, শবটিকে ঘিরে যখন ছোটো-খাটো জনতা জমে উঠছে ঠিক সেই সময়ে একজন স্যুট্-পরা

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন কৃশাঙ্গী মধ্যবয়স্কা মহিলা তাজের মর্মর-সোপান বেয়ে চবুতরার ওপর উঠে আসছিলেন। মহিলাটির খড়্গের-মতো নাকের ওপর পুরু চশমা ও চশমার অন্তরাল থেকে কোল-বসা দু'টি তীক্ষ্ণ চোখ যার ওপর পড়ে তাকেই যেন কিছুটা বিদ্ধ করে। ভদ্রমহিলার কানে এলো পাশ দিয়ে দু'জন হিন্দুস্থানী যুবক বলাবলি করতে করতে নেমে যাচ্ছে।

—ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখতে পেলি কিছু ?

—পেয়েছি বৈকি। সত্যি বড়ো কষ্ট হয় দেখলে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় খুব বড়ো ঘরের মেয়ে।

—মিনারের ওপর থেকে প'ড়ে গেলো কী ক'রে ? প'ড়ে গেলো কেন ? সুইসাইড্ নাকি ?

—নিশ্চয় ও-রকমের কিছু ব্যাপার আছে।

ওপরে উঠে আসতে ওঁদেরও নজরে পড়লো একটি মিনারের পাদমূলে ছোটো-খাটো একটি জনতা। সেই জনতার কলেবর বৃদ্ধি করতে কেউ গিয়ে জমা হ'চ্ছে আবার কেউ স'রে আসছে ভিড় থেকে।

ভদ্রলোকটি তাঁর পার্শ্বচারিণী মহিলাটিকে বললেন—ওখানে এত ভিড় কেন ?

মহিলাটি বল্লেন—চলোনা পৃথীরাজ, দেখি কী ব্যাপার ?

এঁরা দু'জন এই ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে নেন। কৃশাঙ্গী মধ্যবয়স্কা মহিলাটিকে আমরা চিনি—ইনিই আমাদের প্রাক্তন মৃদুলা সেন। সম্প্রতি ইনি এই বিপুলায়তন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির সঙ্গে পত্নীত্বসূত্রে লগ্না হ'য়েছেন।

ভিড় ঠেলে গিয়ে ওঁরা দু'জনেই দেখতে পেলেন একটি মর্মন্তুদ দৃশ্য। একটি সুন্দরী মেয়ের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ প'ড়ে আছে শুভ্র মর্মর-চত্বরে। দেখামাত্রই দু'জনে স্তব্ধ হ'য়ে যান। নিজের অজ্ঞাতসারেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মৃদুলার মুখ দিয়ে। বেদনায় আতঙ্কে বিভীষিকায় মৃদুলা দুই হাতে মুখ ঢাকলো—ওমা গো ! শারী ? ইস্ !

তাঁর সহচর পুরুষটি মৃদুলার কানের কাছে মুখ এনে জিগেস করলেন—কী হ'লো ? চলো, চলো, স'রে চলো এখান থেকে। এ-ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আসতে দেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে। একে তুমি চেনো নাকি ?

পাট-করা রুমাল চোখের পাতায় বুলিয়ে নিয়ে মৃদুলা ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গলায় বলে—চিনি মানে খুব ভালোভাবেই চিনি, এ যে আমার ছাত্রী ছিলো—কতো ভালো ছাত্রী—ঠিক মেয়ের মতো। কী ঘরের মেয়ে, তার একি অবস্থা ? হা ভগবান !

সদ্যমৃতা মেয়েটির সঙ্গে মৃদুলার পরিচয়-সূত্র পাওয়া যাওয়াতে জনতার তরফ থেকে মৃদুলাকে নিয়ে খুব একচোট জেরা চললো যে-পর্যন্ত-না পুলিস এসে পড়লো।

পুলিস এসে বললো—আপনাকেও যেতে হবে থানায়।

মহান্ মৃত্যুর সামনে মুহূর্তকাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনাদ্বিধায় মৃদুলা বললে—নিশ্চয় যাবো। এখানে আমি ছাড়া ওর যখন আর কেউ নেই যে ওকে জানে বা যে ওকে চেনে, যাবো বৈকি। পৃথ্বীরাজ তুমি এক্ষুনি কলকাতায় ওর দাদার কাছে জরুরী তার ক'রে দাও। আজই এয়ারে তিনি যেন আগ্রা চ'লে আসেন। ঠিকানা আমি দিচ্ছি, ট্রাঙ্ক কলেও তাঁকে একবার অতি অবশ্য পেতে চেষ্টা করো।

এভাবে একটা সন্দেহজনক মৃত্যুর সঙ্গে নিজেকে ইচ্ছে ক'রে জড়িয়ে ফেলার জন্যে যদিও পৃথ্বীরাজ মৃদুলার ওপর প্রথমটায় খুবই বিরক্ত হ'য়েছিলো তবু শেষপর্যন্ত কী-যেন ভেবে-চিন্তে অজকে জরুরী তার করতেও দেরি করেনা উপরন্তু একাধিক বার চেষ্টা ক'রে ট্রাঙ্ক কল-এ অজকে পেয়েও যায়।

ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলো ছায়াছবি

এদিকে হঠাৎ শারীর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই অজ কলকাতার সকল কাজ ফেলে তৎক্ষণাৎ মসুরী এসে পড়ে। এসে দেখলো মঞ্জুভিলায় চাকর বাহাদুর ছাড়া আর কেউ নেই। ঘরগুলো তালা বন্ধ। বাসবী বর্তমানে মঞ্জুভিলা ত্যাগ ক'রে অনিরুদ্ধের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে শুনে সে সেখানেই এলো। তার নিজের সংসারের এত বড় ভাঙনের সংবাদটা অজ খুব শান্ত হ'য়েই নিলো রামকিষণের কাছ থেকে। একদিকে তার ব্যবসায়ের এত বড় ভাঙন সেটা থেকে সামলে উঠতে-না-উঠতে অন্যদিকে তার সংসার ভেঙে পড়লো। সে শুধু ভেঙে পড়তে দিলোনা তার নিজের ধৈর্যটুকুকে কারণ তাহ'লে আর তার থাকবে কী?

স্ত্রীকে অজ জিগেস করে—তাহ'লে···এবার তাহ'লে কী হ'বে?

—কিসের কী হ'বে? ··বাসবী বলে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বলে—তুমি যা বলবে তাই হ'বে। আমি তার কী জানি?

অজ বলে—এখানকার পালা তো শেষ হ'লো···আমি বলি কী এবার কলকাতায়ই ফিরে চলো।

বাসবী চুপ ক'রে রইলো দেখে অজ আক্ষেপের স্বরেই বললো—মনে করো ওরা যদি আর না-ই ফেরে?

বাসবী আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা করলোনা, সে শুধু বললো—ভবিষ্যতের কথা এখন কেমন ক'রে বলবো?

—তুমি ওখানে আর থাকবেনা যখন, মঞ্জুভিলা রেখে কী করবো, ছেড়ে দিই? কী বলো?···অজ জিগেস করে স্ত্রীকে।

বাসবী বলে—নিশ্চয়ই দেবে। মিছিমিছি কেন অতগুলো ক'রে টাকা মাসে মাসে ভাড়া গুনবে? মালপত্তর তুমি সব নিয়ে যাও কলকাতায়।

ক্লিষ্টস্বরে অজ বলে—আচ্ছা। তাই হ'বে।

—কলকাতার কাজ আজো মেটেনি লিখেছিলে? ··বাসবী প্রশ্ন করে।

—না মেটেনি। কালকেই আবার যেতে হ'বে—না গেলেই নয়। ভালো লাগেনা আর এ-সব। সময়ে সময়ে আজকাল মনে হয় কী জন্য এ সমস্ত, কার জন্য এ সব? ভাঙে যদি তো ভেঙেই যাক।

বাসবী চুপ ক'রে চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে।

অজ আবার বলে—কবে যে মিটবে তার কিছুই ঠিক নেই। তাই তো

তোমাকে যেতে বলছিলাম আমার সঙ্গে। এখানে তোমাকে একা ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত থাকবো কী ক'রে? তা তুমি যখন যাচ্ছোনা তখন আমাকে একাই যেতে হ'বে কাল।

—কলকাতার কাজ সেরে আবার কবে তুমি ফিরছো?

—কোথায় ফিরবো, এখানে?

—হ্যাঁ। কেন, তুমি আর এখানে ফিরে আসবেনা?

—আমাকে কি ফিরে আসতে বলো?

—বললে তবেই আসতে পারো—ভাবখানা এই রকম—তাই না?

—বললে তাহ'লে আসতে হ'বে বৈকি। এ বন্ধন তো আর ঘোচবার নয়। তুমি তো আর যাচ্ছোনা?

—বললে আসবে নইলে আসার ইচ্ছে নেই? কেন, সম্ভব হ'লে কি আমাকে নির্বাসন দিতে? বলো, চুপ ক'রে আছো কেন?

—তোমাকেও যদি নির্বাসন দিই তবে কাকে নিয়ে থাকবো? কার জন্যে ব্যবসা করবো, টাকা বাড়াবো, বাড়ি-গাড়ি লোক-লস্কর এ সবের অর্থ কী? আমার কী রইলো তবে?

—কেন? বাড়ি-গাড়ি লোক-লস্কর সবই? তোমার টাকা আছে। এমন কি জীবিকার জন্যেও আমাকে তোমারই ওপর নির্ভর করতে হ'বে।

—কেন বলো তো জীবিকার জন্য স্বামীর ওপর নির্ভর করতে কুণ্ঠা বোধ করো? এ-সবের জন্যেই আমার সময়ে সময়ে মনে হয় সব থেকেও আমার যেন কিছুই নেই—তুমি নেই। একটা মাত্র বোন সেও ছেড়ে চ'লে গেলো। এখন তুমিও যদি……

অজের হাত দু'খানা বাসবী হাতের মধ্যে নিয়ে মিনতির স্বরে বলে—অমন ক'রে বোলোনা, আমি সইতে পারিনে। তুমি যদি হুকুম করো আমাকে যেতে হ'বে—এখনি যাবো; কিন্তু তুমি তো হুকুম করোনা। তাই সময় চাইছি। আমায় একটু শান্ত হ'য়ে নিতে দাও। তোমাকে তো সব খুলেই বলেছি, তুমি তো সবই জানো। এবং এও তো জানো মন আমার কোনোকিছুই আঁকড়ে প'ড়ে থাকেনা, সব কিছুই সহজে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। তাতেও তো কিছু সময় দরকার।

—তাহ'লে এখানে এভাবে একাই থাকবে? রামকিষণ আর বাহাদুরকে রেখে যাচ্ছি তোমার এখানেই, অমত করোনা, বুঝলে? আমার কিন্তু উৎকণ্ঠা রইলো।

বাসবী বলে—আমার জন্যে তুমি ভেবোনা কিছু। কেবল শারীর কোনো

খোঁজ পাওয়া গেলে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিও। তখুনি আমি চ'লে যাবো। কিংবা শারীরিক কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে বলো, আমাকে তখুনি টেলিগ্রাম করবে? কথা দাও?

একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে অজ শুধু বল্লো—আচ্ছা, তাই হ'বে।

তার পরদিনই কলকাতায় রওনা হ'লো অজ।

(২)

সেই যে অজ একটি দিন ও একটি রাত্রি মসুরীতে কাটিয়ে বাসবীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে পরদিনই কলকাতায় রওনা হ'লো তারপর থেকে বাসবী আবার মসুরীতে একা। এই একাকিত্বের প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছায়ই নিয়েছে সে। চোখের জলে ধোয়া দিনগুলো তার যেন আর কাটতেই চায়না। রাতগুলো তুষারের মতো ঠাণ্ডা আর ভিজে আর স্যাঁৎস্যাঁতে। অনিরুদ্ধ-মলয়ার ঘরের জিনিশপত্র গুছিয়েই তার সারাটা দিন কাটে তবু মনের মতো হয়না। মনে করতে ইচ্ছা হয় যে, নিরুদা কোথায় যেন অনেকক্ষণ বেরিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে। তাহলেই ও ছুটি পাবে। এসে ঐ ঘরে বসবে, এই ঘরে শোবে; ঝাড়া-পোঁছা ঝকঝকে আস্‌বাব···ধোয়া ধব্‌ধবে নিভাঁজ-চাদর পাতা এই খাটের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পথশ্রম দূর করবে, হয়তো বলবে—ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে বাসবী। নিজের ঘর যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটিই ফিরে পেলাম।

দিন নেই, রাত নেই, বাসবী আশা ও ঔৎসুক্যের জাল বুনে চলে—রাত্রের ঘুম হঠাৎ কোনো কারণে ভেঙে গেলে মনে হয়—ঐ বুঝি এলো, ডাকলো নাম ধ'রে। ঘুমোবার অবসর সারাদিন অথচ ঘুমিয়েও যেন স্বস্তি নেই—ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও মনে হয় অনিরুদ্ধ যেন এক্ষুনি ফিরলো, ওর টুপি ও চেস্টারফিল্ড থেকে রাত্রির তুষার ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে মেঝেয়। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও ব'লে ওঠে—উঃ, কী তুমি নিরুদা! এত দেরি করলে? এখন কত রাত, বলো তো? এমন সময়ে বাইরে কি কেউ থাকে? তোমার টুপিতে-চেস্টারফিল্ডে বরফ পড়েছে যে, আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছি দাঁড়াও। হ'য়েছে হ'য়েছে···এবার বোসোগে খানিক আগুনের পাশে। ছাখোনা কেমন চমৎকার আগুন ক'রে রেখেছি তোমার জন্যে। ঐখানে ব'সে আরাম করো একটু। পাহাড়ের, শীতের, রাত্তিরের, দুঃসাহসের যতো গল্প আগুনের পাশে ব'সে তুমি বলবে, আমি শুনবো। ঐ শোনো তোমার ঘোড়াটা ডাকছে কী রকম! ওকে বাইরে রেখে এলে? হিমে-শীতে ঘোড়াটা মরে যাবে যে। না, না, তোমায় যেতে হ'বেনা, আমি বলছি রামকিষণকে ডেকে, তুমি বোসো। ওদের কথা জিগেস করছো? ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে। উনি ঘুমোচ্ছেন, শান্তী

ঘুমোচ্ছে, আর মলয়া বৌদি সেও ঘুমোচ্ছে, নয়? রাত্তির ঘুমোচ্ছে, পাহাড় ঢুলছে, আমরা যদি আজ জাগি কার এমন কী ক্ষতি হ'বে বলো তো?

…স্বপ্নের সুতো ছিঁড়ে যায়। ঘড়িতে বারোটা বাজে। চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বাসবী। দোরের পাশের ছোটো ঘরটা থেকে রামকিষণের কাসির আওয়াজ আসে মুহুর্মুহু—হেঁপো বুড়োটা কেসে-কেসেই মরবে। গায়ে পশমের রাগ্‌টা টেনে বাসবী শুয়ে পড়ে।

দিনের বেলায় জেগে-জেগেও স্বপ্ন ছাখে বাসবী। কিন্তু তার এই দিবাস্বপ্নও মাঝে মাঝে রামকিষণের ভজন গানে ভেঙে যায় তখন মনে হয় তার জগতে এই হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা কতো বেশি অনাবশ্যকভাবেই প্রক্ষিপ্ত। রামকিষণ অজয়ের বাবার আমলের দরোয়ান। সে সারাদিনই দোরের কাছে টুল নিয়ে ব'সে থাকে, খৈনি টেপে, শব্দ ক'রে তালি দিয়ে দোক্তা থেকে চুন ওড়ায়, ঘুম এলে ভজন ধ'রে নিজের সজাগ উপস্থিতি ঘোষণা করে। তাহোক তবু ওর সঙ্গে ফাই-ফরমাজের অছিলায় যা দু'একটা কথা কওয়া যায় তাতে নিঃসঙ্গতাও কিছুটা দূর হয় অথচ স্বপ্ন দেখার আবেশটুকুও পুরোপুরি কাটেনা।

আর শারী? ওর কথা মনে ক'রেই আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করেনা। উঃ কী নিষ্ঠুর! একটুও কি দয়া-মায়া নেই ওর শরীরে? সেদিনের সেই শারী এমন করলো শেষকালে? এদের বাড়ির বৌ হ'য়ে যখন বাসবী প্রথম এসেছিলো তখন শারী ছিলো কতোটুকু মেয়ে। কী সুন্দর, আর কী রোগা-রোগা—ফ্যাকাশে, ফ্রক-পরা লাজুক মেয়ে! প্রায় একরকম তার আঁচল ধ'রেই ঘুরে বেড়াতো। সেদিনের সেই শারী সব ভুলে যেতে পারলো, আমাদের ছেড়ে যেতে পারলো? উঃ, কী শয়তান তপেশটা! উনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন তপেশকে। শারীর জীবনটা নষ্ট ক'রে তবে ছাড়লে? যা হ'য়ে গেছে তা তো হ'য়েই গেছে তাই ব'লে শারী আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে? কেন, লজ্জায়, ভয়ে? কাকে লজ্জা? উনি কি সেই রকম দাদা? বাসবীর তো মনে হয় যে, আঁচল-চাপা দিয়েই শারীর সব লজ্জা, সব কলঙ্ক সে ঢেকে নিতে পারতো। পৃথিবীতে সভ্যতার শুরু থেকে আর আজো পর্যন্ত এমন অপরাধ কেউ কি করেনি, না ক্ষমা কখনো পায়নি।

এতক্ষণ কল্পনার ব্যারিকেড তুলে নিজেকে যে ঘিরে রেখেছিলো এবার তাতেও যেন হঠাৎ ভাঙন ধরলো; জীবনটা তো আর অখণ্ড একটা স্বপ্ন নয়। ঘটনার দৌরাত্ম্য সহ্য করবার জন্যই জীবন আমাদের কঠোর।

ডাক পিওন না কে যেন দোরে এসে সুর ক'রে ডাক দ্যায়, বড়ো পরিচিত

হ—চিঠ্ঠি। বহুদূর থেকে আসা গানের একটা কলির মতো এর স্বর—নদীর ওপার থেকে কেউ যেন ডাকছে—উৎকণ্ঠার উৎক্ষেপ!

রামকিষণ বেয়ারাটাকে ডেকে কী যেন বলছে—জ্বরের-ঘোরে-শোনা, চাপা, অস্পষ্ট গুঞ্জনের মতো তার কানে আসছে সব। বেয়ারাটা এলো। হাতে ওর কী? ঠিক চিঠির মতো—আরে, চিঠিই যে! লোকটা ছায়ার মতো কী-যেন বলছে, হাত-মুখ নাড়ছে, বাসবীর কানে কিন্তু ঢুকছেনা কিছুই। বেয়ারাটা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা ধরলো তার সামনে। যন্ত্রের মতো বাসবীও নিলো চিঠিটা হাত থেকে। ঠিকানাটা দেখেই মনে হ'লো সতীর হাতের লেখা। খামটা ছিঁড়ে তুললো, সতী লিখেছে:

এ-বাড়ির বর্তমান অবস্থা তোমরা কেউ ভাবতে পারবেনা বাসবীদি। ডাক্তার-বাবুর অতো সাধের হাসপাতাল—তাঁর অনুপস্থিতিতে কী যে হচ্ছে কোনো খোঁজই আর নিতে পারিনে। আজকাল আমার আর হাসপাতালে যাওয়াই হয়না। বাড়ির রুগীকে নিয়েই সময় কাটে। সময়ে সময়ে অসহ্য মনে হয়, ডাক্তারবাবু একি শাস্তি দিয়ে গেলেন আমায়, বলো তো?—আমার ঘাড়ে একি দায়িত্ব চাপিয়ে গেলেন? এই সব ছেড়ে-ছুড়ে যদি কোথাও স'রে যাওয়া সম্ভব হ'তো তবে পালিয়েও যে বাঁচতাম। ভালোয় ভালোয় ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির ফিরে আসুন ওঁর হাতে অদ্রীশবাবুর ভার তুলে দিয়ে আমি এখান থেকে স'রে পড়বো। এ-জীবন বেই আবার নতুন ক'রে শুরু করা যাবে অজানা অচেনা জায়গায়, অনেক দূরে—সেই ভালো, সেই শ্রেয়। কেন, কিসের বন্ধন? যিনি নিজে কোনো বন্ধনকেই স্বীকার করলেননা কোনোদিন, আমাকেই বা তিনি কী ক'রে বেঁধে রাখতে পারেন—সেকি ভেবেও পাওয়া যায়? কখনো কিছু দেননা, কখনো কিছু নেননা, তবু সদাসর্বদা হুকুমে হাজির থাকা চাই—বড়ো অদ্ভুত মানুষ! জীবনের এতোগুলো বছর নষ্ট ক'রেও ডাক্তারবাবুকে আজো ঠিক বুঝে উঠতে পারলুমনা।

যতদিন তিনি নিজের বাড়িতে বড্ডো বেশি প্রত্যক্ষ হ'য়ে ছিলেন ততদিন বোঝাও যায়নি যে, তিনিই ছিলেন এ-সবের মালিক; আজকে তাঁর অনুপস্থিতিতে সেটা বড়ো বেশি ক'রেই বোঝা যাচ্ছে। তাঁর ঘরে আমিও আর ঢুকিনা, ও-ঘর বন্ধই থাকে। খালি বাড়িটা যেন গিলতে আসে। কোথায় পালাই? ছুটে আসি নিজেরই ঘরে। সেখানে অদ্রীশবাবুর প্রলাপ আরো বেশি ক'রে কানে আসে—শেষপর্যন্ত নিজের কাছ থেকে ওঁর কাছে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবো ব'লে মনে হয়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাই ওঁর কাজেই আমার সারাটা দিন কাটে।

আচ্ছা বাসবীদি, ভরসন্ধ্যার আব্‌ছায়ায় একলা দাঁড়িয়ে ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া প্রকাণ্ড একটা দুর্গের চেহারা কখনো চেয়ে-চেয়ে দেখেছো? না যদি দেখে থাকো তো কলকাতায় ফিরলে আমার জায়গায় ব'সে দু'দণ্ড দেখে যেও অদ্রীশবাবুকে, কতো বড়ো মানুষ কী হ'য়ে যেতে পারে! ওঁর কথা ভাবতে গেলে সব কিছুতেই আস্থা হারাতে হয়। এই ধরোনা কালকের কথাই বলছি—বুঝতেই তো পারছো কারো সঙ্গে দু'টো কথা কইবারও উপায় নেই, এ-বাড়ি ছেড়ে কিছুক্ষণ নড়বারও উপায় নেই। রাত্তিরেও ভালো ঘুমোতে পারিনে, তাই কাল দুপুরের দিকে নিজের ঘরে একটু পালিয়ে এসে সবে বসেছি—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে—হঠাৎ পাশের ঘরে জিনিশপত্তর নাড়ানাড়ির শব্দ হ'লো। উঠে তাড়াতাড়ি দেখতে গেলাম, দেখি—অদ্রীশবাবু সমস্ত মালপত্র ঘর থেকে বের ক'রে আনছেন সামনের বারান্দায়। হাতখানা ধ'রে বলি—আরে, আরে, এ-সব কী করছেন আপনি? ছাড়ুন, ছাড়ুন।

কী ভাগ্যি, অদ্রীশবাবু আমায় সঙ্গে জোর করেননা নইলে আমি কি পারতাম ওঁকে সামলে রাখতে? তৎক্ষণাৎ নিজেকে আমার হাতে উনি ছেড়ে দিলেন শুধু সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে বললেন—আগুন। আরে, আগুন লেগেছে নতি! দেখছো না? আমার লেখাগুলো বাঁচাও আগে।

হাত ধ'রে টেনে নিয়ে ওঁকে ফের ঢুকিয়ে দিই ঘরে, বলি—আগুন নিবে গেছে, ভয় নেই, বসুন।

আমার চোখের মধ্যে খানিকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে আমার কথায় বিশ্বাস করার কী যে সূত্র খুঁজে পেলেন জানিনে, তবে আগের চেয়ে কিছুটা শান্ত তবু সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন—অ্যাঁ, আগুন নিবে গেছে? আর, আমার লেখাগুলো বাঁচেনি তো?

সর্বহারার মতো ওঁর দু'টো চোখ দেখে ভারি কষ্ট হ'লো, বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার লেখা বেঁচে গেছে, বেঁচে আছে, থাকবে। অতো ভাবেন কেন লেখা নিয়ে সবসময়ে?

আচ্ছা, তুমিই বলোনা বাসবীদি, কথাটা কি মিথ্যা স্তোক দিলাম? সত্যই যে লেখাগুলোই যা বেঁচে রইলো, মানুষটা আর বেঁচে নেই। কতোটা দুঃখ হয় বলো তো এই মানুষটার জন্য?

তারপর পত্রের শেষাংশে সতী খোঁজ নিয়েছে শারীর, খোঁজ নিয়েছে নিরুদার, জানতে চেয়েছে মসুরীর খবর। উত্তরে কী লিখবে বাসবী? এর জবাব নিতান্ত কি দিতে হ'বে ওকে? সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস উঠে আসে বাসবীর অন্তস্তল ভেদ ক'রে। মনটা আরো কেমন যেন হ'য়ে যায়—বিষণ্ণ স্বপ্নটুকুও যেন ছিঁড়ে

গেছে। তার মনের সাম্‌নে শারী, নিরুদা, এরা যেন ছেঁড়া ছবি—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে তার সাম্‌নে, চারিধারে। আরাম-কেদারার হাতলের বাইরে বাসবীর চিঠি-ধরা হাতখানা এলিয়ে প'ড়ে কেমন যেন একটা অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলতে লাগলো। ওর দিক্‌-ভ্রান্ত দু'টি চোখ জান্‌লার বাইরে গিয়ে কেবলই কী-যেন হারানো জীবন খুঁজে-খুঁজে ফিরছিলো, হয়তো খুঁজছিলো কোথায় শান্তি? শান্তি কোথায়? কোথাও নেই। মেঘ ঘিরে আসছে চারিদিক থেকে। জান্‌লার বাইরে গিয়ে যদিও তার চোখ দেখছিলো কেমন ক'রে পড়ন্ত বেলার ছায়া ক্রমশ বড়ো থেকে আরো বড়ো হ'তে হ'তে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে পাহাড়টাকে কিন্তু তার মন দেখছিলোনা কিছুই। মন বলছিলো: চতুর্দিক থেকে মেঘ যখন উত্তাল হ'য়ে ঘিরতে আসে আকাশকে তখন প্রান্তরের চেয়ে গৃহই ভালো, ভুল কোরোনা বাসবী।

এই প্রথম তার মনে হ'লো যে, এখানে ব'সে-ব'সে একা-একা সে আর বোঝা ঠেলে উঠতে পারছেনা একজন শরিক দরকার। তার মনের একটা অংশ যখন হা-হুতাশ ক'রে বলে—কই, ফিরলোনা তো নিরুদা? কবে ফিরবে? ফিরবেনা কি আর? এই তো সেদিন সে ফিরিয়ে দিলো স্বামীকে নিরুদার পথ চেয়েই।

তখনই আবার মনের আর একটা অনুতপ্ত অংশ বলে—শিগ্‌গির কি আর ফিরে আসবেনা অজ্ঞ? জোর ক'রে তাকে এইবার যাবেনা নিয়ে? এই অরুন্তুদ স্মৃতির কণ্টকশয্যা থেকে, উদ্ধার করবেনা তাকে?

স্বামীর সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যহীনতায় হঠাৎ কেমন যেন তার ভয় হ'লো। ওর দীর্ঘ-বিবাহিত জীবনে স্বামীর জন্য এতটা প্রবল উৎকণ্ঠা এই বুঝি প্রথম অনুভব করলো বাসবী।

বহুদিন হ'লো সে কাউকেই কোনো চিঠি দেয়নি, অজ্ঞকেও না। আজ এতদিন পরে স্বামীকে চিঠি লিখতে ব'সে সে অনুভব করলো বুক তার ফুলে-ফুলে উঠছে ক্রমাগত। এই সঙ্গে সতীর চিঠির জবাবও দিতে হ'বে একটা।

(৩)

বাসবীর দু'দিনের স্বপ্ন বড়ো সহজেই শেষ হ'য়ে গেছে তবু স্বপ্নভঙ্গের আক্ষেপ ঘুচতে চায়না। ভেবে সে নিজেই অবাক্ হয় মাঝখানে এতগুলো বছর নিরুদাকে হারিয়েও কী ক'রে সে সহজ হ'য়ে বাঁচতে পেরেছিলো। এখন কেনই বা সেটা এত অসম্ভব মনে হচ্ছে? থেকে থেকে বড়ো আত্মগ্লানি হয় বাসবীর। জীবনে সে গড়তে পারলোনা কিছুই। নিজের সংসার সে নিজে হাতেই ভেঙেছে; যে-অনিরুদ্ধকে সে এত ভালোবাসে তারই সংসার ভাঙার অপরাধের বোঝাও কি

শেষে তাকেই বইতে হবে? নিরুদার পারিবারিক সুখ ছিলোনা বটে তবুও আজ বাসবীর নিজেকেই নিমিত্ত ব'লে মনে হয়। আত্মগ্লানির দংশন থেকে পালিয়ে বাঁচতে সে ফিরে যেতে চায় ফেলে-আসা ছাত্রীজীবনে। বই আনিয়ে নিয়েছে মঞ্জুভিলা থেকে। সে বই প'ড়েই সময় কাটায়, মনকে ভুলিয়ে রাখে। ব্রাউনিং পড়ে, সুইন্‌বার্ন পড়ে, রসেটি পড়ে, রবীন্দ্রনাথ পড়ে, বৈষ্ণব কবিতা পড়ে, বাকি সময় জানলার বাইরে চেয়ে কাটায়। সর্বদা শুয়ে-ব'সে থেকে-থেকে দিন দুপুরেও এমনই ক্লান্ত লাগে যে, ঘুমিয়ে পড়ে আবার রাত দুপুরেও ঘুম আসেনা, শুয়ে-শুয়ে বিছানায় ছটফট্‌ করে, জেগেই বই প'ড়ে-প'ড়ে রাত কাটায়। তার কাছে দিন ও রাত্রির ঘুম ও জাগরণ, স্বপ্ন-বিভীষিকা, আশা-আশঙ্কা সব কিছু মিলে-মিশে একশা হ'য়ে গেছে! এমন কি দিনের বেলাও জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার কিছু বাধা হয়না বহুবাঞ্ছিত চরিত্র আসে, চিত্র হ'য়ে ওঠে। ঘুম আসে, স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে।

—কে? নিরুদা? উঃ এত দুঃখ তুমি দিতে পারলে আমায়?

কল্পনার অনিরুদ্ধ বাসবীর হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—মাপ করে দেবি, এত দুঃখ আর কখনো দেবোনা তোমায়। এ ক'দিন নিজেও কিছু কম দুঃখ পাইনি তোমার চেয়ে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? সঙ্কোচ কিসের? এসো, বোসো এই বিছানায়, আমার পাশে—ভিনাস্‌ যে অ্যাডোনিসের আসার পথ-চেয়ে-চেয়ে অন্ধ হ'তে বসেছে—নিষ্ঠুর। এখন তোমার আসার সময় হ'লো? এদিক দিয়ে কী ক'রে এলে তুমি, সুন্দর? কী ক'রে এলে তুমি, চোর?

মিট্‌মিটে হাসি ঠোঁটে মেখে অনিরুদ্ধ বললো—চোরই তো! তাই সদর দিয়ে আসিনি আমি, খিড়কি দিয়ে ঢুকেছি তোমার অন্দর মহলে।

মিনতিতে ভিজে উঠে বাসবী বলে—সত্যি বলোনা গো, কোথা দিয়ে এলে? আশ্চর্য তুমি সুন্দর—আশ্চর্য তুমি চোর।

অনিরুদ্ধ আঙুল দিয়ে বাসবীর দুটি স্বপ্নালু চোখের দিকে দেখিয়ে দ্যায়—ঐ যে দুটো পথ-চাওয়া জান্‌লা—ওখান দিয়েই তো এলাম দেখতে পাওনি?

বাসবী বলে—ঐ দু'টি জান্‌লা দিয়েই তো আমি পথ দেখি—অ্যাডোনিসের প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় অপলক হ'য়ে যাই। কই পেলামনা তো দেখতে, চোখে ধুলো দিয়ে কখন তুমি এলে?

অনিরুদ্ধ বাসবীর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসতে-হাসতে বলে—তোমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।

বাসবী বলে—ভালোই হ'য়েছে; চোর তুমি, তোমার জন্য সদর রাস্তা নয়—

খিড়কি দিয়েই তুমি এসো। রাজপথ দিয়ে আসিও না তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর আলোকে। অন্তরের নিভৃতেই তোমার আসন আছে পাতা। বোসো সেখানেই। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কিন্তু চলবেনা আর, বুঝলে চোর?

—বেশ, তাই হ'বে। আর কখনো যাবোনা তোমায় না জানিয়ে।

বাসবীর হাতের কাছে বিছানার প্রান্তে ওর কয়েকখানা প্রিয় কাব্যগ্রন্থ প'ড়েছিলো তা থেকে অনিরুদ্ধ একখানা তুলে নিয়ে বললো—কবিতা পড়া হচ্ছিলো বুঝি?

—নইলে আর কী করবো বলো একা-একা? তুমিও একটু পড়োনা অ্যাডোনিস্, তোমার মুখ থেকে শুনি সুইন্‌বার্নের সুর—

অনিরুদ্ধ পড়ে—

If love were what the rose is,
And I were like the leaf,
Our life would grow together
In sad or singing weather,
Blown fields or flowerful closes,
Green pleasures or grey grief;
If love were what the rose is,
And I were like the leaf.

If I were what the words are,
And love were like the tune
With double sound and single
Delight our lips would mingle,
With kisses glad as birds are
That get sweet rain at noon;
If I were what the words are,
And love were like the tune.

বাসবী বলে—থামলে কেন? বলো, ব'লে যাও···

অনিরুদ্ধ বলে—আমাকে যে এবার যেতে হ'বে। শুনছোনা কাজ ডাকছে?

বাসবী বলে—আর একটু বোসো। এত কাজের মানুষ হ'য়ে গেলে আমার একটুও ভালো লাগেনা কিন্তু।

অনিরুদ্ধ বলে—বেশ, এবার তবে তুমিই কিছু শোনাও। আমি শুনি।

বাসবী হাতের কাছ থেকে আর একখানা বই তুলে নেয়। অনিরুদ্ধ বলে—ও কে ব্রাউনিং বুঝি?

বাসবী বলে—হ্যাঁ। তারপর বহুবার পড়া কবিতাই আবার পড়তে শুরু করে—

Escape me?
Never—
Beloved!
While I am I, and you are you,
So long as the world contains us both,
Me the loving and you the loth,
While the one eludes, must the other persue.

অনিরুদ্ধ বলে—চমৎকার! ঠিক সময়োপযোগী হ'য়েছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে যে তোমার ব'সে থাকা আমার চলাচল। সে হিশেবে তুমি যা বললে সেই আমার জবানী হ'লো যে।

বাসবী বলে—ইস্, ছাই! বাস্তব ক্ষেত্রে তো দেখতে পাই যে, আমার ধ'রে রাখা, তোমার পলায়ন।

—বলো তো কী দেখছি? দেখছি তোমার দু'টি চোখ যা সত্যসত্যই deeper than the depth of water stilled at even.—সেই পথ-চাওয়া দু'টি জান্‌লা যেখান দিয়ে তুমি পথ দ্যাখো, তোমার অ্যাডোনিসের প্রতীক্ষা-প্রতীক্ষায় অপলক হ'য়ে যাও এবং যেখান দিয়ে আমি এখুনি এলাম অথচ তুমি জানতেও পারলেনা যে আমি এসেছি এবং যাবার সময় বার বার ব'লে গেলেও তুমি জানতে পারবেনা যে আমি গেছি। বিদায়, বাসবী!

বাসবীর চোখ চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে খুঁজে-খুঁজে দ্যাখে কোথাও অনিরুদ্ধ নেই অনিরুদ্ধ আসেও নি, অনিরুদ্ধ যায়ও নি, স্বপ্ন স্বপ্নই!

কুড়ানোর ছিলো বাকি ভাঙা পুতুলের অবশেষ

মৃদুলার মাংসবিরল মুখখানাও তখন যেন আশ্চর্য কোমল দেখাচ্ছিলো বাসবীর এমন কি সুন্দরও। যেন একটা থরো থরো বিষণ্ণ ছায়ার পর্দার আড়াল থেকে ব'লে উঠলো বাসবী—তারপর ?

অনেকটা যেন হাঁপানোর মতোই শোনালো ওর প্রশ্নটা।

ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ শেষ ক'রে মৃদুলা চশমার কাচ রুমালে মুছতে মুছতে বললো—বুঝেছো বোধহয় এতক্ষণ যেটাকে দুর্ঘটনা ব'লে উল্লেখ করছিলাম, আসলে সেটা কোনো দুর্ঘটনা নয়—জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েই মেয়েটা এ-রকম নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে নষ্ট করলো।

এ-জায়গায় আবার একটু বিরাম নিলো মৃদুলা। তখন বাসবী যেন আর কাছের মানুষ নেই। এতক্ষণ এতখানি বিবরণ দেওয়ার পরেও মৃদুলার সন্দেহ ঘুচলোনা যে, তার পাশে কেউ জেগে রয়েছে কিনা কিংবা যাকে লক্ষ্য ক'রে সে এতক্ষণ এত কথা ব'লে গেলো একবর্ণও তার শ্রুতিগোচর হ'য়েছে কিনা।

একবার কেসে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মৃদুলা আরম্ভ করে—তোমাকে জানাবার এই অপ্রীতিকর কর্তব্যটা কেন জানিনা অজুবাবু আমার ওপরে দিলেন, বললেন—বাসবীর কাছে আপনি যান। মনে হ'লো এ-রকম দুঃসংবাদ নিয়ে তোমার কাছে আসার অপ্রীতিকর দায়িত্বটা উনি এড়াতে চাইছেন। আমিও ভেবে দেখলাম যেহেতু আমিই এ-ব্যাপারে প্রধান সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী, আমারও আসা কর্তব্য। তাই আমিও রাজী হ'য়ে গেলাম আসতে। তা'ছাড়া আরো কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে ওঁর আসতে কিছু দেরিও হ'তো। তাই আমাকেই আসতে হ'লো। আসবো কি আসবোনা এটুকু ঠিক করতেই দিন দুই কেটে গেলো কিন্তু শেষপর্যন্ত শারীর শেষ ইচ্ছাই জয়ী হ'লো। ওর শেষ ইচ্ছা ছিলো জিনিশগুলো একেবারে তোমার হাতেই যেন পড়ে।

ব'লে মৃদুলা একটি এ্যাটাচি কেস্, একখানি ছোরা, একটি ফাউন্টেন্ পেন আর ডায়েরিখানি বের ক'রে বাসবীর সাম্‌নে টেবিলের ওপর রাখলো একে একে।

স্বপ্নের ভেতর থেকেই যেন হাত বাড়িয়ে দিলো বাসবী ডায়েরিটার ওপর তারপর মৃদুলা কী-যে বলছে, সেগুলো মামুলি সান্ত্বনার কথা কিংবা কোনো মূল্যবান সংবাদ কিংবা এখনো সে ব'সে আছে কি বিদায় নিয়ে চ'লে গেছে, কিছুই আর তার খেয়াল রইলোনা।

সে ততক্ষণে ডুবে গিয়েছিলো ডায়েরির পাতায়, দুর্বার ঘটনার রোমাঞ্চকর টানে; ভেসে যাচ্ছিলো রক্ত-জমা তুষার-স্রোতের দৃকপাতহীন নিষ্ঠুরতায়, দুর্নিবার নিষ্করুণ নিয়তির ক্রীড়াবর্তে। চেতনার তটশিলায় ঠেক খেয়ে যে-মুহূর্তে সে পরিপার্শ্ব-সচেতন হ'য়ে উঠলো, দেখলো পাশে মৃদুলা নেই, কখন চ'লে গেছে বিদায়-সম্ভাষণ কি একটুখানি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন কি একটুখানি ভদ্রোচিত ধন্যবাদও জানানো হয়নি ওকে।

বুকের পাঁজরের উষ্ণ অবরোধে লম্বা একটা নিশ্বাস চেপে নিতে-নিতে বাসবীর মন যেন বারে বারেই বলছিলো—'একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন কোথায়? কখন? দীর্ঘ দিগন্তের ফাঁক দিয়ে যেন এখনো উঁকি মারছে সেই মুখ—একটি মুখই ভেঙে গিয়ে যেন ছড়িয়ে আছে সবখানে—পর্বতসানুর বিসর্পিত পথে পথে, জানলায়, আকাশে।

এই তো ক'দিন আগেও শারী রোজ সকালে-বিকালে ও বাড়ি থেকে এখানে এসে তাকে পেড়াপীড়ি ক'রেছে আবার 'মঞ্জুভিলা'য় ফিরে যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি, ভর্ৎসনা-শ্লেষ সব কিছুই ব্যর্থ হ'লে পর শেষে আবার একাই ফিরে গেছে 'মঞ্জুভিলা'য়। গিয়ে দাঁড়িয়েছে 'মঞ্জুভিলা'র সেই দূরের জান্‌লাটায় যেখানে এক সময়ে বাসবীও দাঁড়াতো এ-বাড়ির অনিরুদ্ধকে জান্‌লায় পাবার জন্যে ইদানীং বাসবী অনেকখানি সহানুভূতির সঙ্গেই বুঝতে পারতো যে, শারী এখন বড্ডো একা এবং সেও হয়তো এখন বাসবীকে কাছে পেতে চায়, প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতো শারীর নিঃসঙ্গতা কিন্তু কে আর জেনেছিলো যে এ-জীবনের মতো শারীকে কাছে-পাওয়া আর ঘটবেনা কখনো। এতদিন হাসি-তামাশায়, বিদ্রূপে বেদনায়, মানে-অভিমানে যে-শারী তার কাছে প্রতিদিনকার সত্য ছিলো সে আজ সহজ প্রত্যয়েরও বাইরে, ছায়ার চেয়েও ছায়া হ'য়ে গেছে!

কয়েকদিন পর বাসবীর নামে চিঠি এলো একটা। হাতের লেখাটা দেখামাত্র বাসবীর মন যেন লাফ দিয়ে উঠলো—নিরুদার চিঠি, তাহলে আছে? নিরুদা আছে? নিরুদা যে আছে বাসবীর কাছে এই সংবাদটুকুই যথেষ্ট! যেখানে থাক, ভালো থাক। বাসবী কম্পিত হাতে খামটা ছিঁড়লো, অনিরুদ্ধ লিখছে:

বাসবী, আর কতোদিন মসুরীতে থাকবে? প্রকৃতির প্রয়োজনে, নিসর্গ নিয়মে, ঋতুর রঙ্গে মসুরী এবার ক্রমশ ক্রমশ আরো বদরং হ'য়ে যাবে—ওখানে তোমায় আর মানায়না। তুমি ফিরে চলো কলকাতায়। কলকাতার রং ফিকে হয়না কোনোসময়েও। বসন্তের কোকিল বসন্ত ফুরোলে শীতের তুষারে বাসা নেয়না; শীতের দেশই ছাড়ে। তবে তুমি কেন মসুরীর পাহাড় কামড়ে প'

থেকে স্বভাবের বিরুদ্ধতা করছো? আমার কথা শোনো, তুমি কলকাতায় চলো; ওখানেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের জন্য তুমি ভেবোনা—মলয়া ভালো আশ্রয়ই পেয়েছে। ওর জন্য চিন্তার কিছু নেই।

যদিও তোমাদের কাছ থেকে দূরে তবুও তোমাদের সব খবরই আমি রাখি। শারীর ব্যাপারটা যতোই মর্মন্তুদ হোকনা কেন এটাও তো অসত্য নয় যে, সব শোকই দু'দিনের—কিন্তু জীবনের আবেদন চিরদিনের। তাই মানুষকে শোক ভুলতেই হয়; তুমিও ভুলতে চেষ্টা করো। এখন থেকে মসুরীর নিঃসঙ্গতা আর তোমার মনকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার পক্ষে অনুকূল নয়। আমি যতোদূর জানি, অজবাবু মসুরী যাচ্ছেন দু'চার দিনের মধ্যেই। একান্ত আশা ও অনুরোধ করি যে, তুমি ওঁর সঙ্গে কলকাতায় শিগ্‌গির ফিরে যাবে।

আমি উপস্থিত আগ্রায় এসেছি কয়েক দিনের জন্য। পথে একদিন অজবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। আলাপ হ'লো। এমন প্রাণ-খোলা আলাপ ওঁর সঙ্গে আমার এর আগে কখনো হয়নি। ওঁকে দেখে কষ্ট হ'লো। শারীর প্রতি ওঁর মনে ক্ষমা ও সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু নেই। ওঁর প্রতিটি কথায়ই বোঝা যায় যে, শারীকে উনি কতোটা বেশি ভালোবাসতেন অথচ সে-দুর্বলতাটুকু অন্যের কাছে পাছে প্রকাশ পায় সেজন্য সদাসর্বদা কতো সতর্কতা! নিজে সৎ থেকেও অন্যের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা সম্বন্ধে এতটা সহানুভূতি-সম্পন্ন, উদার ও ক্ষমাশীল মানুষ খুবই কম পেয়েছি জীবনে। এতটা সজ্জন ব্যক্তিই যে আরেক দিকে এতো বড়ো ধুরন্ধর ব্যবসায়ী—সেকথা ভাবতেও অবাক লাগে ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বুঝতে পারি যে, ব্যক্তিকে দেখে ব্যক্তিত্ব চেনা কতোটা দুষ্কর।

এইবার একটা খবর তোমাকে দিই—জানিনা খবরটা তুমি জানো কিনা—তপেশ ধরা পড়েছে। অজবাবুর এখানে এসে এতদিন থাকা, এতো কষ্ট, এতো শ্রম-স্বীকার করা, এতো অর্থব্যয় করা ব্যর্থ হয়নি। তপেশের মতো ধূর্ত লোকও ভগবানের ন্যায়ের দণ্ড এড়াতে পারলোনা। তপেশের মামলার শুনানি কাল থেকে হ'বে একথা অজবাবুর মুখে শুনে যদি সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় ভেবে আমি স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হই। সবে তখন তপেশের বিচারের শুনানি শুরু হ'য়েছে। তপেশ মাথা হেঁট ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, ওর মুখে তখন আর সেই স্বভাবসিদ্ধ শঠতার হাসি নেই। এমন সময়ে হঠাৎ একটি অপ্রকৃতিস্থ মেয়ে ব্যস্তভাবে কোর্ট-রুমের মধ্যে এসে ঢোকে। বিচারকের এজলাসের দিকে গিয়ে বিচারককে লক্ষ্য ক'রে কী-যেন বলে, জুরিদের সম্বোধন ক'রেও কী-যেন বলে

ভালো বোঝা গেলোনা—সঙ্গে সঙ্গে গুলি তিনটি শব্দ! শাড়ির মধ্যে রিভলভার প্রচ্ছন্ন ক'রে এসেছিলো মেয়েটি, তপেশকে লক্ষ্য ক'রে তিনটি গুলি ছোঁড়ে, একটিও ব্যর্থ হয়নি। তপেশ তৎক্ষণাৎ কাঠগড়ার ওপর প'ড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

তপেশকে হত্যা ক'রে মেয়েটিও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো কিন্তু পারেনি। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে কিংবা ইচ্ছে ক'রেই ধরা দ্যায়। সে পালাতে চেষ্টা করেনি তারপর পুলিসের কাছে সে যা জবানবন্দী দিয়েছে তাতে তপেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। অজবাবুর কাছে সব ভালো ক'রে শুনতে পাবে। মেয়েটির নাম সোনালি সমাদ্দার।

আমি এখন কলকাতার দিকেই যাচ্ছি। যাবার আগে তোমাকে ডাক দিয়ে যাই—কলকাতায় চলো। কলকাতা তোমার প্রতীক্ষা ক'রে আছে, আমি ডাকছি, কলকাতা ফিরে যাবার আবেদন নিয়ে অজবাবু তোমার কাছে যাচ্ছেন। আশা করি দু'চার দিন পরেই তোমাকে কলকাতায় পাবো।

স্বভাবের যে-প্রাণনশীলতার জন্য তুমি প্রাক্-তিরিশে পৌঁছেও সতেরোর প্রান্ত আজো ছাড়োনি, যে-প্রাণনশীলতার জন্য তুমি অনন্যভাবেই তুমি, আপন নিজস্বতাতেই বিশিষ্ট—তোমার স্বভাবের সেই প্রাণনশীলতাই তোমাকে আবার তোমার স্বধর্মে, স্বস্থতায় ফিরিয়ে আনবে—এটাই আমার স্থির বিশ্বাস, এটাই আমার একান্ত কামনা—এর বেশি কিছু সম্ভাষণ কলকাতায় গেলে দেবো। মসুরীর কৃচ্ছ্রসাধন তোমার জন্য নয়, আত্মবিস্মৃত হয়োনা। —অনিরুদ্ধ

এরই দিন দুই পর অজ এলো। গত দু'দিনের মধ্যেই যেন কী মন্ত্রবলে আবার বেশ কিছুটা সজীব হ'য়ে উঠেছে বাসবী। সে হাসিমুখেই গিয়ে অভ্যর্থনা করলো অজকে। আর্ত, ক্লান্ত স্বামীর মানসিক অবসাদ সে যেন নিজের বেদনা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো, বুঝলো স্বামীর দুঃখ; সেদিন সারাদিন ধ'রেই স্নিগ্ধ মমতায়, সদাজাগ্রত সেবায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো স্বামীকে।

কলকাতায় যাবার প্রস্তাব বাসবীর কাছে করি-করি ক'রেও এতক্ষণ করেনি অজ। বাসবী এবার নিজে থেকেই বললো—আমায় এবার কলকাতায় নিয়ে চলো। আর ভালো লাগছেনা এখানে।

মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেলো দেখে অজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো, বল্লো—বাঃ, এই তো সুবুদ্ধি হ'য়েছে! তোমার ভাবগতিক দেখে শুনে আমি তো প্রায় ঠিক ক'রেই ফেলেছিলাম যে, আপাতত সব কাজ-কর্ম ছেড়ে ব্যবসা আপিস

গুটিয়ে এখানেই চ'লে আসবো যে-পর্যন্ত তোমার মন না বদলায়। যাক্ মন যখন বদলেছে তখন আর দেরি নয়। কালকের মধ্যে গোছ-গাছ সেরে নিতে পারবে তো?

বাসবী বলে—গুছিয়ে কেন নেওয়া যাবেনা? সবে ট্রেন-জার্নি ক'রে এলে—দু'একদিন বিশ্রাম ক'রে গেলে ভালো হয়না? এখনকার এই মৃদু শীতটা তো তোমার পক্ষে ভালোই হ'বে। তোমার জন্যই এখানে আসা অথচ ছাখো এসে কেবল কষ্ট ছাড়া আর কিছুই তোমার ভাগ্যে জোটেনি।

অব্জ একটুখানি বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলে—এতো সবের পরেও মসুরী আমার পক্ষে ভালো হ'তে পারে একথা বিশ্বাস করাও শক্ত।

বাসবী বলে—মিছে জায়গার দোষ দিয়ে কী হ'বে? ঘটনাচক্রের দোষ দাও।

অব্জ বলে—যে ঘটনাচক্রের কথা তুমি বলতে চাইছো সেটাও তো এই জায়গাকে কেন্দ্র ক'রে তবে ঘুরতে পেরেছিলো—একথাও তো মানতে হ'বে।

—তাহ'লে কি তুমি বলছো কালকেই রওনা হ'তে?

—কালকেই চেষ্টা করতে হ'বে, নাহয় পরশু। গুছিয়ে নিতেও তো কিছু সময়ের প্রয়োজন।

—বেশ তো তাই হবে'খন। আজ এখ্খুনি তো আর ট্রেন ধরতে হ'চ্ছেনা। আপাতত আমাদের বিকেলের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

অব্জের কাছ থেকে একটু বিরলে যেতেই বাসবীর মনে হ'লো সত্যিই সব কিছু সত্ত্বেও যেন তার মসুরীর ওপর মায়া প'ড়ে গেছে। যে-দিকেই চোখ ফেরানো যায় এই যে পাহাড়, নিরুদার এই যে ছোট্টো ঘরোয়া বাড়িখানি—ঐ যে দূরের মঞ্জুভিলা—ঐ যে উচ্চাবচ সর্পিত পথ—নানারকম সুখে-দুঃখে জড়ানো মসুরীর এই যে কটা মাস—এ যেন তার আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছে। এই মসুরী এক হাতে তার কাছ থেকে নিয়েছেও যতো অন্যহাতে দিয়েছেও কম নয়। সত্যি, মায়া প'ড়ে গেছে জায়গাটার ওপর।

রাত্রের খাওয়া ওদের শেষ হ'য়ে গেছে বহুক্ষণ। বাসবী তখন পাশের ঘরে। দু'টি ঘরের মাঝেকার খোলা দরোজা দিয়ে দেখা যায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরের প্রায় সবটাই। কলকাতায় যাবার জন্যে গোছানো শুরু ক'রে দিয়েছে বাসবী। বাসবীর এক একটা ট্রাঙ্কের এক একরকম গন্ধ। এই সব গন্ধগুলো অব্জের কতো পরিচিত! ঝাঁঝালো ন্যাপ্‌থ্যালিনের সঙ্গে মেশা নানারকম প্রসাধন সামগ্রীর মিশ্র গন্ধে ঘর ভ'রে গিয়েছে। রাত বোধহয় বারোটাও হ'তে পারে। খাটের

বাজুতে হেলান দিয়ে ব'সে-ব'সে অজ লক্ষ্য করছিলো বাসবীর ব্যস্ত আনাগোনা আর শাড়ি, শাল, গাউন, কার্ডিগান, ব্লাউজ, পেটিকোট, স্কার্ট, আণ্ডারশর্ট, ব্রেসিয়ারের স্তূপের মধ্যে ডুবে গিয়ে হিম্‌সিম খাওয়া। অজর ক্লান্ত শরীরে আলস্য—চুড়ির রুনুঝুনু আসছে কানে ঘুমের ঘুঙুরের মতো। চোখ বুজে আসছিলো অজের। এমন সময়ে বাসবী পাশের ঘর থেকে উঠে এ-ঘরে এসে অজকে বললো—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে যে! ভালো ক'রে শোও না।

বাসবী হাতের চাপে বালিশটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিভাঁজ মসৃণ ক'রে দিতে-দিতে জিগেস করে—এতেই শীত ভাঙবে, না আরো কিছু দেবো?

অজ সটান হ'য়ে প'ড়ে পশমের রাগ্‌টা গায়ে টেনে নিতে-নিতে বলে—আর কিছু দরকার হ'বেনা। তুমি যাও। যে-ভাবে জিনিশপত্তর কাপড়-জামা ছড়িয়েছো তাতে তো তোমার সারা রাতটাই কাবার হ'য়ে যাবে এগুলো গুছিয়ে তুলতে। অতো বেশি রাত কোরোনা। আজ সারাদিনই খাটছো।

বাসবী বলে—না, আমি তো আর দেরি করবোনা। ওসব যেমন আছে তেমনই ছড়ানো থাকবে, দোর-টোরগুলো খালি ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে আসছি।

দরোজাগুলো ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে ঘরে তালা লাগিয়ে আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে বাসবী শুতে এলো।

—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো?

—না। কেন?

শেষ আলোটি নিভিয়ে বাসবী উঠে বসলো শয্যায়। আর সেই সঙ্গে একটা সুগন্ধ অন্ধকারে যেন ঢাকা পড়লো অজ। অন্ধকারের বিবর থেকে ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্যাঁতে মসৃণ সর্পিণীর নিশ্বাসের মতো ওর ফিস্‌ফিসানি অজের মগজ থেকে ঘুম তাড়ালো। কতো বছর আগেকার উচ্ছলিতা বাসবীকে আবার যেন ফিরে পাওয়া গেলো।

বাসবী বল্লো—তাহ'লে কাল আর যাওয়া সম্ভব হ'চ্ছেনা, তাই নয়?

—সে তো নয়ই।

—কালকে তাহ'লে সকালে কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোনো যাবে, কেমন?

—বেশ, যেও'খন।

—কোথা যাওয়া যায় বলো তো?

—তুমিই বলো কোথায় যেতে চাও?

একটু চুপ ক'রে থেকে বাসবী বলে—এমন কোনো জায়গায় যেখানে কারো

সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবেনা, যেখানে লোকালয় নেই, বসতি নেই, যেদিকে চাইবো দেখবো পাহাড়, পাহাড়ী পথ. আর পাহাড়ী গাছ! ক্যাম্পটি ফল্‌সের দিকে চলোনা। এ সময়ে সেখানে কেউ যায়না।

—ক্যাম্পটি ফল্‌স্? সে তো অনেক দূর।

বাসবী বলে—দূর ব'লেই তো ভালো।

অজ জিগেস করে—কেন, ক্যাম্পটি তুমি ছাখোনি?

বাসবী বলে—আমি দেখলেই বা তুমি তো আর ছাখোনি। আমি বলছি দেখো তোমারও ভালো লাগবে খুব। কী সুন্দর নির্জন!

—কিন্তু বেড়ানোরও বিপত্তি আছে, বাসবী। আমি শুনেছি ডাকাতি হয় ক্যাম্পটির পথে।

নিরীহ কথা, নিরীহভাবেই বলেছে অজ তবু বাসবী কেমন যেন চমকে ওঠে শুনে। এই নিরীহ কথার মধ্যেও তার জীবনের সব চেয়ে গোপন কথাটি নিয়ে একটি খোঁচার কল্পনা যেন মনে আসে। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রেই থাকে, কিছুই বলতে পারেনা। তারপর সে যেন জোর ক'রে মন থেকে উড়িয়ে দিতে চায় কথাটা, বলে—আহা, আমি যেন খুকী যে তুমি জুজুর ভয় দেখাচ্ছো।

অজ বলে—খুকী নয় ব'লেই তো।

অন্ধকারে দেখা যায়না কিছুই তবু বাসবীর মনে হয় অজ যেন হাসছে।

বাসবী বলে—আহা, তুমি যেন কতো কী সোনা-দানা নিয়ে যাচ্ছো সঙ্গে যে ডাকাতি হ'বে।

অজ বলে—সোনা নয়, সোনার চেয়েও দামী জিনিশ নিচ্ছি যে সঙ্গে।

—সে ছোঁবেও না কেউ। তার জন্যে অতো আর দুর্ভাবনা কোরোনা বাপু, চুপ করো।

বাসবী তার সুগন্ধি-মার্জিত উষ্ণ হাতের তালু অজের ঠোঁটের ওপর রাখে। অজ বাসবীর হাতখানাকে ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বুকের ওপর নিয়ে বললো—ছোঁ'য় বৈকি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজো পর্যন্ত জগতে এর খদ্দেরই তো বেশি। সকলেই তো আর আমার মতো বোকা নয় যে জীবনভর শুধু সোনাই চিনবে আর সোনা-সোনা ক'রে শেষটা মাটি হ'য়ে যাবে। জগতের দিকে যতোই তাকাচ্ছি দেখছি এখানে বুদ্ধিমানের সংখ্যাই আশ্চর্য রকম বেশি। তুলনায় নিজেকে নেহাৎ স্থূল, নেহাৎ নিরেট মনে হয়।

বাসবীর যে-হাতখানা এতক্ষণ অজের বুকের ওপর ছিলো সেখানায় একবার একটুখানি চাপ পড়ে আর সেই সঙ্গে অনুভব করতে পারে যে, একটা সুদীর্ঘ শ্বাসে

অজের বুকখানা বারেকের জন্য স্ফীত হ'য়ে উঠেই আবার শূন্য হ'য়ে যায়। বাসবী চুপ ক'রেই থাকে।

অজ বলে—চুপ ক'রে আছো কেন? তুমিই বলো, মিথ্যে কি কিছু বলেছি? সোনা আগ্‌লাতেই কি দেউলে হ'য়ে যাইনি আমি? আজীবন সোনা-সোনা ক'রেই শেষটায় এমন মাটি হ'য়ে গেলাম।

বাসবী ব'লে উঠলো—সোনা-সোনা ক'রে মাটি তুমি হওনি তো, একেবারে সোনাই হ'য়ে গেছো—খাঁটি সোনা। একটু খাদ মিশলেই বরং ভালো হ'তো, মূল্য একটু কমতো বটে কিন্তু ব্যবহারযোগ্য হ'তো। বেদীতে চড়িয়ে পূজো করলেই মনে হ'তোনা যে কর্তব্য এখানেই শেষ হ'লো; আরো কিছু থাকতে দেবার। সেজন্য নিশ্চয়ই তোমাকে দোষ দেওয়া যায়না, নিজেকেই ধিক্কার দিই শতবার। কেন আমি এই স্বর্ণ-বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। কেন সেই শক্তি নেই আমার কিংবা যদিও কিছু থেকে থাকে তো কেন সেই শক্তির অনেকখানিই অপচয় ক'রে ব'সে আছি অনেক আগেই।

অজ বলে—আমাকে সোনার পুতুল বানিয়ে তোলাই কি তোমার সুখ বাসবী?

বাসবী বলে—সুখ নয়, সুখ নয়, বেদনা। আমার বলার কথা তুমি বোঝোনি ঠিক—কেউই বোঝেনা। দোষে-গুণে রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষ যেমন হয় তা-ই যদি তুমি হ'য়ে উঠতে তো যে-কোনো মেয়েকে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারতে। আর তোমার সুখ দেখে আমিও সুখী হতাম, অনুতাপও কাটতো। কিন্তু তা' তো তুমি হওনি—তোমার জন্য দুঃখ হয়…এমনই সৎ তুমি! এই সততা, এই নিষ্ঠা, এতো সহ্য, এতো ধৈর্য আর পারিনা সইতে। কেন? কেন তোমার সুখ-শান্তি, তোমার প্রয়োজনের জন্য আজো তুমি একান্তভাবে আমারই ওপর নির্ভর ক'রে আছো—এই কথা যখন ভাবি তখন কী-যে আত্মগ্লানি হয় তা তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারবেনা।

অজ আর থাকতে পারেনা, ব'লে ওঠে—আঃ, এ কী বলছো? থাক্‌, চুপ করো এবার—অনেক হ'য়েছে। শান্ত হ'য়ে ঘুমোও, রাত অনেক হ'লো।

—তা হোক। আত্মগ্লানিই আমার প্রায়শ্চিত্ত…সেই প্রায়শ্চিত্তই আমাকে এবার করতে দাও।

—প্রয়োজন নেই; দোষ তুমি করোনি কিছু, অধীর হ'য়োনা অতো…

বাসবী শোনেনা তবু, স্বামীর পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে; অন্ধকার আর্দ্র হ'য়ে ওঠে বাসবীর চোখের জলে।

অজ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাসবীকে তুলে নেয়, বলে—অমন করেনা, ছিঃ

তুমি যে আমার লক্ষ্মী। শুধু শুধু নিজেও এতো কষ্ট পাচ্ছো, আমাকেও এতো কষ্ট দিচ্ছো কেন বলো তো?

বাসবী বলে—আর করবোনা। তুমিই এবার ব'লে দাও আমি কী করবো?

অজ বলে—আমি কিছুই বলবোনা। এবার থেকে তোমার মনই তোমাকে ব'লে দেবে সব।

ক্যাম্পটির কাছ থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে পরের দিনই যখন বাসবী কলকাতার গাড়ি ধরবার জন্যে মোটরে গিয়ে উঠলো তখন তার মনে হ'তে লাগলো যেন পাহাড়ের পাঁজর থেকে কান্নার মতো আওয়াজ উঠে চাকায় চাকায় জড়াচ্ছে! সঙ্গের অধিকাংশ মালপত্রের পরতে-পরতে শারীর স্মৃতির সুরভি জড়ানো। রোদের কান্নায় যেন পিছনে ফিরবার মিনতি। অজ রয়েছে পাশে তবু থেকে-থেকে যেন চমকে ওঠে বাসবী। মনে হয়, সে যেন চলেছে একা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চিরকালের জন্যে। পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে ঢালু পথে মোটর যেন বড্ডো বেশি গড়ায়। বারে বারে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়, বারে বারে চমক লাগে—কার যেন আর্তস্বর মোটরের পিছন পিছন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে—একা একা কোথা যাও বৌদি আমায় ফেলে?

কী-যেন ভাবতে-ভাবতে অজ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো, বাসবী ব'লে উঠলো—তুমি তো তবু নিজের কাজ নিয়ে মেতে থাকতে পারবে, আমি কী নিয়ে থাকবো? কলকাতার বাড়ির জগদ্দল ভারের তলায় এবার থেকে কেমন ক'রে আমার দিন কাটবে—যে-দিনগুলো এতকাল তুচ্ছ সব আদরে-আবদারে, মানে-অভিমানে, হাসি-ঠাট্টায়, ঝগড়া-খুনসুটিতে শারী ভরিয়ে রাখতো? বলো, আমি এবার কী করবো?

একটু ভেবে নিয়ে অজ বললো—দিনকতক একটু কষ্ট হ'বে বৈকি। তুমি সাহিত্য ভালোবাসো সাহিত্য নিয়েই দিন কাটিও, নিজেকে ভুলিয়ে রেখো। ভেবেছি তোমায় একটা কাগজ ক'রে দেবো। কাগজ মানে, সাহিত্য-পত্রিকা।

বর্ধমান জেলার অখ্যাত একটি গ্রামে আজ মাস দুই হলো এসে রয়েছে রঙ্গিলা। যে বাংলো-ধরনের বাড়িটায় গ্রামের জমিদারবাবুদের দাতব্য ঔষধালয় ছিলো তারই গোটা দুই শূন্য ঘরে সে থাকে এবং গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের জুটিয়ে নিয়ে একটা অবৈতনিক পাঠশালাও খুলেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের ধ'রে ধ'রে এনে ক্লাস করে। আবার পড়ানো শেষ হ'লে নিজে তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসে। তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সে এখন রাঙাদি ব'লেই পরিচিত। এই অল্পদিনের মধ্যেই রাঙাদিকে ওরা শুধু যে ভালোবেসে ফেলেছে তাই নয়, সকলেই তার খুব বাধ্য এবং তাকে বেশ মান্য ক'রে চলে।

এদের নিয়ে একদিন সে দুপুরে ক্লাস ক'রছিলো, এমন সময়ে খুব চেনা গলার ডাক এলো বাইরে থেকে। তখনই সে বেরিয়ে এসে দেখলো নিখুঁত একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের ছদ্মবেশ নিয়ে বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়—হাসলো তার দিকে চেয়ে। পলকে উলসিয়ে উঠলো রঙ্গিলা—এতদিনে খেয়াল হ'লো? খবর ভালো তো? কিছুদিন যাবৎ কোনো খবর পাচ্ছিলামনা—ভাবছিলাম যে।

বন্ধু বলে—সবই শুনবে—দেখছো তো পাল্কিটা দাঁড়িয়ে আছে?

রঙ্গিলা বলে—ওমা তাইতো! পাল্কিতে কে এলো?

সহাস্যে বন্ধু বলে—তোমার জন্যে একটি সঙ্গী জুটিয়ে এনেছি। তাতে তোমার কাজ অবশ্য একটু বাড়বে—তার আর উপায় কী? আগে অতিথিকে অভ্যর্থনা ক'রে আনবে চলো।

বন্ধুর সঙ্গে পাল্কির দিকে যেতে-যেতে রঙ্গিলা বলে--অতিথিটি কে শুনি?

বন্ধু বলে—সঙ্গে মলয়াকে এনেছি। মলয়া বললে হয়তো চিনবেনা তুমি। মলয়া হচ্ছে অনিরুদ্ধের স্ত্রী—বিখ্যাত সাঁতারু অনিরুদ্ধ ভট্টচায্যি—সেই যে বিরুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সেবার পুরী গিয়ে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম।

রঙ্গিলা বলে—ওহো! বুঝেছি, আর বলতে হ'বেনা। তোমার কাছেও শুনেছি ওঁদের কথা, তাছাড়া কমরেডের কাছেও শুনেছি। শুনেছিলাম ওঁর স্ত্রী নাকি পঙ্গু।

বন্ধু বলে—হ্যাঁ তাই। প্রদোষের কাছে শুনেছো বোধহয়? অনিরুদ্ধের খবর প্রদোষ তো রাখবেই। অনিরুদ্ধ আর প্রদোষ যে বাল্যসঙ্গী। অনিরুদ্ধ যদিও প্রদোষের চেয়ে বছর কয়েকের ছোটো তাহ'লেও একই সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে একই স্কুলে প'ড়ে ওদের শৈশব কেটেছে।

পাল্কির দোরে এসে বন্ধুর পাশে দাঁড়ালো রঙ্গিলা। মলয়ার মুখখানি তার ভালোই লাগলো। যতোটা ভালো লাগতে পারে গত সন্ধ্যায় ছেঁড়া মল্লিকা-কলিকে পরদিবসের প্রখর দ্বিপ্রহরে—কুণ্ঠিত, ম্লান, বিষণ্ণ!

—পথশ্রমে খুব বেশি কষ্ট হয়নি তো?···রঙ্গিলা উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলো মলয়াকে।

—না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়। কষ্ট একটু হ'লোই বা! এই সব কষ্টকে এড়াতে গিয়েও এতদিন কম কষ্ট ভাগ্যে জোটেনি। আপনাদের আশ্রমে শেষপর্যন্ত যে ঠাঁই পেয়েছি কষ্টের মধ্যে সেখানেই তো সুখ। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ বন্ধুদার কাছে, কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। শুনছি এখানে সবাই আপনাকে রাঙাদি বলে—আমিও ঐ ব'লেই ডাকবো আপনাকে। কী বলেন?···মলয়ার আশ্চর্য চোখ দুটি নিবদ্ধ হয় রঙ্গিলার মুখের ওপর।

রঙ্গিলা বলে—আচ্ছা তাই হ'বে। অনিরুদ্ধবাবু কোথায় এখন, কবে আসছেন এখানে?

মলয়া চুপ ক'রে থাকে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চায়।

রঙ্গিলার প্রশ্নের জবাব দিলো বন্ধু—এখুনি তার এখানে আসার প্রয়োজন তো নেই। সে তো আমাদের সঙ্গে আসেনি, তবে সঙ্ঘে আসতে চায়। অবশ্য শিগ্‌গির হোক, দু'দিন বাদে হোক, আসবেই সে। আমি যতোদুর দেখলাম অনিরুদ্ধ মানুষটা নির্ভরযোগ্য, তাই তো ওকে এভাবে নষ্ট হ'তে দিতে পারলামনা। সঙ্ঘে এখন কর্মীর অভাব—তৈরি ক'রে নিলে ওর দ্বারা ভালো কাজ পাওয়া যাবে।

তারপর মলয়ার দিকে ফিরে বন্ধু বলে—অবশ্য তোমার কাছে এখন তোমার স্বামীর দোষ ত্রুটি দুর্বলতাগুলো বড্ডো বড়ো হ'য়ে দেখা দিচ্ছে কিন্তু আসলে সেগুলো অতোটা নয়। এখন ঠিক ওকে বিচার করতে পারবেনা। দু'দিন যাক্।

তারপর বন্ধু ওদের পারিবারিক অশান্তি, দুঃখ-দুর্ভাগ্যের বিবরণ সংক্ষেপে দিতে দিতে বাড়ির ভেতর ঢোকে। সেই সঙ্গে রঙ্গিলার ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে মলয়াকে আসতে দেখে বন্ধু ব'লে ওঠে—উঁহুঁ, হ'লোনা, হ'লোনা।

রঙ্গিলা ভুরু তুলে বলে—কী? কী হ'লোনা?

বন্ধু বলে—মলয়াকে তুমি ছেড়ে দাও, রঙিল। ও আপনি হাঁটুক। এতোদিন নিরুর ওপর ভর দিয়ে-দিয়ে বোনটি আমার চলাও ভুলে গেছে। এখানে এসে ওকে সেটাই আবার অভ্যেস করতে হ'বে। খঞ্জকে যষ্টি দেওয়ার চেয়ে খঞ্জতা নিরাময় করাটাই বেশি কাজের।—মনে রেখো কথাটা।

লজ্জিত সঙ্কুচিত অধোমুখ মলয়ার দিকে চেয়ে বন্ধু বলে—তুমি এমন কেন

বোন! একটু ফুর্তি আনো মনে। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াও। সর্বদা মাথা হেঁট ক'রে থাকো কেন বলো তো? মনে হয় লক্ষ্য তোমার বড়ো নিচু—মাটির দিকে ছাড়া তাই চাইতেও পারোনা। ছাখোনা তুনিয়ার সকলের কাছে মাথা নিচু ক'রে-ক'রে আমাদের জাতটাই মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে গেছে। এটা বিনয় নয়, এটা ভদ্রতা নয়, এ অন্ত জিনিশ; দাস মনোভাবের থেকেই এর জন্ম। আমাদের মা-ঠাকুমাদের কথা একবার ভাবো দিকি—এ মাটির দিকে চেয়ে-চেয়েই তাঁরা মাটি হ'য়ে গেছেন। তাও কতোটুকু মাটি তাঁরা দেখেছেন? ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা বড়ো জোর এক হাত মাটি!

বন্ধু স'রে এসে চিবুকের তলায় হাত দিয়ে মলয়ার মুখখানা তুলে ধ'রে, সোজা সটান ক'রে রাখতে হয় কীভাবে দেখিয়ে ছায়, বলে—এই, এই রকম রাখবে।

সলজ্জ হাস্যে মলয়ার মুখখানা ভ'রে ওঠে, তবুও ঠিক মেরুদণ্ড ঋজু হয়না।

রঙ্গিলা বলে—আহা, ওতো আর তোমার আমার মতো সুস্থ নয় যে ওকে তু'দিনেই তুমি কুচ্‌কাওয়াজের সেপাই বানাতে পারবে?

বন্ধু প্রায় ধমকের স্বরে বলে—কে বল্লে ও সুস্থ নয়, আমি জানি, আমি বুঝেছি ও সুস্থ, তোমার-আমার মতোই সুস্থ। তাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস এভাবেই আবার ও আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠবে দিনে-দিনে।

বন্ধুর বিশ্বাসের জোর রঙ্গিলার কণ্ঠস্বরে আসেনা তবু সেও বলে—উঠবে বৈকি, মনের জোর থাকলে সবই হ'তে পারে—আহা! এমন সুন্দর মেয়ে! রঙ্গিলার শেষ কথাগুলো স্তোকবাক্যের মতো শোনায়।

বন্ধু বলে—সুন্দর তখন সুন্দরতর হ'বে। এই সংঘের আব্‌হাওয়ায় তোমাদের সান্নিধ্যে কোনো মেয়েই একেবারে Lolly-pop Dolly পুতুলটি হ'য়ে উঠবেনা এ বিশ্বাস আমার আছে। তাহ'লে এই মেয়েই আরো কতো সুন্দর হ'য়ে উঠবে ভেবে ছাখো। (মলয়ার দিকে ফিরে) বলে—আমার কথাগুলোই লোহার জ্যাকেটের মতো ভাববে তাহ'লে শিরদাঁড়া আর সহজে নুইবেনা। সর্বদা নাকের সিধে চাইবে।

ব'লে বন্ধু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখিয়ে ছায় পূর্বদিক, যেদিকে সূর্যদেব ওঠেন। দেখিয়ে ছায় পশ্চিম দিক যেদিকে সূর্য পাটে বসেন, দেখায় উত্তর দিগন্ত যেদিকে সুদূর পাহাড়ের নাতি উচ্চ রেখা দেখা যায়। দেখায় দক্ষিণ দিগ্বলয় যেদিকে প্রান্তর আর তরুশ্রেণী আকাশে গিয়ে মিশেছে এবং দখিনা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বান যেদিক দিয়ে এসে!

রঙ্গিলা যে-ঘরটিতে থাকে ঠিক তারই পাশের ঘরটি মলয়ার জন্ত নির্দিষ্ট হ'লো।

একটি চৌকিতে মলয়াকে বসিয়ে বললো—বোসো তোমরা, আমি আসছি এখখুনি। বোনটির জন্যে একটি খাটিয়ার ব্যবস্থাও তো অন্তত করতে হ'বে। এখানকার বেয়ারাটাকে ব'লে দেখি একবার।

রঙ্গিলা একটু ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বন্ধু ডাকলো, বললো—শোনো, শোনো, এইজন্য এতো ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ভূমিশয্যাই তো ভালো। নাঃ, তুমি দেখছি ওর শিরদাঁড়াটা সোজা রাখতে দেবেনা। কঠিন শয্যার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। তুমি বরং ওকে মেঝেয় কম্বল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিও। আমার তো সেটাই পছন্দ।

রঙ্গিলা প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—এটা তোমার কিন্তু অন্যায় বন্ধুদা। তোমার মতো সকলেই বুঝি?

বন্ধু হাসতে হাসতে বলে—আমার মতো সকলে নয় জানি কিন্তু চেষ্টা করলে হ'তে পারে এটাও মানি।

রঙ্গিলা বলে—না, বন্ধুদা। এ তুমি কী বলছো? ও কি কখনো শুয়েছে এতো শক্ত বিছানায় এ ভাবে? যার যা অভ্যেস···

—কোনো কিছুই অভ্যেস থাকেনা, সব কিছুই অভ্যেস করতে হয়। অবশ্য আমার কথা যদি তুমি শোনো তো আমি এই রকম পরামর্শ ই দেবো। আচ্ছা তুমি নাহয় ওকেই একবার জিগেস করো—ওর যা ইচ্ছে সে-রকমই ক'রে দিও ওকে।

রঙ্গিলা বলে—জিগেস আবার করবো কী? এ-রকমভাবে জিগেস করলে কেউ বলতে পারে নাকি কিছু?

মলয়া এইবার ব'লে ওঠে—না রাঙাদি, আপনি কেন এতো তুচ্ছ জিনিশ নিয়ে ব্যস্ত হ'চ্ছেন? বন্ধুদা যেমন বলছেন আপনি তেমনি ব্যবস্থাই করুন। আমারও তাই ইচ্ছে। বন্ধুদার পরামর্শ ই এখন আমার প্রধান অবলম্বন।

বন্ধু চেঁচিয়ে ওঠে—হিয়ার, হিয়ার! ছাখো রাঙল, মলয়া তৈরি হ'য়ে গেছে।

রঙ্গিলা একবার মলয়ার দিকে চায়, একবার বন্ধুর দিকে চায় আর নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

বন্ধু বলে—আশা করি দু'চার মাস বাদে তুমি এমন তৈরি হবে যে তোমাকে বাহন ক'রে আমি হিল্লি-দিল্লী ঘুরে আসবো। কী বলো? পারবেনা আমার ভার নিতে? খুব পারবে। তোমার রাঙাদিদি তোমাকে সাহায্য করবেন সেই জন্যে অনেক ভেবে-চিন্তে তোমাকে এখানে রেখে গেলাম।

—আপনিই তো সকলের ভার নিয়েছেন, আপনার ভার কে নেবে? সে কি আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে? অবশ্য রাঙাদি পারলে পারতে পারেন।

বন্ধু ভ্রূকুটি করে—উঁহুঁ, নিজেকে অতোটা তুচ্ছ ভাবতে নেই মলয়া। অনেক সময়ে নিজের মধ্যে কী সম্ভাবনা সুপ্ত আছে তা' নিজেই জানতে পারেনা মানুষ।

রঙ্গিলার দিকে ফিরে বন্ধু বলে—কী বলো রঙিল ? মলয়ার দ্বারা আমরা কিছু কিছু কাজ পেতে পারিনা ?

রঙ্গিলা বলে—নিশ্চয়ই পেতে পারি। আমার তো মনে হয় ওঁর সাধ্যমত কাজ ওঁকে এখন থেকেই দেওয়া যায়। কী বলো ?

বন্ধু বলে—নিশ্চয়ই দেবে। সহ্যমতো স্বল্প শ্রম অবশ্যই দরকার। কাজ কিছু দিও ওকে। গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার কাজে ও তোমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারবে। সেটা ওর পক্ষেও শুভ হ'বে। কিছু কাজ নিয়ে মেতে থাকলে আশা করা যায় ও আবার নিজের মনোবল ফিরে পাবে। ওষুধপত্র, ডাক্তার সব কিছু শেষ হ'য়ে গেলে এই পরীক্ষাটুকুই বাকি থাকে।

মেঝেয় একটা মাদুরের ওপর মোটা একটা .কম্বল, তার ওপর একটা চাদর বিছিয়ে রেখেছিলো রঙ্গিলা।

বন্ধু বলে—তুমি তা'হলে এখানেই একটু বিশ্রাম করো মলয়া আমরা একটু পাশের ঘরে যাচ্ছি।

আড়ালে এসে বন্ধু রঙ্গিলাকে বলে—ওকে নিয়ে অবশ্য তোমাকে কিছুটা সময় ব্যাপৃত থাকতে হ'বে বটে কিন্তু উপায় কী বলো ? এখন যখন আমরা স্থির করেছি যে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দিন কতকের জন্য বন্ধ রাখবো, তুমি এখন এই সবই করো। এও তো সৎ কাজ। যা করছো এই কাজই এখন প্রয়োজন। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাও, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে শিক্ষা দাও, সমাজ-সংস্কার করো, ভাবীকালে উত্তরপুরুষ যাতে স্বাস্থ্যবান সমাজ-সচেতন, রাষ্ট্র-সচেতন, হ'য়ে ওঠে।

সংঘের চিঠি ও কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে বন্ধুর কিছু সময় কাটলো। এতদিনের জমা জরুরী কাজগুলো হ'য়ে গেলে রঙ্গিলা এক সময়ে বললো—তুমি তো ফিল্ড ঘুরে এলে, কী রকম বুঝলে বন্ধুদা ?

বন্ধু বলে—পরিস্থিতি তো বিশেষ ভালো মনে হ'চ্ছেনা। সরকারী নজর এখন বড্ডো কড়া। তাইতো আমরা ঠিক করেছি যে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে বন্ধ করতে হ'বে—বিশেষ করে এ সময়ে যখন ডাঃ বিরূপাক্ষ জেলে অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়ার একটা জোর প্রস্তাবনা চলছে। বিরূপাক্ষ ডাক্তার আজ জেলের বাইরে থাকলে কি সংঘের এতো আর্থিক অনটন হ'তো ? খুব সম্ভব ডাক্তারকে ওরা মুক্তি দেবে এবার। যে-পর্যন্ত তিনি জেলের

বাইরে না আসছেন আমাদের আর কিছু করা উচিত নয়। সেইজন্যই তো ও-সব কাজে এখন ঢিলে দিয়েছি।

রঙ্গিলা সায় দ্যায় বন্ধুর কথায়।

এতো জিজ্ঞাসার মধ্যেও কিন্তু একটি আর্ত জিজ্ঞাসা ওর মনের দোরে কড়া নাড়ছিলো বহুক্ষণ ধ'রে হঠাৎ কেমন যেন মরীয়া হ'য়ে ওর মন থেকে মুখে এসে গেছে—প্রকাশ কিন্তু সহজ হয়না, বেধে যায় কথা। বাধোবাধো ভাবে রঙ্গিলা জিগেস করলো—কমরেডের তো অনেকদিন কোনো খবর নেই···খবর কিছু জানেন ওর?

বন্ধু হেসে ফ্যালে, বলে—কত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়—আনপথে ধাই তবু কানু পথে ধায়—তাই না? ঘুরে-ফিরে শেষকালে তোমারও সেই স্যাঁৎ স্যাঁতে ভাবনা আর মিন্‌মিনে ফোঁপানি? এঃ! হরি, হরি! ষোল আনাই মেয়েমানুষী ব্যাপার? এতো ভাবনার কী আছে? এতো ভাবো কেন?

রঙ্গিলা সলজ্জ মুখে বলে—ভাববো ব'লে কি কখনো ভাবে মানুষে?

—কিন্তু ভেবেই বা কী করে সে?

—তা জানিনা···তবু ভাবে।

—তাহ'লে ভাবুক গে। আমার কিন্তু উপস্থিত এসব ভাবনার চেয়ে পেটের ভাবনায় উৎসাহ বেশি। তাছাড়া ওসব সূক্ষ্ম কাব্যিক ভাবনার বিলাসিতা আমার ভালো লাগেনা কোনোদিন।

রঙ্গিলা হেসে ফেলে, বলে—ওমা, খাওয়া হয়নি বুঝি? দেখেছো একেবারেই ভুলে ব'সে আছি। ব্যস্ত হ'য়ে উঠে যায় রঙ্গিলা।

একটু পরেই বড়ো এক গ্লাস দুধ, এক থালা সামান্য ফলমূল ও কিছু মুড়ি নিয়ে ফিরে আসে—তার সামান্য গৃহস্থালীর দরিদ্র আতিথেয়তা। বলে—কোথায় কী পাবো? ঘরে যা ছিলো তাই-ই ধ'রে দিলাম। পেট ভরাবার মতো কিছু নয় অবশ্যই, একটু দেরি করো। দু'চারখানা লুচি ভেজে দিই।

বন্ধু বলে—লুচি? এতো সমাদর গ্রহণ করতে পারি কী ক'রে? আজকের দিনে লুচি খাওয়ার অধিকার কি আর আছে আমাদের? রাস্তায় রাস্তায় নরকঙ্কাল যখন একটুখানি ফ্যান-আমানির জন্য কাৎরে কাৎরে মরছে তখন আমাদের পেটপুরে যে ভাত জুটছে সেটাই তো আমার মনে হয় প্রাপ্যের চেয়ে বেশি—এর চেয়ে আরো বেশি আর আমাকে নিতে বোলোনা।

বহুদিন পর পরমপরিতৃপ্তিকর আহারান্তে নিটোল একটি বিশ্রাম-সুখ! বন্ধুর শরীর ও মন আপ্লুত হ'য়ে আসছিলো—কেমন যেন মিষ্টি ঘুমের আমেজ। বন্ধুকে

নিজের শয্যা ছেড়ে দিয়ে রঙ্গিলা গিয়েছিলো তখন পাশের ঘরে মলয়ার কাছে। ওদের কথা টুকরো-টুকরো হ য়ে কিছু-কিছু আসছিলো বন্ধুর কানে। মলয়া কইছে অনিরুদ্ধের কথা, রঙ্গিলা কইছে সংঘের কথা, প্রদোষের কথা, বন্ধুর কথা। বিশ্রামের অন্তরাল থেকে এগুলো শুনতে বন্ধুর খারাপ লাগছিলোনা। দু'টি মেয়ে একত্র হ'লেই খালি গৃহস্থালীর কথা কয়। এমন কি রঙ্গিলার মতো মেয়েও এ ধরনের কথায় যোগ দিতে ক্লান্তি বোধ করেনা। সে তো হবেই, সংসারই যে ওদের সত্তার সার। তার নিজের কথাটাই নিজের কানে যেন লেগে আছে এখনো —এঃ,, একেবারে ষোলআনাই মেয়েমানুষী! মনের বড়ো অংশটা যে-কথাগুলোকে মেয়েমানুষী ব'লে ব্যঙ্গ করে, মনের আরেকটা অংশ আবার তাকে মাঝে মাঝে অন্যরকম পরামর্শ ছায়, বলে—একবার শুনেই ছাখোনা সেই হৃদয়বৃত্তির প্রলাপগুলো যাদের দিকে কোনোদিন কান দিলেনা জীবনে।

হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বন্ধুর মনে প'ড়ে যায় যে তার অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে সময় নেই আয়েসের। এখুনি যে যেতে হবে তাকে। সে উঠে পড়ে শয্যা ছেড়ে। বেঁধে নেয় হোল্ডঅলটা। সবেমাত্র Knapsackটা কাঁধে ঝুলিয়েছে এমন সময়ে রঙ্গিলা এসে ঘরে ঢুকলো।

বন্ধুকে দেখে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললো—ওমা আমি কোথা ভাবলুম তুমি একটু বিশ্রাম নেবে, দু' রাত্তির ট্রেনে কষ্ট গেছে। আর এরই মধ্যে তুমি যে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছো কে তা জানে বলো?

এক মুহূর্ত রঙ্গিলার দিকে চেয়ে বন্ধু বলে—বিশ্রাম? আমার আবার বিশ্রাম কিসের? বিশ্রাম কোথা?

—কেন? তোমার কি বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? এ-রকম করলে দেহ টেঁকবে? তুমি কি মানুষ নও?

বন্ধু বলে—দত্যি-দানোও তো হ'তে পারি। তোমাদের মনে আমার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকাই তো ভালো।

রঙ্গিলা বলে—বাজে কথা রাখো। থেকে যাও আজকের দিনটা। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালেই রওনা হ'য়ো।

—মাপ করো, এ নিয়ে আর পেড়াপীড়ি কোরোনা। বিশ্রামকে আমি বড্ডো ভয় করি রঙিল, বড্ডো ভয় করি।

—কেন, তোমার পুরুষালিয়ানাটা পাছে একটু খর্ব হয়ে যায় ব'লে?

—না, তা' নয়। ভুল বুঝলে, কিংবা বুঝলেনা কিছুই, শুধু বিদ্রূপই করলে। সব জিনিশের অতো কারণ অনুসন্ধান করতে নেই। কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ জিনিশ

মেনে নিতে হয়, কতকগুলো অবান্তর জিনিশ এড়িয়ে যেতে হয়। অনেক সময় নিজেও এভাবে চলি—অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারের ক ।ণ নিজেই জানিনা জানতে চাইনা, এড়িয়ে যেতে চাই। সেগুলো জানতে গেলে পদে পদে বাধা এসে জুটতো, এগোনো চলতোনা। আমাকে বিশ্রাম দিতে চেওনা রঙিল সেটা নির্যাতন দেওয়ারই সামিল হ'বে।—তা বোধ করি তুমি চাইবেনা ?

এর পর রঙ্গিলা নিরস্ত হয়। হঠাৎ তার মনে হ'লো যেন বেদনা-নীল একখানি ছায়া এক মুহূর্তের জন্য কোথা থেকে ভেসে এসে আবার কোথায় চ'লে গেলো। বন্ধুর মুখ আবার হাস্যোদ্দীপ্ত স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, বলে—কিছু মনে কোরোনা তুমি, এখনই আমি যাই, কেমন ? সংকল্প করেছি যখন ··

—সে তো তুমি যাবেই জানা কথা। অনুরোধ দিয়ে তোমার সংকল্প টলাতে পারবো সে-সাধ্য কি আমার আছে ?

আবার রঙ্গিলার মনে হ লো যেন সেই বেদনা-নীল ছায়াটির একটুখানি প্রান্তভাগ উঁকি দিয়ে গেলো বন্ধুর মুখে চকিতের জন্য। আবার ঝলমলিয়ে উঠলো বন্ধুর মুখ শিশু-সুলভ অট্টহাসিতে। সে বললো—সেই কথাটাই ভালো ক'রে জেনে রাখো, বুঝলে ? সুধু জানলেও হ'বেনা মুখস্থ ক'রে রাখো। হা-হা-হা···

বাইরে থেকে যে-আকাশ প্রশান্ত, স্থির, মৌন, অন্তরে তারই কুটিল উল্কার আগ্নেয় উদ্গার, নক্ষত্র-নির্ঘোষ, হিংস্র ধূমকেতুর পুচ্ছ-বিধূনন, নক্ষত্র-জনয়িত্রী নীহারিকাদের রহস্যধূম্র সূতিকাবর্ত, কোটি সৌরবিশ্বের অসংখ্য বৃত্তপথ, অধিবৃত্তপথ, পরাবৃত্তপথের কল্পনাতীত গহন গ্রন্থিলতা। ক্রমোদ্ঘাটিত আলো অন্ধকারের কালোত্তীর্ণ প্রবাহ ও পরিবাহ—ক্রূর, অকল্পেয়, ফেনিল, হিংস্র ও জঙ্গম ! রঙ্গিলার চোখের সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত আকাশপথের ঢাক্‌নাটি বারেকের জন্য খুলে গিয়ে তখনই আবার বন্ধ হ'য়ে গেলো। ছোটো একটি মুহূর্তের বিশাল আভাসে রঙ্গিলা বিস্ময়-বিমূঢ়, মুগ্ধ, উদ্বেল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

বন্ধু তার স্বাভাবিক হাসির সঙ্গে জিগেস করলো—মলয়া কী করছে ?

ক্ষণিকের স্বপ্নভঙ্গের পর এই যেন রঙ্গিলা কথা ক'য়ে উঠলো—এতোক্ষণ তো কথা কইছিলো, ক্লান্ত হ'য়ে হয়তো এবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

বন্ধু বলে—থাক্, ঘুমোক। ওকে আজ যতোখানি আশার কথা শুনিয়ে গেলাম দেখো তার ফল ভালো হ'বেই। ওর জন্য বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা কোরো, বিশেষ মানে খুব শৌখিন গোছের কিছু নয় অবশ্য। পুষ্টিকর অথচ শাদা মোটা পথ্যই ওকে দেবে, আর সেই সঙ্গে সময়মতো স্বল্প শ্রমও প্রয়োজন।

যৌগিক প্রক্রিয়া দু'একটা ওকে দেখিয়ে দিও, ও অভ্যেস করুক। এর পরের মাসে একবার আসতে চেষ্টা করবো।

রঙ্গিলা বলে—ঠিক তো? কথা দিয়ে যাচ্ছো মনে থাকে যেন।

বন্ধু বলে—পাগল! কিছুই কি ভুলি সহজে? তবে পথে বেরিয়ে পড়লে কথা দেওয়ার যতোটা মূল্য ততোটুকুই আস্থাস্থাপন কোরো আমার কথায়, তার বেশি কোরোনা আশা করি নিরাশ হ'তে হ'বেনা।

—নিয়মিতভাবে চিঠি মারফত খবরটা অন্তত পাই যেন।

—এম্নিতেই কি পাও না?

—পাই বটে; কিন্তু সেটাকে ঠিক নিয়মিত বলা যায়না 'মাঝে-মাঝে' বলতে হয়। তাতেও যে ভাবনা যায়না। তোমরা কে কোথায় আছো, কী করছো সর্বদাই জানতে ইচ্ছে করে যে বন্ধুদা।

বন্ধু এ জায়গায় একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

রঙ্গিলা বলে—কমরেডের কথা কিছু জানতে পারলে অবিশ্যি চিঠিতে জানাবে।

বন্ধু বলে—এই দ্যাখো! ঘুরে-ফিরে আবার সেই? এতোক্ষণ এলোপাতাড়ি ঝোপঝাড় না ঠেঙিয়ে সোজাসুজি আসল কথাটা ব'লে ফেললেই হয় যে, এইবার আবার মাথুরের পালা শুরু করতে চাও। দোহাই, আমি বাপু তোমার বৃন্দাদূতী নই।

বন্ধু সশব্দে হেসে ওঠে।

রঙ্গিলা লজ্জিত হয়, বলে—না না থাক্। কিছুই তা'হলে আর বলার নেই তোমাকে—তোমার যাত্রা শুভ হোক।

বন্ধুর চোখে রঙ্গিলার মুখখানা করুণ বিষণ্ণ মনে হয়। সে সস্নেহে রঙ্গিলার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলে—মনে কিছু কষ্ট দিয়ে ফেললুম নাকি? মিছিমিছি ঘাব্ড়াচ্ছো কেন বোন, সব হ'বে, সব হ'বে। যা ব'লেছো সব হ'বে। যা চেয়েছো সব পাবে। এইবার হাসো তাহ'লে একটু—হাসিমুখ দেখে যেতে হয় যে।

রঙ্গিলার মুখ এবার হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে বন্ধুর পায়ের ওপর মাথা নোয়াতে যায়—বন্ধু স'রে যায়, নিষেধ করে—সামরিক কায়দায় স্যালুট ক'রে দেখিয়ে ছায়, বলে—উঁহুঁ, ও রকম নয়, এই রকম।

বন্ধুর অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করলো রঙ্গিলাও।

রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রচলিত লাইন দুটো ঈষৎ পরিবর্তিত ক'রে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে স্যাপ্স্যাক্ ঝুলিয়ে হোল্ডল কাঁধে ক'রে চললো বন্ধু। কাঁচা মাটির রাস্তায় স-বুট পদক্ষেপে ধুলো উড়িয়ে এগোতে লাগলো, একবার পিছন ফিরে তাকালোও না।

যতোক্ষণ শোনা যায় রঙ্গিলা নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো বন্ধুর মিষ্টি গলার গান—আবার এই যাত্রা হ'লো সুরু এখন ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার ··যতোক্ষণ দেখা যায় কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো বন্ধুর নিক্রমণ।

কাঁধে ঘাড়ে মোট নিয়ে ভারী বুট দিয়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে চ'লে গেলো বন্ধু। সেই ধুলোর মেঘে বারেকের জন্যও ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠলো রঙ্গিলার দৃষ্টি। তার চোখে ধুলো দিয়ে চ'লে গেলো বন্ধুদা—এই সত্যটা যখন আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো বন্ধু তখন পথের বাঁকে গছের আড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে! একটা উদ্বেলিত আবেগে রঙ্গিলার চোখ সত্যি-সত্যি ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো। অন্তস্তল থেকে স্বতোৎসারিত হ'য়ে বেরিয়ে এলো একটি অকপট অনুশোচনা গুনগুনিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের সুরে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো
এমন অনাহূতের মতো॥

মাথা তোলে জীবন-কেতন

জগতে অঘটনও ঘটে। বিস্ময় ব'লেও একটা কথা আছে। তেম্নি একটা বিস্ময়কর অঘটনই ঘ'টে গেলো মলয়ার বেলায়। এখানে আসার মাস দুয়েক পরে ক্রমশই যেন স্পষ্ট হ'য়ে, উঠতে লাগলো যে মলয়ার শরীরে ও মনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সে এখন পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বাবলম্বী। জ্বর হ'লে থার্মোমিটার নিয়ে কেউ সাধ্য-সাধনাও করবার নেই তাই জ্বরও আর আসেনা। সমস্ত রোগই সে যেন গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার সংকল্প করেছে। প্রথম দিকে মলয়ার কোনো-কোনো দিন জ্বর-জ্বর লাগতো বৈকি এবং ঐরকম লাগলেই সে পাঠশালার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরো মেতে উঠতো। এতদিনে ওদের সে ভালোবেসে ফেলেছে। তার উপবাসী মাতৃত্ব ওদের নিয়েই যেন সন্তান-সম্ভোগ করে। ছেলেমেয়েরাও মলয়াকে খুব পছন্দ করে। মলয়াকে ওরা মালাদি ব'লে ডাকে। রঙ্গিলাও মলয়ার পথ্যাদির দিকে ও স্বাস্থ্যের দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখে। মলয়াও ইদানীং অনুভব করে যেন তার জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হ'য়েছে—যে-অধ্যায় নতুন ক'রে কুমারী জীবনের স্বাদে-গন্ধে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে তাকে কেবলই হাতছানি দিচ্ছে।' যৌগিক ব্যায়াম, আসন ইত্যাদি সে এখন নিয়মিতভাবে করে। সকালে বিকালে খালি পায়ে মেটে পথে সহমতো পদচারণা ও অন্যান্য অন্তবিধ নিয়মানুবর্তিতার ফলে তার জীবন-যাপনের ধারাই যেন বদলে গেছে।

ওদের পাঠশালা বসে খুব সকালে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে গ্রামেরই—কেউ কেউ পাশের গ্রাম থেকেও আসে। রোদের তাপ বেশি হ'বার আগেই ওদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পাঠশালার ছুটি হ'লে রঙ্গিলা নিজে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি রোজই যেমন পৌঁছে দিয়ে আসে আজো তেম্নি বেরোচ্ছিলো। দেখলো ঘরের ঠিক সাম্‌নেই একটু দূরে—পথের ধারে, একটি গাছের তলায় অসামান্য সুপুরুষ এক ভদ্রলোক উবু হ'য়ে বসে আছেন। এ পাড়াগাঁয়ে এই চেহারা ও এমন সুবেশ একেবারেই অভাবনীয়।

রঙ্গিলাকে দেখামাত্রই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন ও রঙ্গিলার পিছন পিছন কয়েক পা চললেন। রঙ্গিলার মনে হ'লো ভদ্রলোকের প্রয়োজন সম্ভবত তারই সঙ্গে। রঙ্গিলা ফিরে দাঁড়ালো, জিগেস করলো—কিছু কথা আছে আমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।··ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন রঙ্গিলার কাছে। ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনিই বুঝি এদের রাঙাদি?

—কেন বলুন তো? অপরিচিত লোক দেখলে সতর্কভাবে কথা কইতেই রঙ্গিলা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে—তার দৃষ্টি আপনা থেকেই একটু প্রখর হ'য়ে ওঠে।

ভদ্রলোক একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলেন—আমি বন্ধুদার কাছ থেকেই আসছি।

রঙ্গিলা এতক্ষণে অনেকটা আন্দাজ ক'রেই নিয়েছিলো এবার সে চিনেই ফেললো অনিরুদ্ধকে। যদিও সে কখনো চাক্ষুষ ছাখেনি তাকে—তবু যে-চেহারার খ্যাতি এতোদিন ধ'রে সে এতো লোকের মুখে শুনে এসেছে সে-চেহারা চাক্ষুষ না দেখলেও ভুল করবার নয়।

সে বললো—আর বলতে হবেনা, বুঝেছি। আপনিই অনিরুদ্ধবাবু তো?

অনিরুদ্ধ একটু বিস্মিত হ'য়ে জিগেস করলো—কী ক'রে চিনলেন? আপনি তো আমাকে এর আগে কখনো দেখেননি।

রঙ্গিলা সহাস্যে বলে—দেখার দরকার করেনা। আপনার চেহারাটি যে একেবারে legend-এর মতোই হ'য়ে গেছে—তাই চেহারা দিয়েই চিনলাম আপনাকে। সাবধানে ঘোরা-ফেরা করবেন কিন্তু…আপনার চেহারাই আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারে। সর্বদা মনে রাখবেন সেই হরিণের গল্পটি, যে তার সুন্দর শিঙ্-জোড়াটির জন্য গর্ব করতো শেষটায় সেই শিঙ্-জোড়াই তাকে শিকারীর হাতে ধরিয়ে দিলে।

ব'লে হাসতে লাগলো রঙ্গিলা। অনিরুদ্ধ লজ্জা পেলো।

রঙ্গিলা বলে—এভাবে দূরে দূরে ঘুরছেন কেন? চলুননা ভেতরে নিয়ে যাই। মলয়া বেশ ভালোই আছে। ভাবনার কিছু নেই।

—ভালো আছে?…অনিরুদ্ধের স্বরে বিস্ময়ের ভাব চাপা থাকেনা।

—হ্যাঁ, কেন? খবরটা কি মনঃপুত হ'লোনা? আশ্চর্য খবর সন্দেহ নেই।

—সেই জন্যই অবাক্ লাগছে।

—অবাক্ লাগবারই কথা। কারণ আপনি ওকে বছরের পর বছর সদাসর্বদা সেবাযত্ন দিয়ে, ওষুধ-পত্র দিয়ে রুগী সাজিয়ে রেখেছিলেন—আমরা তো তা করিনি। আমাদের এখানে ওর জন্য দামী দামী ওষুধ-পথ্যি নেই, যা শাক-ভাত আমাদের জোটে, তা-ই ও-ও পায়। শুধু মনের ফুর্তিতে আর কাজে ওকে ব্যাপৃত রাখা হয়—এক দণ্ডের জন্যও ওকে ভাববার অবকাশ দেওয়া হয়না যে ও রুগী। সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের ওপর ছেড়ে রেখে দিয়ে যেটুকু ফল হ'বার তাই হ'য়েছে।

অনিরুদ্ধ স্বরে একটু গ্লানি এনে বলে—হয়তো বা ভুলই করেছিলাম এতোদিন।

রঙ্গিলা বলে—ওকথা থাক্। চলুন মলয়ার সঙ্গে দেখা করবেন। আজকের

দিনটা এখানে বিশ্রাম ক'রে কালকে গেলেই চলবে। তেমন জরুরি কাজ হাতে নিয়ে তো বেরোননি।

অনিরুদ্ধ ব'লে ওঠে—না, না, আমি এখনিই চ'লে যাবো। ওর সঙ্গে দেখা আর করতে চাইনা, এ নিয়ে পেড়াপীড়ি করবেননা। এখন আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা ওর পক্ষে বিশেষ শুভ হ'বেনা। ও জানুক যে, এখানে ও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত; এটাই ওর এখন জানা দরকার। ওর পক্ষে সেটাই ভালো হ'বে। তবেই তো ও নিজেকে নিজে সাহায্য করবে এবং স্বভাবের কাছ থেকে সাহায্য পাবে। দেখা করার জন্যে তো আমি এখানে আসিনি, এসেছিলাম খোঁজ নেবার জন্যে। এমনকি ওকে জানাবারও পর্যন্ত প্রয়োজন নেই যে, আমি এখানে এসেছিলাম।

রঙ্গিলা বলতে যায়—তাহ'লে ধুলো পায়েই চ'লে যাচ্ছেন?

অনিরুদ্ধ ব'লে ওঠে—আজ তা-ই যাই।

বন্ধুদার খবর কিছু জানেন?·· রঙ্গিলা প্রশ্ন করে।

অনিরুদ্ধ বলে—বন্ধুদা রানীগঞ্জ অঞ্চলেই ছিলেন কয়েকদিন আগে পর্যন্ত। প্রদোষদাও নাকি ঐ অঞ্চলে···হয়তো এখানে আসবেন শিগ্‌গির তখন একেবারে তাঁদের মুখ থেকেই শুনতে পাবেন সব। আমি আর দেরি করবোনা···চার-পাঁচ মাইল দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে হ'বে। যাই।

ব'লে একটু ব্যস্তভাবেই চ'লে গেলো অনিরুদ্ধ। রঙ্গিলা চললো ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্যপথ ধ'রে।

বিলগনে এলো কুসুমের মরশুম

এরই দিন কয়েক পর প্রদোষের কাছ থেকে রঙ্গিলা একখানি চিঠি পেলো। প্রদোষ লিখেছে অনেক কথা। লিখেছে, বন্ধুদা এখন বড়ো ব্যস্ত—হয়তো নতুন কিছু কাজ হাতে নেবেন। লিখেছে, ডাঃ বিরূপাক্ষকে খুব শিগ্‌গিরই মুক্তি দেওয়া হবে—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। সব শেষে লিখেছে: আমি দিন তিন চার পরেই যাচ্ছি—বন্ধুদার মুখে শুনলাম সব কথা। আমার হাতে বেশি সময় নেই—মাসখানেক পরেই হয়তো আমাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে যেতে হ'বে। কবে ফিরবো, আদৌ ফিরবো কিনা কিছুই নিশ্চয় ক'রে বলা যায়না। আমি ভেবে দেখলাম এবং সেইজন্যই কথাটার ওপর আরো বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। তাছাড়া তোমারও তো অনেক দিনের ইচ্ছে এবং সর্বোপরি বন্ধুদার আদেশ এর মধ্যেই শুভকাজটা সম্পন্ন হ'য়ে যাক্—মানে আমাদের এই বিয়েটা। এবার আমি এক রকম মনস্থির ক'রেই ফেলেছি। আমাদের এ বিয়েতে কিছু আড়ম্বর নেই—এটা যেন অতীত কোনো ঘটনার লৌকিক সমর্থন মাত্র।...পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠলো রঙ্গিলা। বিয়ে? নিজেরই কানে যেন ব্যঙ্গের মতো শোনালো। মন থেকে যতোই কথাটা সে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো ততোই কাঁদবার জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠলো মন। এখন বিয়ে? এতোগুলো বছর নষ্ট ক'রে বিয়ের এই সময় হ'লো? এখন যখন ওকে ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে চ'লে যেতে হ'চ্ছে—কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং বিয়ে? চমৎকার! আর এই বিয়েটা হ'তে চ'লেছে কিসের তাগিদে? না—'তোমার ইচ্ছা' অর্থাৎ রঙ্গিলার ইচ্ছা আর তার চেয়েও বড়ো তাগিদ বন্ধুদার আদেশ। নিজের মনের তাগিদই যার নেই তাকে এমন শোচনীয় বিয়ের বিড়ম্বনায় পেয়ে বসবে কেন? না, না, এ বিয়ে কিছুতেই সে হ'তে দিতে পারেনা। দু'দিন বাদে এই বিয়েই শৃঙ্খলের মতো মনে হ'বে প্রদোষের কাছে। কিন্তু প্রদোষের কথা কি সে ঠেলতে পারবে? বন্ধুদার আদেশ? ক্ষণেকের জন্য রঙ্গিলা মনে-মনে যেন বড়ো দুর্বল হ'য়ে পড়ে। গতবার অসুখের পর প্রদোষ তো বলতে পারতো কিছু? বন্ধুদাও তো সবই জানতেন তখন তাঁর আদেশই বা ছিলো কোথা? তখন প্রদোষ যদি এ প্রস্তাব করতো তবে কি সাধ্য হ'তো রঙ্গিলার ওর কথা ঠেলতে? কিছুতেই পারতোনা। যে-রকম হওয়া উচিত ছিলো সেরকম কিছুই হ'লোনা তখন। সেই প্রতীক্ষার লগ্ন পার হ'য়ে গেছে। এখন তার মনে হ'চ্ছে আজ আর

যেন ও-সবের সময় নেই। প্রদোষের চিঠির জবাবে রঙ্গিলা ওকে জানিয়ে দেবে একথা।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায় কিন্তু রঙ্গিলার চিঠি আর শেষ হয়না। লেখে কাটে, লেখে কাটে মনঃপুত হয়না কিছুতেই। তার বলার কথা প্রতিমুহূর্তেই যেন রূপান্তর নিতে থাকে। যতোবারই সে অবসর ক'রে এসে লিখতে বসে ততোবারই আগের লেখাটুকু ছিঁড়ে ফেলে তাকে আবার নতুন ক'রেই আরম্ভ ক'রতে হয়।

এম্নি ক'রে চতুর্থ দিনেও চিঠি শেষ হ'লোনা, প্রদোষ এসে হাজির হ'লো।

রঙ্গিলা প্রদোষকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়ে একবার আড়ালে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আশ্বস্তচিত্তে এসে বসলো প্রদোষের পাশে। এই কয়দিন ধ'রে যে-সব সমস্যা নিয়ে সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলো, যে-সব পরিণতি সে দু'হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলো সেগুলো হঠাৎ যেন কী জাদুমন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হ'লো! এখন আর যেন তার কিছুই ভাববার নেই, সব কিছুই মেনে নেবার আছে।

—চিঠি পেয়েছো তো ঠিক সময়ে?

—পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের ব্যাপার বোঝাই ভার।

—কেন! এ তো আর নতুন ক'রে বোঝার কিছু নেই।

—সে তো বুঝলুম। এতোদিন তুমি ছিলে কোথা? কোথায় ছিলো বন্ধুদার আদেশ? বন্ধুদার আদেশ বোধ করি তখন অন্যরকম ছিলো?

প্রদোষ হাসতে থাকে, বলে—তা' নিয়ে আর আপসোস ক'রে লাভ নেই।

রঙ্গিলা বলে—আপ্‌সোস তো করছিওনা শুধু ভাবছি বিসর্জনের আগেই বুঝি বোধনের দরকার হয়? একটু থেমে রঙ্গিলা বলে—কবে তুমি যাচ্ছো তাহ'লে ভারতবর্ষ ছেড়ে?

প্রদোষ বলে—প্রায় মাসখানেক বন্ধুদা আমাকে ছুটি দিয়েছেন—সব কাজের ভার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

'মধুনিশি' যাপনের জন্যই বোধহয়?…অত্যন্ত বেখাপ্পা ভাবে হেসে ওঠে রঙ্গিলা।

—হয়তো কথাটা তা-ই।…প্রদোষ একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়ে। বলে—কী জানো রঙিল আমাদের এই বিয়ের ব্যাপারটা সবটাই ধ'রে-নেওয়া মেনে-নেওয়া গোছের হ'চ্ছে। বন্ধুদা এটা যেন ধ'রেই নিয়েছেন যে, এ-বিয়েতে তোমার সম্মতি আছেই। আর আমারও ধারণা তা-ই। আমাদের ধারণার মধ্যে ভুল

কিছু থাকতে পারে কিংবা এ বিষয়ে তোমারও কিছু বলার থাকতে পারে—সেটুকু শোনাও অত্যন্ত প্রয়োজন। বলো, তোমার কিছু বলার আছে?

রঙ্গিলা প্রদোষের মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে শেষটা বললো—মা আমি কিছু বলবোনা, তুমি যা বলবে তা-ই হ'বে।

—তাহ'লে এ বিয়েতে তোমার সম্মতি আছে এই বুঝে নিতে হবে তো?

—সে তো তুমি জানোই—তা আবার নতুন ক'রে জিগেস করছো কেন?

প্রদোষ রঙ্গিলার কাছে স'রে এসে ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বললো—বুঝেছি, তোমার এতদিনের জমা অভিমান আজ তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

একটি কথায় একটু স্পর্শে রঙ্গিলার আবার যেন মনে হ'লো যে প্রতীক্ষার লগ্ন তার যাই-যাই ক'রেও যেন আজো পার হ'য়ে যায়নি—ওর চোখ দু'টি একটু চক্ চক্ ক'রে উঠলো, গলাটা কেঁপে উঠলো কথাগুলো বলতে—সারাটা ফুলের মরশুম তোমারি প্রতীক্ষায় রইলুম, শেষটা তুমি এলে কিনা পাতা ঝরার বেলায়, হায় রে আমার কপাল! আমার এখন কান্না পাচ্ছে কমরেড বলো তো কী করি?

প্রদোষ রঙ্গিলার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে।

পরের দিন হিমাংশু সংঘের তরফ থেকে নানা রকম উপহার-উপঢৌকন নিয়ে এসে হাজির হ'লো। একটি মুটের মাথায় কাঁধে বোঝাই জিনিশপত্র।

ব্যাপার দেখে রঙ্গিলা বলে—ও মা কোথায় যাবো গো, একি কাণ্ড করেছো ভাই তোমরা! গোটা গন্ধমাদন পর্বতটাই উঠিয়ে এনেছো নাকি?

স্মিতহাস্তে গদ্‌গদভাষণে হিমাংশু বলে—ভক্ত হনুমান যে রঙ্গিলাদি।

সমস্ত জিনিশপত্র খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রদোষ ব'লে ওঠে—গোটা গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে বের করেছি রঙিল, এই নাও।

ব'লে প্রদোষ রঙ্গিলার হাতে সোনালি রূপোলি কাজ-করা অত্যন্ত লোভনীয় একটি হাতীর দাঁতের বাক্স তুলে ভায়। রঙ্গিলা সেটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে বলে—বাঃ, বড়ো সুন্দর জিনিশ তো এটি।

হিমাংশু রঙ্গিলাকে বলে—এটি হ'চ্ছে আপনাকে দেওয়া বন্ধুদার উপহার। প্রদোষদা এটি ভুলে ফেলে এসেছিলেন আসার সময়ে, বন্ধুদা তাই আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে তিনি আপনাকে একখানি চিঠিও দিয়েছেন।

হিমাংশুর হাত থেকে বন্ধুর চিঠিখানি নিয়ে রঙ্গিলা পড়ে, বন্ধুদা লিখেছে: তোমার বিয়ে-উপলক্ষে এটি আমার উপহার। জিনিশটা হয়তো সামান্তই কিন্তু এটির ইতিহাস আছে। এটি আমার মায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো—তাই এটি

তোমাকে দিয়ে তৃপ্তি পেলাম। তোমাকে পৌঁছে দিতে প্রদোষের হাতেই এটা দিয়েছিলাম কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার সময়ে সে সম্ভবত তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে। তাই হিমাংশুর হাতে পাঠালাম। তুমি এটা এখন খুলোনা, বিয়ের আগে তো নয়ই। ভেতরে কী আছে দেখার কৌতূহল আপাতত তুমি দমন কোরো—এটুকুই আমার একান্ত অনুরোধ। সেজন্য এটি আমি শীল ক'রে পাঠালাম। Pandora-র বাক্সের গল্পটা জানো? না জানা থাকলে প্রদোষের কাছ থেকে জেনে নিও তাহ'লে স্বভাবতই আর লোভ হবেনা খুলতে। বিয়ের পর অবশ্যই তুমি খুলতে পারো।'

প্রদোষকে বন্ধু লিখেছেন: 'প্রদোষ, তুমি তো জানোই বর্তমানে আমি কী রকম ঘটনাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। তবু তোমাদের বিয়ের দিনে যে-কোনো রকমে পারি উপস্থিত হ'বার চেষ্টা করবো। তবে অনিবার্য কারণে যদি আমি নাও উপস্থিত থাকতে পারি তাতেও ক্ষতি নেই। নির্দিষ্ট দিনে তোমাদের বিয়েটা হওয়া চাই। তোমাকে আর কী লিখবো এবিষয়ে তুমি তো জানোই সব।'

রঙ্গিলা বলে—তুমি তো জানোনা ভাই হিমাংশু আমি এখানে একটি বোন পেয়েছি ইতিমধ্যে। শোনোনি বন্ধুদার কাছে?

হিমাংশু বলে—হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি এখনো এখানেই আছেন কি? তাহ'লে সুবিধেই তো।

রঙ্গিলা হাঁক ছায়—মলয়া, একবার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসোনা ভাই।

মলয়া পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়ায়।

রঙ্গিলা বলে—এই হ'লো হিমাংশু—বড়ো সৎ ছেলে—আমাদের সংঘের একজন বিশিষ্ট কর্মী। (হিমাংশুর দিকে ফিরে) এই আমার নতুন বোন—মলয়া। আজ ক'দিন আমার পাঠশালার ভার এর হাতে ছেড়ে দিয়েই তো আমি নিশ্চিন্ত আছি।

হিমাংশু মলয়াকে বলে—সুবিধেই তো হ'য়েছে তাহ'লে—সাম্‌নে কাজ, আরো অনেক ভারই তো নিতে হ'বে আপনাকে।

সবিস্ময়ে মলয়া ব'লে ওঠে—আচ্ছা রাঙাদি, কী চাপা মেয়ে বাপু তুমি—এদিকে সব ঠিকঠাক অথচ একটু জানতেও পারলুমনা। বিয়েটা প্রদোষবাবুর সঙ্গেই বুঝি?

হিমাংশু বলে—এই তো সবই জেনেছেন।

—জানিনে কিছুই; তবে আন্দাজ করছি।

—ঠিকই আন্দাজ ক'রেছেন।

নিঃশব্দে হাসছিলো রঙ্গিলা মলয়া যখন জিগেস করলো—বিয়ে কবে রাঙাদি?

—কে জানে ভাই—আজ, কাল, কি পরশু যবে হয় হ'লেই হ'লো। পাঁজি দেখার হাঙ্গামা তো আর নেই।

মলয়া বলে—তুমি যাই বলোনা কেন, আমার কিন্তু এ ভালো লাগছেনা, এ কী রকম বিয়ে? পাঁজি নেই, পুরুত নেই, মন্তর নেই?

রঙ্গিলা হেসে ফ্যালে, বলে—বলো, বলো, ঠিকই বলছো, বাজনা নেই, বাতি নেই, ব্রাহ্মণ-নবশাক-ভোজন নেই সত্যি কথা…

প্রদোষের দিকে ফিরে রঙ্গিলা বলে—শুনছো তো কমরেড, নিন্দে হ'বে যে। (আবার মলয়ার দিকে ফিরে) তুমি ভাই দেখছি আজো খাঁটি বঙ্গললনাই রয়ে গেছো। নাই বা থাকলো পাঁজি, নাই বা থাকলো পুরুত, নাই বা থাকলো মন্তর, আমাদের সাক্ষী আছো তুমি, সাক্ষী আছে হিমাংশু, আমাদের আছে সংঘের খাতায় চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর—আমাদের আছে সংঘের অনুমোদন, পেয়েছি বন্ধুদার আশীর্বাদ—তুমি কি ভাবো মন্তর-পড়া বিয়ের চেয়ে আমাদের এ বিয়ের বাঁধন কম শক্ত?

এরপর মলয়া আর কিছু বলতে পারেনা।

প্রদোষ বলে—পাঁজি পুরুত মন্তর ছাড়াও আরো গলদ আছে—কন্যাকর্তা কই? বরকর্তা কই?

রঙ্গিলা বলে—কন্যাকর্ত্রী হ'বে মলয়া।

সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষও যোগ ক'রে দ্যায়—বন্ধুদার অনুপস্থিতিতে হিমাংশু হ'বে বরকর্তা।

খুব একচোট হাসির হুল্লোড় প'ড়ে যায়।

হাসি থামলে হিমাংশু বলে—আমাকে তাহ'লে এবার যেতে হ'চ্ছে প্রদোষদা।

—তুমি কি এখানে থাকবেনা তাহ'লে?

—না; আমি তো বাসা পেয়েছি এখান থেকে দু'ক্রোশ উত্তরে একটা গ্রামে। ঘর-দোর সব এলোমেলো হ'য়ে আছে। আমার মন প'ড়ে আছে সেখানে, আর দেরি করবোনা।

—চলো তোমায় একটু পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রদোষও হিমাংশুর পেছন পেছন বেরিয়ে যায়।

রঙ্গিলা যেন আর এক মুহূর্ত্তও ভুলে থাকতে পারেনা বন্ধুদার অমন সুন্দর উপহারটির রহস্য। সোনালি কাজ-করা সেই ছোটো হাতীর দাঁতের বাক্সটি—ওরই মধ্যে যেন প'ড়ে আছে তার মন। যতোক্ষণ সে জেগে থাকে তার কৌতূহলও জেগে থাকে। প্রদোষের কাছ থেকে Pandora-র পেটিকার কাহিনীটা

শুনে নেওয়ার পর থেকে সে কিছুতেই যেন তার কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রে রাখতে পারছেনা। কোনোমতে একটা দিন কাটালো—বিয়ের আগে খুলতে মানা ক'রেছেন বন্ধুদা। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হ'লো। রিবনে বাঁধা সীল-করা বাক্সটি কানের কাছে এনে নাড়লে খড় খড় শব্দ হয়। কী আছে কে জানে! প্রদোষের সামনে খুললে প্রদোষ কি তাকে বাধা দিতো? তবে! কেন সে এটা গোপনে খুলতে চাচ্ছে? কেন আবার—এম্নিই! প্রদোষকে সাক্ষী রেখে খুলতে কেমন যেন দ্বিধা, কেমন যেন লজ্জা হ'য়েছিলো।

কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললো রিবনের বাঁধনটা। তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো কেন, একি আবেগ, একি ভয়? কিন্তু ভয়ই বা কিসের? পাছে প্রদোষ দেখে ফ্যালে? কিন্তু দেখলোই বা? বন্ধুদা এটা তো ওর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ও তো আনেনি। আনেনি কেন? ভুলে ফেলে এসেছিলো না ইচ্ছে ক'রেই? সে যাই হোক, এখনো একটা বাঁধন কাটতে বাকি আছে। তার হাত এখনো কাঁপছে—কিন্তু কাঁপবার কী কারণ আছে? কী কারণ আছে ভয় পাবার? সে যে বিয়ের আগেই এটা খুলে দেখে নিয়েছে সেকথা প্রদোষের কাছে লুকোবারই বা কী আছে? জানলেই বা। জানুক না। এবার সে খুলে ফেললো বাক্সের ডালাটা। বাক্সটা খালি—কেবল একটুকরো কাগজ রয়েছে—সেটাই এতোক্ষণ খস্‌খস্ শব্দ করছিলো। কাগজটা পড়লো, লেখা আছে: একেবারে খালি, রঙিল, একেবারেই খালি এই বাক্সটা দিলাম তোমাকে। ইচ্ছে ছিলো ভ'রে দেবো কিন্তু তোমাদের বিয়ে দিতেই ফতুর হ'য়ে গেছি কোথায় আর কী পাই বলো? তোমার এই ছোট্টো বাক্সটি ঘিরে যে শূন্য সেই শূন্যটুকু আশীর্বাদেই ভ'রে দিলাম।

তোমাদের বন্ধুদা

সে তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দ্যায় বাক্সর ডালাটা বন্ধুর আশীর্বাদগুলো যেন সব ডানা মেলে এখুনি পালিয়ে যাবে আকাশে আকাশে, ঝ'রে পড়বে জলে-স্থলে, তার জন্যে আর কিছুই থাকবেনা উদ্বৃত্ত। একটা মর্মান্তিক মমতায় সে বাক্সটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে যেন এখনি কেউ ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে।

—ওকি হ'চ্ছে?···রঙ্গিলা চমকে ওঠে প্রদোষের কণ্ঠস্বরে।

হঠাৎ প্রদোষকে দেখামাত্রই কী যেন এক দুজ্ঞেয় কারণে সে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ে মেঝেয়, আঁচলের মধ্যে বাক্সটা বক্ষস্পন্দনের তালে তালে কাঁপতে থাকে।

প্রদোষ বলে—এঃ! সেই তো তুমি বন্ধুদার নিষেধ মানলেনা, রঙিল! খুলেছো তো বাক্সটা?

রঙ্গিলা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলতে চেষ্টা করে—কে? আমি? হ্যাঁ। কিন্তু···এমন কিছু অপরাধ করেছি কি সেজন্য?

প্রদোষ সহাস্যে বলে—আমি তো বলিনি তুমি অপরাধ করেছো।

রঙ্গিলা প্রদোষের হাতে বাক্সটা তুলে দ্যায়, বলে—তুমি দ্যাখোনা, কিছু নেই, ফাঁকা একেবারে।

বাক্সটা সরিয়ে রেখে প্রদোষ বলে,—সে তোমার আগেই জানি।

—কিন্তু এই শূন্য বাক্স দেওয়াটা বোধহয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলো তো কী এর মানে?···রঙ্গিলা এতোক্ষণে তার অপ্রস্তুতির ভাবটা সাম্‌লে নিয়েছে।

—মানে তো খুব সোজাই অর্থাৎ ফাঁকা—শূন্য—খালি অর্থাৎ বন্ধুদা ভয়ঙ্কর ঠকিয়েছেন তোমাকে—মানে কিছুই দেননি।

প্রদোষ রঙ্গিলার মুখের সামনে মস্ত একটা তুড়ি মেরে বুঝিয়ে দ্যায় বক্তব্যটা।

—মিছে কথা, ধ্যেৎ। তাহ'বে কেন? তুমি ছাই জানো—

—তবে কী?

—ঐ শূন্য বন্ধুদা ভ'রে দিয়েছেন আশীর্বাদে—ছোট্টো একটু চিরকুট রয়েছে বাক্সয়, প'ড়ে দ্যাখোনা।

—ও আর আমায় পড়তে হ'বেনা, জানি। তুমি ভাগ্যবতী, রঙিল। বন্ধুদার দুঃসহ আশীর্বাদ মাথা পেতে নেবার মতো ক'টি মেয়ে আছে এ ভূ-ভারতে।

প্রদোষ স্নেহার্দ্র বাহুর মধ্যে আরো নিবিড় ক'রে টেনে নেয় রঙ্গিলাকে।

রঙ্গিলা বিগলিত স্বরে বলে—বন্ধুদার আদেশ তবে শিরোধার্য হোক। এসো আমরা ওঁর ইচ্ছা কালকেই পূর্ণ করি।

প্রদোষ বলে—তাই হোক। হিমাংশুকে খবর পাঠাই তাহ'লে আজ?

ঘাড় নেড়ে রঙ্গিলা তার সম্মতি জানায়।

প্রদোষ রঙ্গিলার দু'গণ্ডে চুম্বন এঁকে দিতে যায়—প্রদোষের ঠোঁটে লবণাক্ত জলের স্বাদ। বিস্মিত স্বরে প্রদোষ ব'লে ওঠে—একি রঙিল, তুমি কাঁদছিলে নাকি এতোক্ষণ?

রঙ্গিলা প্রদোষের সে-প্রশ্নের কোনো জবাবই দ্যায়না, শুধু প্রদোষের কাঁধে মুখ রেখে চোখ বোজে।

পরাজিত বীর কথা কয়

কলকাতায়ই আবার পটোত্তোলন হ'লো আমাদের আখ্যায়িকার।

দিনকতক পরেকার কথা। খবর পাওয়া গেছে বিরূপাক্ষ জেলের মধ্যে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। খবরটা শুনে পর্যন্ত সতীর মন বড়ো অস্থির হ'য়ে আছে। এদিকে অদ্রির অনর্গল বকুনিটাও আরো যেন বেড়ে উঠেছে হঠাৎ। কখনো কদাচিৎ দু'চারটে ঠিক কথার সঙ্গে অবিশ্রাম ছুট্-কথা সে ব'কে যাচ্ছে। সতীর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে। সর্বদা দোর জানলা বন্ধ ক'রে, ঘর অন্ধকার ক'রে রাখতে হয়—তবেই কিছুটা শান্ত হ'য়ে থাকে। রাত্রে অদ্রীশ প্রায়ই ঘুমোয়না তাই সতীর ঘুমেরও ব্যাঘাত হয়।

পূর্বরাত্রে ঘুম না হওয়ায় সতীর অনেক চেষ্টায়, অনেক আয়োজনে সেদিন দুপুরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়েই অদ্রীশ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম থেকে হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে অদ্রীশ, চেঁচিয়ে ওঠে।

সতী ছুটে এসে বলে—কী? কী হ'য়েছে?

অদ্রীশ বলে—আকাশ অন্ধ হ'য়ে গেছে নতি, বাতাস বন্ধ, নিশ্বেস ফুরিয়ে আসছে। খুলে দাও, খুলে দাও।

অদ্রীশ অন্ধকারে হাঁপাতে থাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যায়, সতী বলে—উঠছেন কেন? বসুন। আমি খুলে দিচ্ছি জানলা। আলো যে আপনি সইতে পারেননা তাইতো খুলিনা—শান্ত হ'য়ে বসুন। খুলে দিচ্ছি।

জানলা খুলে দ্যায় সতী। পশ্চিমের জানলা দিয়ে অবেলার আলো এসে ঘর ভরিয়ে তোলে। পশ্চিমের দিগন্ত-চিতায় কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়ার আড়ে সূর্য জ্ব'লে যায়!

মুহূর্তখানেক জানলার বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতে অদ্রি ফের অশান্ত হ'য়ে ওঠে, বলে—জ্ব'লে গেলো, জ্ব'লে গেলো, দিগ্বিদিক্ জ্ব'লে উঠেছে দেখছোনা! ছাখো, ছাখো। এই আগুনের পায়েই প্রণতি তার প্রণাম শেষ ক'রে গেছে। উঃ কী আগুন। আঁচ লাগেনা গায়ে? কী ক'রে তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখো, কী ক'রে তোমরা সহ্য করো এই আলো, এই আগুন? বোকা, আলোর পোকা, পুড়ে মরবে যে ভয় নেই? আমি সইতে পারবোনা; অন্ধকার করো, অন্ধকার। বলিনি আমি তোমায়, সে-আগুন নেবেনি এখনো—প্রদীপ-শিখা ছোট্টো কেন ভাবো তাইতে ছাখো সূর্য জ্ব'লে যায়।

সতী আবার জানলা বন্ধ ক'রে দ্যায়।

ঘরের বাইরে বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেলো, কে যেন আসছে! সতী যাচ্ছিলো দেখতে এমন সময়ে বাসবীও ঢুকতে যাচ্ছিলো ঘরে। বাসবীকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে সতী হঠাৎ যেন খুশিতে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলো।

—উঃ, বাসবীদি? আমি ভাবছিলুম কে না কে! কবে ফিরলে, কেমন আছো?

বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বাসবী বলে—যেমন দেখছো তেমনই আছি। কী রকম দেখছো, বলো তো?

সতী ভেবে-চিন্তে বলে—যেন ঠিক শীতের পদ্মটি! একটু শুকনো শুকনো বটে কিন্তু কিছু কম সুন্দর নয় তা' বলে। ঐ যে মহাজনপদে আছে না—'দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু'···ওটা যেন ঠিক তোমারই উপমা!

সলজ্জা বাসবী প্রথমটা সতীকে ধমকে উঠলো—ধ্যেৎ! ফাজলামি হচ্ছে?

তারপর গূঢ় হেসে বললো—আজকাল খুব কবির হাওয়া গায়ে লাগানো হচ্ছে বুঝি? কথায় কথায় এতো কবিত্ব যে?

সতী বলে—কবিত্বই বলো আর যা-ই বলো কথাটা কিন্তু একেবারে সত্যি। বাড়িয়ে বলিনি একটুও।

তারপর আরো গাঢ় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বললো—তোমাকে কাছে পেয়ে মনের ওপর থেকে যেন বিশ মণ বোঝা নেমে গেলো। শুনেছি তোমাদের সব কথা—সত্যি বড্ডো ভাবনা হ'য়েছিলো তোমাদের জন্যে। বিশেষ ক'রে তোমার জন্যে—যখন শুনলাম তুমি স্বেচ্ছাপ্রবাসের সংকল্প নিয়েছো তখন মনে হ'লো সব কিছু ফেলে-ঠেলে ছুটে যাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধ'রে-বেঁধে যে কোনো রকমে পারি ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

সতী খুব সাবধানে শারীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলো পাছে বাসবী ব্যথা পায়।

বাসবীর পিঠখানি বাহুতে বেড়ে নিয়ে খুব কোমল এবং অন্তরঙ্গ স্বরে বলে—কী যে আনন্দ হ'চ্ছে আবার তোমাকে পেয়ে। কবে ফিরলে?

—এই তো সপ্তাহখানেক হ'বে।

—এই তো কতোগুলো মাস মাত্র গেলো কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতো যুগ পার হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে কতো কী-যে ঘটে গেলো! তোমাদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যেন বন্যার জল বয়ে গেছে—চারিদিকে চেয়ে যেন আর কিছুই চেনবারও উপায় নেই। এসো, চলো ও-ঘরে বসবে।

বাসবী বলে—এবার তাহ'লে চলোনা ওগো ভাঙা স্বর্গের প্রহরী, ভগ্নসভার

আব্‌ছায়ায় একলা দাঁড়িয়ে তোমার ভাঙা স্বর্গটা একবার দেখে আসি। নিয়ে চলো। মনে নেই সেই চিঠিতে যে লিখেছিলে অদ্রীশবাবুর কথা?

স্মিতমুখে সতী বলে—বেশ, তাই এসো। বোসো ঐ চেয়ারে।

বাসবীকে সতী একখানা চেয়ার দেখিয়ে ছায়। বাসবী বসে।

—উনি কি ঘুমোচ্ছেন? তাহ'লে না হয়···

—না; উনি জেগেই আছেন। যে-সময়ে বকুনিটা কিছু কম থাকে সে-সময়ে চোখ বুজিয়ে ঐ ভাবে কাটান। চিন্তাশীল মানুষ তো··

ওদের মৃদু কথার শেষাংশ হয়তো অদ্রির কানে গিয়েছিলো। ইজি-চেয়ারে শয়ান অদ্রি চোখ মেলে চায়, বলে—কে? কে তুমি? কে তুমি?

বাসবী অদ্রীশের পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—আমাকে কি চিনবেন? বললেও কি চিনবেন?

চেনবার প্রবল চেষ্টায় অদ্রীশ ভ্রূ কুঁচকে দৃষ্টিটা একটু প্রখর ক'রে তোলে।

বাসবী সতীর সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

মৃদু জড়ানো কণ্ঠস্বরে অদ্রীশ ব'লে ওঠে—সত্যি কি চিনিনে? হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনিনে; আমায় ব'লে দেবে কে?···নতি, নতি, কোথায় গেলে নতি? আমায় সাহায্য করো।··ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যায় অদ্রীশ।

সতী এগিয়ে যায়, বলে—এই যে আমি। বসুন, বসুন।

বাসবীর দিকে ফিরে সতী বলে—বোসোনা তুমি বাসবীদি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ চেয়ারটায় বোসো।

বাসবী বসে, বলে—ঘর এতো অন্ধকার ক'রে রেখেছো কেন ভাই? ঘর একেবারে বন্ধ যে, একটু আলো-বাতাস ঢুকুকনা।

অদ্রীশ ব'লে ওঠে—চিনিনে, চিনিনে, কে তুমি? কিন্তু ঠিক বলছো তুমি। আলো ঢুকুক, বাতাস ঢুকুক, অন্ধকার কাটুক।

বাসবীর দিকে ফিরে সতী বলে—উনি যে আলো সইতে পারেননা মোটে। কেবলই বলেন বন্ধ করতে, কী করবো তাই বন্ধ ক'রেই রাখি।

অদ্রীশ ইজি-চেয়ারে শুয়ে প'ড়ে তখন গোঙাচ্ছে, যেন আর্তনাদ করছে—আলো ···আরো আলো·· আরো আরো আলো—আরো হাওয়া···নিশিতে-পাওয়া মনের গায়ে লাগুক কিছু আলো···লাগুক কিছু ভগবানের হাওয়া। খুলে দাও জানলা, খুলে দাও।

আবার জানলা খুলে দ্যায় সতী। তখনই পড়ন্ত পশ্চিমের রোদ সোনার জলে ধুয়ে দিলো ঘরখানা—আভা পড়লো বাসবীর মুখেও।

সতী বলে—চিনতে পারছেন ?—এই হ'লো বাসবীদি।

বাসবী বলে—আমি বাসবী। কখনো কানে এসেছে নামটা ?

—তুমি বাসবী ? বাসবীর দিকে চেয়ে অদ্রীশ বলে। পরমুহূর্তেই সতীর দিকে চেয়ে বলে—তুমি বুঝি উপবাসবী ?

ম্লান হেসে সতী বলে—হ্যাঁ তাই। আপনি ঠিকই বলেছেন।

—বাসবী-উপবাসবীর গল্প তোমরা পড়েছো কেউ ?···বেশ প্রকৃতিস্থের মতোই এবার প্রশ্নটা করে অদ্রীশ।

সতী ও বাসবী উভয়েই বলে—না।

—কী আশ্চর্য ! ভুলে গেলুম নামটা। কী যে বললে, কে এসেছে ?

সতী ব'লে ছায়—ওঁর নাম বাসবী। মনে রাখুন নামটা এবার।

অদ্রীশ বাসবীর নামটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো—বাসবী ?

সতী আরো ব'লে দিলো—আপনার সহপাঠী অজবাবু···মনে আছে তাঁকে ? ইনি হলেন তাঁরই স্ত্রী। চিনেছেন এবার ?

মুহূর্ত কয়েক অদ্রীশ স্মৃতি উদ্রিক্ত ক'রে নিয়ে বলে—অজবাবুর স্ত্রী ? কে অজ ? ওহো অজুর স্ত্রী ? কোন্ অজু—ছাট্ হ্যাপি-গো-লাকি চ্যাপ, না, না তা হ'তেই পারেনা—মিছে কথা বলছো। ওকেই জিগেস করো, ওই বলুক। কই, উঠে এসো তুমি, বোসো এই চেয়ারে।

অদ্রীশ বাসবীকে ডাকে তার পাশে। বলে,—আচ্ছা তুমিই বলো, তুমি না স্পার্টার মেয়ে ? মেনেলায়ুসের স্ত্রী ? প্রথমটায় আমি ঠিক কনেক্ট করতে পারছিলুমনা—আজকাল মাঝে মাঝে আমার এ-রকম হয়। বহুদিন আগে বহু যুগ আগে আমি দেখেছি, চিনে রেখেছি এই মুখ, এই মুখের আদল। ছাখো, ছাখো তুমি নতি, এই মুখ নয় ? আমার কি এতোটাই ভুল হ'চ্ছে ? হাসছো কেন. তুমি হেলেন ? তুমিই তো সেই—

> She who had brought great Hector down
> And put all Troy to wreck.

ব'লে অদ্রীশ নিজের শয্যা ছেড়ে উঠে বাসবীর কাছে গিয়ে মুখ নিচু ক'রে কী যেন দেখলো তারপর মর্মান্তিক শ্লেষের হাসি হেসে উঠে নিজমনেই বললো—

> তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ ক'রে দেবে ?
> উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।···অদ্রীশ নঙর্থক ঘাড় নাড়লো।

বললো—কী বলো ? না না, উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।

বাসবী ও সতী নিরুত্তর।

শেষটায় রঙ্গমঞ্চের বিমূঢ় নায়কের মতো উদাত্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলো—

Was this the face that launch'd a thousand ships,
And burnt the topless towers of Ilium ?—
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.—

অদ্রীশ বাসবীর চিবুক স্পর্শ করতে উদ্যত হয়।

সতী বাসবীকে চাপা গলায় বলে—আপনি স'রে যান বাসবীদি, স'রে যান।

বাসবী স'রেও যায়না, অদ্রীশকে বাধাও ছায়না। বরং সতীকেই হাত ধ'রে পাশের দিকে ঠেলে ছায়, বলে—উঁহুঁ তুমি তাব'লে অদ্রীশবাবুর সঙ্গে জোর কোরোনা। হোকগে। হোকগে।

বাসবীর ভাবখানা যেন বাঘ-ভাল্লুক তো আর নয়, মানুষ তো ; পালাবার কী আছে ?

আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অদ্রি তখনো বলতে থাকে—

Her lips suck forth my soul : see where it flees !—
Come, Helen, come, give me my soul again.
Here will I dwell, for heaven is in these lips,
And all is dross that is not Helena.

আবৃত্তির শ্রমে অদ্রীশ যেন হাঁপাতে থাকে খানিকক্ষণ। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বাসবীর দিকে। বাসবীর চোখের দৃষ্টি তার সামনে মাটির দিকে নেমে আসে।

সতী ব'লে—তুমি তো এখন আছো খানিকক্ষণ, না বৌদি ?

বাসবী বলে—হ্যাঁ। বোসোনা তুমি।

সতী বলে—আসছি, এক মিনিট।

সতী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অদ্রীশ ডাকলো—সতি ! ছাখো, ছাখো—

What is this face, less clear and clearer
…more distant than stars and nearer than the eye
Whispers and small laughter between leaves and
hurrying feet
Under sleep, where all the waters meet.

অদ্রীশ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছায় বাসবীর মুখের দিকে।

সতী হাসতে হাসতে বলে—আমি দেখেছি, আপনি দেখুন, আপনি তো এই এই প্রথম দেখলেন।

অদ্রীশ বাসবীকে ব'লে উঠলো—There is none like thee…

Thine arms are as a young sapling under the bark ;

Thy face as a river with lights.

…As a rillet among the sedge are thy hands upon me ;

Thy fingers a frosted stream.

সতী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাসবী অদ্রীশের খেয়াল প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বলে—অদ্রীশবাবু, একটা সাহিত্য-পত্রিকা শিগ্‌গিরই বের করছি আমরা। তাতে আপনার লেখা চাই।

—কিন্তু আমি তো আর লিখিনা।…অন্য আর একজন মানুষ যেন কথা ক'য়ে উঠলো এতটা সহজ স্বাভাবিক অদ্রীশের কণ্ঠস্বর! সময়ে সময়ে বাসবীর সন্দেহ জাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায়না যে, এই মানুষ পাগল।

বাসবী ব'লে ওঠে—না, না, আপনি আবারও লিখবেন। কী হ'য়েছে আপনার? কেন লিখবেননা আপনি? কেন?

বাসবীর প্রশ্নের উত্তরে অদ্রীশ ব'লে ওঠে—For in the morn of

my years there came a woman

As moonlight calling,

As the moon calleth the tides,

'Song, a song.'

Wherefore I made her a song and she went from me

As the moon doth from the sea,

But still came the leaf words, little brown elf words

Saying 'The soul sendeth us.'

'A song, a song!'

And in vain I cried unto them 'I have no song

For she I sang of hath gone from me.'

বাসবী খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে অদ্রীশের মুখের দিকে—নাতিগৌরমুখের রং রোদে পুড়ে তামাটে—সুগঠিত কপাল প্রতিভার প্রস্ফুট চিহ্নে প্রশস্ত—মাথার চুল ঈষৎ পাতলা হ'য়ে গেছে—আশ্চর্য চোখ দুটোর উদ্‌ভ্রান্তির ফাঁকে ফাঁকে অসামান্য গরিমা ও অনন্যসাধারণ দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই মানুষ পাগল? অসম্ভব মনে হয় যেন। সাধারণের চেয়ে এতটাই পৃথক্ যে কেন্দ্রচ্যুতিই যেন এঁকে মানায়—যা হ'য়েছে এই ছাড়া যেন অন্য কিছু এঁকে মানাতোনা

আজ যে অবস্থায় উনি এসে পৌঁছেছেন তার জন্য দায়ী কে? প্রশান্তির মৃত্যুই কি?

অগ্নীশ নিজের খেয়ালে তখনো যা কিছু ব'লে যাচ্ছে তা থেকেই বাসবী তার প্রশ্নের জবাব পায়।

অগ্নীশ বলছিলো :

She hath drawn me from mine old ways,
Till men say that I am mad;
But I have seen the sorrow of men, and am glad,
For I know that the wailing and bitterness are a folly.
And I? I have put aside all folly and all grief.
I wrapped my tears in an ellum leaf
And left them under a stone
And now men call me mad because I have thrown
All folly from me, putting it aside
To leave the old barren ways of men,
Because my bride
Is a pool of the wood, and
Though all men say that I am mad
It is only that I am glad,
Very glad, for my bride hath toward me a great love
That is sweeter than the love of women
That plague and burn and drive one away.

বাসবী খুব কোমল আর্দ্র কণ্ঠে প্রায় মিনতির স্বর তুলেই বলে—যাই হোকনা কেন আপনার, যাই কিছু ঘটুকনা কেন আপনার জীবনে, আপনাকে আবার লিখতে হ'বেই। স্বক্ষেত্রে আপনাকে আবার আমরা প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। স্বধর্মেই বাঁচুন আপনি। লেখাই আপনার ধর্ম—সাহিত্যই আপনার জীবন—সৃষ্টিই আপনার কাজ। শেষপর্যন্ত তাই মনে-প্রাণে একে অবলম্বন করলে তবেই আপনি বাঁচবেন, একে ত্যাগ করলে কিছুতেই আপনি বাঁচবেননা। এতেই আপনার মুক্তি, এতেই আপনার শান্তি, আর কোথাও নয়, আর কিছুতেই নয়।

—তুমি ভালোবাসো আমার লেখা!...আশ্চর্য স্বাভাবিক শোনায় এবার অগ্নীশের প্রশ্নটা।

বাসবী বলে—ভালোবাসিনা? কী বলেন?

—তুমি কি কোনো বই পড়েছো আমার?

—পড়েছি মানে? আমি যে আপনার লেখার মস্ত একজন ভক্ত—আপনার কান বইটা পড়িনি তাই জিগেস করুন।

এমন সময়ে সতী ঘরে ঢুকলো।

বাসবী বললো—সতী জানে, ওকে জিগেস করুন।

সতী বলে—সে সত্যি, বাসবীদি-কে আমাদের মতো ভাববেননা—উনি যথেষ্ট পড়াশোনা ক'রে থাকেন আর তা ছাড়া ওঁর পড়াশোনা করবার সুযোগ-সুবিধেও আছে। বিশেষ ক'রে আপনার বইগুলো তো উনি অত্যন্ত আদর ক'রেই পড়েন এবং বোঝেনও।

বাসবী অম্নি সবিনয়ে বলে—সবই যে ঠিক ঠিক বুঝি এতো বড়ো ধৃষ্টতার কথা বলবোনা। তবে, আমার ভালো লাগে আপনার লেখা যতোটুকু বুঝি তার জন্যেও, যতোটুকু না বুঝি তার জন্যেও। আজ বছর দেড়েক আগে আপনার সাম্প্রতিকতম বই 'সব্‌জে স্বর যখন প্রথম বেরোলো তখন দিনের পর দিন আমার কী ভাবে যে কেটেছিলো মনে আছে সেকথা আজো। মন কী রকম হ'য়ে ছিলো ক'দিন—সে আর কী বলবো? সেই মানুষ, সেই মন কি এমন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যেতে পারে? একথা কি বিশ্বাস হয়? আবার লিখতেই হ'বে আপনাকে—লেখার জন্য আমরা ভালো পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করেছি।

অদ্রীশ বলে—কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে আমি যে আর লিখবোনা ঠিক করেছি। লেখায় Professionalism-কে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতে শুরু করেছি কিছুকাল থেকে।

—কেন? Professionalism-কে ঘৃণা করলে চলবে কেন আপনার, লেখক আপনি, এই তো আপনার পেশা।

অদ্রীশ সখেদে ব'লে ওঠে—ওঃ, হোঃ, হোঃ! এবং তৎক্ষণাৎ ওর কণ্ঠ আবার উদ্ধৃতি-মুখর হ'য়ে ওঠে—

O God, O Venus, O Mercury, patron of thieves,
Lend me a little tobacco-shop,
or install me in any profession
Save this damn'd profession of writing,
where one needs one's brains all the time.

ঘৃণা করি আজকাল লেখাকে—ঘৃণা করি। লেখার চেয়েও তামাকের প্রয়োজন

জগতে আরো ঢের বেশি। লেখকের চেয়েও বেশি প্রয়োজন তামাক ব্যবসায়ীর সিগারেটের টিনটা কোথায় রেখে গেলো নতি। জানো, তামাক নইলে আজকাল আর মোটেই বাঁচতে পারিনা আমি।

—সতীকে ডেকে দিচ্ছি।···বাসবী সতীকে ডেকে আনতে উদ্যত হয় কিন্তু অদ্রীশ বারণ করে, বলে—থাক, তুমি যেয়োনা বোসো আর একটু। তাম্রকূটের চেয়ে খারাপ লাগবেনা সেটা—

I rests me to be among beautiful women.

Why should one always lie about such matters?

I repeat:

It rests me to converse with beautiful women

Even though we talk nothing but nonsense.

তবু বাসবী আর একবার বলে—সতী বোধহয় শুনতে পায়নি আপনার ডাক। আমি সতী-কে ডেকে নিয়ে আসছি এখুনি।

আবার অদ্রীশ নিষেধ করে—না, আমি জানি ও হয়তো বিছানা নিয়েছে। আহা, থাকগে।

বাসবী একটু বিস্ময়প্রকাশ ক'রে জিগেস করে—বিছানা নিয়েছে? কেন! কী হ'য়েছে সতীর? অসুখ হ'য়েছে নাকি?

অদ্রীশ বলে—অসুখ? কই না। জানিনা অন্তত। কিন্তু অসুখের চেয়েও মস্ত একটা সুখ হ'য়েছে যে ওর—'She is dying piece-meal of a sort of emotional anæmia.'

ক্রমশই বাসবীর আশ্চর্য লাগছিলো অদ্রীশকে—এ-রকম অসাধারণ পাগলের সংস্পর্শে বাসবী তার জীবনে এই প্রথম এলো।

বাসবী বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে থাকে অদ্রীশের দিকে। ইতিমধ্যে অদ্রীশ কেমন আবার একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে। বাসবীর মনের কোথাও যেন একটু আর্দ্র হ'য়ে উঠলো, বললো—এক মিনিট আমি আসছি বাইরে থেকে, আমায় অনুমতি দিন।

ঘুমের ঘোর মাখানো বাসবীর দু'টি চোখের দিকে অদ্রীশ খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললো—তুমি কি চ'লে যাচ্ছো?

একটি অকারণ দীর্ঘশ্বাসে বুকটা স্ফীত ক'রে বেরিয়ে যেতে-যেতে বাসবী ব'লে যায়—আসবো বৈকি, এখ্‌খুনি আসছি।

অদ্রীশ আপন মনে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে আবৃত্তি ক'রে চলে—

With slow reluctant feet and weary eyes
And eyelids heavy with the coming sleep,
With small breasts lifted up in stress of sighs,
She passed as shadows pass amid the sheep
While the earth dreamed and only I was 'ware
Of that faint fragrance blown from her soft hair.

—বাসবীদি এখানে দাঁড়িয়ে যে ?

—এই তো তোমারই খোঁজে ভাই। অদ্রীশবাবুর সিগারেটের টিনটা কোথা ? তিনি চাইছেন।

—চলো যাচ্ছি। কেমন দেখলে, বলো ?

—আশ্চর্য ! একটুখানি পাগলামি না হ'লে বোধহয় অমন মানুষকে মানাতো না কিছুতে। তুমি তাহ'লে যাও এবার তোমার ভাঙা দুর্গ পাহারা দিতে। পরিশ্রম তোমার মিথ্যে হ'বেনা সতী—

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

—দরকার নেই, বৌদি, কোনো কিছু মিলে। আমি শুধু ছুটি চাই।

—কিন্তু ছুটি চাইলেই কি মেলে ?

এমন সময়ে মোটর ড্রাইভার ডাকতে আসে বাসবীকে।

বাসবী বলে—চললুম ভাই। অনেকক্ষণ এসেছি। আজ ওঁর শরীরটা অসুখ দেখে এসেছি।

সতী বলে—আচ্ছা যাও। এম্নি ক'রে এসো কিন্তু মাঝে-মাঝে।

বাসবী বলে—আসবো বৈকি। চলো, অদ্রীশবাবুর কাছে ছুটি নিয়ে যাই।

সতীর পেছন পেছন বাসবীও ঢুকলো অদ্রীশের ঘরে, বললো—চললুম অদ্রীশবাবু আজকের মতো। দু'একদিনের মধ্যেই আসবো কিন্তু লেখা চাইতে—লেখা চেয়ে বিরক্ত করতে।

অদ্রীশ বলে—লেখা ? লেখা চাও ? আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

—বাসবী বলে—উঁহুঁ, চেষ্টা করবো নয়। চাই-ই চাই।

—চেষ্টা করলেও পারবো কি আর লিখতে ? তোমার কী মনে হয় ?

—নিশ্চয়ই পারবেন।

একটুখানি বাসবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর অদ্রীশ বললো—আচ্ছা তুমি যেতে পারো ; এখন মনে হচ্ছে হয়তো তাহ'লে পারবো।

সতীর দিকে ফিরে অদ্রীশ বলে—নতি, প্যাড্‌টা দাও। কলমটা দাও। বসি এই জানলাটার ধারে ইজি চেয়ারে।

তখন সূর্যাস্ত হ'য়ে গেছে। তবু বেশ আলো রয়েছে বিকেলের।

বাসবী বিদায় নিয়ে চ'লে গেলে সতীও গেলো ওর সঙ্গে সঙ্গে মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

সতী বলে—তুমি মায়াবিনী বাসবীদি, কী যে জাদু জানো তা জানিনে। আবার তুমি ওঁকে কলম ধরাতে পারবে? লেখাবে আবার ঐ মানুষকে দিয়ে? তা তুমি সব পারো।

বাসবী চ'লে গেলে পর সতী আবার যেম্নি অদ্রীশের ঘরে এলো, অদ্রীশ জিগেস করলো—চ'লে গেলো?

সতী বললো—হ্যাঁ।

শুনে যেন হতাশ হ'য়ে সোফায় এলিয়ে পড়লো অদ্রীশ: অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে রগ দুটো টিপে ধ'রে ব'লে উঠলো—She carries within her such a great fund of life! ওঃ··ওঃ···ওঃ···পরক্ষণেই আবার ঠেলে উঠলো, কী যেন হাতড়ালো, কী যেন পেলোনা খুঁজে, শেষটায় বলে উঠলো—উৎসবের মতো বাতি এক মুহূর্তে একটি ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে কে? আবার ডেকে আনলে কে এই অন্ধকারের গুমোট? এই অন্ধকারে তুমিও মরবে নতি, আমাকেও মারবে। খুলে দাও জানলা, খুলে দাও। অন্ধকারেরও ওজন আছে জানোনা তুমি—যা একবার বুকের ওপর চেপে বসলে মানুষ নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে ম'রে যেতে পারে?

—জানলা তো খোলাই আছে, দেখুননা চেয়ে।

—তবে? মন কেন এমন অন্ধকার?

—কী বলছেন এ-সব? দু'একদিনের মধ্যে আপনার লেখা দিতে হবেনা বাসবীদি-কে? লিখে ফেলুন। লিখছেন কোথা?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে অদ্রীশ, বলে—ঠিক কথা বলছো। লেখা? লেখা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এই ঘরের চার দেয়ালের গায়ে, সিলিংয়ে দেখছি আমার মনের কথা স্তরে স্তরে সাজানো; যে-পথ দিয়ে তুমি এসেছো আমার কাছে দু'খানি করুণ হাতের সেবায়, যে-পথ দিয়ে দু'দণ্ডের হেলেন এইমাত্র চ'লে গেলো চোখ ধাঁধিয়ে, সেই সব পথে-পথেই প'ড়ে রয়েছে আমার বলার কথার

বিচিত্র বর্ণস্তূপ! জান্‌লা দিয়ে যেমন ক'রে বিকেলের আলো এসে পড়ছে আমার এই ঘরে, তেম্নি নিঃসাড়েই এরা এসেছে আমার মনে সঙ্গোপনে—যেমন ক'রে বাতাসে ভাসে দূরের বনের ঘ্রাণ তেম্নি ক'রেই আমার মাঝে ভেসে-ভেসে বেড়ায় এই সব কথার জটলা। রাতের তারার ছিদ্র দিয়ে আকাশ থেকে অবিরল ঝ'রে পড়ে এই সব কথার ধারা আমার মনের অন্ধকারে। এই সব জমে-ওঠা কথার ভার নামাবো কী ক'রে কাগজের পিঠে কলমের আঁচড়ে—ভেবে পাগল হ'য়ে উঠি। এই সব কথাগুলোকে অক্ষরে বাঁধবার ধৈর্য হারিয়েছি—আর কিছু নয়। নইলে মন আজো একেবারে মূক হ'য়ে যায়নি।

শুনে সতীর বড়ো আশা হয়। এতোটা প্রকৃতিস্থ অদ্রীশকে সে এই কয় মাসের মধ্যে প্রায় ছ্যাখেনি।

সতী বলে—আপনি লিখুন এই বেলা, লিখুন। আমি স'রে যাচ্ছি এখান থেকে। এই নিন প্যাড্‌, এই নিন কলম।

অদ্রীশ প্যাড আর কলম নিতে নিতে বলে—এবার আমি লিখবো। আবার আমি লিখবো, তুমি আমায় খেতে ডেকোনা নতি, তুমি আমায় শুতে বোলোনা।

অদ্রীশকে লেখার একটা নিভৃত অবকাশ ক'রে দেবার জন্তে সতী স'রে যায় সেখান থেকে।

বাইরে আলো ক'মে এসেছে। সতী একবার উঁকি মেরে দেখে যায় অদ্রীশ তখনো লিখছিলো। নিঃশব্দে এসে একবার আলোর স্থইচ্‌টা টিপে দিয়ে আবার নিঃশব্দেই বেরিয়ে যায়। অদ্রীশ আবার যেন খুঁজে পেয়ে গেছে বহুদিন হারিয়ে-ফেলা আপন সত্তা, তাই নিয়েই সে তন্ময় হয়ে আছে, তার কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সতী বারে বারে এসে উঁকি মেরে দেখে যায়। যতো সে দেখে যায় ততোই আশ্চর্য হয় আর আনন্দে, আবেগে তার আকণ্ঠ হ'য়ে আসে। অদ্রীশের এ চেহারা সতী কখনো ছ্যাখেনি।

(২)

নির্দিষ্ট দিনে বাসবী আসামাত্রই যখন অদ্রীশের লেখাটা একেবারে তৈরি পেলো তখন বড়ো বিস্মিত হ'লো। ততোধিক বিস্মিত হ'লো যখন সে লেখাটা প'ড়ে শেষ করতে পারলো। সতীকে বললো—আশ্চর্য সতী; আশ্চর্য! কে ভাবতে পেরেছিলো যে ওঁকে দিয়ে আবার লেখানো যাবে এমন লেখা! ওঁর অবচেতন মনের অনেকখানিই উনি দিয়ে ফেলেছেন এই লেখাটির মধ্যে। ভাবতেও পারা যায়নি যে এতোটা মূল্যবান লেখা দিয়ে আমরা আমাদের পত্রিকা সুরু করতে পারবো।

সতী হাসতে হাসতে বলে—বাইরের লোক না জানুক, আমি তো জানি লেখানোর পেছনে কতোখানি কৃতিত্ব তোমার।

বাসবী বলে—কিচ্ছু না, লেখকের কৃতিত্বেই লেখা…

সতী বলতে ছাড়েনা—কিন্তু হেলেনের মুখের হাসি নইলে ওই মানুষ কি আবার কলম ধরতে পারতেন?

সলজ্জ হাস্যে বাসবী বলে—আহা-হা থাক্, ঢের হয়েছে! বড্ডো ফাজিল হয়েছো তুমি সতী।

সতী বলে—একটুও বেশি বলিনি আমি।

বাসবী বলে—ওকথা যাক্। গুজব শুনলাম নিরুদাকে ওরা নাকি ছেড়ে দিচ্ছে শিগ্‌গির।

সতী। হ্যাঁ। গুজব আর নয়, পাকা খবর। পরশুদিন সকালে গাড়ি নিয়ে জেলখানার গেটে হাজির থাকতে বলেছেন প্রদোষদা।

বাসবী (সবিস্ময়ে)। প্রদোষবাবু? উনি আছেন নাকি এখানেই?

সতী। এখানেই মানে এ-বাড়িতে নয়। কলকাতায়ই আছেন। অর্থাৎ সম্প্রতি এসেছেন। কয়েকদিন হ'লো তিনি রঙ্গিলাদির সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন।

বাসবী। বাঃ, বেশ, বেশ, সুখবর!

সতী। আরো সুখবর দেবো—আমায় মিষ্টিমুখ করাবে বলো?

বাসবী। কী? শুনি আগে।

সতী। প্রদোষদার সঙ্গে নিরুদাও কলকাতায় এসেছেন, বলো দেখা করতে চাও?

বাসবীর বুকে বেদনার একটা তন্ত্রী হঠাৎ যেন স্পৃষ্ট হয়। সে ব'লে ওঠে—না, থাক্‌গে। ভালো আছেন তো? তাহ'লেই হ'লো।

—ইস্, না বৈকি! না মানেই হ্যাঁ। চেষ্টা ক'রে তোমাকে আর দেখা করতেও হ'বেনা দেখে নিও—দেখা তুমি শিগ্‌গিরই পাবে। এইটুকু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখলুম। উনিও আজকাল সংঘের বেশ একজন গণ্যমান্য কর্মী কিনা। ওঁকে এখন সংঘের কাজে বাংলা-বিহারের নানা পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হ'চ্ছে—সবে তো দু'একদিন কলকাতায় এসেছেন।

বাসবী জিগেস করে—আর…মলয়া-বৌদির কথা জানো কিছু?

সতী। খবর পেলাম বন্ধুদার ও রঙ্গিলাদির তত্ত্বাবধানে তিনি নাকি এখন বেশ ভালোই আছেন! প্রায় সেরে গেছেন বলতে পারা যায়। স্বামীর

সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে ওঁরও বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। অসম্ভবও সম্ভব হ'য়েছে। আরো কয়েকদিন ধৈর্য ধ'রে থাকলেই ক্রমশ জানতে পারবে সব।

ভয়-ভাবনার জুগুপ্সিত গুমোট থেকে আশ্বাসের হাল্কা হাওয়ায় আবার যেন ডানা ভাসাতে পারলো বসন্তের পাখি। বাসবী বাড়ি ফিরে আর কোনো দিকে চাইলোনা একেবারে সোজা গেলো শোবার ঘরে; গিয়ে দাঁড়ালো সেই ভিনাসের প্রতিমূর্তিটির সাম্নে। দেবীমূর্তিকে সম্বোধন ক'রে মনে-মনে বল্লো—আমি জানতুম দেবি, জানতুম, তুমি স্তোক দাও না, ছলনা করোনা। চোখের জলে ভিজে অহরহ যে কামনা ক'রে এসেছি সে-কামনা তুমি অপূর্ণ রাখবেনা। সে কামনা তুমি অনেকখানিই পুরিয়েছো এবার। সুসংবাদ পেয়েছি আমার অ্যাডোনিসের। সন্ধান পেয়েছি। এবার তোমার একটি জুড়ি এনে দেবো। তার সন্ধানেই চললাম। আর তোমায় একলা রাখবোনা।

বাসবীর মন আবার যেন কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছে—এমন কি সাময়িক-ভাবে মন থেকে মুছে গেছে নতুন সাহিত্য-পত্রিকা বের করার তাড়াও। নতুন প্রাপ্তির প্ররোচনায় তার সব তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। সে তখুনি মনস্থ ক'রে ফেললো ঐ ভিনাসের প্রতিমূর্তির জুড়ি একটি অ্যাডোনিসের মূর্তির ফরমাস দিতে হবে কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে। সে তখনই আবার বেরিয়ে পড়লো। অজ তখনো বাড়ি আসেনি।

বড়ো প্রেম আর ছোটো জীবন

মূর্তিশিল্পীর স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলো বাসবী। ওর গাড়ি অদূরে দাঁড়িয়ে। বড়ো রাস্তার পেভমেণ্ট পার হ'য়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে বাসবী এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অনিরুদ্ধের সঙ্গে দেখা। বিস্ময়ের অর্ধস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এলো বাসবীর গলা থেকে—নিরুদা যে ?

—তুমি এখানে ? ··অনিরুদ্ধও অবাক্ হ'য়েছে খুব।

—ভাবিওনি যে আবার দেখা হ'বে। যা কাণ্ড ক'রে নিরুদ্দেশ হ'লে মসুরী থেকে! কী ভাবে যে দেখা হ'য়ে গেলো সেটা কী ভাবতেও পারা যায়? নিয়তিকে তুমি-আমি নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনা, তাই না ?

—হয়তো তাই।

—আচ্ছা তাহ'লে নিয়তির কাছেই আমরা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিনা কেন? তাই হোক, কী বলো ? চলো তবে গাড়িতে।

অনিরুদ্ধ মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললো—চলো।

এরপর দু'জনেই এসে উঠলো গাড়িতে, অনিরুদ্ধ শুধালো—কোথায় এসেছিলে এখানে ?

—অ্যাডোনিসের সন্ধানে।···বাসবী বললো।

—সন্ধান মিললো ?···স্মিতহাস্যে অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করে।

বাসবী অনিরুদ্ধের একখানা হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো—হ্যাঁ, এই যে।

—রঙ্গ ছাড়ো। বলোনা, সত্যি।

—বলছি তো, শিল্পীর স্টুডিওতে এসেছিলাম একটা পুতুলের অর্ডার দিতে।·· ভোলোনি নিশ্চয় সেই যে আমার ভেঙে-যাওয়া অ্যাডোনিস্—আমার ভিনাসের জুড়িদার একটি···।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধ'রে গাড়ি তখন উত্তর দিকে যাচ্ছিলো, অনিরুদ্ধ জিগেস করলো—কোথায় যাবে ?

—বিশেষ কোথাও না। অন্তত তেমন কোনো সংকল্প ছিলোনা মনে। বাড়িই যাবো।

—তবে এদিকে যে ? দক্ষিণ দিকে বাড়ি তাই কি উত্তর দিকে পাড়ি ? বাড়ি পৌঁছবার এই বুঝি সিধে সড়ক ?

বাসবী শুনে হাসে, বলে—সঙ্গে তুমি আছো কিনা, তাই খানিকটা তেল পোড়াতে ইচ্ছে করছে। বেশ বড়ো রকম একটা চক্কর দিয়ে বাড়ি ফিরবো।

—আমি কিন্তু তোমার বাড়ি নামবোনা ব'লে রাখছি।

—বেশ, তাই হ'বে। যেখানে তোমার ইচ্ছা—পথেই নেমে যেয়ো

দু'জনের আলাপ যেন একটা দুর্জ্ঞেয় যতিচিহ্নের প্রান্তে এসে ঠোক্কর খায়। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। বাসবী কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে সে বাধাটা ডিঙোয়, আলাপ আবার সহজ হয়।

—তারপর বৌদির কী খবর? কোথায় নির্বাসন দিলে তাকে?

—নির্বাসন তো দিইনি—অন্তরীণ অবস্থা থেকে বরং মুক্তিই দিয়েছি। স্বস্তি পেয়েছে সে।

—কোথায় আছে বৌদি এখন?

—রঙ্গিলাদির কাছে। জানো তো রঙ্গিলাদিকে?

—জানি, মানে সতীর মুখে শুনেছি বটে, আলাপ নেই।

এই জায়গায় বাসবীর উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে উত্তরে অনিরুদ্ধ মসূরী থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রার পরেকার ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে ফ্যালে।

সব শুনে বাসবী বলে—তাহ'লে এখন তোমাদের এই ছাড়াছাড়িটাই কি পাকাপাকি হ'বে?

—সেটাই তো বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া মলয়ার ব্যাধিমুক্তির জন্য সেটা প্রয়োজনও। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হ'বে যে, রঙ্গিলাদির ওখানে সামান্য পথ্য ও বিনা ওষুধে সে এখন অদ্ভুত রকম ভালো আছে। শুনছি গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজে রঙ্গিলাদিকে মলয়া নাকি সাহায্য করছে। তাই করুক, ভালো থাক, তাই-ই চেয়েছিলুম।

কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে বাসবী যেন একটু বেখাপ্পাভাবে ব'লে ওঠে—আচ্ছা নিরুদা, আমার ওপর মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় তো?

—রাগ হয়? তোমার ওপর? কেন? তোমার হঠাৎ একথা মনে হ'লো কেন বলো তো?

বাসবী হেসে ফ্যালে, বলে—মনে হয়নি গো মনে হয়নি, ঠাট্টা করছিলাম। এও তুমি বুঝলেনা?

তারপর বাসবী বললো—এখন তাহ'লে তুমি কী করবে? ঘর-সংসার চুলোয় গেলো—বাউণ্ডুলের মতো এখান থেকে ওখান ক'রে বেড়াবে নাকি?···বাসবী বেশ ভারিক্কি গলায় মুরুব্বিয়ানা চালে গিন্নির মতো ক'রেই প্রশ্নটা করে।

—কেন, এতেই বা কী ক্ষতি ? ঘর-সংসার করার মধ্যেই বা আমার পক্ষে কী এমন শান্তির প্রতিশ্রুতি ছিলো ? এতে বরং ভালোই থাকবো। সান্ত্বনা পাবার, আশ্বস্ত হ'বার তবু কিছু কারণ থাকবে। মনে হ'বে, তবু যাহোক মহৎ কিছু করছি। জানো, আজকাল বন্ধুদা আমায় সংঘের অনেক কিছু কাজের ভার দেন।

বাসবী আর থাকতে পারেনা, ব'লে ওঠে—তবু ভালো! তুমি দেশের কাজ করবে ?···অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে সে অবিশ্বাসের ভ্রূকুটি করলো।

—কেন বিশ্বাস হ'চ্ছেনা ?

—না সে হ'তেই পারেনা। সে তুমি পারোনা কিছুতে। সকলেই সব পারে নাকি ? প্রেমিকের ভূমিকায় তোমাকে যেমন মানায় দেশোদ্ধারকের ভূমিকায় তেমন মানায়না। ও সংকল্প যদি ক'রেও থাকো, ত্যাগ করো—আমার কথা শোনো। ও তুমি পারবেনা।

—উপায় নেই, পারতেই হ'বে। আরো কতো লোক যে আরো কতো কঠিনতর স্বার্থ ছাড়তে পারছে, আমিই বা কেন পারবোনা ? আমি কি এমনই অধম ?

অনিরুদ্ধের এ কথায় বাসবী ব্যথা পায়, বলে—ক্ষমা করো আমার মনের ক্ষুদ্রতা। আমার মনের ক্ষুদ্রতার মাঝখানেই তোমায় বেঁধে রাখবো চিরদিন—এইটেই খালি ইচ্ছে করে। আমার প্রেম স্বার্থপর ; তুমি অধম হ'তে যাবে কেন অ্যাডোনিস ? তুমি মহৎ—মহতো মহীয়ান। আমি আর কিছু বলবোনা, বাধা দেবোনা। সত্যই তো! তোমার ইচ্ছাই আমার সাধনা—তোমার সকল ইচ্ছা, সকল আদেশের পায়ে আমার আত্মসমর্পণ দিনে-দিনে সত্য হ'য়ে উঠুক।

ভূমিকা ক'রে অনিরুদ্ধ এইবার কথাটা পাড়তে চেষ্টা করে, বলে—বাসবী, একটা জরুরি আর্‌জি আছে তোমার কাছে, এখুনি পেশ করতে চাই। বলো, কথা দাও, তুমি অনুমোদন করবে, অনুমতি দেবে।

—কী আগে কথাটা শুনি ?

—সংঘের কাজে আমাকে ভারতবর্ষের বাইরে যেতে হ'বে।

—তোমাকে যেতে হবে ভারতবর্ষের বাইরে ? কেন, কী এমন কাজ ? সংঘে কী এমনই লোকের অভাব যে তুমি যাচ্ছো ?

—সত্যিই এখন লোকের অভাব, বিশ্বাস করো। বন্ধুদা আমার ওপরই ভার দিয়েছেন। প্রদোষদাও যাচ্ছেন। এখানে আমার আর বড়ো জোর মাসখানেক মেয়াদ আছে।

বাসবী চুপ ক'রেই থাকে

অনিরুদ্ধ বলে—কই, চুপ ক'রে কেন? প্রাণ খুলে অনুমতি দাও—তোমার অনুমতি ও অনুমোদন চাইছি।

বাসবী শুধু বললো—তার কি খুব দরকার আছে?

—নিশ্চয়ই আছে।

—তাহ'লে আমি বলবো তুমি যেতে পাবেনা।

—সে আর হয়না বাসবী।

—তবে এখন এভাবে অনুমতি চাওয়ারও কোনো অর্থ হয়না।

—মানছি সেকথা, কিন্তু এখন আর তার কোনো উপায় নেই। বন্ধুদাকে একবার কথা দিয়েছি। সংঘের ডিসিপ্লিন্ মানতে হ'বে তো।

বাসবী বলে—বেশ, বন্ধুদাকে ধ'রে যেমন ক'রেই হোক, তোমার যাওয়া আমি বন্ধ করবোই, দেখো তুমি।

—ছিঃ, ছেলেমানুষী করেনা!

—কেন? কী দোষ হ'বে তাতে?

—কী দোষ জানোনা? আমার সম্পর্কে তোমার এতোখানি উৎকণ্ঠা লোকচক্ষে অশোভন ঠেকবে। তাছাড়া তার বিশেষ গুরুত্বও দেবেননা বন্ধুদা।

—তাহ'লে? আমাকে কী করতে বলো?

—এতে তোমার কিছুই করার নেই। তুমি শুধু অনুমতি দাও, লক্ষ্মীটি।

—তাহ'লে যাবেই, এই কথা তো? যাও, বেশ।

ব'লে বাসবী একটুখানি থেমে বলে—কবে ফিরবে তার ঠিক আছে কি কিছু?

—বেরোলে ফেরবার ঠিক থাকে কি কিছু? বিশেষ ক'রে সংঘের কাজ নিয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই তো পারছো। কী হ'তে-পারে না-পারে তা কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায়না। আদৌ ফিরে আসা ঘ'টে ওঠে কিনা, কিংবা বিদেশের কারাগারে বাকি জীবন কাটাতে হয় কিনা—এখন থেকে কী ক'রে বলবো বলো?

—সে আশঙ্কা মনে-মনে আমিও ক'রেছিলাম। না, সে হ'বেনা, তুমি যেয়োনা। আমাকে মেরে ফেলোনা তুমি। বদলাও তোমার মত, নিরুদা, লক্ষ্মীটি! আচ্ছা, আমি মলয়া-বৌদির কাছে যাচ্ছি, ব'লে দিচ্ছি এ সব কথা।

—বলবে কাকে? সে তো সব কথাই জানে। সে কি সংঘের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করবে ভাবো?

—সব জানে? সব জেনেও মত দিয়েছে। তার মত তাহ'লে আছে তো?

মলয়ার সঙ্গে যদিও আমার দেখা হয়নি কিন্তু আমি জানি যে, আমার বিদেশ-যাত্রায় তার অসম্মতিও নেই, সম্মতিও নেই।

—বাঃ, বীরবধূ বৌদি আমার !···স্বগতোক্তি ক'রে বাসবী খানিক চুপ ক'রে থাকে। তারপর বলে—আমি জানি আমার নিষেধও তুমি এখন শুনবেনা। তাই হোক, তুমি যাও। ফল যখন কিছু হ'বেনা তখন আমিই বা কেন বাধা দিতে যাই। তবে এ-বিষয়ে আমার মত নিতে চেয়োনা। তুমি তো জানোই প্রাণ থাকতে আমি কিছুতেই এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারবোনা।

অনিরুদ্ধ বলে—বেশ, তবে ওকথা যাক্। কিন্তু প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ-দেহ আকাশ হ'তে···তাহ'লে ? তার জন্যও বিদায় নিয়ে গেলাম বাসবী।

—ইতিমধ্যে ঠিক এরই উল্টোটাও তো ঘটতে পারে। তখন তোমার কি আফ্‌সোসও হ'বেনা যে, একজন ছিলো যে কিছুতেই ছাড়াছাড়ির প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি—সে আজ নেই। বরাবরের জন্যই সে ছেড়ে চ'লে গেছে !

অনিরুদ্ধ হেসে ফ্যালে, বলে—এসো আমরা তাহ'লে চুক্তিবদ্ধ হই যে, ততোদিন আমরা কেউ মরবোনা যতোদিন না আবার আমরা কলকাতায় এসে মিলতে পারি।

বাসবী বলে—হ্যাঁ তাই। তাহ'লে শপথ ক'রে বলছো তো যে ফিরে আসার সুযোগ পেলেই যতো শিগ্‌গির পারো দেশে ফিরে আসবে, দেরি করবেনা ?

অনিরুদ্ধ হেসে ওঠে—সুযোগ না এলেও সুযোগ তৈরি ক'রে নিতে হ'বে, এই তো ?

বাসবী উষ্মার সঙ্গেই ব'লে ওঠে—হ্যাঁ তাই। অতো উপহাসের কী আছে ? কেন, কেবল বন্ধুদার আদেশই আদেশ ? আমার আদেশ আদেশ নয় ? আমার এই যে কাকুতি-মিনতি, ভিক্ষা, অনুরোধ—কিছুরই কি কানাকড়ি দাম নেই ?

খুব নিচু গলায় কথাবার্তা চলছিলো ওদের। অনিরুদ্ধ আরো নিচু স্বরেই বললো—খুব আছে গো, খুব আছে। বড্ডো বেশি আছে ব'লেই তো···

বাসবী ব'লে ওঠে—থামো, থামো। ও-সব মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা প্রথম প্রথম বেশ লাগে।

—মিথ্যে মোটেই নয়।··অনিরুদ্ধ প্রতিবাদ করে।

—মিথ্যে যে নয় সেটা প্রমাণ করো, কেবল কথায় নয়, কাজে।

—করবো বৈকি, সময় এলে দেখে নিও।

এগুলো ওর স্তোকবাক্য কিনা বুঝতে পারেনা বাসবী, সে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে করুণভাবে চেয়ে থাকে।

অনিরুদ্ধ বলে—কেন, আমায় বিশ্বাস হচ্ছেনা ?

—কী জানি বাপু, আমার যেমন কপাল পোড়া বড্ডো যে ভয় হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে বাসবী এবার বলে—আচ্ছা ধরো এমনও তো হ'তে পারে যে, হয়তো ফিরে এসে দেখবে বাসবী আর সে-বাসবী নেই—যাকে তুমি একদিন ভিনাস্ ব'লে ডেকেছিলে। ততোদিনে চুল হয়তো সব শাদা হ'য়ে গেছে, চোখে আর সেই কটাক্ষ নেই, গাল তুবড়ে গেছে, দাঁত হয়তো প'ড়ে গেছে মেদ শিথিল হ'য়ে গেছে, চামড়া লোল হ'য়ে গেছে, মাংসের স্তরে স্তরে বয়সের ভাঁজ প'ড়েছে। আজো যে-দেহশ্রীর তারিফ করতে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠো, দেহের সেই মাধুরী অসংখ্য বলিরেখায় বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে। কিছুই থাকবেনা। তখন চেনালেও কি আর চিনবে? বলবে—এ আবার কে? একে তো চিনিনা, একে তো চাইনি কখনো? ব'লে রাখছি সে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারবোনা, অ্যাডোনিস্। তার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়। তোমার সঙ্গে শেষ-দেখা যদি তাতে নাও হয়, নাই হ'বে। ফিরে আসবেই যদি তো এসো যৌবনের অস্তরাগ শেষ হ'য়ে যাবার আগে নইলে তোমার বাসবীকে আর খুঁজে পাবেনা কখনো, খুঁজে পাবেনা কোথাও।

অনিরুদ্ধ বলে—সে কি কথা বাসবী? এমন কথা শুনিও না যাবার আগে। এ কী-সব বলছো তুমি? এখন থেকে বরং এমন কিছু আশার কথা বলো যে-কথাগুলো মনে ক'রে মাসকে মনে হ'তে পারে দিনের মতো ছোটো। দাও বরং এমন কিছু উত্তাপ যে-উত্তাপে মসুরী পাহাড়ের তুহিন-তুষারও দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠতে পেরেছিলো এই তো সেদিন! কথা দিয়ে যাচ্ছি ফিরবো শিগ্‌গির—যতোদূর সম্ভব শিগ্‌গির।

বাসবী বলে—ঠিক তো? আচ্ছা। তাহ'লে আর তোমার সঙ্গে ঝগড়ার কিছু নেই।

এবার সার্কুলার রোড ধ'রে দক্ষিণ-কলকাতা অভিমুখে চলছিলো গাড়ি, অনিরুদ্ধ বললো—আমি তাহ'লে এখানেই নেমে যাই? কী বলো?

বাসবী বলে—আচ্ছা। কিন্তু আবার কবে দেখা হ'বে?

—কালকেই। নিউ এম্পায়ারে—ছটার সময়ে—পারবে হাজির হ'তে?

—খুব পারবো—যাবোই যাবো। এখনো কিছুদিন তুমি নিশ্চয়ই আছো?

—হ্যাঁ, অন্তত আর দিন পনেরো তো আছিই।

অনিরুদ্ধ নেমে গেলো এর পরই।

পরের দিন নিউ এম্পায়ারে ঠিক ছটার সময়েই পৌছয় বাসবী। পৌছেই কী যেন একটা কাজের অছিলায় গাড়িটাকে সে পাঠিয়ে দিলো, বললো—গাড়ি

আর আনতে হ'বেনা, সে ভাড়াটে ট্যাক্সি ক'রেই বাড়ি ফিরবে। তারপর দোতলার সিঁড়িতে উঠতেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে দেখা। সেদিন ওরা কোনো ছবি দেখলোনা। ব'সে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা বেরিয়ে এলো ময়দানে একটুখানি জনবিরল ছায়ার খোঁজে। মাঠে বসলো অনেকক্ষণ। উঠলো ঠিক শো ভাঙার সময়েই। ততোক্ষণে কিন্তু অনিরুদ্ধের মনে ওষুধ ধ'রে গেছে অর্থাৎ মনে হ'তে শুরু ক'রে দিয়েছে যে হায়, কী ভুলই করেছে সে! দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করার আর কোনো মোহই যেন নেই তার! এখন অব্যাহতি পেলেই যেন বেঁচে যায়। কিন্তু তার কি আর উপায় আছে? সংকল্পের সমস্ত জোর যেন এলিয়ে গেছে এই দু' ঘণ্টার মধ্যেই।

বাসবীর সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হ'বে, আবার কবে, মন কেবল তারই প্রতীক্ষায় থাকতে চায়, ফিরে ফিরে শুধু সময় গুনতেই শুরু করে।

জিভ জল খোঁজে দগ্ধ দিগন্তের

সদ্য-কারামুক্ত বিরূপাক্ষকে নিয়ে সংঘের তরফ থেকে কিংবা জনসাধারণের তরফ থেকে পাছে কোনো শোভাযাত্রার আয়োজন হয় আর তাই নিয়ে কোনো গোলমালের সূত্রপাত হয় এই আশঙ্কা ক'রেই চতুর সরকার নির্ধারিত দিনের আগের দিনেই বিরূপাক্ষকে মুক্তি দিলেন। বিরূপাক্ষ কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে সে-সন্ধ্যায় একটিও চেনা মুখের অভ্যর্থনা পেলোনা। একাই এসে উঠলো বাড়ি।

সেদিনটা সারাক্ষণ সতী যখনই অবসর পেয়েছে তখনই ঘর গুছিয়েছে—বিরূপাক্ষের শোবার ঘর, বসার ঘর, রোগী-পরীক্ষার চেম্বার। ঘরগুলির প্রত্যেকটি জিনিশ ঝাড়াপোঁছা, চিত্তের মথিত মমতা দিয়ে সাজানো-গোছানোতেই লেগে রইলো সতী—কাল যে বিরূপাক্ষ বাড়ি ফিরে আসছে! কোথাও কোনো অপরিচ্ছন্নতা যেন তার চোখে না পড়ে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সতী। আজ দু'দিন ধ'রেই তার অসম্ভব খাটা-খাটুনি চলছে। শোবার ঘরের গোছ-গাছও সে অনেকটা সেরে এসেছে।

বিরূপাক্ষের খাটের বিছানার চাদর বদলাতে বদলাতে সতীর হাত থেমে যায়, পেছনের বারান্দায় শোনা গেলো কার জুতোর শব্দ। কে এলো? সতী ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে পিছনের দরজার দিকে। এখনো অগোছালো হ'য়ে আছে ঘর। চেয়ারটা কতোগুলো বালিশে বোঝাই। সে তাড়াতাড়ি সেটা খালি করতে থাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিরূপাক্ষ ঢুকলো ঘরে। সতী ছুটে গিয়ে প্রণাম করে।

—ওমা আপনি? একেবারে অবাক কাণ্ড! তবে যে প্রদোষদা ব'লে গেলেন আসছে কাল আপনি ছাড়া পাবেন?

আগে সতী কোনোদিন বিরূপাক্ষকে এভাবে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করেনি। বিরূপাক্ষ এটা লক্ষ্য করলো, বললো—থাক্, থাক্, কেমন আছো?

একটুখানি ম্লান হেসে সতী বলে—যেমন রেখেছেন তেম্নি আছি। আমার কথা আর অতো ঘটা ক'রে জিগেস করা কেন? আমার কথা বাদ দিন। কিন্তু আপনাকে যে বড্ডো শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে। নিন, বসুন ততোক্ষণ, জিরোন। ইস্, ঘরটা এখনো গোয়াল ঘর হ'য়ে আছে। আমি আসছি।

একটা চেয়ার টেনে বসলো বিরূপাক্ষ পাখার তলায়।

সতী বাইরে গিয়ে দরওয়ান, চাকর, বেয়ারা, পাচক—সকলকেই ডেকে নিমেষের মধ্যে রীতিমত একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুললো—বাবু এসেছেন তোমাদের সব হুঁশ্ থাকে কোথা?

ফিরে এসে বিরূপাক্ষকে কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলে—ছেড়ে ফেলুন ও-সব। কাপড় ছেড়ে জিরোন। ইস্, কী ময়লা হ'য়েছে! এতো ময়লা তো জীবনে কখনো পরেননি, খুব কষ্ট হয়েছে তো?

জুতোর ফিতে খুলে দিতে যায় সতী, বিরূপাক্ষ নিষেধ করে। কিন্তু সতী মানেনা, পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে যথাস্থানে। কোট, নেকটাই, বোতাম এ-সব খুলতে সাহায্য করে।

বহুদিন পর সতীর সেবায় ও পরিচর্যায় বিরূপাক্ষের মন স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তেই যেন অনুভব করতে থাকে সে বাড়ি ফিরে এসেছে এতোদিনে। বিরূপাক্ষের অসমাপ্তশয্যা সতীর হাতের স্পর্শ পেয়ে দেখতে দেখতে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হ'য়ে ওঠে।

সতী বলে—মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিন, অসময়ে স্নান করবেন কি? ইচ্ছা হ'লে তাও করতে পারেন। স্নানের ব্যবস্থাও হ'য়ে আছে।

বিরূপাক্ষ স্নানের ঘরে যায়। সেই অবসরে সতী নানা পরিচিত বন্ধু-বান্ধব মহলে ফোন ক'রে জানিয়ে দিতে থাকে বিরূপাক্ষের ফিরে আসার খবরটা।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই বিরূপাক্ষ দেখতে পেলো প্রস্তুত হ'য়ে আছে স্নিগ্ধ পানীয়, কিছু খাবার। স্নানান্তে তার অনেকখানি ক্লান্তি গিয়েছিলো এখন ক্ষুৎপিপাসা মিটিয়ে নিয়ে সুখশয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে পেয়ে যেন হাতের কাছে স্বর্গ পেলো।

বিরূপাক্ষ বললো—জানো সতী, আজ দু'রাত্তির একটুও ঘুমোইনি।

—প্রেসারটা বেড়েছে বোধহয়?

—বোধহয়।

—তাহ'লে Rawolfia Serpentina দিই দশ মিনিম, একটু ঘুমোন।

—তাই নাহয় দাও কিন্তু প্রেসারটা দেখে ওষুধটা খেলে হ'তো।

—তাহ'লে থাক।

সতী ওষুধ আর জায়না। নানা গল্পে ব্যাপৃত রাখে। অদ্রীশের কথা ওঠে। বিরূপাক্ষ জিগেস করে—ও আজকাল কেমন আছে?

সতী বলে—আগের চেয়ে একটু ভালো বৈ তো খারাপ নয়। বাসবীদি ওকে দিয়ে আবার লেখাচ্ছেন—আশ্চর্য ব্যাপার! বাসবীদি একটা নতুন সাহিত্য-পত্রিকা

ের করেছেন কিনা। তার জন্যে অদ্রীশবাবুকে দিয়ে সম্প্রতি একটা লেখা লিখিয়ে নিয়েছেন।

শুনে বিরূপাক্ষ একটু বিস্মিত হয়, বলে—কেউ পারে যদি তো বাসবীই পারবে। ওর সংস্পর্শে অদ্রীশের পাগলামি সেরেও যেতে পারে—কিছুই বিচিত্র নয়। কী বলো? অদ্রীশের কাছে একবার যাওয়া যাক, দেখা ক'রে আসি।

সতী বলে—থাক এখন, আপনি একটু জিরিয়ে নিন। পরে গেলেই হবে। বাসবীদি এই ক'দিন আগে এ-বাড়ি এসেছিলেন ··

ব'লে বাসবীর সঙ্গে অদ্রীশের সেদিনকার নাটকীয় আচরণের এমন কৌতুকাবহ বিবরণ দ্যায় যে, বিরূপাক্ষ না হেসে পারেনা।

ওদের মসুরীর ব্যাপার, শারীর পরিণাম, যতোদূর সতী জানতে পেরেছিলো সবই বিরূপাক্ষকে বলে। শারীর কথা জানতে পেরে সত্যিই বিরূপাক্ষ মর্মাহত তারই একটা হাতে-গড়া পুতুল যেন দৈব-দুর্যোগে ভেঙে গেছে। খেদে বিরূপাক্ষ বলে—আহা, অমন একটা মেয়ে এভাবে নষ্ট হ'য়ে গেলো! বড়োই আপ্‌সোসের কথা যে! অনেক আগেই এ-ধরনের কিছু আশঙ্কা করেছিলাম। ওর দাদা-বৌদি নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছেন।

সতী বলে—বাসবীদি তো প্রায় পাগলের মতোই হ'য়ে গিয়েছিলেন। এতোদিন উনি স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন। মাঝে অজবাবু একবার আনতে ন, এলেননা। এই তো ক'দিন হ'লো ফিরেছেন কলকাতায়। অজবাবু বার কতো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এসেছেন। দেখে মনে হয় এখন উনি সামলে গেছেন। তাছাড়া অতোটা বিচলিত হবার আরো একটা কারণ সা—ব'লে একটুখানি গূঢ় হেসে অনিরুদ্ধ-মলয়ার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার হিনীটা সতী যতোদূর শুনেছিলো বিরূপাক্ষের কাছে বিবৃত করলো।

প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা অনর্গল গল্প চলে। বিরূপাক্ষও তার কারাবরোধের গুলির অভিজ্ঞতার গল্প করে; প্রথম প্রথম গিয়ে সে কী কী অসুবিধা ভোগ সেই সব গল্প তারও যেন আর ফুরোতে চায়না যে-পর্যন্ত-না পাচক নৈশ ভোজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আসে।

আয়োজন নেহাৎ সামান্ত নয়, নাম করতে গেলে ভোজ্য-তালিকা দীর্ঘ। দেখেই পাক্ষ সতীর দিকে চেয়ে বলে—করেছো কী? এ যে যজ্ঞির ব্যাপার!

সতী হাসতে হাসতে বলে—এ তো কিছুই নয়। কালকেই প্রকৃত উৎসব! নিজে রান্নার ভার নেবো।

উৎসব! কিসের উৎসব?—হো হো ক'রে হেসে ওঠে বিরূপাক্ষ।

—বাঃ, এতোদিন বাদে মনিব তাঁর নিজের বাড়ি ফিরে এলেন—উৎসব নয়তো কী? প্রভুভক্ত ভৃত্য-পরিচারিকা আমরা সবাই—আমাদের যথাসাধ্য করবো না কাল আমার পালা।

গল্পে-গুজবে খাওয়া শেষ করে বিরূপাক্ষ।

—হ'য়ে গেলো? সেকি? প'ড়ে রইলো যে অতো?

—কী করবো? এতো কি সব খাওয়া যায়? মিছিমিছি এতো আয়োজন ক'রে খাবার নষ্ট করলে এই খাদ্য-সংকটের দিনে?

সতী সহাস্যে বলে—ভয় নেই নষ্ট হ'বেনা। এতো প্রচুর করা হয়নি যে নষ্ট হ'বে। শুধু আপনার মতোই করা হ'য়েছিলো। ফেলে রাখলেন ভালোই হ'লো প্রসাদ পাওয়া যাবে। যা প'ড়ে আছে তাও একটা মানুষ খেয়ে উঠতে পারেনা।

বিরূপাক্ষ বিস্মিত হয়, বলে—বলছো কী তুমি? এই উচ্ছিষ্ট তুমি খাবে? ছিঃ।

—হ্যাঁ, খাবো, আমার ইচ্ছে। কেন? এইটুকু সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চান?

সৌভাগ্য সম্বন্ধে তোমার এমন আজব ধারণা জেনে তোমার জন্য দুঃখ হয় সতী। এ তুমি কী করছো?

—আমার যা ইচ্ছে তাই করছি। আপনি উঠে যান তো, আঁচিয়ে নিন গে। তারপর যদি দুঃখ হয় তো যতো ইচ্ছে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে দুঃখ করবেন'খন।

—কিন্তু আমি যদি না উঠি, যদি চাকরকে ডেকে এগুলো রাস্তায় ফেলিয়ে দিই' এভাবে তোমায় পাত কুড়িয়ে খেতে আমি যদি না দিই?

সতী বলে—ইস্, ফেলিয়ে দেবেন বৈকি! কখ্খনো না।

—যদি দিই?

—বেশ, দিন। চাকরকে এখন কোথা পাবেন? ওরা সবাই এখন খেতে বসেছে। তাছাড়া বাড়িতে এখন এককণাও খাবার নেই এটা মনে রাখবেন যেন। বেশ তো একথা জেনে-শুনেও যদি ফেলিয়ে দেন তো দিন—আমাকে তাহ'লে আজ উপোস ক'রে থাকতে হ'বে।

ব'লে সতী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বিরূপাক্ষ ডাকলো—শোনো সতী শোনো।

সতী ফিরে দাঁড়ালো, বললো—কী, আপনি উঠবেন কিনা?

বিরূপাক্ষ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে।

বিরূপাক্ষ যখন মুখ-হাত ধুয়ে এলো সতী ততোক্ষণে আহারে ব'সে গেছে বিরূপাক্ষের পাতেই।

সতীর সামনে এসে দাঁড়ায় সে, আর এই দৃশ্য দেখে মিটি মিটি হাসতে থাকে।

—কী দেখছেন? আগে কখনো কি আপনার সামনে খেয়েছিলুম? বলুন?

—না।

—তবে? দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দয়া ক'রে স'রে যাননা আমার লজ্জা করছে যে।

—যাচ্ছি। কিন্তু আজ তোমার হ'য়েছে কী, এমন করলে কেন?

—কী আবার হ'বে? কিছুই হয়নি। জঠরাগ্নির জোর কিছু বেশি হ'য়েছে এই যা—দেখছেননা কী রকম গোগ্রাসে গিলছি।

বিরূপাক্ষ সহাস্যে ক্লান্ত পায়ে, ক্লান্ত মনে শুতে চ'লে যায়। ওর চ'লে যাওয়ার ভঙ্গিটা সতী চেয়ে-চেয়ে ছাখে।

নিজের খাওয়া শেষ ক'রে, অদ্রীশকে খাইয়ে, টুকিটাকি কাজ সেরে সতী গিয়ে দেখলো বিরূপাক্ষের ঘর তখন অন্ধকার। সারাদিনের ক্লান্তির পর সম্ভবত সে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। সতী নিজেও তার শোবার ঘরে এসে দোর বন্ধ করলো।

বেশ খানিকক্ষণ ঘুমের আরাধনা ক'রেও যখন ঘুম এলোনা তখন বিরূপাক্ষ উঠে আলো জাললো। তার বন্ধু-বান্ধবের কাছে যে কয়খানা চিঠিপত্র লিখতে হ'বে ব'লে সে ঠিক ক'রে রেখেছিলো সেগুলো সে এখনই সেরে ফেলতে মনস্থ করলো।

খানকয় চিঠি লেখা তার শেষ হ'য়েও গেছে। রাত তখন অনেক। দুটো বেজে গেছে। চিঠি লেখাতেই সে তন্মনস্ক ছিলো এমন সময়ে বারান্দার দিকের জান্‌লা থেকে মৃদু গলার আওয়াজ এলো—এখনো জেগে আছেন? আজো কি তবে ঘুমোবেননা।

—তুমিও ঘুমোওনি নাকি?

—আপনি ঘুমিয়েছেন মনে ক'রে আমিও ঘুমিয়েছিলাম। এখন ঘুম ভাঙতেই দেখি আপনার ঘরে আলো জলছে—তাই বলতে এলাম আজ আর না ঘুমোলে চলবেনা। Rawolfia-টা এক ডোজ এনে দিই, খেয়ে ফেলুন।

এ ওষুধটা সতী নিজের কাছেই রাখে, কেন কে জানে! হয়তো সে এই ওষুধটা সম্বন্ধে বিরূপাক্ষকেও বিশ্বাস করেনা। ওষুধটা কাছে থাকলে পাছে বিরূপাক্ষ বেপরোয়াভাবে সেটা ব্যবহার করে সেই আশঙ্কা ক'রেই হয়তো সতী নিজের কাছে এটা রাখে। একটি ছোটো কাচের গ্লাসে ক'রে তৎক্ষণাৎ সে বিরূপাক্ষের জন্য ওষুধ নিয়ে আসে। ভেজানো দোরটা ঠেলে সে ঢুকলো বিরূপাক্ষের ঘরে।

—নিন, খেয়ে ফেলুন।···ওষুধটা সে দিলো বিরূপাক্ষের হাতে। বিরূপাক্ষ গ্লাসটা খালি ক'রে তখুনি ফিরিয়ে দিলো সতীকে।

সতী বলে—এবার তবে শুয়ে পড়ুন। আর রাত জাগেনা।

—শুলেই কি আর ঘুম আসবে? ওষুধের ক্রিয়াটা হ'তে দাও।

—তা হোক তবু ঘুমোবার চেষ্টা তো করুন—চেষ্টা করলে তবে তো ঘুম আসবে। ওডিকলোনের জলে মাথাটা একটু ভিজিয়ে দেবো? দেখুননা, বেশ আরাম পাবেন। বিছানায় আসুন, পাখাটা আমি জোর ক'রে দিচ্ছি।

বিরূপাক্ষ হাসে, বলে—জেল ঘুরে এলেই যদি এতো সেবা-যত্ন মেলে তাহ'লে নিত্য-নিত্য কেবলই জেলে যেতে ইচ্ছে করবে যে।

সতী বলে—আহা, কী কথাই বল্লেন। খোর-পোষ দিয়ে লোকজন পুষছেন এটুকুও আর পাবেননা?

বিরূপাক্ষ বলে—সত্যিই তো! তাও তো বটে! কিন্তু খোর-পোষ মানে তো এঁটো পাত কুড়োতে দেওয়া আর ··

সতী এর সঙ্গে যোগ ক'রে দ্যায়—মাইনের অঙ্কটা দিব্যি হস্‌পিট্যালের চাঁদার খাতায় জমা হ'তে থাকা।

শুনে বিরূপাক্ষ শব্দ ক'রে হেসে ওঠে, বলে—সেই তো···তাতেই কাজে এতো আঠা!

সতী বলে—আঃ, এতো রাত্তিরে অতো শব্দ ক'রে হাসেন কেন? শুনলে লোকে কী মনে করবে, বলুন তো?

বিরূপাক্ষের খেয়াল হ'লো কাজটা সত্যিই অবিবেচকের মতো হ'য়ে গেছে। যদি এখনো কেউ জেগে থাকে!

ওডিকলোনের জলে বিরূপাক্ষের মাথাটা ভিজিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিতে থাকে। ওর শাড়ির মৃদু স্পর্শ বিরূপাক্ষের কাঁধে গায়ে লাগে। কেমন যেন তার মনে হ'লো শাড়িটা বুঝি সতী এখুনি বদলে এসেছে। সে বলে—সত্যিই কি এতোক্ষণ তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

—কেন বলুন তো?

—কেন আবার? এম্নিই জিগেস করছি। তুমি যখন উঠে এলে তখন তোমার চোখ-মুখ দেখে তো মনে হ'লোনা যে তুমি ঘুম থেকে উঠে আসছো।

—তবে যা মনে হ'লো সেটাই সত্যি ব'লে ভেবে নিতে পারেন। তা আবার জিগেস করছেন কেন? জিগেস করলে আমি তো মিথ্যেও বলতে পারি।

—আচ্ছা, এতোদিন আমার জন্তে মন কেমন করতো বুঝি?

—আবার ? জানিনা। কী যে ছেলেমানুষী করেন ! নিন, শুয়ে পড়ুন, আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।

আলো নিবিয়ে দিতে যাচ্ছিলো সতী, বিরূপাক্ষ ফস্ ক'রে ওর একখানা হাত ধ'রে ফেললো, বললো—বলো ? ব'লে যাও। জবাব দাও আমার কথার।

—বলুন কী জবাব চান ?

—মন কেমন করতো ?

—নেহাৎ-ই কি সেটা আমার মুখ থেকে শুনতে হ'বে ?

—শুনতে বেশ লাগবে। বলোনা।

—আপনি চ'লে যাবার পর থেকে আমি তো আর এ-ঘরে ঢুকিনি। আজই প্রথম ঢুকলাম ঘর পরিষ্কার করতে। ঘর যা হ'য়ে ছিলো ! সে যদি আপনি দেখতেন তো বুঝতেন।

—কিন্তু কেন ঢুকতেনা ?

—কী জানি কেন ঢুকতে পারতুমনা।

বিরূপাক্ষ একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—কিন্তু মিছে কেন এ-সব ? তোমার জন্য দুঃখ হয় সতী। প্রভুভক্তির জন্য কোনো প্রাইজ নির্দিষ্ট নেই একথা জানোই বোধহয়।

—জানি এবং প্রাইজের লোভও নেই।···সতী বিষণ্ণমুখে আরো কী-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। সতীর চোখ হয়তো জলে ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছিলো, শেষ কথা-গুলো বলতে তাই ওর কেমন যেন গলাটা ধ'রে এলো।

বিরূপাক্ষ সেটুকু লক্ষ্য ক'রেই বললো—তোমার আজ কী হ'লো বলো তো ?

তেমি ধরা গলাতেই সতী বললো—কী জানি···আমি নিজেও কি জানি ? হয়তো ভূতেই পেয়েছে। আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছিনা তো প্রকাশ ক'রে বলবো কেমন ক'রে ? একি আনন্দ, একি দুঃখ, কিংবা একি আনন্দের দুঃখের অতীত কোনো অনুভূতি আমার পক্ষে সেটা যে বলা শক্ত। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। দয়া ক'রে আমায় আর কিছু জিগেস করবেননা।

এ নিয়ে সতীকে বিরূপাক্ষ আর কিছুই প্রশ্ন করেনা, হাসতে হাসতে বলে—অয়ি সেবাপরায়ণে, আমার যদি বরপ্রদানের ক্ষমতা থাকতো···

—তাহ'লে···তাহ'লে কী দিতেন ?···প্রত্যাশায় প্রখর হ'য়ে ওঠে সতীর চোখ।

ঢং ক'রে রাত আড়াইটে বাজলো ঘড়িতে।

বেফাঁস কথাটা ঘুরিয়ে নিতে বিরূপাক্ষ বললো—কী আর দেবো ? কিছুই দিতামনা।

সতী পেড়াপীড়ি করে, বলে—বলুননা, কী বলতে যাচ্ছিলেন?

বিরূপাক্ষ বলে—বলছি·তো কিছুই:দিতামনা···উল্টে জরিমানা করতাম।

কপালে করাঘাত ক'রে সতী বলে—আ আমার পোড়াকপাল! কপালগুণে মনিব পেলাম এমন?

—হাড়ে-হাড়ে বুঝছো তো সেকথা। তবে আর কেন? যাও, শোও গে অনেক খাটাখাটুনি হয়েছে আজ সারাদিন—রাত আর খুব বেশি বাকি নেই 'যাবার সময়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেয়ো।

সতী আলোটা নিভিয়ে দ্যায় কিন্তু নিভিয়েই বেরিয়ে যায়না। খাটটার পায়ের দিকে বাজুর পাশে ছায়ার মতো এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, বলে—জরিমানা কিংবা চাকরি থেকে বরখাস্ত—এ দুটোর যে বরই আমাকে দিন—সে সবই আমার সইবে··কিন্তু তার জন্যে আপনাকে যদি পরে অনুতপ্ত হ'তে হয় তো সে আমার কিছুতেই সইবেনা।

বিরূপাক্ষের পায়ে কেমন যেন তপ্ত হাতের স্পর্শ লাগলো।

—এইটুকুই আজ আপনার পায়ে ধ'রে বলছি।···কান্নার সমুদ্দুর পার হ'য়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো সতীর কথাগুলো।

প্রকৃত অনুতাপের স্বরে বিরূপাক্ষ ব'লে ওঠে—আহা, করো কী! করো কী' পা ছাড়ো, শোনো।

অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও বিরূপাক্ষ অনুভব করে পায়ের ওপর পুঞ্জিত চুলের স্পর্শ, কোমল গণ্ডের মসৃণ ত্বক্, মুঠি-পরিমাণ তপ্ত মাংসপিণ্ড, উষ্ণশ্বাস পায়ের ওপর। একি, সতীর মুখখানা বিরূপাক্ষের পায়ের ওপর নাকি? বিরূপাক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যায়, বলে—সত্যিই সতী আজকে তোমায় ভূতে পেয়েছে দেখছি। কী-যে করো তার ঠিক নেই।

বিরূপাক্ষের হাত অন্ধকারেই প্রসারিত হয় কিন্তু সতী ততোক্ষণে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর ব'সে ব'সে বিরূপাক্ষ শুনতে পায় সতীর ঘরের দরোজায় খিল দেওয়ার শব্দ।

গতরাত্রে বিরূপাক্ষের ঘুম এসেছিলো ভোরের দিকে তাই ঘুম ভাঙতে বেলা হ'লো। সকালের কৃত্য সেরে বাথরুম থেকে সে যখন বেরোলো—তখন সতীর একবার খোঁজ করলো। কিন্তু সতী তখন ওপরেই ছিলোনা। চাকরের মুখ থেকে শুনলো সে আছে নিচে—রান্নার কাছে। ওমনি তার মনে প'ড়ে গেলো আজ বুঝি সতীর উৎসব, মনে-মনে একটু হাসলো। এই মেয়েটি, যাকে বিরূপাক্ষ সম

কর্তৃত্ব দিয়েও কর্ত্রীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রেখেছে, যাকে সদাসর্বদা সকলের কাছে বেতনভোগিনী নার্স মাত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে গৃহস্থালির মধ্যে তার যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ ক'রে ছায়—সেই মেয়েই যে এ-সংসারের কতোখানি সেটা বিরূপাক্ষ অন্তরে অন্তরে স্বীকার করলেও বাইরেকার অবজ্ঞার মুখোশটা কিছুতেই ফেলতে চায়না, প্রাণপণবলে আঁকড়ে থাকতে চায়। বিশেষ ক'রে গত রাত্রির পর থেকেই দতীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় বিরূপাক্ষের মন আরো যেন আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তবু সংস্কার দুর্মর!

বিরূপাক্ষ অদ্রীশের ঘরে যায়। অদ্রি তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে সিলিঙের দিকে চেয়ে ছিলো। বিরূপাক্ষ ইজিচেয়ারের শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে জিগেস করলো—কী অদ্রি, কেমন আছো?

অদ্রীশ ঘাড় ফিরিয়ে একবার চেয়ে ছাখে বিরূপাক্ষের দিকে কিন্তু কিছুই বলেনা আবার সে পূর্ববৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় সিলিঙের দিকে। বিরূপাক্ষ আবার শুরু করতে যায়—কারাবাস উদ্‌যাপন ক'রে কাল ফিরে এসেছি রাত্তিরে। তুমি জেগে ছিলে কিনা জানিনা তাই আর দেখা করিনি তখন।

অদ্রীশ বলে—উঁহুঁ, হ'লোনা। এ দুনিয়ায় কারাবাসের উদ্‌যাপন নেই, জানো? জেলখানার উঁচু পাঁচিলটা পার হ'য়েই মনে করলে বুঝি কারাগার এড়িয়ে এলে—তা নয়, তা নয়—ভুল! এক কারা থেকে আরেক কারায় এসে ঢুকলে, মূঢ়! হ্যাঁ, ছাখো, এখুনি একটা কথা ভাবছিলুম—জ্ঞানের অনুসরণে আমরা কী পাই বলতে পারো? ভেবে দেখেছো কখনো?

বিরূপাক্ষ বলে—না ভাই, ভেবে দেখিনি, তবে চোখের সাম্‌নে তোমার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আর মাঝে-মাঝে শুনতে পাই গোটা কয়েক গালভরা বুলির ফাঁকা আওয়াজ—অন্তঃসার কী পাই তা ভেবে দেখিনি কখনো।

—ভেবো, ভেবে দেখো। কিন্তু ভাবতে তো তোমরা কখনো শেখোনি, বলা বৃথা। বিজ্ঞান তোমাদের একদেশদর্শী করেছে। বুদ্ধি তোমাদের বিশ্লেষণের, সংশ্লেষণের নয়। তোমরা যা ছাখো তাই স্বীকার করো আর যা তোমরা ছাখোনা তা তোমাদের স্বীকার করতে বাধে—শুধু যে স্বীকার করতেই বাধে তা নয়, তাকে তোমরা বিলকুল উড়িয়েই দাও।

বিরূপাক্ষ বলে—ঐখানেই তো গণ্ডগোল বাধে। তোমরা যে ঠিক উল্টোটাই করো। যেটাকে তোমরা ছাখো সেটাকেই তোমরা অস্বীকার করতে চাও—আর যা তোমরা ছাখোনি কোনোদিন, দেখবেনা, তাকেই তোমরা বড়ো নিষ্ঠার সঙ্গে

মানো। কিন্তু যাক ওকথা ··জ্ঞানের অনুসরণে আমরা কী পাই বলছিলে? তোমার আত্মপ্রতীতির কথাটা শুনে নেওয়া যাক্।

অদ্রীশ মাথা নাড়ে, বলে—বুঝবেনা, বুঝবেনা।

এতোক্ষণ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলার পর অদ্রি আবার কী-যেন বিড়বিড় করে, চোখ বুজোয়, আবৃত্তি ক'রে ওঠে—

The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to our ignorance,
All our ignorance brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to God.

ইতিমধ্যে বারান্দায় কয়েকজনের জুতোর শব্দ পেয়ে বিরূপাক্ষ কখন যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মুদিত-চক্ষু অদ্রীশ তা জানতেও পারেনি।

বিরূপাক্ষকে দেখামাত্রই আগন্তুক তিনজনেই সমস্বরে সশব্দ অভ্যর্থনা জানালো। বিরূপাক্ষ ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসালো বসার ঘরে। আজ সকাল থেকে অনিরুদ্ধ ও হিমাংশু জেলখানার গেটে অপেক্ষা করার পর খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারলো যে, কাল সন্ধ্যায় বিরূপাক্ষ ছাড়া পেয়ে গেছে অমনি সেখান থেকেই ওরা ছুটে আসছে বিরূপাক্ষের বাড়ি। ওদের সঙ্গে এসেছে প্রদোষও।

প্রদোষের পরনে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে আচ্‌কান, মাথায় ফেজ, চোখে সানগ্লাস্, অল্প দাড়ি। অনিরুদ্ধের পরনে স্যুট। হিমাংশুই একমাত্র জাতীয় পোষাকে এসেছে অর্থাৎ ধুতি-পাঞ্জাবী।

বিরূপাক্ষ জিগেস করে—তারপর? প্রদোষ, তোমার কী খবর?

প্রদোষ সহাস্যে বলে—আমার খবর আছে বৈকি। আমার খবর নিরু বলবে।

অনিরুদ্ধ বলে—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে এই যে, মাত্র কয়েকদিন হ'লো প্রদোষদা কৌমার্য ভঙ্গ করেছেন—রঞ্জিলাদির সঙ্গে উনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন।

বিরূপাক্ষ বলে—বাঃ, বেশ, বেশ, সুখবর নিশ্চয়ই। শুনে সুখী হ'লুম ভাগ্যবান বটে! বিয়ের ব্যাপারে এতোদিন দেরি করা প্রদোষের সার্থক হ'য়েছে

সত্যিকার সহধর্মিণীই পেয়েছে এবার প্রদোষ। সহকারিণী, সহচারিণী, সহধর্মিণী আর কী বলবো, আরো কী-কী যে সব বলে। মনের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে, মতবাদের দিক থেকে, একেবারে সুন্দর মিল, যাকে বলে রাজযোটক।

সতীর সঙ্গে চাকরটা ঢোকে একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে, টেবিলে রেখে চ'লে যায়।

অনিরুদ্ধ সতীকে লক্ষ্য ক'রে বলে—সতীদি শুনেছেন তো? ইতিমধ্যে প্রদোষদা···

অনিরুদ্ধের কথার পিঠে কথা লুফে নিয়েই সতী সহাস্যে যোগ করে—রঞ্জিলাদির সঙ্গে ··এই তো?

প্রদোষের পিঠ চাপ্‌ড়ে বিরূপাক্ষ বলে—খুব ভালো, খুব ভালো, বেশ ক'রেছো ভাই। কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করছি।

হাসতে হাসতে প্রদোষ বলে—তুমিও এবার একটি ক'রে ফ্যালো—কৌমার্য-ব্রতের উদ্‌যাপন হোক। আমাদের মধ্যে তুমিই বা কেন আইবুড়ো থাকবে, সে কি হয়? কী বলুন সতী দেবী? বাঙালীর জীবন অর্ধেকের বেশি তো পার হ'য়েই গেছে। এ কিন্তু অন্যায়!

সতী এ-সময়টা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় গুঁজে কেৎলি থেকে চায়ের কাপ্-গুলোতে লিকার ঢালতে যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

অনিরুদ্ধ ব'লে উঠলো—নিশ্চয়ই খুব অন্যায় বিরুদার। সত্যিই আর ভালো দেখাচ্ছেনা।

—তাহ'লে কী করতে হ'বে বলো?

প্রদোষ বলে—একটি বিয়ে করতে হ'বে।

—বিয়ে করলে কী হ'বে?

—অন্তত নিন্দুকের মুখটাও তো বন্ধ হ'বে।

—নিন্দুকের মুখ একদিক থেকে বন্ধ করতে গেলে আর এক দিক থেকে খুলে যাবে। ওতে বিশেষ লাভ হ'বেনা। বুঝলে? বিয়েটাকে সর্বসমস্যাহর ভাববার কোনো কারণ নেই। কী হে নিরু, তুমিও তো বিয়ে করেছিলে?

অনিরুদ্ধ বলে—আমার কথা ছেড়ে দাও বিরুদা, আমি হতভাগ্য।

—তোমার কথা ছেড়ে বা দেবো কেন? তাছাড়া তুমি তো হতভাগ্য নও। আর একদিক থেকে দেখলে তুমিই হয়তো অত্যন্ত বেশি ভাগ্যবান। পারিবারিক সুখশান্তিই যে একমাত্র ঐহিক সুখের মাপকাঠি এমন কথা কী ক'রে ধ'রে নিতে পারা যায়?

আপনাদের চা কিন্তু জুড়িয়ে যাবে—এবার চায়ের টেবিলে আসুন আপনারা।... ব'লে সতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ওর মনে তখন একটি কথাই খালি খালি ওঠা-পড়া করতে থাকে। 'আর ভালো দেখাচ্ছেনা বিয়ে ক'রে ফ্যালো, নিন্দুকের মুখটাও তো বন্ধ হ'বে।'

কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করার জন্যই বা জগৎসুদ্ধ লোকের এতো মাথাব্যথা প'ড়ে গেছে কেন? নিচে রান্নার কাছে সতী একবার গেলো। সেখানেও তার মন টেঁকলোনা। ভাবলো প্রদোষ, অনিরুদ্ধ, হিমাংশু—এরা সবাই এসে পড়েছে ওদেরও আজ খেয়ে যেতে বললে হ'তোনা? সে নিজে আজ এতো ক'রে রাঁধছে। সে আবার ওপরে এলো। বারান্দায় পায়চারি করলো একটু। ওদের কথাবার্তা তখনো চলছে—সতীর কানেও আসছিলো কিছু-কিছু। সে ভ্রূ কুঁচ্কালো বিরক্তিতে কিন্তু বিরক্তিই বা কিসের? অকারণ, নেহাৎ অকারণ। কী যেন একটা মরণ-বাঁচন সমস্যায় তাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। এ-রকম সমাধানহীন সমস্যায় মাঝে মাঝে সে বড়োই কষ্ট ভোগ করে। ওদের চা হয়তো এতোক্ষণে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেলো। এ কথাটাই আবার ওদের মনে করিয়ে দিয়ে আসবে নাকি? দোরের দিকে গিয়েও যেন আবার খানিকটা পেছিয়ে এলো। বহুদিন ধ'রেই তো একটি সংকল্প তার বিবেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মুহুর্মুহু রক্তাক্ত ক'রে তুলছে; সে-সঙ্কল্পে পরিণতি আনা তার কি আর হ'য়ে উঠবেনা কোনোদিন? ফিরে এসে দাঁড়ালো আবার বারান্দার রেলিং ধ'রে। কিন্তু সেখানেও একা-একা থাকতে পারলোনা বেশিক্ষণ, গেলো বিরূপাক্ষের শোবার ঘরে, বসলো একটা চেয়ারে। বিরূপাক্ষের বসার ঘর আর শোবার ঘর পাশাপাশি। মাঝেকার দোরটা একেবারে ভেজানো নয়, খোলা খানিকটা। ওদের সব কথাই আসছিলো সতীর কানে :

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ, সম্মার্জনী আমাকে কী লিখেছে বলছিলে নিরু?

অনিরুদ্ধ। সে আর তোমার শুনে কী লাভ? ও-সব বাঁ কানেও শুনতে নেই।

—তবু বলোই না, শুনি।

—সতীদির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিয়ে কী সব কুৎসা রটনা করেছে আর কি! ত্যাখোনা, প্রদোষদার কাছে সম্মার্জনীর সে-সংখ্যাটা আছে বোধহয়। দেখান না প্রদোষদা।

প্রদোষের কাছ থেকে নিয়ে প'ড়ে দেখলো বিরূপাক্ষ। পড়া হ'য়ে গেলে বললো—এর কিছু-কিছুও তো সত্য হ'তে পারে, কারণ কথায়ই তো বলে যা রটে তার কিছু বটে। তাহ'লে ...?

অনিরুদ্ধ আহত স্বরে ব'লে ওঠে—ওকথা বোলোনা বিরুদা। আমরা তোমাকে

ভালোভাবেই চিনি, সতীদিকেও ভালোভাবেই চিনি—সম্মার্জনীর ইতর মন্তব্য প'ড়ে আর নতুন ক'রে তোমাদের চিনতে হ'বেনা। এই মিথ্যেগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'তেই পারেনা। এর কিছু প্রতিকার করতেই হ'বে। কী বলো প্রদোষদা? নইলে সামনের নির্বাচনে···

প্রদোষ বলে—সত্যিই বিরু, আমারও তাই মত। কিছু করা দরকার। বিশেষ ক'রে আমরা যখন তোমাকে সামনের ইলেক্‌শনে পার্টি-টিকেটে প্রার্থী হিশেবে দাঁড় করাচ্ছি।

—আমাকে? আমাকে কেন?

—হ্যাঁ ভাই, তুমি ছাড়া আর লোক নেই। বীরভূম কেন্দ্র থেকে তোমাকে দাঁড়াতে হ'বে। তুমি না দাঁড়ালে আমাদের পার্টির সম্ভ্রম আর রক্ষা হয়না—বুঝছোই তো···নইলে একেবারে ডাহা হার!

—আমি দাঁড়ালেই তোমরা জিতবে ব'লে আশা করো?

—হ্যাঁ, করি বৈকি। ওরা মস্ত একজন হোমরা চোমরা রিএক্শনারী ক্যাণ্ডিডেট্‌কে খাড়া করছে। আমাদের তাই তোমাকেই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। সাম্‌নে ইলেক্‌শন, সম্মার্জনীর মতো ইতর প্রচার-পত্রিকাকেও তুমি উপেক্ষা করতে পারোনা কিংবা তুমি পারলেও আমরা পারিনা।

অনিরুদ্ধও প্রদোষের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ব'লে ওঠে—নিশ্চয়ই পারিনা। তুমি মানহানির মামলা আনো বিরুদা।

—কে? আমি?

—তুমি নিজে না আনো সতীদিকে দিয়ে আনাও; তুমি পেছনে থাকো।

—তোমরা সেকথা সতীকেই ব'লে দেখতে পারো।

এমন সময়ে সতী ঘরে ঢুকলো। প্রদোষ ব'লে ওঠে—এই যে সতী দেবী··· আপনি আজ সঙ্গদানে বড়োই কুণ্ঠিতা দেখছি।

বিরূপাক্ষ বলে—যথোচিত অতিথিসৎকারের জন্মই সতী সম্ভবত ব্যস্ত।

অনিরুদ্ধ বলে—তাই নাকি?

সহাস্যে সতী বললো—সে তো বটেই। আজ আপনারা তিনজন এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবেন।

—কিন্তু তার জন্য অতো ব্যস্ত হবেননা, বসুন।

কিন্তু সতী বসেনা, বলে—কিন্তু আমি এখানে ব'সে থাকলেই বা কি আপনাদের সুবিধা হ'বে? আলাপে ব্যাঘাতই হ'বে বরঞ্চ। আমি যাই, কাজ আছে নিচেয়। ··সতী স'রে যায় সেখান থেকে।

কী করবে সতী? সে কোনো কিছুই আর ভেবে-চিন্তে পাচ্ছেনা। তার বিমূঢ়তা, বিভ্রান্তি, বেদনা তাকে উত্তরোত্তর আরো যেন অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণে মন্ত্রণা দিচ্ছে। এতোদিন তার নামের সঙ্গে বিরূপাক্ষের নাম জড়িত হ'য়ে যেভাবে লোকের মুখে-মুখে কুৎসার আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো তাতে সময়ে সময়ে একটু বেদনা অনুভব করলেও প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ এবং গৌরবও যেন সেটার মধ্যে মেশানো ছিলো। এবার বিরূপাক্ষের নির্বাচনপ্রার্থী হিশেবে দাঁড়াবার প্রাক্কালে এ-রকম ইতর কুৎসা রটনায় সে যেন অত্যন্ত বেশিরকম আত্মগ্লানি ও লজ্জা অনুভব করতে লাগলো। যাকে সে শ্রদ্ধা করে, যাকে সে ভালোবাসে তারই রাজনৈতিক জীবনের সুরুতে এভাবে সকল সম্ভাবনা নষ্ট ক'রে দেবার নিমিত্তমাত্র শেষটা কি তাকেই হ'তে হ'লো? একটা মর্মন্তুদ বেদনা সর্বক্ষণ যেন তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করতে লাগলো। নিজেরই ওপর সে শতবার ধিক্কার দিলো। যেখানে নিজের দুর্বলতা সেখানেই নিজেকে সে বারবার আঘাত করলো। কেনই বা সে চিরদিন বিরূপাক্ষের পথের কাঁটা হ'য়ে ওর উন্নতির পথ আগলে এখানে প'ড়ে থাকবে? কোন অধিকারের বলে? কেন কর্তব্যে কঠোর হ'তে পারেনা সে? যেখানে যাক, যাই কিছু করুক সতীর মনের মধ্যে এখন থেকে এই কথাটাই কেবল খচ্‌খচ্‌ ক'রে বিঁধতে থাকলো। এর পরও তাকে করতে হ'লো সবকিছুই। অতিথি-আপ্যায়নও করতে হ'লো। প্রদোষ-অনিরুদ্ধ-হিমাংশু এদের কাছে ব'সে খাওয়াতেও হ'লো, ওদের প্রতিটি কথার জবাবও সতীকে দিতে হ'লো, রসিকতা ভালো না লাগলেও মেপে মেপে হাসতে হ'লো ভদ্রতার হাসি, করতে হ'লো গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়।

ওরা চ'লে যাওয়ার পর থেকে সতী সেদিন একা-একাই রইলো। বিরূপাক্ষকে সে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চললো। বিরূপাক্ষের খুঁটিনাটি কাজের কথার উত্তরেও দু'একটি সংক্ষিপ্ত 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' উত্তর দিয়ে সেখান থেকে স'রে গেলো।

পরের দিন দুপুরে নেহাৎ-ই আকস্মিকভাবে একগোছা চাবিসুদ্ধ রিংটা বিরূপাক্ষের মুখের সামনে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সতী বললো—এই নিন, রাখুন চাবিটা।

ওর এমন আকস্মিক ব্যবহারে বিরূপাক্ষ বড়ো অবাক্ হ'লো। সতী চ'লে যাচ্ছিলো বিরূপাক্ষ ওকে ডাকলো—শোনো, শোনো। কী হ'লো হঠাৎ? এর মানে?

—কেন আবার এম্নিই। আমাকে কি দু'একদিনও বিশ্রাম নিতে নেই? কাল

থেকে আমার ছুটি, বুঝলেন? আপনি নিজেই সব ক'রে নেবেন। তাছাড়া চাকর-ঠাকুর এরা তো সবাই রইলো।

—আমিই সব ক'রে নেবো মানে? সংসার করবো? আর তুমি? তুমি শুধু শুয়ে-শুয়েই থাকবে—তাই না?

—হ্যাঁ তাই। এই বাড়িতেই থাকি কিং ন্য কোথাও যাই মোটকথা কাল ছুটি আমার চাই।

—কিন্তু পরের চাকরি করতে গেলে ইচ্ছে মতো ছুটি কি আর পাওয়া যায়?

—হ্যাঁ পাওয়া যায়—পেতেই হ'বে।

—ছুটি যদি না মঞ্জুর হয়?

—তবে চাকরি ছেড়ে দেবো। আহা, কী আমার চাকরি রে! সব কাজে ছুটি আছে কেবল এ কাজেই ছুটি নেই একদিনও?

—সে তো নেই-ই। আর সেটুকু ভালোভাবেই জেনেও তো টেঁকে আছো এতোদিন। উল্টে চাকরিটা বজায় রাখবার জন্যে কতোখানি কী করেছো-না-করেছো সেকথা নিজেকেই জিগেস করো।···হাসতে হাসতে কথাগুলো বললো বিরূপাক্ষ।

সতী কিন্তু একথায় বিদ্রোহ ক'রে ওঠে, বলে—এখন আর কিছুই করবোনা। কিছুই করতে চাইনা। এইবার সেই সুবুদ্ধিই হোক আপনার। বরখাস্ত করুন আমাকে। এখন আমি আর কিছুই করবোনা। তামাসা নয়, আপনি বুঝছেননা। সত্যিই আমি আর পেরে উঠছিনা।

ব'লে সতী আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায়না, বেরিয়ে যায়। অবাক্ হ'য়ে বিরূপাক্ষ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, তারপর বাইরে এসে ছাখে সতী তার নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিয়েছে।

সতীর অপেক্ষায় বারান্দায় খানিক পায়চারি ক'রে যখন দেখলো দোর খোলার আশু কোনো সম্ভাবনা নেই তখন তার নিজের ঘরে ফিরে এলো। আজকের দুপুরের এই সময়টায় তার ভালো লাগছিলোনা কিছুই। একবার সে নিচের নেমে গেলো, চেম্বার-ঘর খুলে সেখানে কাটালো খানিকক্ষণ। সেখানেও ভালো লাগলোনা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো হাসপাতালের কথা। ঠিক করলো হাসপাতালেই যাবে এখুনি। যে-হাসপাতাল তার বুকের রক্ত দিয়ে এতো বছর ধ'রে গ'ড়ে তুলেছে সেখানে তার অনুপস্থিতিতে কী রকমভাবে কাজ চলছে অতর্কিতে গিয়ে সে দেখতে চায় স্বচক্ষে। রোগী দেখার চেম্বার বন্ধ ক'রে ওপরে উঠে এলো বিরূপাক্ষ। সতীর ঘর তখনো বন্ধ, সাড়া শব্দ পেলোনা কয়েকবার

ডাকাডাকি ক'রেও। কী হ'লো আজ সতীর? হঠাৎ কিসের অভিমান? এমন কিছুই তো ঘটেনি যেটাকে ওর এই অভিমানের কারণ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এতোবার ডাকাডাকি ক'রেও সতী যখন দোর খুললোনা, বিরূপাক্ষও পণ করলো সতীকে সে কিছুতেই আর ডাকবেনা। না আসে, নাই আসবে। এতোই কি অসহায় সে? নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলো যখন অনুভব করতে পারলো যে, কতোটা পরমুখাপেক্ষী সে। বহুক্ষণ ধ'রে বহু পরিশ্রম বা পণ্ডশ্রম করার পর যখন দেখলো যে, ট্রাউজার পায় তো শার্ট পায়না, শার্ট পায় তো কোট পায়না, কোট দু'একটা মিললো তো গ্রীষ্মকালে পরার যোগ্য একটাও নয় তখন ধৈর্য হারিয়ে যে ময়লা পোষাকে সেদিন সে বাড়ি ফিরে এসেছিলো সেটাই প'রে নিলো। সতীর বন্ধ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার বললো—আমি তাহ'লে হাসপাতালে বেরিয়ে যাচ্ছি।

শোনামাত্রই সতী দোর খুলে বেরিয়ে এলো। চোখ তার স্বাভাবিক নয়। শুধু বললো—ওই প'রে যাওয়া হ'তে পারেনা। আপনারই কাছে চাবি রয়েছে, সব রয়েছে—এটুকু আর খুঁজে নিতে পারলেননা? যদি ধরুন দু'দিন আমি অসুখে প'ড়ে থাকি তাহ'লে কী হ'বে বলুন তো? একটু অভ্যেস রাখলে ভালো করতেন।

—পয়সা ফেললেই লোক পাওয়া যায় এটুকু মনে রাখাই বা কী এমন মন্দ?

—থাক্, থাক্, ঢের হ'য়েছে, থামুন। আর বাহাদুরী করবেননা। খুব মুরোদ আপনার জানি। চলুন।

সতী গিয়ে একেবারে পাট-ভাঙা একটা স্যুট্ বের ক'রে দ্যায়।

বিরূপাক্ষ বলে—হাসপাতালে চলোনা তুমিও। যাবে? অদ্রি তো আজকাল শান্ত হ'য়েই আছে।

সতী বলে—না। আপনার হাসপাতাল, আপনি যান।

বিরূপাক্ষ বলে—কেন, তোমার হাসপাতাল নয়?

সতী ঝাঁঝিয়ে ওঠে—আমার আবার কিসের? আমার আর অতো শখ নেই।

বিরূপাক্ষ সবিস্ময়ে বলে—কেন? হঠাৎ কী এমন হ'লো তোমার?

—হবে আবার কী? কিছুই হয়নি।··ব'লে সতী নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিলো আবার।

সতীকে আজ বিরূপাক্ষের অত্যন্ত দুর্বোধ মনে হ'লো।

বেরিয়ে গেলো বিরূপাক্ষ। কাজের মানুষ সে—বহুদিন পরে আজ আবার তার স্বাভাবিক কাজে ফিরে আসতে পেরে মনটা যেন বেশ হাল্কা হাল্কা মনে

হচ্ছিলো। সে স্থির করেছে কাল থেকে আবার তার চেম্বারে রোগী দেখতেও সুরু করবে।

অনেকদিন পরে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে বিরূপাক্ষের বেশ একটু দেরিই হ'লো বাড়ি ফিরতে। পাঁচটা নাগাদ সে বাড়ি ফিরলো। বাড়ি ফিরেই কী যেন একটা প্রয়োজনে খোঁজ করলো সতীর, পেলোনা। সতীর ঘর খোলা, সতী নেই। হয়তো কোথাও বেরিয়েছে, আসবে এখুনি। নিজের ঘরে গিয়ে পোষাক ছাড়লো। 'লন্'-এর দিকে মুখ ক'রে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলো, বেশ হাওয়া দিচ্ছে। এমন সময়ে চাকর এসে সামনে দাঁড়ালো। বিরূপাক্ষ জিগেস করলো—কী রে, কী চাস ?

চাকর বললো—বাজারে যাবো। খরচা দিন।

শুনেই সে প্রায় খেপে ওঠে—রোজ বাজার-খরচা আমি তোকে দিই ? আমার কাছে চাইছিস্ যে ? সতী-দিদিমণি এলে নিস্।

—আজ্ঞে, দিদিমণিই ব'লে গেছেন আপনার কাছ থেকে নিতে। তাঁর আসার ঠিক নেই কিছু···

—একথা কে বললে তোকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিই বলছিলেন।

—তবে যা বাজার হ'বেনা আজকে।

নিঃশব্দে চ'লে যাচ্ছিলো চাকরটা, বিরূপাক্ষ তাকে আবার ডাকলো—এই শোন্। কতোক্ষণ বেরিয়ে গেছেন রে দিদিমণি ?

—আপনি যখন বেরোলেন তার একটু পরেই।

'লন্'-এর ওপারে চেয়ে থাকতে থাকতে বিরূপাক্ষ একটুখানি অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে দেখে চাকরটা নিঃশব্দেই স'রে পড়েছিলো।

বিরূপাক্ষ মুখে যাই বলুক শেষপর্যন্ত তাকে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হয়। সত্যিই তো আর এতোগুলো লোক উপোস ক'রে থাকতে পারেনা। সতীর চাবির রিংটা তখন থেকে বালিশের তলাতেই প'ড়ে আছে তার হঠাৎ মনে পড়লো। তখুনি সে উঠে গেলো নিজের ঘরে। চাবিটা তো আর ওখানেই ফেলে রাখা যায়না। কিন্তু বালিশটা সরাতেই নজরে পড়লো শুধু চাবিই নয়, একটা চিঠিও আছে সতীর হাতের লেখা। চিঠিটা সে পড়লো :

এটাকেই ছুটির দরখাস্ত কিংবা চাকরিতে ইস্তফা-পত্র কিংবা বিদায়-সম্ভাষণ যা ভাবলে আপনি খুশি হ'তে পারেন তাই ভেবে নেবেন। এতোদিন আপনার আশ্রয়ে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। এবারে যাচ্ছি, যাচ্ছি সম্ভবত বরাবরের জন্যই।

তবে জীবনে কখনোই যে আর এ মুখো হ'বোনা—এমন কোনো সাধু সংকল্প আমার নেই। তবে এমনই কোনো দৃঢ় সংকল্পের কথা যদি আপনি ভেবে নিতে পারেন তো সেটাই আপনার পক্ষে সব দিক্ থেকে শুভ হয়, আপনি রেহাই পান। রেহাই পাওয়ার এমন শুভ সুযোগ আশা করি আপনি হেলায় হারাবেননা—এটাই আপনার কাছে আমার শেষ অনুরোধ। প্রথমটা হয়তো নানা কাজে অসুবিধা হ'বে, কষ্ট হ'বে, দিনকতক ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, অকারণেই হয়তো মনে অনুতাপ আসবে—কিন্তু সে আর কতো দিন? সেটা স'য়ে থাকতে পারলেই দু'দিন পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আপনার ঘর-সংসার দেখাশোনা করার জন্যে নতুন লোক আনবেন—তাকে নিয়েই অভ্যস্ত হ'য়ে যাবেন। তখন আর কিছু অভাবও অনুভব করবেননা।

এমন সুখের চাকরি, এমন মহানুভব মনিব ছেড়ে কেন চ'লে যাচ্ছি? ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো মনে হ'তে পারে।

আপনি সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ, আমি অনেক নিচুস্তরের—একথা মনে-মনে আমি যতো জানি আর কেউ এতো জানেনা। তবু কথায় কথায় সেটাই আপনি বারে বারে মনে করিয়ে দিতে চান—বোধহয় ঐটুকুই আপনার দুর্বলতা। মহতের আশ্রয় পেয়ে আমার সুখের শেষ ছিলোনা—সেটুকু কি আপনি বুঝতে পারতেননা? এতো বছর ধ'রে আমার এই সৌভাগ্যের জন্য নিজ ভাগ্যবিধাতাকে প্রত্যহ ধন্যবাদ জানিয়েছি। লোকাপবাদ যতোই মুখর হ'য়ে উঠেছে ততোই আমার ভালো লেগেছে। কলঙ্ককে কলঙ্কই মনে হয়নি—মনে হ'য়েছিলো অমূল্যভূষণ। তবু এভাবেও যদি লোকে আমার নামটা আপনার নামের সঙ্গে জড়িত ক'রে রাখে। কিন্তু একথা মনে হয়নি যে, অপবাদের সঙ্গে জড়িত ক'রে উচ্চকে খানিকটা লোকচক্ষে নিচেয় নামাতে পারি কিন্তু তাতে যে সত্যই নিচের মানুষ তার আর ওপরে ওঠা হয়না। ওপরে ওঠা তবেই সম্ভব হ'তো যদি আপনিও হাত বাড়িয়ে খানিকটা টেনে তুলতে সাহায্য করতেন; তাহ'লে আমিও খানিকটা উঠতে পারতাম এবং উচ্চ-নীচের মধ্যস্থ কোনো এক সম্ভ্রান্ত সমতলে আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে পারতাম। এতোদিন সেটা একেবারেই অসম্ভব ব'লে ঠাওরাইনি—কিন্তু সম্প্রতি ভুল ভেঙেছে, বুঝেছি তা হ'বার নয়। তবে কেন আর মিছে একজন মহৎ লোকের শত সুকৃতি একটি মাত্র অপযশে কলঙ্কিত ক'রে দেওয়া? এ সমস্যার সমাধান আমি এখানে থাকতে হবার নয়, তাছাড়া দিন-দিন আমিও বড্ডো ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছি। যেমন চ'লে আসছে কিছুই আর চিরকাল তেমনি চলতে পারেনা। ঔদাসীন্যের প্রতিযোগিতায় আপনার কাছে আমি হার মানলুম। বিশেষ ক'রে

ও দু'দিন বড্ডো বেশি রকম ধরা প'ড়ে গেছি আপনার কাছে—লজ্জায় ম'রে গেছি তবু নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। দেখে মনে-মনে হয়তো আপনি হেসেছেন কিংবা ঘৃণা ক'রেছেন—সেকথা আমি জানতে চাইনা। জানতে চাইলে হয়তো এমন কিছু জানবো যা আমি সইতে পারবোনা তাই সে সাহসও পোষণ করিনা মনের মধ্যে।

এই যে আজ আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে মনস্থ করলাম এটা কিছু আমার তাৎক্ষণিক সংকল্প নয়—অনেক ভেবে-চিন্তে তবে আমি এটা স্থির করেছি। এ-বাড়ি আরো যতোদিন কাটাবো ততোই নিজের দুর্বলতা আরো হয়তো বেশি ক'রে প্রকাশ ক'রে ফেলবো, নিজেকে আরো হেয়, আরো তুচ্ছ করবো তাতে গ্লানির পুঁজি আমার আরো বেড়ে যাবে এর বেশি কিছু লাভ হ'বেনা। তার চেয়ে এখানেই থেমে যাই।

এই যে আপনার ঘরে এসেছি চিঠিখানা শেষ করতে আপনারই টেবিলে বসেছি, আপনারই প্যাডে, আপনারই কলমে আপনাকেই সম্বোধন করছি এক মুহূর্তের জন্যও মনে হচ্ছেনা এ-সবের কোনোকিছুই আমার নয়, কোনোকিছুতেই আমার কোনো স্বত্ব নেই—বরং মনে হয় এ সবের মধ্যেই আমারও খানিকটা অধিকার জন্মে গেছে—তাই আজ এসব থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে আমার এতো কষ্ট হচ্ছে। এতোখানি অধিকার যে আমার কোন দাবিতে, কবে থেকে, কেমন ক'রে জন্মে গেলো একথা জিগেস করলে হয়তো তার জবাবে সন্তোষজনক কোনোকিছুই বলতে পারবোনা। কিংবা হয়তো এমনকিছু বলবো যা আপনার পক্ষে স্বীকার করতে সম্ভ্রমে বাধবে কিংবা তাতে আপনার মনিবত্বের অভিমান ক্ষুণ্ণ হ'বে। সে আপনি সইতে পারবেননা…এটুকু বেশ বুঝে নিয়েছি ব'লেই আজকে এভাবে আপনাকে মৌখিক কোনোকথা না জানিয়েই আমি এখান থেকে স'রে যাচ্ছি।

যে ঘর-গৃহস্থালি যতো আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একদিন সাজিয়েছিলাম, যে পরিমাণ মমতা ঢেলে গুছিয়েছিলাম, যতো বেদনা-মাধুর্য দিয়ে ভ'রে রেখেছিলাম সে সমস্তই আজ আমার পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। এ সবের মায়া কাটানো কি কম দুঃখ? এ সবের স্মৃতি, এ সবের মোহই আমাকে আজীবন দুর্বার শক্তিতে টানবে যখন যেখানেই থাকি, যতোদূরেই যাই।

কোথায় যাবো বা কী করবো সে-সম্বন্ধে এখনো আমার ধ্রুব কোনো ধারণা নেই। যা আমার পেশা খুব সম্ভব সেই কাজই করবো; মোটের ওপর নার্সিং কাজটা নেহাৎ মন্দ নয় আর তাছাড়া পেটটাও চ'লে যায় যাহোক ক'রে। তবে যেখানেই থাকি, যা কিছু করি, আপনার শুভানুধ্যানই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়।'

এর পর থেকে বিরূপাক্ষ প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে লাগলো যে, তার অজ্ঞাতসারেই সতী এ-সংসারে কতো বড়ো বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছিলো। অন্যমনস্ক হ'য়ে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো বেলাশেষের রাঙা এক ফালি রোদ ক্রমশ বারান্দার কোণ থেকে উঠলো ঝিলমিলের ওপর, সেখান থেকে গেলো কার্নিসের ওপর, সেখান থেকে ক্রমশ বিবর্ণ হ'তে হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিলিয়ে গেলো গোধূলির ধূসরিমার মধ্যে।

কাছের ঐ মাঠটা যেখানে এতোক্ষণ ছেলেরা 'ভলিবল' খেলছিলো সেটি পার হ'য়ে, ছোটো-বড়ো বাড়ির অগণিত ঢেউ পার হ'য়ে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চুড়ো পার হ'য়ে, হাওড়া ব্রিজের দু'টি শিখর পার হ'য়ে যে-আকাশ, সেই আকাশ থেকেই যেন অন্ধকারের বাষ্প এলো নিঃশব্দ তুফান তুলে, ঘিরে ধরলো, ভরিয়ে তুললো চারিধার। ক্রমশ বড়ো রাস্তার বড়ো বড়ো দোকানের নিয়ন বাতিগুলো জ্ব'লে উঠলো তবু সেই সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে বিরূপাক্ষ ব'সে রইলো ঠিক একই ভাবে। সমস্ত দোতলার কোনো একটা ঘরেও আজ আলো জ্বলেনি—বাড়িটা প্রেতপুরীর মতোই নিঃশব্দ ও অন্ধকার—হঠাৎ এটা খেয়াল হ'লো তার। এই প্রেতপুরীর নিরন্ধ্র অন্ধকারে মায়া-মাধুর্যের স্নিগ্ধ আলো কে জ্বালবে আজ? সতী এসে জ্বেলেছিলো একদিন, সতীই জ্বালিয়ে রেখেছিলো এতোদিন, সতী এসেই কি জ্বালবে আবার? তখন বিরূপাক্ষের মনে শুধু একটি কথাই তোলপাড় হ'তে থাকলো—সতী নেই, সতী চ'লে গেছে! সতী কি আসবে আবার?

এই অন্ধকারের মধ্যে থেকেই আর্তনাদ আসে।

—নতি···নতি···কোথায়, কোথায় তুমি?

বিরূপাক্ষ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে অদ্রীশের ঘরের দিকেই যায়, গিয়ে জিগেস করে—কী ভাই, ডাকছো কেন? সে নেই।

—নেই? কেন নেই? কোথায় গেলো?

—জানিনা। কবে আসবে তাও জানিনা। আদৌ আসবে কিনা তাও বলতে পারিনা।

সতীর চিঠিখানা হাতে ক'রে বারান্দার চেয়ারে আবার এসে বসলো বিরূপাক্ষ। তার খেয়ালও নেই যে চাকরটা তার কাছে বাজার খরচার টাকা চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ'লে গেলো। তখন তার মনে শুধু একটি কথাই তোলপাড় হ'চ্ছে যে, সতী চ'লে গেছে।

অদ্রি হঠাৎ তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—নতি, নতি, কোথায় গেলে! শিগ্‌গির··

বিমর্ষ মৌন বিরূপাক্ষ আবার গিয়ে দাঁড়ায় অদ্রীশের পাশে, জিগেস করে—কী ?

অদ্রীশ ব'লে ওঠে—জ্ব'লে গেলো, জ্ব'লে গেলো দিগ্বিদিক্, দেখছোনা ? ছাখো, ছাখো, উঃ কী আগুন ! এই আগুনের পায়েই প্রণতি তার প্রণাম শেষ ক'রে গেছে। তোমাদের আঁচ লাগেনা গায়ে ? কী ক'রে তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখো, কী ক'রে তোমরা সহ্য করো এই আলো, এই আগুন ? বোকা, আলোর পোকা, পুড়ে মরবে যে ভয় নেই ? সইতে পারবোনা, সইতে পারবোনা, বন্ধ করো জানলা, অন্ধকার করো, অন্ধকার। বলিনি আমি ? বলিনি আমি তোমায়—সেদিনের সেই আগুন নেবেনি এখনো ? প্রদীপ-শিখা ছোট্টো কেন ভাবো, তাতেই ছাখো সূর্য জ্ব'লে যায়।

কোথায় সূর্য, কোথায় আগুন, কোথায় নতি তবু বিরূপাক্ষ জানলা বন্ধ ক'রে ছায়।

অদ্রীশ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটু স্বস্তিতে এবার যেন চোখ বুজোয়।

বিরূপাক্ষ সেখান থেকে স'রে গিয়ে আবার বারান্দায় চেয়ার টেনে বসলো। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলো—এবার থেকে অদ্রীশের ভারও তাকে একা-একাই বইতে হ'বে ?

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে হঠাৎ যেন একেবারে অতিনাটকীয় ভাবে অদ্রীশ হেসে ওঠে—হা-হা-হা ! বলে—আমি জানি, আমি জানি।

—সেকি তোমায় ব'লে গেছে কিছু ?

সেকথার কোনো উত্তর না দিয়েই অদ্রীশ বলে—তুমি নিরেট···আমি নিরেট··· ঐ মেয়েটাই ফাঁপা ! হয়তো বা সে এতোক্ষণে পেরিয়ে গেছে ধাপা। Buck up, doctor ! গোটা ধাপার মাঠ সাফ হ'য়ে গেলো, কী বলো এঃ ? হঠাও জঞ্জাল। বোসো, বোসো।

বিরূপাক্ষ একটু ক্ষীণ আশায় উৎসাহিত হ'য়ে আবার জিগেস করে—সে কি তোমায় ব'লে গেছে কিছু ?

অদ্রীশ বিরক্ত হ'য়ে ব'লে ওঠে—না, না, না। একবার দাঁড়িয়ে উঠে সে আবার শুয়ে পড়ে ; ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে, বলে—এতোদিনে গেলো ছাড়ি, কী বলো ?

বিরূপাক্ষ উত্তর ছায়—হুঁ।

—শুনছো ডাক্তার ?

—কী ?

—So at last…অদ্রীশ যেন দম নেবার জন্য কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তার বক্তব্যটা শেষ করলো—Nora has left her Doll's House.

—তাই তো দেখছি। কিন্তু তুমি ডেকেছিলে কেন?

—অন্ধকার ডাক্তার, অন্ধকার। জগদ্দলন অন্ধকার আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। দেখছোনা আকাশ অন্ধ হ'য়ে গেছে, বাতাস বন্ধ, নিশ্বেস ফুরিয়ে আসছে। জানলা খুলে দাও।

বিরূপাক্ষ আলো জেলে জানলা খুলে দিয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে বসলো অন্ধকার বারান্দার চেয়ারে।

আজকের রাত্রির বারান্দায় ব'সে এই চিন্তার নৈঃশব্দ্যের কাছ থেকে হয়তো এমন কিছু মন্ত্রণা পেলো বিরূপাক্ষ যে, যে-কোনো সর্তেই হোক সতীকে খুঁজে বের করতে হ'বে। বিরূপাক্ষের মনে আজ থেকেই সে-সাধনার জন্ম নিক।

বিরূপাক্ষ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, বেরোবার জন্যে তৈরি হ'য়ে নেয়, চাকরকে হাঁক ছায়, বলে—গাড়ি বের করতে বল্ ড্রাইভারকে।

চাকরটা যখন জানালো যে ড্রাইভার নেই তখন সে ঠিক করলো নিজেই ড্রাইভ ক'রে যাবে, কুছ পরোয়া নেই।

এ দুঃসময়ে সবার আগে তার বাসবীর কথাই মনে এলো। এ সময়ে একমাত্র বাসবীই তাকে সাহায্য করতে পারে—নিতে পারে অদ্রীশের ভার। কেবল অদ্রীশের জন্যই তার যা কিছু দায়িত্ব নইলে সে তো আজ মুক্তই। সতী তো মুক্তি দিয়েই গেছে তাকে—মুক্ত সে। অদ্রীশের গুরুভার দায়িত্বটা বাসবী যদি স্বেচ্ছায় নেয় তাহ'লেই তো তার ছুটি। বাসবীকে একটা সংবাদ পাঠানোই স্থির করলো। লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিলো এক সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে ছিলো—সতীর হঠাৎ চ'লে যাওয়ার সংবাদ আর সেটার মধ্যে বাসবীকে অনুরোধ ছিলো অদ্রীশের ভার নেবার জন্য।

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষ বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করলো। তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো গাড়ি নিয়ে।

এ সংবাদ পাবার পর বাসবী কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরূপাক্ষের বাড়ি এসে হাজির হ'লো, কিন্তু পেলোনা কাউকেই। সতী তো নেই-ই, বিরূপাক্ষও নেই। চাকরদের ডেকে কথা কইলো, শুনলো সব কথা। তারপর গেলো অদ্রীশের ঘরে।

—কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?…কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বাসবী।

—ওহো সেই তুমি আবার?

—হ্যাঁ, সেই আমি।···হাসলো বাসবী বড়ো বিষণ্ণ সেই হাসি।

—কিন্তু কেন? আবার তুমি কেন? মুহূর্তের মুঠি ভ'রে দিতে কেন যে তুমি আসো, কেন যে তুমি যাও, বুঝিনে, বুঝিনে। এখুনি আবার যাবেই যদি ফেলে তাহ'লে কেন এলে?

—এবার আর ফেলে যাবোনা, একেবারে নিয়েই যাবো আপনাকে।

—হায় রে, আমাকে? তোমার কী কাজ আমাকে? কী করতে পারো তুমি আমাকে নিয়ে? না, না, তা হয়না।

বাসবী বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হয়, খুব হয়। হ'তেই হ'বে। চলুন।

হাতখানা বাড়িয়ে দ্যায় অদ্রীশের দিকে।

অদ্রীশ বিমূঢ়ভাবে বলে—কোথায়?

—আমি যেখানে নিয়ে যাবো সেইখানে। ভয় কিসের? কেন, আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারছেননা?

খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে-চিন্তে অদ্রীশ ব'লে ওঠে—হয়তো পারবো, পারবো।

অশক্ত মানুষ যেমন যষ্টিতে ভর দিয়ে চলে তেমনি অদ্রীশও বাসবীকে ভর ক'রে বারান্দা পার হয়, সিঁড়ি দিয়ে নামে, উঠোন পার হয়, সদর দরজা পার হ'য়ে রাস্তায় এসে নামে। অদ্রীশ নিশ্চিন্ত-নির্ভরে শুধু বাসবীর দিকে চেয়ে থাকে অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে!

এই পরিণত শিশুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে বাসবীর জননীহৃদয় সমবেদনায় সহানুভূতিতে বিগলিত হয়। কেন যে সতী এই বয়স্ক শিশুটি সম্পর্কে অতোখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রেছিলো চিঠির মধ্যে, বাসবী মসুরী থেকে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। এখন অদ্রীশের পাশে এসে সে বুঝলো যে, সেই উচ্ছ্বাসের কতোখানি কী করুণ ভাবে সত্য!

বাসবী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো—চলুন, ঐ তো গাড়ি।

বাসবী অদ্রীশকে ধ'রে গাড়িতে ওঠায়, নিজেও ওঠে।

এখন থেকে অদ্রীশ নীরবেই বাসবীর অনুসরণ করলো, দ্বিরুক্তিও করলোনা।

(৩)

আসার পথে মোটরে অদ্রীশ এক সময়ে ব'লে উঠলো—জেগে আছো?

বাসবী একটু অন্যমনস্কই হ'য়ে প'ড়েছিলো, চমকে উঠলো অদ্রীশের অদ্ভুত প্রশ্নে, জিগেস করলো—কাকে বলছেন? আমায়?

—হুঁ।···অদ্রীশ সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়লো।

সবিস্ময়ে বাসবী বললো—জেগে আছি বৈকি। কেন? আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

অদ্রীশ কিন্তু স্বগতভাবেই একটু হাসলো আর বললো—চোখ তোমার চেয়ে আছে তাই জানতেও পারোনি মন তোমার ঘুমিয়ে প'ড়েছে কখন; স্বপ্নই দেখছে হয়তো।

যেন অতীন্দ্রিয় কোনো অনুভূতির সাহায্যে কেউ সত্যদ্রষ্টা বুঝি বা কথা ক'য়ে উঠলো অদ্রীশের মধ্য থেকে—বিস্ময়ের পর বিস্ময় জমা হ'তে থাকলো বাসবীর মনে; তখন-তখনই সে এর কোনো জবাব দিতে পারলোনা; তার মনে আবার নতুন ক'রে ধোঁকা লাগলো, ভাবলো একি সত্যিই পাগলের কথা? আমরা হয়তো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা এই অসাধারণ মানুষটিকে আর তাই এঁকে মিথ্যে-মিথ্যে পাগল ভেবে নেবার মূঢ়তার জন্য এঁর কাছে আমাদের অপরাধের বোঝা দিন দিনই বাড়িয়ে চলি।

বাসবীর মোটরটা এই সময়ে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে এসে লোয়ার সার্কুলার রোডে বাঁক নিলো।

কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ আবার আগের মতো ক'রেই অদ্রীশ ব'লে উঠলো—দেখতে পাচ্ছো?

অদ্রীশের চোখ দু'টো যেন কোনো স্বপ্ন দেখার মধ্যে মশ্‌গুল হ'য়ে গেছে।

বাসবী অপাঙ্গে কিছুক্ষণ ধ'রে অদ্রীশের তন্ময়তা লক্ষ্য করলো। অদ্রীশ চেয়ে ছিলো গাড়ির জানলার বাইরে। ওর দৃষ্টির তন্ময়তাটুকু লক্ষ্য করতে করতে বাসবীর মনে হ'তে লাগলো মসুরীর ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাকের ওপর দাঁড়িয়ে যেন কেউ অনেক নিচে দূন-উপত্যকার দৃশ্য দেখছে। সব কিছুই সুদূর, আবছায়া!

—দেখতে পাচ্ছো তো? ছাখো, ছাখো···অনেক বিবর্ণ ছবির, অনেক বিধ্বস্ত মূর্তির ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এখনকার মানুষেরা কিংবা ভাবীকালের 'রোবটেরা' যেন স্পর্ধাভরে বড়াই করছে—

> We are the hollow men
>
> We are the stuffed men
>
> Leaning together
>
> Headpiece filled with straw.

···একেবারে হুবহু পিকাসোর আঁকা ছবি! ছাখোনি পিকাসোর কোনো ছবি?

বাসবী ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। তার চোখে তখনই একবার The Three Musicians, Guernica ইত্যাদি ছবির ধাঁধা ভেসে উঠলো। এই সব কাঁপ

মানুষ, এই সব ঠাসা মানুষদেরই শিল্পী হচ্ছেন পিকাসো—এই ভাঙামূর্তির সভ্যতার শিল্পী-প্রতিনিধি।

বাসবীর মন অগ্নি পিকাসো-অ্যালবামের পাতা উল্টে যায়—বুঝতে চেষ্টা করে অনেক ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে কেন তাঁর শিল্প এগোয়। তাঁর দৃষ্টি হয়তো বা কালাপাহাড়ী, মূর্তি-ভাঙা মন! হয়তো কেন হ'তেই যে হ'বে ও-রকম। যে বস্তুটি তিনি আঁকতে চান প্রথমেই তিনি সেটির ভাঙচুর ক'রে নেন [শিল্প-পরিভাষায় যাকে বলে 'ভিস্যুঅ্যাল্ এক্সপ্লোশন'] তারই মাত্র দু'একটা বৈশিষ্ট্যময় ও ইংগিতময় অংশ (Significant Fragments) অভিনব উপায়ে জোড়া-তালি দিয়ে তাঁর নিরালোক মনের নৈরাজ্যিক ভাবমূর্তি গড়েন। তাঁর শিল্পশাস্ত্রের মূলসূত্রই হ'লো আগে ভেঙে তারপর ফের নতুন ক'রে গড়া। অথচ তপেশ পিকাসোকেই বলতো 'হাম্‌বাগ্' অর্থাৎ সে নিজে যা ছিলো তাই।

পিকাসোর ভাবলোকে বিচরণ করতে করতে বাসবী খেয়ালও করেনি কখন তার চিন্তার অবসরে গাড়িখানা গেট পেরিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো এবং বাগানের পাম ও ক্যাসুয়ারিনার বৃত্তার্ধ-বীথিপথ অতিক্রম ক'রে এসে থামলো গাড়িবারান্দার তলায়।

বিপ্রতীপও হ'লো সন্নিহিত

সেদিন দুপুরে অন্তু যখন বেরিয়ে গেছে অফিসে এমন সময়ে বন্ধু এলো—তার সেই পূর্বপরিচিত পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ। সদর দরোজা পার হ'য়ে বার-বাড়িতে পৌঁছোলো। অনিরুদ্ধের কাছ থেকে আসছে বাসবীর সঙ্গে দেখা করতে চায় এই রকমই যেন বললো বেয়ারাটার কাছে। কাজে-কাজেই বাসবীর দেখা পেতে তার একটুও দেরি হ'লোনা। নিচের ড্রইং-রুমেই বাসবী দেখা করলো বন্ধুর সঙ্গে। বাসবী এর আগে কখনো ছাখেনি বন্ধুকে অথচ তার সম্বন্ধে শুনেছে এতো যে বলতে গেলে প্রায় পরিচিতই। তাই বন্ধু যখন নিজের পরিচয় নিজেই দিলে বাসবী অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো, বললো—আজ আমার কী দিন ! কার মুখ দেখে রাত পুইয়েছে যে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আমার এখানে ! কী ভাবে অভ্যর্থনা করি ?

প্রশান্ত হাস্যে বন্ধু নিরস্ত করে বাসবীকে, বলে—কিছু প্রয়োজন নেই। ব্যস্ত হবেননা, বসুন।

আজ কয়েকদিন অনিরুদ্ধের দেখা পায়নি বাসবী, প্রথমেই তার সংবাদটা জানবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছিলো বাসবীর মনটা। কিন্তু একটু কিছু ভূমিকা না ক'রে একেবারে সরাসরি অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেও বাধছিলো, তাই বললো—আপনার সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পরিচিত হ'তে পেরে নিজ সৌভাগ্যে খুবই আনন্দিত হ'য়েছি, বন্ধুদা।

প্রথম দেখায় সংলাপের শুরুতেই বন্ধুকে বাসবী 'বন্ধুদা' বলে সম্বোধন করলো, বল্লো—আপনি এখন কোথেকে আসছেন ? নিরুদার কাছ থেকে কি ?

—নিরুর কাছ থেকে নয়, তবে নিরুর সম্পর্ক নিয়েই। বলবো সবকথাই কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা জিগেস করার আছে—আশা করি আপনি জানেন যে সংঘই আমাদের সব। সংঘের দাবির কাছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের যে কোনো দাবিই নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।

বাসবী বললো—জানি।

বন্ধু আরো জিগেস করলো—আমাদের সংঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আশা করি কিছু ধারণা আছে আপনার।

বাসবী বললো—আছে। কিন্তু আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন বন্ধুদা।

—বেশ, তাই হ'বে। সংঘের সবাইকে তুমি বলতেই আমি অভ্যস্ত। তাছাড়া নিরুকেও তো আমি 'তুমি' বলেই ডাকি।

এর পর আলাপ আরো সহজ হয়। বন্ধু আরো অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠেন।

বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থা সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন ও মন্তব্য ক'রে বাসবী বন্ধুকে নিজ মতামত প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বন্ধু এড়িয়ে যায়।

বাসবী বলে—এবার হয়তো কিছু পাওয়া যাবে, কী বলেন? হয়তো বরাত ফিরতে পারে আমাদের গরিব ভারতবর্ষের?

বন্ধু বলেন—কী ক'রে বলবো বলো? কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলের ওপর তো আমাদের কোনো হাত নেই। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যেতে হ'বে আমাদের; চেষ্টা ও সতর্কতাই আমাদের মূলমন্ত্র। ক্ষান্ত হ'তে পারিনা আমরা, একটুও ঢিলে দিতে পারিনা কাজে। এমন হ'তে পারে যে, শুধু চেষ্টার বীজই বুনে গেলাম আমরা, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি ঘটলোনা আমাদের ভাগ্যে—তার জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে হ'তেও পারে আমাদের উত্তরপুরুষকে। সমস্ত সুদূর সম্ভাব্য পরিণতিই মনের সামনে রেখে তবে আমরা কাজে নামি। পথের বিপদ চোখের সামনে জাগরূক থাকে যখন আমরা পথ চলি। এম্নি ক'রেই যতোখানি এগিয়েছি আমরা; আরো এগোতে হ'বে আমাদের।

বাসবী ব'লে ফ্যালে—কিন্তু এবার থেকে আপনাদের পথ কি কন্স্টিটিউশনল্ পদ্ধতি অনুসরণ করবে? রাতারাতি বিপ্লবের পথ কি আপনারা ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন?

বন্ধু একটু কৌতুক অনুভব করে বাসবীর কথায়, বলে—কেমন ক'রে তোমার মনে হ'লো একথা?

—এম্নিই জিগেস করছি। বলতে আপত্তি থাকে তো করবোনা। আগামী ইলেকশনে বিরুদাকে প্রার্থী হিশেবে দাঁড় করানো হ'চ্ছে শুনছি, শুনেই কথাটা মনে হ'য়েছিলো।

বন্ধু হাসতে হাসতে বলে—না, না, বিরূপাক্ষ ডাক্তার শেষপর্যন্ত ইলেকশনে দাঁড়াবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

—তিনি এখন কোথা?

—সংঘের কাজে ভারতবর্ষের বাইরে যাচ্ছেন। ডাক্তারের মতো লোককে পেয়েছি আমরা সেটা আমাদের ভাগ্য।

—বিরুদাও ভারতের বাইরে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—প্রদোষ-দা, নিরুদা, বিরুদা একই সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন ওঁরা?

—একই সঙ্গে তিনজনে যাত্রা করবেননা। প্রদোষ রওনা হ'য়েই গেছে নিরু আজই যাচ্ছে। আর ডাক্তার আগামীকাল যাবেন। তিনজনেরই গন্তব ভিন্ন ভিন্ন। এর বেশি জানতে চেয়োনা।

একটুখানি কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো বাসবী। হঠাৎ বন্ধু সন্ধানী চোখের সামনে চমকে উঠেই যেন সে সচেতন হ'য়ে উঠলো। বাসবী না প্রশ্ন ক'রে থাকতে পারলোনা—আচ্ছা, নিরুদার একবার কলকাতায় ফি কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে তবে রওনা হওয়ার কথা ছিলোনা? উনি এখ কোথায়?

বন্ধু বলে—কথা এমন ছিলোনা কিছুই তবে ও তাই চেয়েছিলো। কিন্তু আমি ওকে নিষেধ করেছি।

—কিন্তু কেন?

—কেন, তাও শুনতে চাও?

বাসবীর গলাটা কেমন যেন আর স্বাভাবিক নেই, সে বললো—হ্যাঁ।

বন্ধু স্মিতহাস্যে জিগেস করলো—তাহ'লে ভয়ে বলবো, কি নির্ভয়ে বলবো'

—নির্ভয়েই বলুন।

—যাবার প্রাক্কালে ও আরো যদি দিনকতক কলকাতায় কাটাতো তাহ'লে ও আর হয়তো যাওয়াই হ'তোনা। এটা আমি বেশ জেনেছিলাম। তুমিও হয় বুঝতে পারছো?

—কে? আমি? সেকি! কেন?···বাসবী একটু তোৎলায়।

ওর গালের স্বাভাবিক গোলাপী রংটুকুও বড্ডো যেন ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, নির্জীবের মতোই কৌচের ওপর এলিয়ে পড়ে।

—কে বললো আপনাকে? কেন মনে হ'লো আপনার এমন কথা?··নিতা মরীয়া হ'য়েই যেন ব'লে ফেললো বাসবী।

বন্ধু শান্ত কোমল এবং ধীর গলায় বললো—কেউই বলেনি। বরং লুকো চেয়েছে। কিন্তু তবুও আমি জেনে ফেলি সব, সেখানেই তো মজা। সেই সংঘের কেউই কোনো কথা গোপন করতে চেষ্টাও করেনা কারণ যারা আমা জানে তারা আমাকে বিশ্বাস করে। স্বতঃসিদ্ধের মতোই যেন ধ'রে নেয় আমি জানলে ওদের কোনো ক্ষতি হ'বেনা বরং ক্ষতিপূরণের উপায়ই হ'তে পা তোমারও লুকোবার কিছু নেই, বোন। নিরুকে আমি আমার অনুজের মতে

ভালোবেসে ফেলেছি সুতরাং তোমাদের শুভানুধ্যায়ী ব'লেই আমাকে তোমরা ধ'রে নিতে পারো।

বাসবীর ঘাড় আপনা থেকেই হেঁট হ'য়ে আসে দেখে বন্ধু হয়তো মনে-মনে হাসে। বাসবীর মনে হ'তে থাকে বন্ধুর ঐ রঞ্জন-রশ্মি বিকীর্যমান চোখের তলায় তার মনের গহনতম স্থানটিও অনাবৃত হ'য়ে গেছে। বৃথা চেষ্টা, ঢাকা যাবেনা কিছুই। অত্যন্ত করুণভাবেই অনাবৃত হ'য়ে পড়েছে সে। আশ্রয় নেবে কিসের আড়ালে? ঢাকবে কী দিয়ে? লুকোবে কোথা? এমনভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার মর্মান্তিক লজ্জায় সে বার বার যেন অবলাবান্ধব কান্নাকেই ডেকে আনে, বলে—কোথা আছো, এসো। বাঁচাও আমাকে, ঢেকে ফ্যালো আমায় অবলার অশ্রু দিয়ে।

বাসবী আর পেরে ওঠেনা ধরা গলায় ব'লে ওঠে—আপনি তো জানেন··· আমার অপরাধ, ক্ষমা করুন আমাকে।

বন্ধু হেসেই উড়িয়ে ছায় ওর সেকথা—আরে দূর, কী যে ক্ষ্যাপামি করো! ও কিছু না—সব ঠিক হ'য়ে গেছে। মন খারাপ কোরোনা মিথ্যে-মিথ্যে। কিসে যে অপরাধ হয় আর কিসে যে অপরাধ ক্ষয় পায় তা কি আমরা ভালো ক'রে জেনেছি আজো? তবে? দেবালয়ের আরতিপ্রদীপ তুমি। তোমার মতো এমনটি লাখেও মেলেনা এক।

যেম্নি বন্ধুর চোখে পড়লো বাসবীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে অম্নি সে ব'লে উঠলো—তীর্থবারি তোমার চোখের জল ··তা কি এমন ক'রে নষ্ট করতে পারো? ছিঃ!

আলাপের মোড় ফিরিয়ে ওম্নি প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যায় বন্ধু; বলে—দিল্ তোমার দরাজ বাসবী, হাতও তোমার তাই। হ'বেনা কেন বলো, ভগবান তো তোমায় কোনোকিছুই দিতে কার্পণ্য করেননি। তাই বলছি তুমি তোমার দরাজ হাত লাগাও যদি সংঘের কাজে···

বাসবী ব্যগ্র হ'য়ে ব'লে ওঠে—কী চান? বলুন কী করতে হ'বে? আমার যা কিছু আছে সবই আপনার হাতে তুলে দিতে পারি—তা যদি সংঘের কোনো কাজে আসে।

বন্ধু বলে—সময় এলে তাও বলবো বৈকি। বলতেই হ'বে নইলে পাবো কোথা? সে প্রয়োজনও হ'তে পারে শিগ্‌গির কারণ বিরূপাক্ষ ডাক্তারের কাছ থেকে যে সাহায্য আমরা নিয়মিতই পেতাম সেটা বন্ধই হ'য়ে গেলো। সুতরাং অন্যত্র হাত পাততেই হ'বে। সংঘের অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হ'লে আর্থিক সাহায্য

কোরো। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড়ো কাজ অর্থ ছাড়া সামর্থ্য দিয়েও সাহায্য কোরো সংঘকে—সেটাও তোমার কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করছি।

—বলুন; কী করতে হ'বে? যা আদেশ করবেন সাধ্য থাকলে···

বন্ধু বলে—হ'বে, হ'বে, সময় এলে বলবো বৈকি; এখন শুধু দাবিটা জানিয়ে রাখলুম। আপাতত একটা প্রস্তাব আছে—

—কী বলুন?

—সম্প্রতি রঙ্গিলার তত্ত্বাবধানে যে ক্যাম্পটা চলছিলো সেটা ওখানে আর রাখা যাবেনা। সেটা শেষপর্যন্ত হয়তো তুলেই দিতে হ'বে। কারণ রঙ্গিলা এবার আরো সক্রিয় রকম কোনো কিছুতে হাত দেবে। এতোদিন নিরুর স্ত্রীকে রঙ্গিলার ক্যাম্পেই রেখেছিলাম, ওরই তত্ত্বাবধানে ছিলো এখন তার কী ব্যবস্থা হ'বে বলো? তুমি যদি ওর ভার নাও···

—কী আশ্চর্য! এই কথা বলতে এতো কিন্তু করছেন কেন? নিশ্চয়ই নেবো। তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে চাই, কিন্তু তিনি কি ক্ষমা করতে পেরেছেন আমাকে? বৌদি কি আসবেন? তবে আপনি বললে হয়তো আসতে পারেন।

—আমি ব'লে রেখেছি। তবু তুমি একবার চলো নিয়ে আসবে।

—বেশ আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। হাতে-পায়ে ধ'রে যেমন ক'রে পারি আমি ওঁকে নিয়ে আসবোই। কোথায় আছেন তিনি?

—তোমার এখানে কিছুতেই আসতে চাইলোনা। ডাক্তার বিরূপাক্ষের বাড়িতেই আপাতত রেখে এসেছি ওকে।

—কী আশ্চর্য! রেখে এলেন যে সেখানে কে আছে চাকর-দরোয়ান ছাড়া? চলুন আমি এখনিই যাচ্ছি।

বন্ধুর সঙ্গে যাবার জন্যে ব্যস্তভাবে তৈরি হ'য়ে নিলো বাসবী।

পথে যেতে যেতে বাসবী বন্ধুকে জিগেস করে—সতীর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াটা কেমন যেন লাগলো আমার। কোথায় গেলো কে জানে। বিরূপ যখন জেলে তখনই যে ও অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো সেটা আমার কাছেও একবার প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলো মনে আছে। আপনি জানেন কিছু ওর সম্বন্ধে?

—জানি; সেও যাচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে।

—বলেন কি! সেও? কোথায়?

—বিরূপাক্ষ ডাক্তারও যে জাহাজে রওনা হ'বে সতীও সেই জাহাজেই যাবে। ওরা একই জাহাজে সহযাত্রী হ'য়ে যাচ্ছে সেকথা ওরা নিজেরাই জানেনা।

ডাক্তারও জানেনা, সতীও জানেনা। সতী যাচ্ছে নার্সিং-এ বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসবে ব'লে।

বাসবী মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে, বলে—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আপনার বুদ্ধি, বন্ধুদা।

এতোদিন বাদে আবার তাকে মলয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'বে। কেমন যেন ভয়-ভয় করছিলো বাসবীর। তার কথাগুলো মলয়া কী ভাবে নেবে, কে জানে। মলয়া তাকে কী বলবে এবং বাসবী তার কী উত্তর দেবে সেই সব মনে-মনে তালিম দিতে-দিতে বাসবীর গাড়িখানা বিরূপাক্ষের বাড়ির দোরে এসে পেঁছলো।

বন্ধু চললো সোজা ওপরে, পেছন পেছন চললো বাসবী। বিরূপাক্ষ যখন ছিলো বাসবী আগেও তো কতোবার এসেছে, এই সেদিনও—কিন্তু এমন বাধো-বাধো তো কখনো ঠেকেনি। এখন কেমন যেন প্রতি পায়েই হোঁচট্ খাচ্ছে।

দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলো মলয়া। তার পাশেই ছোটো একটা বেডিং, একটা হোল্ডল, একটা ট্রাঙ্ক।

মলয়ার রঙের ঔজ্জ্বল্য আগের থেকে কিছুটা ক'মে গেছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের দীপ্তি কিছুটা এসেছে চেহারায়। যদিও খানিকটা রুক্ষ-রুক্ষ মনে হ'চ্ছে সেটা সম্ভবত গতরাত্রের ট্রেনের কষ্টের দরুন। ওর অদ্ভুত চোখ দুটোর মায়া আজো তেমনিই আছে।

বন্ধু বললো—ছাখো মলয়া, বাসবী ছুটে এসেছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি বলছি তুমি এবার যেতে পারো ওর ওখানেই। ওর ওপর মিথ্যে অভিমান রেখোনা।

মলয়া তার অদ্ভুত চোখ দুটো তুলে একবার চাইলো বন্ধুর দিকে, কী-যেন বলতে গিয়েও বললোনা কিছুই।

বাসবী একটু দ্বিধান্বিতভাবে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে মলয়ার হাতখানা ধরলো, ধরাগলায় বললো—আমাকে ক্ষমা করো। আমার ওপর রাগ রেখোনা বৌদি। চলো তুমি আমার ওখানেই। আমরা দুই বোনে বেশ থাকবো। জানোই তো আমার একটি মাত্র ননদ ছিলো—সেও আমাকে ছেড়ে গেছে—এখন আমি বড্ডো একা। দিদির মতো থাকবে তুমি আমার ওখানে···

মৌন মলয়া একবার বাসবীর দিকে চোখ তুলে চায় তারপর বন্ধুর মুখের দিকে চায়।

বন্ধু বলে—যাও মলয়া, বাসবীকে ভুল বুঝেছো তুমি। যাও, আমি তোমায় বলছি।

মলয়া বাসবীকে বলে—বেশ, তবে তাই হ'বে।

বন্ধু বলে—হ'বে বৈকি। না হ'লে চলবে কী ক'রে বলো? চেষ্টা ক'রে ছাখো, এবার তোমরা মিলতে পারবে। নিরু আজ কাছে নেই—ভেবে ছাখো—তোমরা আজ সমদুঃখী; সুতরাং সমদুঃখের সমতলে এসে তোমরা আজ বেশ মিলতে পারবে।

ব'লে মলয়ার একখানা হাত নিয়ে বাসবীর হাতে সঁপে দিলো বন্ধু।

বাসবী ও মলয়া দু'জনেই দু'জনের কাঁধের ওপর নিজের নিজের মুখ রাখলে—ওদের চোখ তখন ভিজে উঠেছে। মিথ্যে বলেনি বন্ধু, একটি মহৎ দুঃখে আত্মীয়তার বন্ধনে এখন থেকে একজন অপরকে শুধু যে সহ্যই করতে পারবে তা নয়, হয়তো বা অবলম্বনও করতে চাইবে।

সুতোটুকু কের তুলে নেওয়া

বছর ঘুরে যাবার পর অথচ শিশিরের মাস এসে গাছের সবুজ হলুদে ছেয়ে ফলবার আগে চিঠি একটা এলো বাসবীর নামে ইউরোপ থেকে। অনিরুদ্ধের চিঠি। অনিরুদ্ধ বাসবীকে লিখেছে যে, আগামী বড়দিনের আগেই সে কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছে। এই খবরটুকু পাওয়ার যে আনন্দ—সেই আনন্দটুকু যেন আর নিজের মধ্যে ধ'রে রাখতে পারছিলোনা বাসবী অথচ সেটা জানাবার মতো প্রাণের দোসরও কেউ নেই তার এখানে। এই রকম সময়ে শারীর অভাবটা সে যেন বড়ো তীব্রভাবেই অনুভব করে। এ-ঘর ও-ঘর ক'রে বাসবী বেড়ালো খানিক। একবার কি গেলো মলয়ার কাছেও—কিন্তু কে জানে কেন ওর মুখের দিকে চাইলেই আর বাসবীর যেন কোনো কিছু বলা হয়না, হয়তো সাহসেই কুলোয়না। মলয়াকে দেখার আগে বাসবী হয়তো ঠিক বিশ্বাসই করতে পারতোনা যে, সুন্দর একখানি মুখকে সারা শ্রাবণের মেঘভার এমন অনড় অটলভাবে পেয়ে বসতে পারে। অনিরুদ্ধ বলতো বটে, মলয়া হাসতে জানেনা। বৎসরাধিক কাল মলয়ার সংস্পর্শে এসে বাসবীও আজ স্বীকার করে সেকথা। সত্যিই মলয়া হাসতে জানেনা কিংবা কখনো জেনে থাকলেও এখন তা ভুলে গেছে। ভুল ক'রে যদি কখনো হেসেও ফ্যালে তো সে হাসিটুকুকে মনে হয় শ্লেষের মতো, বিদ্রূপে সমাক্ত। মলয়ার এই হাসি বাসবীর অসহ্য মনে হয়, মনে হয় তার মেরুদণ্ড যেন বাঁকা হ'য়ে নুয়ে পড়ে সেই হাসির সম্মুখীন হ'লে। মলয়ার মন জুগিয়ে চলতে আরো একটু ওর অন্তরঙ্গ হ'তে, আরো একটু ওর বিশ্বাসভাজন হ'তে কতো চেষ্টা করেছে বাসবী কিন্তু মলয়ার মন সে কিছুতেই পায়নি বা পারেনি একটুও ঘনিষ্ঠ হতে। মলয়া যদিও মুখে কিছু বলেনা তবু অন্তরে অন্তরে সে একটুও যেন বিশ্বাস করেনা বাসবীকে। অনেক সময়েই বাসবী অনুতপ্ত অন্তরে ভাবতে গেছে, মলয়ার কাছে অপরাধ তার সামান্য নয় [অবশ্য যদি একে অপরাধই বলা যায় তবে]। এ অপরাধ কি ক্ষমারও অযোগ্য? মলয়া কেন যে ভুলতে পারেনা কোনো-কিছুই। একটা অপরাধ-চেতনা বাসবীকে সর্বদা খোঁচাতে থাকে ব'লেই বোধহয় বাসবীর ভদ্র মন ও উদার অন্তঃকরণ আরো যেন মলয়াকে কাছে টানতে চায়, কিন্তু পারেনা। সেজন্য বাসবী আজকাল মলয়াকে আর বড়ো একটা ঘাঁটাতে চায়না। একবার বাসবী বলেছিলো—তুমি কখনো কি একটু হাসতে পারোনা বৌদি? এবার থেকে একটু-একটু হাসো দেখি তোমার পক্ষে সেটা ওষুধের কাজ করবে।

এর উত্তরে মলয়া যে এমন কিছু শ্লেষ ক'রেছিলো তা নয়, শুধু ছিবে
হাসি? আমার হাসি যে তোমার কাছে বাঁধা রেখেছি ভাই। তুমিই হাসে
আমি দেখি।

বাসবীর মনে কিন্তু বেশ একটু খোঁচা লেগেছিলো তাতেই, এর পর সে আ
বলতে পারেনি কিছুই, স'রে গিয়েছিলো সেখান থেকে।

আজকের এই হঠাৎ আনন্দে কাউকে অংশীদার না পেয়ে, নিজেরই মধ্যে সে
আনন্দ জীর্ণ ক'রে নিতে চায় বাসবী আর তারই অভিব্যক্তি যেন ফুটে ওঠে গা
গানে। বহুদিন পরে আজ আবার অর্গ্যানের ডালাটা তুললো সে। তার গানে
উৎস হঠাৎ যেন কী ক'রে খুলে গেছে আজ। কী মনে ক'রে যেন মলয়া এসেছি
বাসবীর দোর পর্যন্ত, পর্দাটা সরিয়ে একবার উঁকি মেরে গেলো। তার চকিত ছা
পড়লো একবার দেয়ালজোড়া আর্শিতে, দেখতে পেলো বাসবী, জানলো সবই
তবু ডাকলোনা মলয়াকে।

মলয়া সম্পর্কে আর কোনো উৎসাহই যেন অনুভব করলোনা সে। ভ্রূক্ষেপ
করলোনা—গানে গানে কাটিয়ে দিলো সারাটা দুপুর এমন কি বিকেল পর্যন্ত
যে-পর্যন্ত না অক্ষের বাড়ি ফেরার সময় হ'লো।

(২)

ভারতে পা দেবার পর থেকেই অনিরুদ্ধ কয়েকদিন অনবরত বন্ধুর সন্ধান ক'
ফিরলো। সন্ধান করতে করতে শেষকালে সে যে-ক্যাম্পে এসে উঠলো সেখা
বন্ধু নেই কিন্তু রঙ্গিলাকে সেখানে পেলো। রঙ্গিলার আতিথ্যে এবার অত্যন্ত প্রী
হ'লো সে। রঙ্গিলার এতোখানি অন্তরঙ্গ পরিচয় এর আগে আর কখনো
পায়নি। বলতে গেলে অনিরুদ্ধ মুগ্ধই হ'লো রঙ্গিলার সানুকম্প ব্যবহারে, অনাড়ম্ব
সৌজন্যে ও চিত্তের দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বল্পভাষিতায়। অনেকদিন পথশ্রমের পর সে এ
যেন প্রথম বিশ্রাম পেলো। আহারাদির পর অনিরুদ্ধকে বেশ খানিক বিশ্রামে
অবসর দেবার জন্যই যেন নিজের কাজে ব্যাপৃত রইলো রঙ্গিলা। তারপর বে
যখন প'ড়ে এলো সে এসে বসলো অনিরুদ্ধের কাছে, বললো—বিশ্রামের প
শরীরটা বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে তো?

অনিরুদ্ধ স্বীকার করে, বলে—একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পেয়ে শরীরটা এখ
বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে, সত্যিই।

রঙ্গিলা বলে—তারপর এবার বলুন শুনি সম্প্রতি কী খবরাখবর শুনে এলে
ইউরোপে?

—কী? ভারত সম্পর্কে?

—তাছাড়া আর কিসে আমাদের আগ্রহ হ'তে পারে ?

উত্তরে অনিরুদ্ধ বললো—একেবারে খাস ইংলণ্ডে তো খুব জোর গুজব শুনে এলাম যে, ভারতকে এবার নিশ্চিতই স্ব-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হ'বে। এমন কি ক্ষমতা প্রদানের সন মাস তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করবার জন্তও যেন অতিমাত্রায় ব্যগ্র মনে হ'লো আমাদের সাম্রাজ্যবাদী মনিবদের।

—সেটুকু তো এখানে ব'সে ব'সেও কাগজ মারফৎ বোঝা যাচ্ছে।

—অবশ্য এবার কিছু যে দেওয়া হ'বেই এতে আর ভুল নেই। তবে সেটা পূর্ণ স্বাধীনতা কিনা সেটাই ঠিক করতে হ'বে আলাপ-আলোচনার দ্বারা, আপোষ-মীমাংসার দ্বারা। এবার হয়তো সত্যই আমরা কিছু পাবো। আপনার কী মনে হয় ?

রঙ্গিলা হেসে বলে—সেটাই তো সম্ভব।

—তাহ'লে তখনকার নতুন সেট্-আপ-এ আমাদের এই সংঘেরও কি আর প্রয়োজন থাকবে ? প্রয়োজন থাকবে এই কার্যসূচীর ?

—সংঘের প্রয়োজন ফুরোবে কেন, কাজ কি ফুরিয়েছে ? কাজ যে ঢের বাকি আছে, কাজের এই তো সবে শুরু ! তবে দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্যসূচীরও নিশ্চয়ই বদল হ'বে।

—ইতিমধ্যে বন্ধুদার সঙ্গে এ নিয়ে কিছু কথা হ'য়েছে আপনার ?

—খুব সম্প্রতি হয়নি।

—কোথা আছেন তিনি ?

—সেটা আমিও ঠিক জানিনা, জানবার চেষ্টাও করিনি, কারণ বন্ধুদার নিষেধ আছে।

—আমি এখন একবার দেখা পেতে পারিনা বন্ধুদার ?···অনিরুদ্ধ একটু অধীরভাবেই প্রশ্ন করলো।

কী যেন ভাবতে ভাবতে অন্তমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো রঙ্গিলা, উত্তর দিলো—সম্ভবত না। কারো সঙ্গেই তিনি দেখা করবেননা, কথাও বলবেননা, যে-পর্যন্ত আবার না তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। আজ মাস তিন হ'লো তিনি অজ্ঞাতবাসে আছেন। তবে এটা সঠিক ভাবেই জানি যে, তিনি কাছাকাছিই আছেন, আড়াল থেকে সবকিছুই লক্ষ্য করছেন, অন্তরাল থেকে তিনিই তো এখনো আমাদের পরিচালিত করছেন।

—কী ক'রে জানলেন ?

—এখনো মাঝে মাঝে দূতের হাত থেকে তাঁর সংবাদ পাই, নানা বিষয়ে

এখনো তিনি উপদেশ পাঠান; সংঘের খুঁটিনাটি সব খবরাখবর এবং যা কিছু জিজ্ঞাস্য সকল কিছুই নিয়মিতভাবে আমিও পাঠিয়ে দিই, কিন্তু কখনো জানতে ইচ্ছে করিনা কোথায় তিনি আছেন কিংবা কীভাবে আছেন। এই রকমই তাঁর আদেশ। তাঁর ইচ্ছাক্রমেই এভাবে চলছে আজকাল।

—আচ্ছা, আপনি আমার সম্বন্ধে তাঁকে একটু লিখবেন? এবার আমি কী করবো?

—আপনার সম্বন্ধেও তিনি সবকিছু জানেন এবং আপনি দেশে ফিরলে কোথায় থাকবেন, কী করবেন তাও আমায় জানিয়ে রেখেছেন।

কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই হঠাৎ যেন একটু শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো, অনিরুদ্ধ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো—আবার কী ঠিক করেছেন তিনি আমার সম্বন্ধে?

—এতে বিশেষ আশঙ্কার বা ভাবনার কিছু নেই আপনার। এখান থেকে আপনি কলকাতায়ই যাবেন, কলকাতার কাছেই থাকবেন—সেকথা কিছুদিন আগেই তিনি আমায় জানিয়ে রেখেছেন। এখানে অনর্থক আপনাকে আর দেরি করতে বলবোনা—ইচ্ছে করলে আজই আপনি কলকাতায় রওনা হ'তে পারেন।

অনিরুদ্ধ এবার যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কলকাতাই তো সে চাইছিলো তার মন, প্রাণ ও সমস্ত অন্তর দিয়ে।

ফাইলের কাগজপত্র ঘেঁটে রঙ্গিলা একটা ঠিকানা উদ্ধার ক'রে অনিরুদ্ধের হাতে দিলো এবং বললো—এই হবে আপনার কলকাতার ঠিকানা। এখানেই আপনি গিয়ে উঠবেন—যে-পর্যন্ত না অন্য সংবাদ পান এখানেই থাকবেন।

অনিরুদ্ধ বলে—আজই তাহ'লে কলকাতায় রওনা হই, কী বলেন?

—যা আপনার সুবিধে মনে হয়।···রঙ্গিলা অনিরুদ্ধের ওপরই ছেড়ে দিলো সিদ্ধান্তের ভার।

তখুনি রওনা হওয়াই সিদ্ধান্ত করলো অনিরুদ্ধ।

অনেকক্ষণ থেকেই অনিরুদ্ধ রঙ্গিলাকে একটা প্রশ্ন করি-করি ক'রেও করতে পারেনি এবার দ্বিধা কাটিয়ে সেই প্রশ্নটাই ক'রে বসলো। বললো—বন্ধুদা মলয়াকে তো আপনার কাছেই রেখেছিলেন—তারপর? এখন সে কোথা আছে? কেমন আছে? কিছু খবর জানেন তার?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু গূঢ়ার্থক হাসি রঙ্গিলা হাসলো, বললো—যতোদূর জানি এখন সে আগের চেয়ে ভালোই আছে আর বর্তমানে সে আগের চেয়ে ভালো

জায়গাতেও আছে। মানে, অজবাবুর স্ত্রীই তাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন নিজের বাড়ি। কলকাতায় গেলেই জানবেন সব। ভাবনার কিছু নেই।

শোনামাত্রই হর্ষ-বিষাদের মতো একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি যেন কিছুক্ষণ মুহ্যমান ক'রে রাখলো অনিরুদ্ধকে।

সেই সন্ধ্যায়ই রওনা হ'য়ে পরদিন সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছলো অনিরুদ্ধ।

(৩)

একদিন দুপুরে ওর ফোনটা যখন বেজে উঠলো, বাসবী তখন কী-যেন করছিলো। আওয়াজ পাওয়ামাত্রই সে এসে রিসিভারটা তুলে নিলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো—কে? নিরুদা?··কলকাতায় কবে এলে?

ওপার থেকে অনিরুদ্ধ কী যেন বললো শোনা গেলোনা।

বাসবী বললো—তোমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমি কী-ভাবে দিন গুনছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো··কলকাতায় তুমি এসেছো অথচ ক'দিনের মধ্যে একবারও সেকথা জানাবার অবকাশ পেলেনা?

শোনা না গেলেও অনিরুদ্ধ ওপার থেকে এ-অভিযোগের সাফাই দিলো নিশ্চয়ই। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শোনার পর বাসবী একটু অভিমানের স্বরে বললো—যাই হোক্ পুরো তিন-তিনটে দিন তো তুমি এসেছো, আজই কি প্রথম মনে পড়লো আমায়? বেশ যা হোক!

আবার খানিক চুপ ক'রে শোনার পর বাসবী বললো—বেশ···নাহয় না-ই এলে, ফোনেও তো জানাতে পারতে খবরটা··আমিই যেতাম। আচ্ছা, তাই হ'বে।··না, তোমায় আমি আসতে বলছিও না।···তোমার ঠিকানা কী?···ধরো এক মিনিট, লিখে নিই।

রিসিভারটা বাঁ হাতে নিয়ে একটুকরো কাগজে অনিরুদ্ধের ঠিকানাটা লিখে নিলো বাসবী, তারপর জিগেস করলো—এতো বড়ো কলকাতার মধ্যে স্থান হ'লোনা তোমার? শেষকালে শিবপুর?···ব'লে হেসে উঠলো বাসবী। তারপর বললো—আজ দুপুরে বাড়ি আছো তো? নিশ্চয়ই যাবো কিন্তু।···ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যেই হাজির হবো···এখন তো বারোটা, পৌঁছতে ধরো আড়াইটে··বেশ তো···কোথা, বোটানিক্সে?··চমৎকার, এইতো কেমন বুদ্ধি খুলছে! অন্য কোথাও খোঁজাখুঁজি ক'রে সময় নষ্ট করতে হয়না যেন···অর্কিড্ হাউসে গেলেই যেন তোমাকে পাই।···আচ্ছা··হ্যাঁ, হ্যাঁ, বৌয়ের জন্য ভেবোনা তুমি। বৌদি ভালোই আছে।·সে অনেক কথা বলবো'খন সব।

কথাটা ব'লেই তার মনে হ'লো পাশে দাঁড়িয়ে কেউ যেন শুনছে ওদের আলাপ। মনে হ'তেই চমকে উঠলো বাসবী, চেয়ে দেখলো কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ তার হুঁশ হলো পাশের ঘরে মলয়া তো থাকতে পারে। মলয়ার অস্তিত্বের কথাটা এতোক্ষণ সে ভুলেই গিয়েছিলো—তাই অনিরুদ্ধের সঙ্গে ওভাবে গলা ছেড়ে আলাপ জুড়তে পেরেছিলো। খেয়ালটা ফিরে আসতেই বাসবীর বড়ো ভয় হ'লো। তখুনি রিসিভারটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখে দোরের দিকে এগিয়ে গেলো দেখতে। 'করিডরে'-ও তো কেউ থাকতে পারে। দেখলো, যা ভয় ক'রেছিলো তা-ই। কার বসনপ্রান্ত যেন একটু দেখা গেলো তারপর ঢুকে গেলো পাশের ঘরে। বুকটা ওর ঢিপ্ ক'রে উঠলো একবার। পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো বাসবী করিডর দিয়ে। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে 'করিডর' থেকেই ভয়ে-ভয়ে ডাকলো —বৌদি, শুনে যাও। তোমায় এখুনি একটা খুব সুসংবাদ দেবো।

মলয়া কিন্তু একবারও পিছন ফিরে তাকালোনা, কথার কোনো জবাব না দিয়েই তার নিজের বিছানায় উঠে বসলো।

বাসবীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চিরদিনই তাকে অনেক বিসদৃশ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে, এবারেও সে কিছুটা শেষরক্ষা করতে চেষ্টা করলো।

বাসবীও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো মলয়ার ঘরে, বললো—নিরুদা আজ ক'দিন হ'লো ফিরেছে কলকাতায়; তোমার খোঁজ নিচ্ছিলো, চলো, ডাকছে তোমায় ফোনে। নিজের শরীরের কথা নিজমুখেই ওকে জানিয়ে আসবে চলো।

এবারেও মলয়া বাসবীর কথার উত্তর দিলোনা। হাতের কাছে গায়ে দেবার মতো চাদর-টাদর না পেয়ে, পাতা বেড্-কভারটাই তুলে নিলো; অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সেটা দিয়েই মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো খাটে।

মলয়ার কাঁধের ওপর হাত রেখে বাসবী বললো—কই বৌদি, চলো? শুয়ে পড়লে যে?

মুখ থেকে ঢাকা না সরিয়েই মলয়া বললো—আমার জ্বর আসছে ভাই, তুমিই যাও। কথা বলো গে।

অনেক সাধ্য-সাধনাতেও কিছু ফল হ'লোনা; অগত্যা বাসবী ফিরে এসে রিসিভারটা যখন আবার তুলে নিলো তখন কিন্তু লাইন কেটে দিয়েছে।

সেদিন দুপুর আড়াইটের আগেই বাসবী হাজির হ'লো বোটানিক্যাল গার্ডেন্সের 'অর্কিড হাউস'-এ। বিচিত্র কার্নে বোঝাই ছোট্টো একটা কৃত্রিম পাহাড়ের ধারে

পেক্ষা করছিলো অনিরুদ্ধ; বাসবীকে দেখামাত্রই উঠে এলো। সেই মুখ, ই চোখ, রক্তে তুফান-তোলানো সেই হাসি! কাছে এসে অনিরুদ্ধ হাত লো বাসবীর, বললো—ওঃ, কতদিন পরে বঁধুয়া আইলে, দেখা না হইত পরাণ লে। চলো বেঞ্চে গিয়ে বসি একটু।

বাসবী বললো—চলো। আমার তো ভয় হচ্ছিলো এতোদিন ধ'রে কতো রে এলে; কতো দেখে-শুনে এলে, আমাকে হয়তো ভুলেই গেছো। তাই সেই রনো দিনের কথাগুলো মনে করিয়ে দিতে পুরনো শরীরটাকে নিয়ে আবার স দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে। 'ছাখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো না।'

—তুমি আমায় চিনতে পেরেছো তো?···অনিরুদ্ধ হাসতে হাসতে জিগেস করে।

—হুঁ-উঁ। বিলেত ঘুরে এসে আরো সুন্দর হয়েছো। কী ভালো যে লাগছে কী বলবো—একা পেলে জড়িয়ে ধরতাম। মসুরীর চেয়েও ভালো। হবেই —শীতের দেশ, স্বাস্থ্যকর জায়গা, তাতে দিব্যি ঝাড়া হাত-পা, নির্ঝঞ্ঝাটে, তোগুলো দিন কাটিয়ে এলে। বৌয়ের কাছ থেকে তফাতে থাকলেই তুমি ভালো কবে, বলিনি আমি তোমায়?

—তা বটে। কিন্তু আমার পাপের বোঝা তুমিই বা বইবে কেন সারাজীবন? হয়না।

—অমন কথা বোলোনা, তাহোক। ছাখো, অনেক কিছু পরামর্শ আছে মার সঙ্গে। চলো এখান থেকে একটু নির্জনে। এ জায়গাটা খুবই সুন্দর ট, কিন্তু লোক ঘোরা-ফেরা করছে।

অর্কিড হাউস থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলো ওরা। বী বললো—ছাখো, একটা ব্যাপার ঘ'টে গেছে। আজ তুমি যখন আমায় নে ডেকেছিলে বৌদি তখন ঠিক পাশের ঘরেই ছিলো, অতোটা খেয়াল করিনি। মার কথাগুলো কিছু কিছু ওর কানে গেছে বোধহয়।

—সেকি?···বিশেষ শঙ্কিত দেখা যায় অনিরুদ্ধকে।

—কী করবো বলো, কতোদিন বাদে তোমার গলার ডাক শুনতে পেলাম—এর র কী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারা যায়? একটু অসতর্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, ময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলাম চারিধারের সব কিছু। ভাবিনি যে বৌদি পাশের থেকে আড়ি পেতে থাকলে শুনতে পাবে সবকথাই।···তারপর একটু থেমে সে লো—যাক্ শুনুকগে, কীই বা এমন বলেছি।···একথায় বাসবী যেন নিজেই জেকে কিছুটা সান্ত্বনা দিলো।

অনিরুদ্ধ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও গম্ভীর মুখে বললো—তুমি যে আজ এখানে সেটাও তাহ'লে মলয়া জেনে ফেলেছে?

—যদি আড়ি পেতে আমার সবকথা শুনে থাকে তাহলে তো জানবারই কথা।

—তাহলে আজ না এলেই পারতে। ফোনে তখন-তখনই জানিয়ে হতো। যাক্ যা হবার হ'য়ে গেছে। এবার তোমার ফোনটি অন্য কোথাও তো আগে।

—সেকথাই ভেবে ঠিক করেছি।··বাসবী অনুমোদন করলো অনিরুদ্ধের কথা তারপর সখেদে ব'লে উঠলো—আর পারিনা। দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে ভয় ক'রে ক'রে দেহের রক্ত যে হিম হ'য়ে গেলো, বুক যে পাথর হ'য়ে গেলো। বাদে তুমি ডাকলে আর আসতে পাবোনা? কী জ্বালা!

অনিরুদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললো—সে সত্যি। এ-জন্মটা এমনি ক'রেই কাটলো।

দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর অনিরুদ্ধ বললো—এসেই যখন প্রথম শুনলাম যে তুমি নাকি মলয়াকে নিজের বাড়িতে জায়গা দিয়েছো তখন কী-যে খারাপ লাগলো, কী বলবো।

মলয়াকে সে কী-ভাবে নিজের বাড়ি এনে তুললো তার বিবরণটা প্রথমে বাসবীর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত শুনে নিলো অনিরুদ্ধ, শেষে একটু উম্মাভরেই ব'লে উঠলো—আঃ, বললেনই বা বন্ধুদা, যাহোক ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলেনা! কেন তুমি তখন মলয়াকে জায়গা দিতে রাজী হ'লে? কেন ওকে ডেকে এনে তুলতে গেলে নিজের বাড়িতে? নিজের সর্বনাশ তুমি নিজেই করেছো—এতোটুকু সাংসারিক বুদ্ধিও কি নেই তোমার?

—যাক্‌গে, কী হয়েছে তাতে?··তাচ্ছিল্য ক'রেই বাসবী বললো।

বেশ একটু উম্মার সঙ্গেই অনিরুদ্ধ ব'লে উঠলো—তাতে কী হ'য়েছে বলছো? ওকে কি জানোনা তুমি?

বাসবী হেসে গা পাতলা করে, বলে—জানি। হাজার হ'লেও আমার নিরুদা'র বৌ তো, ওকে ঘরে এনে তুলবোনা তো কাকে ঘরে এনে তুলবো? কপালে যা আছে তা তো হ'বেই, তা নিয়ে আর অতো ভাবতে পারিনা। মিছিমিছি কেন ও নিয়ে রাগ করছো তুমি?

অনিরুদ্ধ বলে—মিছিমিছি নয় বাসবী। জানোনা, কেবল তোমার জন্যই ওকে আজকাল আমি কতো ভয় ক'রে চলি। সত্যিকথা বলো তো ইতিমধ্যে মলয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে কেলেঙ্কারী করেনি? যা তা কথা অজবাবুর কানে তো

তোমার শান্তির সংসারে বিষ ঢেলে দিতে চেষ্টা করেনি? নিশ্চয়ই ক'রেছে। বলো, লুকোতে চেষ্টা কোরোনা আমার কাছে।

—আঃ, থাক্ ও-সব কথা। অতো খুঁটিনাটি জানতে চেয়োনা তুমি মেয়েদের মতো।

—'মেয়েদের মতো' ব'লে কঠিন বাস্তবকে কী ক'রে এড়াতে পারবে বাসবী? তুমি একটুও বুঝছোনা আমার দুশ্চিন্তা। অশান্তির ভারে তোমার সুখের সংসার ভেঙে যাবে, তোমার নিজের সংসারেই তোমার অপমানের চূড়ান্ত হ'বে, সমাজে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, মাথা হেঁট হবে পাঁচজনের কাছে।—এ আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী ক'রে দেখবো, কেমন ক'রে সইবো? তোমার প্রতি যে এ-রকম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তোমাতে কলঙ্ক আরোপ করতে যে সদা সচেষ্ট তাকে ক্ষমা করতে বা তার সঙ্গে আপোষ করতে আমাকে বোলোনা তুমি।

অনিরুদ্ধের বিস্তর পেড়াপীড়ির পর বাসবীকে স্বীকার করতেই হলো যে, মলয়া একবার অজের কাছ অনিরুদ্ধ সম্পর্কে বাসবীর দুর্বলতার ইঙ্গিত করেছিলো কিন্তু তা নিয়ে অজের একেবারেই কোনো উৎসাহ নেই দেখে এখন নিরস্ত হ'য়েছে।

শোনামাত্রই অনিরুদ্ধ চমকে উঠলো, খুব সন্ত্রস্তভাবেই বললো—খুলে বলো ব্যাপারটা সবটুকু। তারপর?···

সেদিনের ঘটনাটার বিবরণ বাসবী খুব সংক্ষিপ্তভাবেই শেষ করলো। তারপর মন্তব্য করলো—আমার সম্পর্কে আমার স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরেই বোধহয় বৌদি তখন সেখানেই থেমে গিয়েছিলো। তারপর থেকে সেদিকে আর একটুও এগোতে চেষ্টা করেনি। সম্ভবত আর করবেওনা।

অনিরুদ্ধ বললো—জানি এসব ঘটবে; যখনই জানলাম ও তোমার কাছে গেছে তখন থেকে মনে-মনে এ-আশঙ্কাই ক'রেছিলাম।

এর পর সে কিছুক্ষণ একটু বিমনা হ'য়ে গেলো তারপর একটু সন্দিগ্ধভাবে ব'লে উঠলো—তাহোক বাসবী, মলয়াকে তুমি বিশ্বাস কোরোনা কখনো। ওকে আমি এবার নিশ্চয়ই সরিয়ে নিয়ে যাবো তোমাদের ওখান থেকে। মলয়াকে তো আমি জানি আর তুমিও যে ওকে জানোনা তা নয়। তোমার সম্পর্কে ও ঠিক সাপের মতোই ক্রূর হ'য়ে উঠতে পারে। সসর্পগৃহে তোমাকে আর বাস করতে দেবোনা বাসবী, আমার প্রস্তাবে তুমি অমত কোরোনা—এটুকুই আমার অনুরোধ। আমাদের জন্য তুমি আর ভেবোনা।

—কোথায় এবার যাবে তোমরা? কোথা নিয়ে গিয়ে তুলবে বৌদিকে?

—যেখানে হয়।

—আবার নি[illegible] বেরোবেনা তো ?

তিক্ত শ্লেষের মতো সামান্য একটু হেসে অনিরুদ্ধ বললো—না। কথা দিচ্ছি এবার আর আগের মতো কোনো কিছু চেষ্টা করবোনা। এতোদিনে বুঝেছি নিয়তির নির্দেশ লঙ্ঘন করা যায়না। বোঝা যতোই দুর্বহ হোক নিয়তির নির্দেশ ব'লে ভেবে নিয়ে প্রাণপণে তা বইবো, ফেলে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবোনা। ফেলে দিতে গিয়েই ভুল ক'রেছিলাম তাই সে বোঝা আবার তুমি কুড়িয়ে নিলে নিজের কাঁধে আমারই জন্য। লজ্জায় আমি ম'রে গেছি এতে—দুনিয়াসুদ্ধ লোকের কাছে এমন কি তোমার কাছেও কতো ছোটো হ'য়ে গেছি। আমার পৌরুষের মতো খর্বতা ক্ষমা কোরো বাসবী। লোকচক্ষে আমি যদি আরো হেয় হ'য়ে যাই—সেও কি তুমি সইতে পারবে ?

একটু চুপ ক'রে থেকে বাসবী বলে—এ ছাড়া কি আর অন্য উপায় নেই ? তাড়াতাড়ি কোনোকিছু কোরোনা, ভেবে-চিন্তে কোরো, আমিও অনুরোধ করছি তোমায়।

অনিরুদ্ধ বলে—ভেবেই তো বলছি। ক'দিন কেবল এ নিয়েই ভাবছি—এ ছাড়া আর উপায় কী ? তুমিই বলো।…তাছাড়া আইনত ও আজো আমার স্ত্রী অতএব আমারই বোঝা। তা নিয়ে আমারই কষ্ট পাওয়া উচিত অপর কারোরই নয়। যদিও জানি ও এখন রাজার হালে আছে তোমার ওখানে তবু একথাও ঠিক যে, আইনের চক্ষে এবং সমাজের চক্ষে আজো ও আমার স্ত্রী। অন্যের আশ্রয়ে প'ড়ে থাকবে সেটা আমারও পক্ষে সম্ভ্রমহানিকর।

অনিরুদ্ধের একথায় বাসবী কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে, বলে—সত্যি… তাহলে…তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই।

এরপর দু'জনেই চুপচাপ, দু'জনেই চিন্তাবিষ্ট।

বাসবীর একখানা হাত অনিরুদ্ধ নিজের হাতের মধ্যে কখন যেন নিয়েছিলো বাসবীও এতোক্ষণ টেনে নেয়নি। হঠাৎ এখুনি অনিরুদ্ধের হুঁশ হ'লো যে, বাসবীর হাতখানা ওর হাতের মধ্যে কখন থেকে বুঝি ঘামতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বাসবীর হাতটা সে এবার ছেড়েই দিলো, বললো—ওঠা যাক্।

উঠে পড়লো ওরা কারণ বাগান ছাড়বার ঘণ্টা প'ড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

এ যাবৎ বারবার তিমিরান্ধ দিঙ্‌মূঢ় হ'য়েও এই প্রণয়ীযুগল কোনোক্রমে হাতে হাত বেঁধে কষ্টে-সৃষ্টে পথ চলছিলো কিন্তু এবার পারস্পরিক নির্ভরের সেই সাহসসূত্র, সেই করবন্ধন সহসা ছিন্ন হওয়ায় দু'জনেই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আঘাতে মুহ্যমান হ'লো দু'জনেই, তবু মুখ ফুটলোনা কারো।

নিরুদা, চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।—বাসবী ডাকলো।

তুমি গাড়ি এনেছো বুঝি?—অনিরুদ্ধ একটু দ্বিধা করে।

সেটা বুঝতে পেরেই বাসবী একটু হেসে বললো—না, গাড়ি আনিনি। তুমি
রেছো কিনা সঙ্গে—অসুবিধে হ'বে বুঝেই ট্যাক্সিতে এসেছি—ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে
াছে।

অনিরুদ্ধকে এবার বেশ একটু খুশি-খুশি দেখা যায়, সে বলে—বেশ করেছো।
বার বুদ্ধি হচ্ছে একটু একটু। চলো।

ওরা গিয়ে বসে ট্যাক্সিতে।

—তুমি তো কাছেই থাকো এখুনি নেমে যাবে। সারা রাস্তা আমাকে একাই
া যেতে হ'বে।···বাসবী একটু ম্লান হেসে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাইলো।

—একা কেন, চলো আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি তোমার বাড়ির কাছ
র্যন্ত···

কী ভেবে বাসবী পরক্ষণেই ব'লে ওঠে—না, থাক্ নিরুদা। কাজ নেই
ামাকে অতোদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। মিছিমিছি আর কষ্ট দেবোনা। আজকাল
ম-বাসের যা অবস্থা শুনি—বাড়ি ফিরে আসতে খুব কষ্ট পাবে।

বাগানের ছায়া-ঢাকা পথ দিয়ে তখন চলছিলো ওদের গাড়িখানা বেরোবার
টের দিকে ; হঠাৎ বাসবী ব'লে ওঠে—আজকাল আমার কী-যে হয়েছে বলতে
ারিনে—জেগে-জেগেও ভয়ে কেন যে এমন চমকে উঠি?

অনিরুদ্ধ বাসবীর পিঠে হাত রাখে, একটু আর্দ্র স্বরে বলে—কেন, কিসের ভয়?

বাসবী একটু চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে, তারপর করুণকণ্ঠে বলে—
া জানি। মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখলে যেমন ক'রে চমকে ওঠে, আমি জেগে-জেগেও
রকম চমকে উঠি। দিন-রাত্রির অনেক সময় সুধু তোমারই কথা ভাবি কিনা।

ব'লেই বাসবী একটুখানি চুপ ক'রে থাকে।

অনিরুদ্ধ বলে—আরে দূর, ভয় কিসের? কী মনে হয় বলো তো?

বাসবী আরো করুণভাবে বলে—যেন মনে হয় কোন এক অদৃশ্য হাত তোমার-
মার মাঝখানে দিনের পর দিন একের পর এক ইট গেঁথে চলেছে একটা
ড়াছাড়ির পাকা পাঁচিল তোলবার জন্যে। একথা মনে হওয়ার পরেই আমি
কর ভেতরটা কিছুক্ষণ গুরু-গুরু করতে থাকে ভয়ে। শেষটা আমি অপ্রকৃতিস্থ না
য়ে পড়ি এই রকম ভয় পেতে পেতে।

শুনে অনিরুদ্ধও মনে-মনে শঙ্কিত হয় কিন্তু প্রকাশ্যে বাসবীর কথাটা হেসে

উড়িয়ে দিতেই চেষ্টা করে, বলে—না, না, না। কেন ও-সব ভাবো? ও কিছু না। তুমি বড্ডো বেশি ভাবপ্রবণ বাসবী—একটু বাস্তবমুখী হও। এমন করলে নিজের জীবনটাই তুমি মাটি করবে কিন্তু তাতে কি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমার দুঃখ কি তাতে কমবে একতিলও—না আরো বহুগুণ বেড়েই যাবে? বুঝে ছাখো তুমি।

বাসবী বলে—বুঝি সবই কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আমার আয়ত্তে নেই নিরুদা। যাক্ ওকথা। তুমি কি তাহ'লে বৌদিকে আমাদের ওখান থেকে নিয়েই যাবে ঠিক করছো?

অনিরুদ্ধ বলে—হ্যাঁ।

—কেন? বৌদিকে নিয়ে তুমি আমাদেরই ওখানে আপাতত থাকোনা।

—ছিঃ ছেলেমানুষী করেনা। তাকি হয়?

—কেন হয়না? হয়। তুমি রাজী হও লক্ষ্মীটি। তোমাকে সব সময় কেমন দেখতে পাবো।···বালিকার মতোই আব্দার ধরে বাসবী।

কিন্তু অনিরুদ্ধ যে নিরুপায়, সে বলে—যে ভয়ে মলয়াকে তোমাদের ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি সে-ভয়ই যে আরো ভয়াবহ হ'য়ে উঠবে যদি আমিও নিজেই গিয়ে তোমাদের ওখানে আড্ডা গাড়ি। সে তো কেলেঙ্কারীর চরম—অবুঝ হয়োনা বাসবী।

—বেশ, বৌদিকে যেখানেই নিয়ে যাও কিন্তু কলকাতায়ই তুমি থাকবে—কথা দাও। নইলে তোমাতে-আমাতে কী ক'রে দেখা হবে।

—তা কি আর হবে? আমার কলকাতায় থাকবার সঙ্গতিই বা কোথা?

—এ তোমার মিছে কথা। আচ্ছা, আমাদের ওখানে থাকতে তোমার এতো যদি আপত্তি তো বিরুদার বাড়িই থাকোনা। আগে আগে কলকাতা এলে বিরুদা ওখানেই তো উঠতে। বিরুদার বাড়ি তো এখন খালি, চাবি বন্ধ প'ড়ে আছে—বিরুদা, সতী ওরা সব চ'লে যাবার পর থেকে চাবি তো আমারই কাছে। বলো খুলে দিই? কেমন?

—না। কলকাতার প্রলোভন ছেড়ে আমাকে দূরে চ'লে যেতেই হবে।

—বুঝেছি তুমি খালি আমাকে এড়িয়ে চলতে চাও।

—হ্যাঁ, তা চাই বটে। সে যে কতো দুঃখে সবই তো জানো বাসবী। কলকাতায় থাকলে মসুরীর প্রহসনের পুনরাবৃত্তিই হ'বে শুধু—সেকি তুমি চাও?

—কিন্তু আমি থাকবো কী ক'রে—সেকথা একটুও ভাবছোনা কেন?···বলে অসহায় চোখে চেয়ে রইলো বাসবী অনিরুদ্ধের দিকে। শেষটা ওর কোলের ওপ

মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো, বার বার বলতে লাগলো—না পারবোনা, পারবোনা, পারবোনা।

অনিরুদ্ধ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে, বলে—আমি ভেবে দেখেছি, তুমি পারবে বাসবী। আবার তুমি সুখী হ'বে। আমি শুধু তোমাকে দুঃখই দিলাম। আরো যতোই তুমি আমাকে কাছে টেনে নিতে যাবে ততোই দুঃখ পাবে। তাই যাবার আগে আমি ব'লে যাবো তুমি কী ভাবে থাকবে। দিয়ে যাবো গোপন এমন একটি মন্ত্র যার জাদুপ্রভাবে আমাকে ছেড়েও তুমি স্বাভাবিক-ভাবে দিন কাটাতে পারবে। অন্তত কষ্ট হবেনা। আগে যেভাবে পেরেছিলে আবার ঠিক তেমনিই পারবে।

বাসবী বলে—বেশ, এখনই বলো তোমায় ছেড়ে আমি কী ভাবে থাকতে পারবো—দাও তোমার সেই গোপনমন্ত্র।

অনিরুদ্ধ বলে—আগে কথা দাও আমার ওপর তুমি রাগ করবেনা, আমার কথার ওপর আস্থা রাখবে, আমাকে ভুল বুঝবেনা।

বাসবী বলে—আচ্ছা, কথা দিলাম। এবার বলো।

অনিরুদ্ধ বলে—যখন আমার অভাব বড্ডো বেশি অনুভব করবে—যখন বড্ডো মন কেমন করবে তখন তুমি মসুরীর দিনগুলো মনে এনো আর তোমার স্বামীর মধ্যেই আমাকে খুঁজো—দেখো শান্তি পাবে। আমার বিকল্প হিশেবে তোমার স্বামীকেই তুমি গ্রহণ কোরো, বাসবী।

কথাটা শোনামাত্রই বাসবী অনিরুদ্ধের কাছ থেকে ছিটকে দূরে স'রে যায় একেবারে মোটরের সীটের অপরপ্রান্তে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরে চেয়ে রইলো।

অনিরুদ্ধ কয়েকবার ওকে কাছে টেনে আনতে গেলো কিন্তু বাসবী সজোরে সরিয়ে দিলো অনিরুদ্ধের হাত।

অনিরুদ্ধ বহু রকমে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা ক'রে বলে—তুমি না এইমাত্র কথা দিলে যে ভুল বুঝবেনা আমাকে, রাগ করবেনা আমার ওপর। শোনো—

বাসবী এবার অনিরুদ্ধের সঙ্গে আর জোর করেনা, নিজেকে ছেড়ে দায় ওর হাতের কাছে, ওর দিকে অপলক হ'য়ে শুধু চেয়ে-চেয়ে ছাখে, বলে—তুমি কী সেই নিরুদা? যার কাছে আমি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছি—আমার আর কিছু নেই। যার কাছে আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছি—তুমি কি সেই?

ক্লিষ্ট স্বরে অনিরুদ্ধ বলে—আমিও সেই, তুমিও সেই। কেন সন্দেহ হয় নাকি?

—কী জানি—এবার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। তুমিও একথা বলছো?…বাস
ঠিক তেমিভাবেই চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধের মুখের দিকে, স্তম্ভিত, বিমূঢ়—ওর চো
পলক পড়েনা একটিও, খুব অস্পষ্টস্বরে আবার বলে—তুমি একথা বলছো? তুমি

তারপর অসীম একটা দূরত্বের ওপার থেকে আরো অস্পষ্ট, আরো জড়ি
গলায় ফিসফিসিয়ে যেন স্বগতোক্তি করলো—তুমি আমায় ঘেন্না করো?

কথাগুলো তবুও কানে গেলো অনিরুদ্ধের, সে চমকে উঠেই অত্যন্ত কঠোর ক
প্রায় চিৎকার করার মতো ক'রেই ব'লে উঠলো—কী বললে?

আর সঙ্গে সঙ্গেই বাসবীর যে হাতখানা তার হাতের মধ্যে ধরা ছিলো সেটা
প্রচণ্ড একটা চাপ দিয়ে ফেললো যাতে চাপা একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো বাস
—উঃ! তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অনিরুদ্ধেরই কোলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ
লাগলো কিছুক্ষণ।

—তোমার হাতে কি খুব লেগেছে বাসবী? আমায় ক্ষমা কোরো।…আবে
বিকৃত কণ্ঠে অনিরুদ্ধ বললো।

—নাঃ, ও কিছু না। বরং শান্তি পেয়েছি…কতো শান্তি। তুমি আ
বদলাওনি একটুও—তুমি সেই, তুমি সেই, তুমি সেই। এ তোমার সেই পুরে
খেলা।…অনিরুদ্ধের কোল থেকে মুখ তুলে চোখে টলটলে জল নিয়েই বাস
বললো। দেখলো অনিরুদ্ধেরও চোখ ভিজে।

বাসবীর পিঠের তলা দিয়ে হাত চালিয়ে অনিরুদ্ধ আরো গাঢ়ভাবে ওকে কা
টেনে নেয়, বলে—তোমায় ঘেন্না করবো আমি? তোমায় আমি পূজা করি বাসবী
আমার সারাজীবনের তপস্যা হরণ ক'রে নিয়েছো তুমি। রাত্রে যেটুকু সময় তোমা
স্বপ্ন দেখি সেটুকুই আমার প্রত্যহের উপাসনার ক্ষণ। তোমায় ঘেন্না করবো?

বাসবী বলে—আর বলবোনা এমন কথা। নাও, বলো এবার, কী বলছিলে
যা তুমি বলবে সব কথা শুনবো, একটুও অবাধ্য হবোনা।

অনিরুদ্ধ আবার আগের মতো স্বাভাবিকভাবেই ব'লে ওঠে—তাই বলে
শুনে বড়ো স্বস্তি পেলাম। যদি আমি কোনোদিন তোমায় ভালোবেসে থাকি, য
কোনোদিন তোমার শুভ চেয়ে থাকি তাহ'লে সেই সমস্ত সুকৃতির দোহাই দি
আজ তোমাকে আবার বলছি—দূরে থাকি বা কাছে থাকি, আমাকে তু
হারাবেনা কখনো, তোমার স্বামীর মধ্যেই আমাকে খুঁজে দেখো, পাবে
এতোদিন তেমন ক'রে খুঁজে ভাখোনি তাই পাওনি। এবার থেকে তাই যেন
তোমার সাধনা। অজবাবু উদার, অজবাবু মহৎ—তাঁর কাছ থেকে কখ
কখনো কোনো ক্ষতির আশঙ্কা কোরোনা বাসবী। আমার প্রলোভন থে

দূরে থাকলে আমি জানি আবার তুমি সুখী হবে। আমার মতো তো নয়, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আমি কিছুতেই এ ভাবে নষ্ট হ'তে দিতে পারিনা। তুমি প্রস্তুত থাকলেও না। আমি তোমার অযোগ্য প্রেমিক কিন্তু তাই ব'লে তোমার শুভচেষ্টা থেকে কখনো যেন ভ্রষ্ট না হই। সে-কাজে তুমি আমায় প্ররোচনা দিওনা বাসবী, তোমার ভালোবাসার দোহাই।

অনিরুদ্ধের ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে এবং ওর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় অনেকখানি বিস্মিত ও ব্যথিত হ'লো বাসবী।

অনিরুদ্ধ আবার বললো—মসুরীর এক সন্ধ্যার আবেগময় মুহূর্তে আমার কাছে তুমি চেয়েছিলে না এমন কোনো হুকুম, এমন কোনো আদেশ যা যতোই কঠোর হোক তুমি সারাজীবন পালন ক'রে যেতে পারো আমার মুখে হাসি ফোটাতে? ছাখো আমি ভুলিনি কিছুই; সে-সব দিনের একবর্ণও যদি মন থেকে হারিয়ে যায় কোনোদিন তবে নিজেকেই হারিয়ে ফেলবো। সেদিন কিছুই চাইতে পারিনি তোমার কাছে—আজ চাইছি আমার এই প্রার্থনাটুকু পূরণ করো।

বাসবী একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বলে—তাই হবে। প্রাণপণে চেষ্টা করবো। উঃ বড্ডো কঠোর তুমি নিরুদা।

—এখন যতোটা কঠোর মনে হচ্ছে চিরদিন এতটাই কঠোর মনে হবেনা তখন বুঝবে যে এ ছাড়া তোমার পক্ষে আর নিরাপদ রাস্তা ছিলোনা, আর সেই সঙ্গে এও বুঝবে যে, নিরুদা আমাকে ভুল পথ দেখায়নি, আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝেছে, আমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও নিজেকে বঞ্চিতই করেছে তবু আমাকে ভ্রষ্ট হ'তে ছায়নি। নইলে তোমাকে ভালোবাসাই যে আমার বৃথা হতো বাসবী। চেষ্টা ক'রে ছাখো তুমি পারবে। আমিও তোমায় সাহায্য করবো—সেজন্যই তো আরো কলকাতা ছেড়ে আমার দূরে স'রে যাওয়া প্রয়োজন নইলে কলকাতার আশে-পাশে কেবলি যদি লোভীর মতো ঘুরে বেড়াই তাহ'লে তোমার গুছিয়ে-আনা সংসার আবার হয়তো অগোছালো ক'রে দেবো। তোমাকে দিয়ে আজ যে-শপথ করিয়ে নিলাম ভবিষ্যতে তা নিজেই আবার ভঙ্গ করবো। তোমার মতো প্রলোভনের সামনে আমি কতোখানি যে দুর্বল সে তো তুমি জানো—তোমার চেয়ে সেকথা কেউ বেশি জানেনা।

বাসবী বলে—তাই নাকি? আচ্ছা হয়েছে, থাক্। আর বক্তৃতা দিওনা বাপু ভালো লাগেনা। আজকের দিনটাই মাটি ক'রে দিলে। কতো আশা ক'রে এসেছিলুম—কতোদিনের পর দেখা, কী সুন্দর কাটবে দিনটা আর কিনা এসে দেখলাম—ব'লে ডান হাতের অঙ্গুলিপ্রান্তগুলি একবার গালে ঠেকালো।

অনিরুদ্ধ হেসে ফ্যালে বাসবীর কথায় এবং বলার ভঙ্গিতে, বলে—এসে কী দেখলে?

বাসবী তার অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলো—এসে দেখি ওমা, আমার সেই চিরকালের নিরুদা আজ প্রেমিকের ভূমিকা স্বেচ্ছায় ছেড়ে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আর আমাকে ধ'রে কেবলি লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ছে।

অনিরুদ্ধ আরো হাসে, বলে—সত্যিকথাই বলেছো। কিন্তু কী করি বলতে পারো? উপায় কী?

—উপায় তো খুবই সোজা গো। আমরা সবাই যদি মিলে মিশে একত্র থাকতে পারি তাহলেই তো আর ছাড়াছাড়ির দরকার হয়না—সমস্যা মিটে যায়।

—ছাড়াছাড়ির সমস্যাটা তাতে হয়তো মেটে কিন্তু আর গুলো? তাতে সামাজিক প্রশ্নটা কি থাকেনা, লোকনিন্দাও কি থাকেনা? চুলোচুলি, কেলেঙ্কারী কিছুই কি থাকেনা, কী বলো?

—না, থাকেনা। যে উৎপাতগুলোর নাম এখুনি করলে পৃথিবীর জল, মাটি, হাওয়ার মতো ওরা ছিলোও না কোনোদিন—ওদের তৈরি করা হ'য়েছে। মনে করলে তবেই ওরা আসে। মনে না আনলে ওরা সত্যি উবে যায়।

—অতঃপর তাহ'লে আমরা সবাই একত্রই থাকবো—এই তো হ'লো তোমার সহজিয়া রায়? অর্থাৎ কিনা, সমাজ, সংসার মিছে সব—কেমন, এই তো? আচ্ছা, এবার বলো তো আমরা মানে কে, কে? কারা?

—আমরা মানে আমরা—তুমি, আমি, বৌদি।

—আর অজবাবু?

—হুঁ-উঁ-উঁ।···বাসবী বড়ো সুন্দর ঘাড় হেলায় অর্থাৎ তা কি আর বলতে হয়?

—বাঃ খুকী, সাবাস্, সাবাস্, বড়ো চমৎকার সমাধান। তারপর একদিন যখন অজবাবু বলবেন—এদের কেন তুমি বাড়িতে এনে রাখলে বাসবী?

—সে আমি বুঝবো। তার জবাবদিহি আমিই করবো। সে তো তোমার ভাববার কথা নয়। তুমি এটুকু বিশ্বাস করতে পারো যে, আমার কাজে তিনি কখনো কোনো কৈফিয়ৎ চাননা।

—আচ্ছা বেশ, সেও যেন হ'লো। কিন্তু বাসবী মুখুজ্যের মতো একজন বিখ্যাত মহিলার দাম্পত্য-জীবন নিয়ে লোকে যখন কানাকানি শুরু করবে, তখন?

—ওঃ এই কথা! কলঙ্ক রটবে? আমি তো তার জন্য তৈরি।···ব'লে অনিরুদ্ধের হাঁটুর ওপর বেশ জোরেই একটা চিপুনি দায়, বলে—তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

—ওটা কাব্যেই ভালো শোনায়, জীবনে ওর প্রয়োগটা ততো সুখের নয়।

—নাহোক। কে কী বলবে-না-বলবে তার ওপরই তুমি বড়ো বেশি জোর দিচ্ছো নিরুদা।

—দেবোনা? লোকমত, সমাজের অনুমোদন—এগুলো তো আর কল্পনা নয় বাসবী—এগুলোই যে বাস্তব সমস্যা। তবে তোমার মতো যাদের মন বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর সুরে বাঁধা তাদের কাছে কিছুই নয়—কিন্তু সাধারণ সমাজবাসীর পক্ষে এগুলোর গুরুত্ব বড়ো বেশি।

বাসবী বলে—কিন্তু তুমি বা বৌদি—এরা কি আমার পর? তোমাদের যদি বাড়িতে ঠাঁই দিই তাহলে এতো কথা উঠবেই বা কেন?

হো হো ক'রে হেসে ওঠে অনিরুদ্ধ, বলে—একেবারে অকাট্য যুক্তি! সত্যি আমরা তো আর তোমার পর নই, পৃথিবীসুদ্ধ লোকেরই তো জানা উচিত সেকথা—বিশেষ ক'রে তোমার বৌদি তো তোমার সব চেয়েই আপনার—তাই না? ওকে আটকে রাখো বাসবী। মলয়াকে তুমি ছেড়োনা।

—ছাড়াবোনা-ই তো। ··বাসবীর টোল-খাওয়া গোলাপী গাল দু'টো হাসির আবীর মেখে নিলো। সে আরো হেসে বললো—কী যে বোকা তুমি নিরুদা, র‍্যান্সমের লোভেই তো আটকেছি ওকে। Ransomটা দিতে পারো তো ছেড়ে দিই—নইলে ছাড়ছে কে?

—কালই যদি Ransomটা দিই তো পরশুই তুমি ওকে ছেড়ে দিতে পারো—তাই না? বেশ, বুঝেছি এবার। কাল তাহলে তোমার সঙ্গে কখন আবার দেখা হচ্ছে?

—সে আমি কী ক'রে বলবো? কাল কিন্তু আর এভাবে তোমার কাছে আসবোনা। ··বাসবী শাসায়।

—তাহলে বলো আমিই তোমার ওখানে যাই—কোন সময়ে যাবো?

—যখন ইচ্ছে যেতে পারো বৌদির সঙ্গে কথা ক'য়ে চ'লে আসবে, আমি কিন্তু আর তোমার সঙ্গে কথা কইছিনা। তুমি যাবে জানতে পারলে আমি বরং বাড়িই থাকবোনা। ··হাসতে হাসতে বাসবী বলে।

—কেন? মানিনীর মান আজ রাখতে পারিনি ব'লে? কষ্ট হয়েছো?

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমায় বড়ো কষ্ট দিয়েছো—অতো দূর থেকে ছুটে ছুটে এলাম ··

—আচ্ছা আর কষ্ট দেবোনা।

—ও সব তোমার মিথ্যে কথা। আমি জানি, তুমি আমায় আরো বেশি কষ্ট

দেবে ব'লে মতলব আঁটছো।···আচ্ছা যাও, অনেক দূর টেনে নিয়ে এলাম তোমায়—কথা বলতে বলতে একেবারে ভুলেই গেছলাম। আমি নাহয় ভুলে গেছি তুমিও তো আমায় মনে করিয়ে দিতে পারতে। এই ড্রাইভার বাঁধো, বাঁধো···

চৌরঙ্গী ও লোয়ার সার্কুলার রোডের ক্রসিং-এর কাছেই ট্যাক্সিটা বাঁধলো।

—কাল তাহ'লে তোমায় ফোনই করবো তো?

—ফোনে আর পাবেনা আমায়।···আবার বাসবী শাসায়।

—তুমিও আসবেনা, আমি গেলেও দেখা করবেনা, ফোনেও ডাকতে বারণ করছো—তবে কী হ'বে?

—কিছুই হবেনা। তুমি যাও। এই সোজা কথা। যা হবার তা হবে।

অনিরুদ্ধ একটু ক্ষুণ্ণ মুখে মোটর থেকে নেমে দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কয়েক পা চ'লে গেছে এমন সময়ে পিছন থেকে আবার বাসবীর ডাক শুনে ফিরলো।

—অ্যাই ··শোনো বলছি।··জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলো বাসবী।

অনিরুদ্ধ ফিরে সাড়া দিলো—কী?···গাড়ির কাছে এলো।

বাসবী বললো—কাল দুপুর আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে আমি হগ মার্কেটে জিনিশ কিনতে যাচ্ছি—বুঝলে? মার্কেটের দক্ষিণে ক্লকটাওয়ারের কাছাকাছি কোথাও গাড়িটা পার্ক করবো—খুঁজে নিও।··ব'লে হ্যাণ্ডব্যাগ্‌টা খুলে এক টুকরো কাগজে গাড়ির নম্বরটা খস্‌খস্‌ ক'রে লিখে দিয়ে দিলো অনিরুদ্ধের হাতে. বললো—হাজির থাকবে। কাল ড্রাইভারকে নেবোনা সঙ্গে, নিজেই ড্রাইভ করবো।···আগাগোড়াই হুকুমের স্বর, দৃপ্ত ভঙ্গি, আশ্চর্য সপ্রতিভ। বাসবীর এ এক নতুন রূপে মুগ্ধ হ'লো অনিরুদ্ধ।

—ড্রাইভ্‌ করতে পারো?

—কাল দেখতেই পাবে।···মাপজোক করা মানানসই একটুখানি হাসি হাসলো বাসবী কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভ্রূকুটি ক'রে শাসানির স্বরে বল্লো—কিন্তু Ransomটা দিতে কাল যদি গাফিলতি করো তবে টের পাবে মজাটা, বৌ গুম্‌ হ'য়ে যাবে ব'লে দিচ্ছি। আমার কাছ থেকে বৌ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে সংসার পাতার মতলব তোমার ঘুচে যাবে।

—তাহ'লে তুমিও আমায় ব্ল্যাক্‌মেল করতে চাও?

—করবোনা? আমি বোকার মতো ভালোমানুষী করতে যাই ব'লেই ফাঁকে পড়ি। একদিকে বৌ তোমাকে ব্লাক্‌মেল্‌ করবে আর একদিকে আমি। ছাখোনা, তোমার অবস্থাখানা কী রকম কাহিল ক'রে ছাড়ি।

হাসতে হাসতে অনিরুদ্ধ বলে—আচ্ছা সে হ'বে'খন Ramsonএর লোভে এসে তুমি নিজেই যদি লুট হ'য়ে যাও—তখন ?

—ইঃ! আমি তোমায় গ্রাহ্যই করিনা। তোমার মুরোদ আমার ঢের জানা আছে। হ্যাঁ, শোনো একটা কথা ব'লে রাখি—কাল কিন্তু বোকার মতো দেখা হওয়ামাত্রই এ-সব কথা তুলবেনা। এতে মন বড়ো খারাপ হ'য়ে যায়। আপাতত ক'দিন আমায় এ-সব ভুলে থাকতে দাও। পরে যা মনে আছে কোরো—বারণ শুনবেনা যখন আমিও আর পেড়াপীড়ি করবোনা এ নিয়ে। আচ্ছা চলি, কেমন ?

বাসবীর ট্যাক্সিটা চ'লে গেলো। অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে চিরকুটটা পড়তে লাগলো কি নম্বরটা মুখস্থ করতে লাগলো কে জানে।

এর পরেও আর 'বাস্'এ ক'রে বাড়ি ফিরতে ভালো লাগলোনা অনিরুদ্ধের; সেও একটা ট্যাক্সিই নিলো।

ভাগ্যের সাথে সংশপ্তক যোঝে

অনিরুদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে-সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে সাড়ে আটটা বেজে গেলো বাসবীর।

গেটের মধ্যে ঢুকে পাম ও ক্যাসুয়ারিনা বীথিপথ পার হ'য়ে বাসবীর ট্যাক্সিটা যখন গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালো তখন বাসবী দেখতে পেলো আর একখানা গাড়ি সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। নেমে ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়েই ভেতরে ঢোকার মুখে বাসবী চাকরদের মধ্যে যাকেই সামনে পেলো তাকেই জিগেস করলো—হ্যাঁ রে, কার গাড়ি ওটা? কে এসেছে?

—ওটা ডাক্তারবাবুর গাড়ি। ডাক্তার এসেছেন।

—ডাক্তার এলো আবার কার জন্য?···বাসবী শঙ্কিত হ'য়ে প্রশ্ন করে।

—নতুন-মা ফিট হ'য়ে গেছেন।

এতোক্ষণের নামহীন একটা উৎকণ্ঠা, ভাষাহীন একটা ভয়-ভয়ের ভাব এইবার যেন মূর্তি নিয়ে তার সম্মুখীন হ'লো। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিগেস করলো—ওপরে বাবু আছেন?

—আছেন। আপনাকে তো খুঁজছিলেন একটু আগে।

বাসবী প্রায় ছুটতে-ছুটতে সিঁড়ি ওঠে—সিঁড়ি থেকে শুরু ক'রে বারান্দার পুবকোণে যেদিকে মলয়ার ঘরটা পড়ে সেই অব্দি যতোগুলো আলো আছে সবগুলোই জ্বলছে। ওপরের নিচের সবগুলো ঝি-চাকরই ব্যস্ত হ'য়ে ওপরে ঘোরাঘুরি করছে। মলয়ার ঘরের কাছাকাছি গিয়ে বাসবী অজের দেখা পেলে অধীর হ'য়ে সে স্বামীকে জিগেস করলো—কী ব্যাপার বলো তো? শুনছি বৌদি নাকি··· ··

—হ্যাঁ, আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রেছেন।

—সর্বনাশ! কোথায় কী পেলো বলো তো? বিষ?

—হুঁ। অন্য কিছু বিষ নয় ঘুমের ওষুধই অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়েছেন।

—কী ক'রে জানা গেলো?

—আমরা যখন দোর ভেঙে ঢুকলাম ঘরে, দেখতে পেলাম ঘুমের ওষুধের খালি শিশিটা আর জলের গ্লাসটা পাশেই রয়েছে প'ড়ে—ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন তখন

ঘুমের ওষুধ! এ জায়গায় বাসবী যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। অনেকটা যেন নিজমনেই ব'লে উঠলো—বেঁচে যাবে তাহ'লে। কী বলো?

—সম্ভব। ডাক্তাররা তো সে আশ্বাসই দেন।

—কখন প্রথম জানা গেলো ঘটনাটা?

—বড়ো জোর ঘণ্টা দেড় দুই আগে হ'বে। ওর ঘরের ঝি নাকি অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও সাড়াশব্দ পায়নি, না পেয়ে ভেজানো জানলাটা খুলে দেই যা দেখলো তাতে তার সন্দেহ হ'লো যে নতুন-মা সম্ভবত বেহুঁশ হ'য়ে ছেন। তখুনি সে চাকরকে ডেকে নিয়ে এসে ব্যাপারটা দেখালো। তারপর রা দু'জন মিলে পরামর্শ ক'রে, সাহস সঞ্চয় ক'রে আমার কাছে জানাতে এলো। আমার আসার অপেক্ষা করতে-করতে ওরাই ঘণ্টা খানেক সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছে...তারপর থেকে দোর ভাঙা—ডাক্তার ডাকা—ওষুধ আনা—এই সব যারক্রমেই চলছে।

বাসবী বাইরের জুতোটা পা থেকে খুলে ফেলে বাড়িতে পরার একটা চটিতে পা গলিয়ে নিলো। হাতের ব্যাগটা নিজের ঘরে রেখে এলো। তারপর ঢুকলো ন্দার ঘরে। পেছন-পেছন ঢুকলো অজও। স্বামীকে একটু একান্তে ডেকে বাসবী বল্লো—ছাখো আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে যা তোমার জানা দরকার। ...ৎ আজ দুপুরে একটা ফোন এলো...গিয়ে ধরলাম...এ জায়গায় বাসবী ঢোক গললো একবার, সে যেন হাঁপাচ্ছে।

অজ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো—তারপর? বলো; কী?

বাসবী এবার অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই বলতে লাগলো—নিরুদা কবে যে ভারতবর্ষে ফিরে এলো কিছুই জানিনি—হঠাৎ একেবারে ফোনে ওকে পেয়ে বড়ো আশ্চর্য হ'লাম। এই তো আন্দাজ বেলা একটা-দেড়টার সময়ে ফোন করেছিলো—ফোনে বৌদিকে ডাকলো—জিগেস করলো কেমন আছে সে আজকাল—আমিও বৌদিকে গিয়ে ডাকলাম, কতো বোঝালাম, বল্লাম—তোমায় কতোক্ষণ ধ'রে ডাকছে নিরুদা; যাওনা একটিবার এখুনি লাইন কেটে দেবে...বৌদি কিন্তু ফোন ধরলোনা কিছুতে...এম্নিতে ঘুরছিলো ফিরছিলো, নিরুদা ডাকছে একথা শোনামাত্রই সে শয্যা নিলো। আর ছাখো ঠিক অম্নি আজকের দিনেই এসব ব্যাপার। ভাগ্যি, নিরুদার ফোন নম্বরটা সে-সময়ে টুকে রেখেছিলাম।

আত্মরক্ষার্থে কিছু সত্য গোপন করলেও বাসবী স্বামীকে মোটামুটি বললো সবই, তবে বললো চুম্বকে। শুনে অজ বললো—যাক্ বললে ভালোই করলে...অনিরুদ্ধবাবু ফিরেছেন তাহ'লে? কবে?

—বল্লে তো ভারতবর্ষে এসেছে দিন পনেরোরও বেশি—তবে কলকাতায় এসেছে মাত্র দিন তিনেক।

—আমার মনে হয় এতোখানি দায়িত্ব আর আমাদের নিজেদের ঘাড়ে রাখা উচিত নয়। এখুনি ওঁকে একটা খবর পাঠানো খুব জরুরি রকম দরকার।

বাসবী তো মুখিয়েই ছিলো অম্নি ব'লে উঠলো—নিশ্চয়ই, সেইজন্যই তো একথা তুলছি। ফোনে এখুনি তাহ'লে জানিয়ে দিই নিরুদাকে? সে আসুক, দেখুক, তার বোঝা নিয়ে সে যাহয় করুক, আমি তো আর পেরে তাছাড়া এতোখানি দায়িত্বের ঝুঁকি নেওয়াই বা কিসের জন্য? এ-ভাবে যদি ভালোমন্দ কিছু একটা হ'য়ে যায় তো তার জন্য জবাবদিহি করতে যাবে কে। ফোন ক'রে দিচ্ছি তাহ'লে? সে এসে দেখে-শুনে যা-হয় করুক। কী বলে? অনুমতির জন্য বাসবী স্বামীর দিকে চায়।

অজ তৎক্ষণাৎ সম্মতি ছায়, ব'লে—নিশ্চয়ই।

বাসবীর ফোন পেয়ে অনিরুদ্ধ সে-রাত্রেই অজভূষণের বাড়ি এসে হাজির হ'লো।

মৃত্যুর সঙ্গে চিকিৎসকের এই দ্বৈরথ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর। অনিরুদ্ধও মলয়ার সেবায় তার প্রাণপণ করতে লাগলো কারণ মলয়া তার স্ত্রী ব'লে নয়—একটি বিপন্ন প্রাণ যদি রক্ষা পায় সেটুকু করা প্রত্যেক বিবেকী মানুষেরই কর্তব্য—সেই অনাসক্ত কর্তব্যবোধই অনিরুদ্ধের প্রেরণা। তাছাড়া এতো বড়ো একটা অপবাদের হাত থেকে বাসবীকেও তো বাঁচাতে হবে, নইলে চিরদিনের জন্য একটা কলঙ্ক থেকে যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে অনিরুদ্ধের চোখেও ঘুম নেই, শরীরে ক্লান্তি নেই। বাসবীও সে-রাত্রে দু'চোখের পাতা একটুখানির জন্যও এক করেনি। অনিরুদ্ধ যতোবার ওর দিকে চাইতে গেছে ততোবারই ওকে যেন থেঁতলানো ফুলের মতোই মনে হ'য়েছে অনিরুদ্ধের। কিছুক্ষণ বাদে-বাদেই সে রুগীর ঘরের দোর পর্যন্ত এসে মলয়া কেমন আছে কিংবা তার সংজ্ঞা ফিরে এলো কিনা এখন তার অবস্থার কতোটুকু উন্নতি হ'লো—এই সব জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছে।

রাত তখন অনেক—এইমাত্র পাশের ঘরে ডাক্তার গেলো সামান্য একটু বিশ্রামের জন্যে। মলয়ার বিছানার পাশেই একটা চেয়ার নিয়ে ব'সে আছে অনিরুদ্ধ। বাসবী পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো, চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো—অবস্থা কেমন?

অনিরুদ্ধ কোনো উত্তর দিলোনা।

অনিরুদ্ধের নীরবতার হয়তো কোনো উল্টো অর্থ ই ক'রে নিলো বাসবী। কান্না ভেঙে গেলো ওর গলার স্বর, বললো—সত্যি তুমি বিশ্বাস করো—নতুন ক'রে আমি কোনোই অপরাধ করিনি বৌদির কাছে। তবে শুধু শুধু এমন নিষ্ঠুর সাজা বৌদি কেন আমাকে দিলে? কতোবার কতো বুঝিয়েছি, মাপ চেয়েছি দেখো

া বলা ওকে—আমার জন্য ওর প্রাণের কোথাও একটুখানিও ক্ষমা নেই। যথাসাধ্য করেছি, শুধু পায়ে মাথা খুঁড়তে বাকি রেখেছি কিন্তু বৌদির মন কিছুতেই ভেজেনি—উঃ এতো কঠিন মনও মেয়েমানুষের হয়? তাহোক যতো নিষ্ঠুরই হোক তবু যে ক'রে পারি ওর মন আমি গলাবোই—নির্দয়ের কাছ থেকেও দয়া ভিক্ষা ক'রে নেবো, নির্মমের কাছ থেকে আদায় করবো ক্ষমা। তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছো, নিরুদা? ভয় পেয়োনা, বৌদি সেরে যাবে, দেখো।

অচৈতন্য মলয়ার পায়ের ওপর মুখ দিয়ে প'ড়ে প'ড়ে বাসবী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

মলয়ার পায়ের ওপর বাসবীকে এভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে অনিরুদ্ধের হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছিলো সস্নেহে তুলে ধ'রে ওর মুখখানা সরিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু বার কয়েক এদিক-ওদিক চেয়ে এবং দেশ-কাল বিবেচনা ক'রে সে হাত দু'টোকে নিজবশে নিয়ে এলো, শুধু মুখে বললো—ছিঃ, ওকি! ওঠো। ওর পায়ের ওপর মুখ দিয়ে প'ড়ে থাকতে পারো তুমি? হায় রে! এতেই বোঝা যায় যে, মলয়ার বিস্তর সুকৃতি ছিলো—অন্তত ওর সেই সুকৃতিটুকুর জন্যই ও হয়তো এবারও বেঁচে উঠবে কিন্তু তার ফলে আমার কী হ'বে একবার ভেবেছো? আমার যে এবার ম'রে যেতে ইচ্ছা করছে?

মলয়ার পায়ের ওপর থেকে অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুললো বাসবী, ভ্রূকুটি করলো—ছিঃ, বলতে নেই অমন কথা।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো রাত দুটো। বাসবী উঠে পড়লো মলয়ার শয্যা থেকে, বল্লো—আমি গিয়ে বারান্দার সোফায় একটু হাত পা ছড়িয়ে নিই গে ততোক্ষণ। এখানে আমি তো আর কোনো কাজে লাগছিনা···বৌদির আর একটা ইন্‌ট্রাভেনাস্‌ ইন্‌জেক্‌শনের সময় হ'লো বুঝি? ডাক্তার তারই যোগাড় করছেন—এখুনি এ-ঘরে আসবেন।

বলতে বলতে ডাক্তার রাবার টিউব, ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে সে-ঘরে ঢুকলেন। এইভাবে গোটা রাতটাই ডাক্তার উদ্যত-হস্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে সকালের দিকে জানালো যে, মলয়ার জীবন এবার বিপন্মুক্ত বলা যেতে পারে। তবে খুব সতর্ক সেবার প্রয়োজন। মলয়ার সেবার ভার অনিরুদ্ধই আবার নিজের হাতে তুলে নিলো বহুদিন বাদে। মলয়ার জ্ঞান তখনো কিন্তু সম্পূর্ণ ফিরে আসেনি, কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে তখনো।

···মলয়া সামলে গেলো পরের দিনই কিন্তু জের চললো তারপরেও

তিন চারদিন। উপর্যুপরি কয়েকদিন সারারাত জাগতে হ'লো অনিরুদ্ধকে মলয়ার সেবা-শুশ্রূষার জন্য। তবে আজ থেকে মলয়া বেশ স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে—ওর জন্য এখন আর উদ্বেগ নেই, সদাজাগ্রত লক্ষ্যের বা সেবার প্রয়োজন নেই। তাই অনিরুদ্ধের এবার অবসর। মধ্যাহ্নের আহারাদির পর মলয়া আজ ঘুমোচ্ছে—ঘুমোবে ও বিকেল পর্যন্ত। সোফায় শুয়ে-শুয়ে অনিরুদ্ধের শরীরও তাই ঘুমে এলিয়ে পড়লো। রাত্রিজাগরণজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের জন্য এই ঘুম, নইলে দুপুরে ঘুমোতে কোনোদিনই অভ্যস্ত নয় সে।

মলয়ার চৈতন্য ফিরে আসার সময়টা পর্যন্ত বাসবী মলয়ার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলো। কিন্তু তারপর থেকে সে আর পারতপক্ষে মলয়ার ঘরে আসেনি। আর আসারই বা দরকার কী যেখানে মলয়ার সেবার ভার অনিরুদ্ধ আবার স্বহস্তেই তুলে নিয়েছে। প্রাণ-পোড়ানো ঈর্ষ্যা, রাগ, ক্ষোভ নিজকর্মের জন্য পশ্চাত্তাপ ও লজ্জা ইত্যাদি দুর্দান্ত হৃদয়াবেগ এবং বহুবিধ অপ্রিয় স্মৃতির পুনরুদ্রেক মলয়ার মনে এবং তার থেকে তার শরীরেও আবার বৈকল্য আনতে পারে—বাসবী কতকটা সেজন্যও এড়িয়ে চলে মলয়াকে কিন্তু আড়াল-আব্ডাল থেকে অনিরুদ্ধকে দেখে ও যায় মাঝে মাঝে।

আজ দুপুরের দিকে মাধ্যাহ্নিক নিঃসঙ্গতার তাড়া খেয়েই হোক কিংবা অনিরুদ্ধকে একটু একা পাওয়ার লোভেই হোক বাসবী মোটকথা এলো একবার মলয়ার ঘরে; মলয়া তখন ঘুমোচ্ছিলো। সে আশা ক'রেই এসেছিলো যে দেখবে মলয়া ঘুমোচ্ছে। অনিরুদ্ধকে কী যেন জিগেস করতে গিয়ে বাসবী টের পেলো যে অনিরুদ্ধও জেগে নেই, সোফায় হেলান দিয়েই সে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, গুছিয়ে শোয়া আর হয়নি। সেখানেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়লো বাসবী। ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে এতো কাছ থেকে দেখার এমন সুযোগ এর আগে আর হ'য়েছে ব'লে ওর মনে পড়লোনা। সুন্দর মানুষ ঘুমোলে বুঝি আরো সুন্দর হয়? জাগ্রত অনিরুদ্ধের চেয়ে ঘুমন্ত অনিরুদ্ধই যেন আরো বেশি ক'রে আজ টানলো তাকে। সে আরো এগিয়ে গেলো সোফার দিকে, সোফার পিছনে দাঁড়ালো; একবার কী ভেবে যেন হাত রাখলো ক্ষণিকের জন্য সোফার উপর। উপর্যুপরি রাত্রি-জাগরণের অবসাদের পর ঘুমিয়েছে অনিরুদ্ধ, বাসবী তাকে আর জাগাতে চায়না নিশ্চয়ই, তবুও কী ভেবে যেন দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। মলয়ায় দিকে চেয়ে দেখলো মলয়া ঘুমোচ্ছে ঠিকই। কয়েকবার তার বুকটা খালি টিপ্ টিপ্ ক'রে উঠলো। আস্তে-আস্তে হাতটি সরিয়ে নিয়ে বাসবী বেরিয়ে গেলো পাশের ঘরে যেখান থেকে দোরের মধ্য দিয়ে ঋজু-ঋজু দেখা যায় নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে, কিন্তু মলয়া আড়াল পড়ে।

বিহ্বল চক্ষে দেখতে লাগলো বাসবী। দেখে-দেখে আশা আর মেটেনা তার—প্রথম বয়সের সর্বনাশ এসেছিলো ঐ মুখের দিকে চেয়েই, শেষ বয়সের আশ্বাসও কি আসবে ঐ মুখের কাছ থেকেই ?

শুধু-শুধু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কেমন যেন বিসদৃশ মনে হ'লো বাসবীর নিজেরই। কোনো একটা অছিলা যেন দরকার। সে তার 'ম্যানিকিওর সেট্'টা নিয়ে একটা গদি-আঁটা মোড়া টেনে বসলো ঠিক দোরের সামনেটিতেই।

সৌন্দর্যের Endymion ঘুমোচ্ছে Selene-এর চুম্বনের ঘুম। গোপন কটাক্ষে দেখছে তাকে বাসবী। এম্নি ক'রে যুগ-যুগ ধ'রে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে যদি পারা যেতো তার Endymion-টিকে! কিন্তু বাসবীর এই ভ্রান্তিবিলাস কতোক্ষণ আর? এখুনি জেগে উঠবে অনিরুদ্ধ। তারপর? তারপর তো মাত্র আজকের দিনটা আর···বড়োজোর কালকের দিনটাও; এমন কি পরশুর সারা সকালটাও তারপর দুপুরেরও খানিকটা অংশ···ব্যস্! আর না, অনিরুদ্ধ আবার তো চ'লে যাবে তার নাগালের বাইরে। অনিরুদ্ধ কালকে তো সেই রকমই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো অব্জভুষণের কাছে।

ওরা চ'লে যাবে এখান থেকে পরশু দুপুরে। বাসবীর গলা অব্দি থালি-থালি আবেগ ঠেলে উঠছে সেকথা ভাবলেই।

ইতি নেই, হাসি তবু হ'লো ইতিহাস

আজ দুপুরেই ওরা যাবে। দুপুরের আগে থেকেই বাঁধা-ছাঁদা শেষ হ'য়ে আছে। অনিরুদ্ধ আজ সারা সকালটাই উশ্‌খুশ্‌ করছে একবার বাসবীকে পাওয়ার জন্য কিন্তু ওর দেখা পায়নি একবারও। ওপরতলার চাকরগুলো যখনই তার সামনে প'ড়েছে তখনই তার কাছ থেকে অনিরুদ্ধ খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, বাসবী মোটে আজ তার ঘর থেকে বেরোয়নি—হয়তো বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। বাসবীর যে শরীর খারাপ হ'তে পারেনা, তা নয়। অনিরুদ্ধের কিন্তু বিশ্বাস ও ধারণা, শরীর খারাপ হয়নি বাসবীর, মনই খারাপ।

কথাটা অমূলক নয়। আজকে হয়তো সে যথাসম্ভব এড়াতেই চাইছে অনিরুদ্ধ ও মলয়াকে। সম্প্রতি এমন বিশ্রী একটা ঘটনা ঘ'টে যাবার পর থেকে অজু অফিসে বেরোবার আগে নিত্য-নিয়মিত একবার ক'রে মলয়ার ঘরের দোরের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং কুশলাদি প্রশ্ন করে। আজো সে তার এই অভ্যস্ত সৌজন্যকৃত্যটুকু সেরে তবে অফিস গেছে। ওর নিত্যকার এই সৌজন্যকৃত্যটুকুর সঙ্গে আজ কিন্তু নৈমিত্তিককৃত্যও ছিলো কিছু—সেটুকুও অজু রীতিমাফিক সেরে গেছে। তার আতিথ্য থেকে ওরা আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছে—এ বিষয়ে গৃহস্বামীর যা যা কর্তব্য সেগুলো সম্বন্ধে সে বড্ডো বেশি সচেতন। অনিরুদ্ধ ও মলয়াকে যথোচিত শুভেচ্ছা ও বিদায়কালীন সম্ভাষণ জানানো ইত্যাদি কাজগুলি সে নিখুঁত ভাবেই সেরে গেছে এবং সেই জন্যই আজ তার অফিস পৌঁছতে দেরি হয়তো হ'য়ে যেতে পারে। যাবার সময়ে ব'লে গেছে—আমার অফিসের একটু কাজ রয়েছে আজ, তাই বেরোতে বাধ্য হচ্ছি। বাসবী তো রইলো। এ সম্পর্কে ওর স্বার্থ আমার চেয়ে বেশি। আমি থাকলে আপনাদের যতোটুকু কাজে আসতুম তার চেয়ে বেশি সাহায্য ওর কাছ থেকে পাবেন। তাই আমি আজ বেরিয়েও নিশ্চিন্ত।

অজু যে, লোক ভালো একথা স্বীকার করতেই হয়, বিশেষ ক'রে ব্যবহারের দিক থেকে তো সে একেবারেই নিখুঁত।

কিন্তু বাসবীকেই বা তারা পাচ্ছে কোথায়? ··মৃদুস্বরে স্বামীর সামনে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো মলয়া। বিশেষত অনিরুদ্ধের সাম্‌নে বাসবীর উল্লেখ করতে হ'লে মলয়া আজকাল অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে এবং অত্যন্ত সমীহ ক'রেই তা করে। গত কয়েক দিনের বিরাট একটা মানসিক বিপ্লবের পর থেকে মলয়া যেন আমূল বদলে গেছে।

—ক'টায় যাত্রা করবে এখান থেকে ?···মলয়া জিগেস করে স্বামীকে

—উঁ অনিরুদ্ধের কানেই যায়নি মলয়ার প্রশ্নটা।

—আর কতোক্ষণ সময় হাতে আছে ?

—সময় বিশেষ নেই—এবার তৈরি হ'য়ে নাও।

অনিরুদ্ধ একটি চাকরকে ডেকে মালপত্র গাড়িতে তুলতে বলে। চাকরটা একে একে মালপত্রগুলো নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

তৈরি হ'য়ে নিতে নিতে অর্থাৎ পরিচ্ছদ পরিবর্তন করতে করতে মলয়া বলে—ক'দিন থেকে বাসবীর দেখা তো আর একবারও পাইনা। ডেকে পাঠাওনা একবার। ডেকে নিয়ে আসবো ওকে ?

—কেন ? তোমার কী ওকে এখুনি খুব প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ?

—না, তবে ওরই আশ্রয়ে এতোদিন রইলুম ··এখন যাবার সময়ে···

—আশ্চর্য ! এতোখানিও তুমি ভাবতে জানো তাহ'লে ?

মুহূর্তখানেক বেয়াড়ারকম একটা শ্লেষের হাসি হেসে অনিরুদ্ধ আবার গম্ভীর হ'য়ে যায়।

মলয়া খানিকক্ষণের জন্য যেন আর মাথা তুলতে পারেনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে ভয়ে-ভয়ে আর একবার চেষ্টা ক'রে বলে—যাত্রা করার সময়েও আর রাগ ক'রে থেকোনা গো—পায়ে পড়ি তোমার। তুমিও যদি রাগ করো তো আমি যাই কোথা বলো তো ?···ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো মলয়া।

অনিরুদ্ধ বিব্রত হ'লো—ইস্ ! আঃ, একি ক'চ্ছো ? রাগ কোথা ? রাগ কেন আমি করবো তোমার ওপর শুধু শুধু ?

এইটুকুকেই মলয়া স্বামীর সম্মতি হিশেবে ধ'রে নেয়—তৈরি হ'য়ে যায় বাসবীর শোবার ঘরের অভিমুখে। দরজা যদিও বন্ধ ছিলোনা, ভেজানো ছিলো মাত্র তবু ঠেলে ঢুকতে সাহসে কুলোলোনা মলয়ার। সে উপর্যুপরি কয়েকবার দোরে টোকা দিলো। কী জানি আজ কেমন যেন তার বড্ডো ভয়-ভয় করছে, তার হাঁটু দুটো যেন ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। অনিরুদ্ধও এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছন পেছন।

ভেতর থেকে দোর খুলে গেলো, সাম্‌নাসাম্‌নি এসে দাঁড়িয়েছে বাসবী। কেমন যেন ঘোর-ঘোর-লাগা চোখ দুটো একটু যেন লাল, শত-শত-রেখা-বিদীর্ণ, শয্যা-বিধ্বস্ত শাড়ি, শিথান-মথিত বেণী প'ড়ে আছে পিঠের ওপর কিন্তু বেণী-স্খলিত অল্প কয়েকটা কোঁকড়া ঝুরোঝুরো চুল উত্তরের হাওয়ায় খেলা করছে কপালে, গালে ও অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির ওপর।

দ্বারপ্রান্তে মলয়া ও তার পেছনে অনিরুদ্ধকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ যেন মুহূর্তেই

উল্লাসে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো বাসবী ; বললো—বৌদি ! নিরুদা ! এসোনা ভেতরে···শোবার ঘরের দোরটা মেলে ধ'রে রইলো সে ।

কিন্তু অনিরুদ্ধ বললো—সময় নেই বাসবী। মলয়া তোমার কাছে কী-যেন বলতে এসেছে—শুনে ছুটি দাও আমাদের। ট্রেনের সময় আর বেশি নেই, এবার আমরা যাত্রা করবো।

পলকে যেমন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো বাসবী, ঠিক তেম্নি আবার পলকেই নিবে গেলো মুখখানি ; সে যেন অস্ফুট গুঞ্জনে শুধালো—কী বৌদি ?

মলয়া একবার অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাইলো, একবার বাসবীর মুখের দিকে চাইলো, তারপর মাথা নিচু করলো কিন্তু কিছুই বেরোলোনা মুখ দিয়ে। সস্নেহে মলয়ার পিঠে একখানি হাত রেখে বাসবী ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আবার শুধালো—কী বৌদি ?

মলয়া একবার শুধু মাথা নাড়লো মাত্র অর্থাৎ কিছু নয়, কিন্তু এবারেও তার মুখ দিয়ে বেরোলোনা কিছু। মলয়ার চিবুকের তলায় হাত দিয়ে ওর মুখটি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করাতেই মলয়া ঝর ঝর ক'রে আবার কেঁদে ফেললো।

—তবে যে বললে কিছু নয় ? এই বুঝি ? ··হাত ধ'রে এক রকম জোর ক'রেই বাসবী নিয়ে গেলো মলয়াকে নিজের ঘরের ভেতরে।

—নাঃ, হ'লোনা। তুমি এসো দিকি ভেতরে। নিরুদা যা বলে বলুক, শুনোনা তুমি। আমি জানি আর দু'চার মিনিটে তোমরা ট্রেন ফেল হ'বেনা। ··ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে মলয়াকে বসালো বাসবী। অনিরুদ্ধকেও ডাকলো—নিরুদা তুমিও এসোনা ভেতরে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ তখন স'রে গেছে সেখান থেকে, শুধু স'রে গেছে নয়, একেবারে নেমেই গেছে নিচে, হয়তো বসেছে গিয়ে গাড়িতে।

গাড়িতে ব'সে অনিরুদ্ধ পাঁচ মিনিট গোনে, সাত মিনিট গোনে, দশ মিনিট গোনে—অধীর হ'য়ে ওঠে। এমন সময়ে গাড়ি-বারান্দার নিচেকার সদর দরজার মধ্য দিয়ে দেখা গেলো দীর্ঘ দরদালানটা পার হ'য়ে মলয়াকে নিয়ে আসছে বাসবী। মলয়াকে নিয়ে বাসবীও এলো গাড়ি পর্যন্ত। স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে মলয়া ব'লে উঠলো—ওমা, তুমি গাড়িতে এসে ব'সে আছো ? বাসবী তোমাকে খুঁজছিলো যে। ও হয়তো তোমাকে কিছু বলতে চাইছিলো—ওর সঙ্গে যাওনা একবারটি ভেতরে—

অনিরুদ্ধ কঠিন কটাক্ষে একবার চাইলো স্ত্রীর দিকে। কার্যত সে নড়লোনা কিংবা জবাবও দিলোনা সেকথার।

বাসবীর কানে গিয়েছিলো কথাটা সে অম্নি হাসতে হাসতে ব'লে উঠলো—অমন কাজও কোরোনা বৌদি। অতো ঠেলে-ঠুলে ভেতরে পাঠিয়োনা নিরুদাকে। এবার থেকে যা বলবার তোমার সামনেই বলবো। বলবার আর কী-ই বা আছে?···প্রণাম করবো তো শুধু।

বাসবী পায়ের ধুলো নিলো অনিরুদ্ধের—ঠিক নিয়মিত চিঠি পাঠিও নিরুদা, তোমাদের খবরাখবরটা জানাতে গাফিলতি কোরোনা। নইলে বড়ো ভাববো।

একটু তিক্তহাসির সঙ্গে অনিরুদ্ধ বলে—অনেক প্রায়শ্চিত্ত তো করলে। এর পরেও আর তুমি আমাদের খবর জানতে চেয়োনা, বাসবী।

—কেন? সেকি কথা গো? এ তোমার রাগের কথা।

—না রাগের কথা তো নয়, তোমাকে এটাই আমার উপদেশ।

—কখ্খনো না; আমি বুঝেছি রাগ ক'রেছো তুমি। সত্যিকথা বলো তো, করোনি?

বাহ্যত বেশ মোলায়েম হেসে অনিরুদ্ধ এবার বললো—বেশ, তাই যেন হ'লো; রাগ করেছি।

—কিন্তু শুধু শুধু কী জন্য রাগ করবে তুমি?

—যদি বলি তুমি নিজে গিয়ে আমাদের সংসার গুছিয়ে দিয়ে এলেনা ব'লেই··· অনিরুদ্ধ বেয়া ড়াভাবে একটুখানি হেসে রসিকতার চেষ্টা করে কিন্তু সেজন্যই আরো বোধহয় সেটা মর্মান্তিক মনে হয়।

বিষণ্ণ বাসবীও রসিকতার প্রত্যুত্তরে রসিকতার চেষ্টা ক'রে বলে—অনেক ভেবে-চিন্তেই শেষ পর্যন্ত গেলামনা। আমার যে-রকম ভাঙা বরাত—গোছাতে গিয়ে তোমাদের সংসার যদি আবার ভেঙেই দিয়ে আসি? তাহ'লে যে আপসোস্ রাখবার জায়গা থাকবেনা। তার চেয়ে নিজেদের সংসার এবার তোমরা নিজেরাই গোছাও। আমি বরং পরে গিয়ে দেখে আসবো'খন।···তাও তুমি বললে যাবোনা। বৌদি বললে তবেই যেতে পারি। তবে বছরখানেকের মধ্যে বৌদি বললেও যাবোনা। আগে খোঁজ নিয়ে শুনি যে, তোমরা বেশ লক্ষ্মী হ'য়ে ঘর-করনা করছো···তবেই।

অনিরুদ্ধ পকেটে কী যেন খুঁজছিলো, কী যেন পাচ্ছিলোনা, হাতঘড়িটা বারবার দেখছিলো, অকারণ দম দিচ্ছিলো, বাসবী বললো—দাও বৌদি, তোমার পায়ের ধুলো দাও। যদিও বয়সে তুমি বরং দু'এক বছরের ছোটোই হয়তো হ'তে পারো তবু মান্যে অনেক, অনেক বড়ো। বাবা, নিরুদার বৌ··গুরুজন যে!

পায়ের ধুলো নেবার জন্য বাসবী মাথা হেঁট করে। মলয়া হাঁ-হাঁ ক'রে

তাড়াতাড়ি বাসবীর দু'টি হাত জড়িয়ে ধ'রে ব'লে ওঠে—করো কী, করো কী? তোমাকে পায়ের ধুলো দিতে পারি এতো পুণ্যির জোর আমার নেই—তুমি আমায় ক্ষমা কোরো বাসবী। তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ এম্নিতেই জমা হ'য়ে আছে—আর অপরাধ বাড়িওনা ভাই।

বাসবীকে জড়িয়ে ধ'রে তার কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে ফুলে-ফুলে কেঁদে ওঠে মলয়া। আবার কান্না!

বাসবী বলে—ওকি, ছিঃ! কেন শুধু-শুধু কাঁদছো বৌদি? তোমার কাছে আমারই তো ক্ষমা চাইবার কথা। তুমি এখুনি যে কথাগুলো বললে সেগুলো আমারই অনুতপ্ত প্রাণের কথা যে—তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—এই যা। তুমি কেন ক্ষমা চাইবে? তুমি কেন কাঁদবে?

অনিরুদ্ধের দিকে ফিরে বাসবী বললো—ছাখো নিরুদা তোমার বৌ শুধু-শুধু কেঁদে-কেঁদে শরীর খারাপ করছে। বলছোনা তো কিছু?

—কী বলবো?

—কী বলবে তাও আমি ব'লে দেবো? ঠাণ্ডা করো বৌকে। পথেই শরীর খারাপ হ'লে যাওয়া ঘুরে যাবে। হ'য়েছে ভালো—যার কাঁদবার কথা সে হাসছে, আর যার হাসবার কথা সে কাঁদছে। আমার পোড়া চোখ দিয়ে যে কিছুতেই জল বেরোয়না ছাই। কান্না আমার আসেওনা বড়ো একটা, ওটা আমি বিশেষ সইতেও পারিনে। নাও হ'য়েছে এবার।—বাসবী চোখ মুছিয়ে ছায় মলয়ার।

এ জায়গায় বাসবী নিজেই কষ্ট ক'রে খুব খানিকটা হাসলো তারপর একটি বিমূঢ় কটাক্ষে মৌন অনিরুদ্ধকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শেষে মলয়াকে উদ্দেশ ক'রেই বললো—কিন্তু প্রাণ খুলে যে হাসবো তার জো তো রইলোনা আর। আজ থেকে আমার হাসি তোমার কাছে যে বাঁধা পড়লো ভাই।

ব'লে বাসবী একটুখানি মরা হাসি হাসলো ঠোঁটের কোণে। মলয়ার ফ্যাকাশে মুখখানা আরো একটু যেন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো বাসবীর কথায়। সে শুধুই চেয়ে রইলো বলতে পারলোনা কিছু।

মোটর স্টার্ট নিলো।

—যাত্রা শুভ হোক। আবার বলছি চিঠি দিও।…বললো বাসবী আর সেই সঙ্গে অনিরুদ্ধের দিকে চেয়ে করুণ এক রকম হাসি মাখিয়ে নিলো সারা মুখময়। অনিরুদ্ধের চোখও চক্‌চক্ ক'রে উঠেছিলো। সেটা ঢাকবার জন্যই বুঝি সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো কিন্তু বাসবীর নজরে এড়ালোনা সেটুকু।

গাড়ি-বারান্দা পার হ'য়ে পাম ও ক্যাস্থয়ারিনা-বীথিপথের মধ্য দিয়ে

মোটরখানা গেটে পৌঁছোলো। পেছন-পেছন বাসবীও রাস্তায় গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। গেট থেকে বেরোবার সময়ে যেই তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে মোটরখানা রাস্তায় গিয়ে পড়বে সেই মুখে বাসবীর সঙ্গে আবার একবার অর্থাৎ শেষবারের জন্যই চোখোচোখি হ'লো ওদের। এই চোখোচোখির উত্তরে মুখে একটু হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলো বাসবী। ভোরের আলো ফোটার মতো ক'রে বাসবীর মুখেও সহজ, সুন্দর, ক্ষীণায়ু একটু হাসি দেখতে-দেখতে ফুটে উঠলো নিঃশব্দে, যে-হাসি অনিরুদ্ধ চিরদিন দেখে এসেছে বাসবীই শুধু হাসতে পারে— যে-হাসির আবেদনের শেষ নেই, ইতি নেই, উপমায় যা নেতিবাচক।

রাস্তার বাঁকে গাড়িটা অদৃশ্য হ'য়ে যাবার আগে অনিরুদ্ধ একবার চাইলো বাসবীদের বাড়ির দিকে—বাসবীরই মতো কেউ যেন তখনো দাঁড়িয়ে আছে, এখন আর ঠিক যেন চেনা যায়না, তবুও চেনা যায়, শাড়িখানা এখনো চেনা যাচ্ছে কিন্তু মুখখানা ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে এরি মধ্যে, এখুনি অদৃশ্য হ'য়ে হারিয়ে যাবে আর এক মুহূর্তেই। বাসবীর মুখখানা ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাবার আগে পর্যন্তও মনে হ'তে লাগলো যেন সে হাসিটুকু এখনো লেগে আছে ওর মুখে···বিজয়-বিস্মৃত্যু সেই হাসি পৃথিবীর বুকে প্রথম আলোক-বার্তার যা সমকালীন—প্রত্যেক উষার উদয়-শিখরে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায়; নিত্যই নূতন হ'য়েও যা প্রথিত পুরাতন। অনিরুদ্ধের জীবনে সেই হাসিই আরো একবার ইতিহাস রচনা করলো।

নতুন ক'রে পাবে ব'লেই

বাসবীর চোখের সামনে থেকে সমস্ত দুপুরটাকে খালি ক'রে দিয়ে ওদের মোটরটা যেই চ'লে গেলো বাসবী উঠে এলো ওপরে ; অপরিসীম ক্লান্তিতে বার কয়েক এঘর-ওঘর করলো, শেষটা নিজেরই ঘরে ফিরে এসে শয্যা নিলো। তখন তার আর হাসির মুখোশ নেই—বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলে বাসবী, নীরব কান্না। চোখ থেকে অনেক জল ঝ'রে যাওয়ার পর কিছু স্থির হ'লো। তখন সে আবার উঠলো। চাকরটাকে ডাকলো, মলয়া এতোদিন যে-ঘরখানায় ছিলো সেখানা এবার তো পরিষ্কার করতে হ'বে, গোছাতে হ'বে সেই গোছানোর কাজে দিব্যি মেতে রইলো খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘর-গোছানো সারা হ'য়ে গেলে, চাকরটা চ'লে গেলে, আবার সে তার ক্লান্তিকর নিঃসঙ্গতার মাঝখানেই ফিরে এলো।

কী করবে সে, এই সুদীর্ঘ দুপুর ধ'রে?—তার নিঃসঙ্গতা এবার যেন আবার তাকে দংশন করতে লাগলো। এবার তাহ'লে কী করবো?—আকুল হ'য়ে এই প্রশ্নটা সে আজ কার কাছে করবে? কে দেবে উত্তর?

শিলাময়ী ভিনাস্-মূর্তিটির কাছে গেলো, প্রশ্ন করলো কিন্তু সেখান থেকে এবারে যেন আর উত্তর পেলোনা কিছুই। বললো—দেবি, তুমি তো আজ তোমার অ্যাডোনিসের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে অধিষ্ঠিত আছো, তবে আমার কেন এমন হ'লো? বলো, এবার আমি কী করবো? কই? বলো··বলো···বলো···

পাথরের মূর্তির নিরেট ব্যঙ্গ এবারে আর যেন পথ দেখায়না তাকে—সে এবার ভিনাস্‌কে ছেড়ে [কোনো এক বিখ্যাত মূর্তিশিল্পীর স্টুডিও থেকে সম্প্রতি আনা] অ্যাডোনিস্ মূর্তিটির পা দু'টি চেপে ধ'রে বলে—তবে তুমিই বলো। তুমি তো আমার অ্যাডোনিসের প্রতিভূ—যাবার সময়েও সে যখন ব'লে যায়নি কিছু তুমিই তবে ব'লে দাও এবার আমি কী করবো?

পাথরের মূর্তিটা কি তবে তাকে বললো কিছু? এই সমস্যায় দিলো কোনো সমাধানের সংকেত? হঠাৎ কিন্তু চমকে উঠেই বাসবী ছেড়ে দিলো মূর্তির পা দু'খানি, যেন কয়েক পা পেছিয়ে এলো।

মসুরী থেকে আসার প্রাক্কালে একদা অজু ঠিক যেমন ক'রে তাকে ব'লেছিলো আজকে এই মূর্তিটাও কি তেমনি ক'রে ব'লে উঠলো বাসবীর মনের কানে—আমি কিছুই বলবোনা। এবার থেকে তোমার মনই তোমাকে ব'লে দেবে সব।

বড্ডো চমকে উঠেছে বাসবী—নিথর পাথরের মূর্তি তো আর কথা কয়নি তবে যে তার মনের গভীরে এখনো ঐ ধ্বনি-মর্মরের রেশ রয়েছে !

সে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে নিজে-নিজেই ব'লে উঠলো—তবে তাই হোক। বেশ তাই-ই হ'বে এবার থেকে। তবে তোমরা কেন আর এখানে ? তাহ'লে জীবিত বিগ্রহের মর্যাদা কেন আর দেবো তোমাদের ? এবার থেকে তোমাদের খাঁটি পুতুল ক'রেই রাখবো। অবশ্য কালাপাহাড়ী করবোনা, থাকো তোমরা কিন্তু নিতান্তই একটা পুতুল হ'য়ে থাকো ঐ কিউরিও ক্যাবিনেটের মধ্যে, এখানে আর ঠাঁই হবেনা তোমাদের।

ব'লে তার সাধের ভিনাস্ মূর্তিটিকে স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে তুলে নিয়ে বলে—তোমার সঙ্গে মন্ত্রণা আমার শেষ হ'লো এবার ··দিয়ে-দিয়েও তো শেষপর্যন্ত দিলেনা কিছুই। এতোদিনের প্রতিষ্ঠিত দেবীত্ব থেকে তোমাকে আবার পুতুলত্বে ফিরিয়ে এনে রাখছি ঐ কিউরিও ক্যাবিনেটের মধ্যে। অনাদর ক'রেই এর পর থেকে সাজা দেবো তোমাকে। দেখি তাহ'লে যদি তুমি কিছু দাও।

ব'লে বাসবী তার দামী মেহগনি কাঠের কিউরিও ক্যাবিনেট্‌টি খুলে সব চেয়ে ওপরের তাকটি খালি ক'রে পুতুল দু'টো তার মধ্যেই সাজিয়ে রেখে চাবি বন্ধ করলো।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পর অজ এলো। বাসবী এতোক্ষণ অজের প্রতীক্ষাতেই ছিলো—যেম্নি ওর গাড়ির সাড়া পেলো, গেটের সামনে যেই বেজে উঠলো হর্ন অম্নি তার ঘরের দক্ষিণ জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো বাসবী। দেখলো গাড়িখানা পাম ও ক্যাস্যুয়ারিনা বীথিপথের মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে গাড়িবারান্দার নিচে। প্রথমেই নামলো উর্দিপরা আরদালিটা হাতে বিস্তর ফাইল-পত্র, কোম্পানির পুরাতন রেকর্ড বই। পরে নামলো অজ। তাকে নামতে দেখে বাসবী গিয়ে দাঁড়ালো দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় রেলিং ধ'রে। অজ তখন ওপরে উঠছে। হাসিমুখে বাসবী অভ্যর্থনা করলো স্বামীকে। তল্পীবাহক আরদালিটা হাতের ফাইলপত্রগুলো রেখে আসতে গেলো অজের বসার ঘরে। বাসবী স্বামীর হাত থেকে টুপিটা নিয়ে টাঙিয়ে রাখলো হ্যাট্-র‍্যাকে। তারপর অজের সঙ্গে ঢুকলো পোষাক বদলানোর ঘরে পোষাক খোলায় স্বামীকে সাহায্য করতে। মলয়া এতোদিন যে-ঘরটায় থাকতো সেই খালি ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময়ে অজ স্ত্রীকে জিগেস করলো—তারপর···ওঁরা কখন গেলেন ?

বাসবী বললো—দুপুর একটা-দেড়টার সময়ে।

অজ জানতে চাইলো—বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়ে দিয়েছিলে তো ? কিছু অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি তো ওঁদের ?

—এতো ক'রেও যদি ওঁদের সবটুকু অসুবিধে না গিয়ে থাকে তো তুমি-আমিই বা কী করতে পারি বলো? সম্ভবত সবটুকু অসুবিধে ওঁদের যাবেনা কোনোদিনও।

অজ বললোনা কিছু শুধু প্রশ্ন-প্রখর চোখে চেয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে, দেখলো বাসবী তখন ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে তার সদ্য-পরিত্যক্ত পোষাক-পরিচ্ছদগুলো নিয়ে ওয়ার্ডরোবে ঝুলিয়ে রাখতে।

ঘড়িতে তখন সাতটা বাজলো। বাসবী স্বামীর কাছে অভিযোগ করলো—তুমি কিন্তু আবার অনিয়ম করছো। আরো অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবে। নইলে এভাবে চালিয়ে গেলে আবার তুমি অসুস্থ হ'য়ে পড়বে।

অজ বলে—কী করবো? এখন কয়েকদিন বড্ডো বেশি কাজের চাপ পড়েছে।

বাসবী বলে—হোক কাজ—শরীরের চেয়ে তো আর কাজ বড়ো নয়। যেমন ক'রেই হোক কাজ কমাতে হবে—সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই বাড়ি ফেরা উচিত। আচ্ছা, তোমার কাজে কী আমি কোনো সাহায্য করতে পারিনা?

অজ একটু মৃদু হেসে বলে—তুমি?

বাসবী বলে—হ্যাঁ, আমি। কেন? আমি কি তোমার কোনো কাজে আসতে পারিনা? তোমার কাজে কোনোভাবেই কিছু সাহায্য করতে পারিনা?

—কী কাজে সাহায্য করতে চাও, বলো? অফিসের কাজে?

—যদি বলি—হ্যাঁ, তাই। অফিসের কাজেই। তোমার অফিসে তো কতো কেরানি—তারা সবাই কি এতোই যোগ্য? আমি কি তাদের মতো একটা পোস্টও পেতে পারিনা তোমার অফিসে?

অজ হাসতে হাসতে বলে—তোমার যোগ্যতা দিয়ে মাত্র একটা কেরানিগিরি কেন অনেক কিছুই করতে পারো, অনেক কিছুই করতে পারতে অন্যত্র—এ আর বেশি কথা কী? কিন্তু কথা তো তা' নয়, তোমার যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনও নেই এখানে, কারণ তোমারই তো এ-সব। এ-কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার শেয়ারই তো এখন তোমার—ইচ্ছামাত্রই তুমি এখন সর্বময়ী কর্ত্রী হ'য়ে উঠতে পারো।

—দোহাই তোমার, সর্বেসর্বা হ'তে চাইনে। আমি শুধু দুপুরটা আর বাড়ি ব'সে থাকতে রাজী নই।

অজ আবার বলে—কিন্তু···তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী, বাসবী।

—বেশ তো, ঘরের লক্ষ্মীকেই বাইরের সহচরীও ক'রে নাও, বলছি দ্যাখো, ঠকবেনা। অমত কোরোনা তুমি, আমিও তোমার সঙ্গে এবার থেকে বেরোবো দশটায়, অফিসের কাজে সাহায্য করবো তোমাকে, থাকবো কাছে-কাছে আবার

তামাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো পাঁচটায়। তারপর অফিস সেরে এসে আমরা বিশ্রাম নেবো খানিকক্ষণ, সন্ধ্যার পর বেরোবো ক্লাবে। ক্লাবে যাওয়াটাও অন্তত যদি তুমি রাখতে তো এতো তাড়াতাড়ি তোমার শরীর ভেঙে পড়তোনা কিছুতেই। এটা খুবই সত্যি কথা।

—এতোদিন বাদে হঠাৎ কেন এ খেয়াল?

ব'লেই কথাটা ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো অজ, বললো—বেশ, যে-ক'দিন ভালো লাগে তাই চলো। কিন্তু এও বেশিদিন ভালো লাগবেনা—শখ মিটে গেলে, ক্লান্তিকর মনে হ'লে, বিরক্তিকর লাগলে তখন তোমার আর না গেলেই চলবে। কী বলো?

বাসবী ব'লে উঠলো—সে দেখা যাবে'খন। সে ভাবনা এখন থেকে কেন?

পরের দিন ঠিক দশটার সময়েই অজের সঙ্গে বাসবীও অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলো। অসম্ভব উৎসাহ তার। আজ যেন ওর নতুন জীবন শুরু হচ্ছে।

অফিসে গিয়ে দেখলো অজের চেম্বারেই বাসবীর জায়গা করা হ'য়েছে আপাতত। একটি সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল্ আর গোটা কয়েক চেয়ার অজের টেব্‌লের সামনে। অজ নিজহাতে বাসবীকে দেখিয়ে দিচ্ছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে সব। এই অভাবনীয় ঘটনায় সারা অফিসময় চাঞ্চল্য। পাশেই চেম্বার তৈরি হ'বে বাসবীর জন্য। তারই যোগাড়-যন্ত্র পুরোদমে চলছে। টিফিনের বিরতির সময়ে বাসবীর নির্মীয়মাণ চেম্বারের নক্সা এঁকে বাসবীকে দেখায় অজ। দু'জনের মধ্যে নানারকম মন্ত্রণা হয়। অফিসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জীবটির জন্য সবচেয়ে সুন্দর ক'রে একটি চেম্বার করাবে অজ--এই ওর জিদ। মূল্যবান সব আস্‌বাবের অর্ডার গেলো—বাসবীর চেম্বার অজ মনের মতো ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছে। অফিসের চেম্বার না ব'লে সেটাকে লাউঞ্জ বলাই ঠিক, এমন কি একজন বিলাসিনী নায়িকার 'বুডয়ার'ও বলতে পারা যায়। বাসবীর মতো রুচিশালিনী, শৌখিন মেয়ে যেখানে তার দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবে সে-কক্ষের উপকরণ-সজ্জা ইত্যাদি সব কিছুই সেই অভিজাত অধিবাসিনীটির যোগ্য হওয়া উচিত। অজ কেবলই খুঁতখুঁত করে, কিছুতেই যেন অর্থব্যয় ক'রে আর তৃপ্তি হয়না। কয়েকবার ওর কিছু কিছু প্রস্তাবে মৃদু আপত্তি তুললো বাসবী, বললো—অযথা অপব্যয় কোরোনা।

অজ কিন্তু শুনলোনা সে-সব কথা, বললো—অপব্যয় কোথা এই তো সদ্ব্যয়; এও দরকার, কারণ তোমার মান-মর্যাদার সঙ্গে যে আমারও মান-মর্যাদা জড়িয়ে আছে বাসবী।

পাছে স্বামীর মনে সে কষ্ট দিয়ে ফ্যালে এজন্য বাসবী স্বামীর এ-কথার ওপর আর কিছু বলতে পারেনি।

বাসবীর চেম্বার সাজানোর ব্যাপারে অজের অতি-উৎসাহ, বাসবীর প্রতি কর্তব্যে অতিকৃতি, সজ্জা ও উপকরণের অযথা আড়ম্বর কতো সময়েই প্রহসনের মতো মনে হ'য়েছে তার কিন্তু তবুও সে-সম্পর্কে বাসবী কোনোই মন্তব্য করেনি এ-পর্যন্ত শুধু যেদিন সোফা, সেটি, কার্পেট, ভালো-ভালো বুককেস্ আলমারী এলো, ক্লোক্‌রুমের আস্‌বাব-পত্র এলো, ডাইনিং রুমের জন্য আসবাব-পত্র, লেভেটরির সাজ-সরঞ্জাম এসে হাজির হ'লো এবং সেই সঙ্গে সব কিছুর জন্য বিলও হাতে নিলো তখন বাসবী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে মোট ব্যয়ের অঙ্কটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। বিনাবাক্যব্যয়ে অম্নি পুরো টাকাটাই একটি কলমের আঁচড়ে পাস্ ক'রে দিলো অজ।

বেয়ারাটা বেরিয়ে যাবার পর বাসবী একবার বললো—আমায় নিয়ে তাহ'লে দেখছি ষোলো আনাই খেলে খেলা।

অজ একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে—কেন? এমন কথা বলছো কেন?

আপন প্রাণের এই স্পর্ধিত প্রশ্নটা যদিও পরিহাসচ্ছলে শুরু করেনি বাসবী কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে শেষপর্যন্ত সে হেসেই গা পাতলা করলো, বললো—এম্নিই বলছি, তুমি যা কাণ্ড করছো।

নিজের কথার বিশেষ কিছু গুরুত্ব সে নিজেই যেন আর দিতে চাইলোনা। এর মধ্যে কতোটুকু বাসবীর মনের কথা আর কতোটুকু পরিহাস সেটা ঠিক বুঝলোনা অজ, বললো—কেন, তুমি কি বিরক্ত হচ্ছো?

—কেন বিরক্তির কি দেখলে তুমি? কই, না তো!

ব'লে বাসবী অম্নি স্বামীর চেয়ারের পেছনে গিয়ে কোল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়, বলে—কিন্তু তোমার ঐ দামী ডিস্‌প্লে-ক্যাবিনেট্‌টির মধ্যে আমাকে পুতুল সাজিয়ে রেখোনা, দোহাই।

—ডিস্‌প্লে-ক্যাবিনেট্? অর্থাৎ ঐ ফার্নিশ্‌ড্ চেম্বারটার প্রতিই কটাক্ষ করছো, না?···অজ হাসতে থাকে, বলে—বলেছো ভালো। কিন্তু তোমার মতো দামী পুতুল রাখতে গেলে দামী ক্যাবিনেট্ নইলে চলবে কেন? এতে যে তোমার সম্মতি নেই সেকথা খুলে বলোনি কেন আগে?

—কী আর বলবো ? এতো ক'রে আমার মতামত নেওয়ারই বা কী আছে এর মধ্যে ?

অজ বলে—আছে বৈকি। তোমার মতামতেই তো এখন থেকে সব হ'বে। ঠিক ক'রে বলো তাহ'লে কী হ'বে ?

বাসবী বলে—কী আবার হ'বে ? এ কী আর ন সমস্যা ? সমাধান তো সোজাই। অর্থাৎ তোমার যা ইচ্ছে সেটাই হ'বে।

অজ বলে—তা কেন হ'তে যাবে ? নিশ্চয়ই হ'বেনা। তোমার অসম্মতি থাকলে হ'তেই পারেনা। কিছু টাকা গেছে তার জন্য কী হ'য়েছে ? বলো, তাহ'লে সব বাতিল ক'রে দিই ?

এ-রকম গুরুতর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়ে বাসবী এবার নিজেই কিন্তু-কিন্তু ক'রে বলে—আমার যে অসম্মতি আছে তাও তো বলিনি। এতো খরচ ক'রে চেম্বার বানানো হ'লো কি খালি প'ড়ে থাকবার জন্য ? ব্যবহারে আসবেনা বলতে চাও ?

অজ বলে—আমি তো বলতে চাইনে কিছুই। আমার ইচ্ছেটা কি জবরদস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি কখনো, বলো তুমি ?

—আমি কি তাই বলছি ? তোমার ইচ্ছে আমার ওপর চাপাতে চাওনা ব'লেই তো তোমার অণুমাত্রও ইচ্ছা আবিষ্কার ক'রে নিতে আমার প্রাণপণ করা উচিত।

—না করলেই বা কী এমন ? এতোদিন যেভাবে চ'লে গেছে ঠিক সেভাবেই এখনো চ'লে যাবে। নতুন ক'রে এ নিয়ে আর ভাবছো কেন এতো ?

বাসবী হয়তো খানিকটা চুপ ক'রে রইলো, হয়তো কী ভাবলো তারপর বললো—কেন জানিনা আজকাল তোমাকে আমার বড্ডো ভয় করে। খালি-খালি মনে হয় যদি তুমি আমার ওপর রাগ করো, তখন কী হ'বে ?

—ভয় ? ভয় কেন ? তোমার ওপর রাগ করিনা তো কখনো।

—সেইজন্যেই তো আরো ভয়ে মরি। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন করো তো সে-রাগ আমি কি আর সইতে পারবো ? সত্যি সেদিন আমি ভয়েই ম'রে যাবো, দেখে নিও। ঠিক···ঠিক ··ঠিক ··

এমনই আশ্চর্য সরলতা অভিব্যক্ত হয় বাসবীর মুখের ভাবে এই কথাগুলো বলার সময়ে যাতে উচ্চরোলে হেসে উঠলো অজ, বললো—আরে দূর, মাথা খারাপ ! ছেলেমানুষী তোমার এখনো গেলোনা বাসবী ?

সংশয়াতীত সারল্যের সঙ্গেই বাসবী ব'লে ওঠে—না গো না, সত্যি-সত্যি ভয়

করে যে, কী করবো? খালি মনে হয় রাগ ক'রে যদি কখনো এমন কিছু সাজা দাও যা আমি সইতে না পারি···তখন?

অন্জ বললো—তোমার এ অমূলক ভয়—তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো যে, তোমার এই ভয়ের উৎস আমার মধ্যে নিশ্চয়ই নেই। আমার কী মনে হয় জানো, বাসবী, তোমার ভয়টা আমার থেকে নয়, ভয় তোমার নিজের কাছ থেকেই।

তখুনি বাসবীর মনের একটা বিপজ্জনক কোণ থেকে বেরিয়ে এসে একটা গোপন কথা যেন তার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে রুখে দাঁড়ালো। সে ব'লে উঠলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-ভয়ের উৎস হয়তো আমি প্রতিনিয়ত ব'য়ে বেড়াচ্ছি আমার নিজেরই মধ্যে। ঠিকই বলেছো তুমি।

অন্জ সকৌতুকে বলে—দেখছো তো, ধরেছি কিন্তু ঠিক? তোমার সাজা রইলো যে তুমি তোমার নিজের সিটের মধ্যেই অন্তরীণ থাকবে আজ টিফিন পর্যন্ত যাও, এবার তোমার সিটে যাও। আর্দালিটা খালি-খালি যাওয়া-আসা করছে, কী ভাবছে বলো তো?

বাসবী লজ্জিত হয়, বলে—ও-হো, ঠিক, ঠিক, মনেও ছিলোনা—আর মনেরই বা কী দোষ বলো? তুমি যে-রকম ঘর-বাড়ি বানিয়ে দিয়েছো অফিসের মধ্যেও। আচ্ছা, এবার আর ফাঁকি দেবোনা কাজে, ছাখো।

—হাজার ঘর-বাড়ি বানানো হ'লেও কিন্তু কোনোক্রমেই ভোলা চলবেনা যে, এটা অফিস এবং ঐ চেয়ারটারও একটা ডিগ্‌নিটি আছে। এক্সপ্লানেশন্ কল্ করা হবে তোমার কাছ থেকেও, তুমিও ইমিউন নও, বুঝলে? ··অন্জ হাস্যচ্ছলে শেষ করলো।

বাসবী তখুনি তার চেয়ারে গিয়ে ব'সে ঘাড় গুঁজে কাজ শুরু করে।

অন্জ মাঝে-মাঝে লক্ষ্য করতে থাকে বাসবীকে, ছাখে বাসবী নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছে তদ্‌গতচিত্ত হ'য়ে। বাসবীর মতো একটি চপল মেয়ে যে, কাজের মধ্যে এতোখানি একাগ্র হ'য়ে উঠতে পারে এটা ওকে লক্ষ্য করার আগে অন্জ বিশ্বাসও করতে পারতোনা। টিফিনের সময় পার হ'য়ে যায়-যায় তবুও বাসবী মুখ তোলেনি একবারও। এবার অন্জ আর থাকতে পারেনা, নিজের চেয়ার ছেড়ে ওঠে, বাসবীর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে—এবার ওঠো, টিফিনে যাবেনা?

—তুমি এখন যাচ্ছো? যাবো বৈকি।

—এসো তাহ লে।···অন্জ বাসবীর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে হাসতে থাকে, বলে—আমি দেখলাম তোমার সব করেস্‌পন্‌ডেন্সের ফাইল।

ব্যগ্রভাবে জানতে চায় বাসবী—কী দেখলে? কেমন দেখলে?

—যা দেখলাম তা যদি তোমায় এখুনি সব কিছু ব'লেই ফেলি তোমার আবার গুমোর হ'য়ে যাবেনা তো?

ম্লান হেসে বাসবী বললো—আমার আবার গুমোর কিসের? গুমোরের কী আর আছে আমার?

অজ বলে—বাবা, একাধারে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী—গুমোর হ'বেনা কী বলো!

বাসবীর অন্তস্তলে কোনো এক সুগন্ধ নিশ্বাসের মতো একটি বেদনার্দ্র কান্না যদিও প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে সমীরিত হ'য়ে ফিরছিলো, যদিও সে মনে-মনে স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বারবার বলছিলো—আমার সব গুমোর ভেঙেছো তুমিই। আমার আর কিছুই নেই—কিছু নেই। কিন্তু বস্তুত সে স্বামীর বুকে মাথা রেখেই ব'লে উঠলো—এইবার যে তোমার সামান্যতম কাজেও আসতে পারলাম—এই তো আমার গুমোর গো। এই গুমোরটুকুই শেষপর্যন্ত রাখতে দাও। আর কিছুই চাইনা, দোহাই তোমার, আর সব ধূলিসাৎ ক'রে শুধু এইটুকু রাখতে দাও।

সময়ে সময়ে আজকাল অজ বাসবীকে ছাখে আর অবাক্ হ'য়ে ভাবে ··বাসবী আরো দিন দিন বেশি ক'রে ভাবপ্রবণ হ'য়ে উঠছে নাকি? তাহোক অজ মনে-মনে কিছুটা বিস্মিত হ'লেও তার এই অসামান্যা স্ত্রীরত্নটি উত্তরোত্তর যেন আরো মধুময়ী হ'য়ে উঠছে তার কাছে—সেটুকুও সে নির্ভুলভাবেই অনুভব করে। কিছুদিন আগের সেই অনুষ্ণ স্বপ্নসুদূরতা থেকে সে যেন এবার স'রে এসেছে স্পর্শোত্তপ্ত সন্নিধি-সীমায়! অজ লক্ষ্য করে স্ত্রীকে, ছাখে আর কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবে এ-সুখের কী আর শেষ আছে? বাসবীকে দেখতে দেখতে অজের চোখে নেশার মতো ঘোর লাগে যেন—এতে নিজেও সে লজ্জিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে অজ এও জানে যে, তার সেই লজ্জাটুকু ঢেকে নেবে তার পার্শ্ববর্তিনী স্ত্রী কোনো-না-কোনো মধুরতর লজ্জাহীনতা দিয়ে। স্ত্রীর সঙ্গে আবার নতুন ক'রে প্রেমে পড়লো নাকি অজ? আর তাও এই বয়সে—বিবাহিত জীবনের এতোগুলো বছর কাটিয়ে দেবার পর?

সেদিন ওরা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বেরুলোনা আর কোথাও।

অজ বললো—আজ সন্ধ্যাটা বাড়িতে ব'সে তোমার সঙ্গে কাটাবো, কী বলো! আপত্তি আছে তোমার?

বাসবী তখনই তার সম্মতিজ্ঞাপন করলো। বললো—বেশ তো। বলো, তোমার জন্য কী করবো আজ সন্ধেটা?

অজ তার মনের ইচ্ছেটা আজ একেবারে দ্বিধাহীনভাবেই প্রকাশ করলো,

বললো—অনেকদিন তো তোমার কোনো গান শুনিনি—আজ ইচ্ছে করছে তুমি গোটা কয়েক রবীন্দ্রসংগীত শোনাও তাহ'লে আজ সন্ধেটা বেশ কাটে।

বাসবী তখুনি গিয়ে বসে অর্গ্যানের সামনে, বলে—বলো কোন্ কোন্ গান গাইবো?

কেন কে জানে অব্জের প্রথমেই মনে এলো, শুধু মনেই নয়, মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেলো—তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ…ঐ গানটাই গাও না প্রথম।

বাসবী অর্গ্যানে সুর দিলো, সুরু হলো—তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লে…

রীতিমতো প্রাণ ঢেলে দিয়েই বাসবী গেয়েছিলো, গানটা শেষ হ'তেই সে কাঁধে করস্পর্শ অনুভব করলো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলো—অব্জ এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। প্রায় গা ঘেঁষেই।

স্বামীর গায়ের ওপর বাসবী একটু নিজেকে ঢেলে দিয়েই জিগেস করলো—ভালো লাগলো গানটা?

অব্জ মুখের কথায় বললোনা কিছু, শুধু ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

অব্জ মুখে কিছু না বললেও তার কৃতজ্ঞ মুখ ও ছলছলে চোখের ভাবে বাসবী বুঝে নিলো না-বলা কথার সবটুকুই।

—গান ভালো যদি লাগে বেশ তো, রোজ তোমায় গান শোনাবো কী বলো?

—শুনিও।

অব্জের গলাটা এ-জায়গায় একটু যেন ধরা-ধরা মনে হ'লো বাসবীর। শুনতে কি তার ভুল হ'লো?—না, না, নির্ভুল, ধরা-ধরা গলাই তো।

অব্জের মতো কথাবিরল একজন কাজের মানুষকেও একটিমাত্র গানে এ-রকম বিচলিত ক'রে দিতে পারে? তার মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তকাল বাসবী এ-কথাই ভাবতে থাকে।

দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ—অনন্ত

মাসখানেক পুরোনো হ'তে চললো বাসবীর এই নতুনজীবন অর্থাৎ ক্লাব-অফিসের জীবন। এখন ক্রমশ ক্রমশ এতেও ধাতস্থ হ'য়ে আসছে সে। সারাদিন অফিসে অনবকাশ খাটুনির পর যখন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন সে আর ঘর-গৃহস্থালির কোনো কথাই শুনতে পারেনা বা কোনোদিকে চাইতেও পারেনা। বাড়ির কথা ভাবার জন্যে বাড়িতে ও আর থাকেই বা কতোটুকু? সকালে চোখ চাইতেই অফিসের তাড়া আর অফিস থেকে ফিরেও বা কতোটুকু থাকে বাড়িতে? অজকে নিয়ে আবার তো বেরিয়েই যায় ক্লাবে, ফেরে রাত্তির ক'রে, ক্লান্ত হ'য়ে। তারপর রাত্রিটুকুর নিটোল বিশ্রাম-সুখের পর আবার সকাল হ'লেই তো সেই ব্যস্ততা, অফিসের তাড়া আর কাজ। যেন সবটুকুই ধরা-বাঁধা মাপা-জোকা—দিনান্তে যেটুকু অবকাশ আসে সেটুকুর মধ্যেও যেন কোথাও একটু আরামপ্রদ শৈথিল্য নেই। আগে হ'লে এ-রকম প্রথানুবর্তিতার শাসন কিছুতেই সইতে পারতোনা সে; এখন অগত্যা এও তার স'য়ে আসছে। বাসবীর উৎসাহেই তো আজকাল অজ নিত্যই ক্লাবে যাচ্ছে—দীর্ঘকাল অনভ্যাসের পর সে আবার টেনিস্ খেলায় যোগ দিচ্ছে। সবটাই যেন বাসবীর জন্য। নিজের স্বাস্থ্যরক্ষায় অজের যেন আর কোনো দায়িত্বই নেই। ক্লাবের সময়টুকু সম-সামাজিক পর্যায়ের পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়; খানিকটা সময় খেলায়-ধুলায়, গল্পে-গাছায়, আনন্দে কাটে; একথা অবশ্যই স্বীকার্য কিন্তু স্ববিশ-বুকনি বোঝাই মেয়েদের পেছন পেছন ইস্ত্রি-করা পুরুষদের নির্লজ্জ চাটুকারিতা তার এখন আর তেমন ভালো লাগেনা।

অদ্রীশের অবস্থা এখনো তেমনই আছে—ওর জন্য একটা নার্স রেখে দিয়েছে বাসবী। মাঝে মাঝে আশ্চর্য স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে সে—কখনো কখনো সেই রকম সময়েই বাসবী দু'দণ্ড গিয়ে বসে ওর কাছে নিজের অবসরমতোই।

ওদের এখান থেকে অনিরুদ্ধ সস্ত্রীক চ'লে যাওয়ার দিন কয়েক পর পর্যন্ত বাসবী অনিরুদ্ধের কাছ থেকে পৌঁছানো সংবাদও অন্তত একটা আশা করেছিলো এবং না পেয়ে খুবই আশাহত হ'য়েছিলো। প্রাথমিক নৈরাশ্যটুকু কাটিয়ে উঠলে পর সে বরং একটা নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলো; মনে মনে বলেছিলো—ভালোই হ'য়েছে। কাজ নেই আর ওদের খোঁজ খবর রেখে। ওরা সুখে থাকুক সেই ঢের। কিন্তু বাসবী আজ যখন সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে চাকর এসে তাকে একটা

চিঠি দিলো। চিঠিখানা হাতে নিয়েই অপ্রত্যাশিতভাবে চমকে উঠলো বাসবী। একি, নিরুদার চিঠি যে! এতোদিন বাদে হঠাৎ? আবার! কিন্তু আবার কেন? আর কেন? বেশ তো ছিলো সে! অনেকটা মনস্থির ক'রেই ফেলেছিলো এতোদিনে। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলো বাসবী, একটু দ্বিধান্বিতভাবে চিঠিখানা হাতের মধ্যে ধ'রে রাখলো কিন্তু শেষপর্যন্ত না পারলো খুলে পড়তে, না পারলো চিঠিখানা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সব কিছু ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, ধুকপুকুনির অবসান ঘটাতে, কিংবা না পারলো ঠিকানাটা কেটে আবার অনিরুদ্ধেরই ঠিকানাতে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। বাসবী অনেকটা নিজেরই অজ্ঞাতসারে বন্ধ খামখানাই ড্রয়ারের মধ্যে পুরে রেখে চাবি দিলো। তারপর বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। গেলো পাশের ঘরে। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—অজ তখন টেবিল-আলো জ্বেলে বসেছে আবার কাগজ পত্র নিয়ে। বাসবী বললো—কী, ও-সব নিয়ে আবার বসলে যে? চলো?

অজ হাসতে হাসতে বললো—তুমি তৈরি হ'য়ে নাও। তোমার তৈরি হ'তে হ'তে আমার এই কাজটুকু সারা হ'য়ে যাবে।

অজের চেয়ারটার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বাসবী ফট্ ক'রে টিপে নিবিয়ে দিলো টেবিল আলোটা তারপর অজের কাঁধের ওপর হাত দু'খানি রেখে একটু জড়িত আব্দারের সুরে ব'লে ওঠে—তোমার কেবল কাজ আর কাজ। কাজের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, হ'য়েছিলোও তো তাই।

বাসবীর মুখ দিয়ে একরকম অনবধানবশতই বেরিয়ে যায় শেষের কথাটা—হ'য়েছিলোও তো তাই।

অজ শুনে হাসলো একটু, বললো—এখন? তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা এইবার বোধহয় সাব্যস্ত হ'য়েছে, কী বলো?

বাসবী তার স্বামীর বাঁ কাঁধের ওপর কপাল রেখে উপুড় মুখে অজের দক্ষিণেতর হৃদয়ের সঙ্গে তার নিজের ঠোঁট ও নাক ঘষতে ঘষতে অর্ধস্ফুটস্বরে কী কয়েকবার 'হুঁ' ও 'উঁহুঁ'র পুনরাবৃত্তি করলো যাতে ঠিক বোঝা গেলোনা কোনটা সে বলতে চাইছে।

অজ তাই জিগেস করলো—কোন্‌টা বলছো? 'হুঁ' না 'উঁহুঁ'? প্রথমটা না দ্বিতীয়টা? না দুটোই?

সেকথার নিশ্চিত কোনো উত্তর না দিয়েই বাসবী বলে উঠলো—জানিনা। তুমি বড়ো দেরি করছো আজ। তৈরি হ'য়ে নাও—আমার কিন্তু হ'য়ে যাবে এখুনি।

বাসবী বেরিয়ে যাচ্ছিলো ঘর থেকে অজ ডাকলো—শোনো।

ফিরলো বাসবী। অজ তখন আবার সেই অনুরোধটাই করলো, বললো—লক্ষ্মীটি, বলোনা সত্যি ক'রে।

বাসবী বললো—বলছি, উঠে এসো, বলবো কানে কানে।

এবার অজই উঠে যায় বাসবীর কাছে।

বাসবী আবার স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো—আমি বলবোনা কিছুই, তোমার নিজের মনই তোমাকে ব'লে দেবে সব। মাপ কোরো, এ জায়গায় তোমার কথাটাই ফিরিয়ে বল্লাম তোমাকে। এই কথাটাই কিছুদিন আগে আমার জপমালা হ'য়েছিলো, মুখস্থ হ'যে আছে তাই। মন্ত্রের মতো এই কথাটা দিয়েই ফের নতুন ক'রে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছিলে আমাকে মসুরী থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে। তাকি মনে নেই তোমার, এতোটাই কি ভুলো তুমি? আমি জানি, কখখনো না।

অজের বসার ঘর থেকে বেরিয়ে বাসবী যখন তার নিজের সাজঘরে ঢুকলো তখনো ওর মুখে হাসি লেগে রয়েছে—বাসবী সাজছিলো আর তুলনামূলকভাবে ভাবছিলো—অজের সঙ্গে অনিরুদ্ধ যেন ঠিক কাজের সঙ্গে খেলা! নিরলস কাজেরও যেমন ক্লান্তি, অবিরল খেলারও তেমনই ক্লান্তি। অনিরুদ্ধের পর অজ তাই এতো মূল্যবান। কিছুদিন আগেও যেন আরেক পৃথিবীর বাসিন্দা ছিলো বাসবী, এখন আরেক পৃথিবীর; দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ—অনন্ত। তখনকার বাসবী আর আজকের বাসবীর মধ্যে যেন জন্মান্তরের ব্যবধান। এক মৃত্যু এবং এক জন্ম ইতিমধ্যে ঘটেছে বাসবীর জীবনে—সেই মৃত্যু দিয়ে সে জেনেছে যে, নিরুদা তার কাছে নেহাৎ-ই আকাশকুসুম, পাওয়ার বাস্তবতাব বাইরে এবং তার সারা জীবনের প্রলোভন হ'য়েই থাকবে মাত্র। কিন্তু সুধুই তো মৃত্যু নয়, এই সঙ্গে আরো এক জন্মও যে ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে তার, হ'য়ে গেছে নতুন দীক্ষা। সেই জন্ম এবং সেই দীক্ষা দিয়ে সে এও জেনেছে যে, তার একান্ত কাছের মহাদেশই অনাবিষ্কৃত প'ড়ে রয়েছে, অবহেলিত আছে অব্যবহিত বসুসীমা আর সে নাকি প্রাংশুলভ্যের লোভে উপমার বামনের মতোই উদ্বাহু! কতোখানি ভুলই করেছিলো সে! নিরুদাও কি চেয়েছিলো তাকে এভাবে? এমন অপ্রস্তুতভাবে অনিরুদ্ধও কি বাসবীকে নিতে পারতো? তার মনেও কি সমাজ ছিলোনা, সংস্কার ছিলোনা? কেন এতোখানি ভুল করতে গেলো বাসবী? নিজের বিবেকেরই একটা অংশ তখুনি প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—ভুল? ভুল কিসের? নিরুদা সম্পর্কে তার আবার ভুল কিসের, ভুল কোথা? প্রেমের দাবির কাছে সবই তুচ্ছ যে···তুচ্ছ সমাজ,

সংসার, সংস্কার। কিন্তু প্রেমের চেয়ে বড়ো সত্যই কিছু নেই? সত্যই কি নেই? —যতো বড়ো প্রেমনিষ্ঠই হোক না, শপথ ক'রে এমন কথা বলতে পারে কি কেউ? এ-বিষয়ে বাসবীও কি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছে?—না, না, নিঃসংশয় সে তো আজো হ'তে পারেনি নিশ্চয়ই। বেশ, তবে তাই-ই। সমাজ মেনে, সংস্কার মেনে, সংসার-বন্ধন স্বীকার ক'রে, এমন কি অনিরুদ্ধের আদেশ মান্য ক'রেও হাতের কাছের সেই এ-তাবৎ-অনাদৃত মহাদেশটাই পুনরাবিষ্কার করতে হ'বে বাসবীকে—যে-মহাদেশ তার বিবাহেরই যৌতুক। যেখানে সবকিছুই সরল সমতল; যেখানে সবকিছুই স্নিগ্ধ, সজল ও ছায়া-নিবিড়; যেখানে দুরারোহ কোনো উচ্চতা নেই; যেখানে চলতে গেলে ঠেলতে হয়না দুরারোহ চড়াই, ভাঙতে হয়না বিপজ্জনক উৎরাই, সইতে হয়না ঝড়ের ঝাপ্‌টা, যেখানে না আছে সমুদ্র-বিক্ষোভ, না আছে অগ্নিগিরির উদ্‌গার, না আছে মরুপ্রান্তরে মরীচিকার কুহক। এখানে সবকিছুই প্রসন্ন, সবকিছুই শান্ত। এখন সুখের চেয়ে শান্তিই বেছে নিতে হ'বে বাসবীকে। খেলার পালা সাঙ্গ হ'লো, এবার কাজ। নিরুদা, নিরুদা গো, এবার তবে যাই? এতোক্ষণে উনি হয়তো তৈরি হ'য়ে গেছেন, হয়তো দেরি করেছেন আমার জন্য। তোমার চিঠিখানা কিন্তু রইলো ঐ ড্রয়ারের মধ্যে—ওটা আমি আপাতত খুলবোনা, খুলতে পারবোনা। খুললে আবার হয়তো সব গোলমাল হ'য়ে যাবে, তখন হয়তো তোমার আদেশও আর মেনে চলতে পারবোনা, হয়তো তখন তোমারও অবাধ্যতা ক'রে ফেলবো। তাই পারলুমনা খুলতে, কিছু মনে কোরোনা, মিনতি। বুকের কাঁটা আর তুলতে চেষ্টা করবোনা, জেনেছি এবং তুমিও জানিয়েছো যে, তা আর হবার নয়। আমাদের জন্য আর রইলোনা এই জীবন, হয়তো রইলো জীবনোত্তরের সান্ত্বনা। তোমার মুখ চেয়ে সে সুদূরও হয়তো একদিন সন্নিহিত হ'য়ে আসবে জানি, কিন্তু তখন—সেই শুভলগ্নে—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসার আগে, চোখের সামনে জগতের আলো চিরতরে নিবে আসার আগে তোমার মুখ যেন আবার নির্ভুলভাবে চিনতে পারি। সমাজ-কল্পিত যে-স্বর্গ, তা থেকে বাসবী নির্বাসিতা—তার জন্য তার ক্ষোভ নেই, তার প্রতি তার লোভও নেই, আমাদের ধর্মানুশাসন হয়তো তার জন্য নরকের ব্যবস্থাই করবে—সেজন্য সে গ্রাহ্যও করেনা। আছে তার নিজের অন্তরের অনুশাসন, আছে তার নিজের মন-গড়া এক স্বর্গলোক। তাতেই সে যেন চিনে নিতে পারে তার সকল ধ্যানের, সকল আরাধনের ধনকে—সেই শেষ চেনার চমক লেগে তার স্বর্গলোকের পথ যেন আলো হ'য়ে ওঠে। অন্তরের দেবতার কাছে আর কিছু কামনা নেই বাসবীর। বিবাহবাহ্য দেহদান কিছুতেই

অশুচি করতে পারেনি তাকে বরং তার সারাজীবনের সেটুকুই স্বকৃতি—একথাই অকপটে বিশ্বাস ক'রে এসেছে বাসবী, পেয়ে এসেছে নিজ বিবেকের দ্বিধাহীন সমর্থন। এর পর থেকে সামাজিক বিচারে সে সতী হ'তেই চলেছে কিন্তু তার মন তো জানে, এ কতো বড়ো ছলনা। এতোখানি চরম অসতী সে আগেও হয়নি কখনো, ছিলোও না কোনোদিন। তবু এই ছলনাকেই যখন তার সমাজ চায়, তার নিজ প্রয়োজনও যখন এই ছলনাকেই স্বীকার ক'রে নেয় আর অজুও যখন এই ছলনার মধু পেয়ে ভুলে থাকতে চায়—তবে তাই হোক। এবার তবে সব দ্বিধা ঘুচে যাক্, সব অভিযোগ মুছে যাক্ মন থেকে। এর পর থেকে তার বিবেকেও আর বিঁধবেনা এটা। আজকের এই অসতীপনাও তো সেই অ্যাডো-নিসেরই অনুজ্ঞায়। তাই বাকি জীবনটা সে সইতে পারবে সব, হাসিমুখে মেনে নিতে পারবে সব।··হুকুম দাও তবে যাই, অপরাধ নিওনা, লক্ষ্মীটি।

ব'লে বাসবী নিজের হাতের অঙ্গুলিপ্রান্তগুলি একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাতে ক'রে সেই চুমোটাই যেন ঢেউয়ের মতো ভাসিয়ে ছায় শূন্যে—কিউরিও-ক্যাবিনেটের সবার উপরের তাকটির উদ্দেশে। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, নেমে যায় নিচে। বাসবীর আগমন-প্রতীক্ষায় অজু তখন সত্যি-সত্যি তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়েই ছিলো মোটরের দোরটা খুলে ধ'রে।

ওরা এখন সোজা চললো ক্লাবে।

লিপিশেষ লিখি Epilogue

১৫ই অগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। পার্বত্য শহরটার সর্বত্র সকাল হ'তে না হ'তেই আনন্দ কোলাহল, ভোর থেকে 'প্রভাত-ফেরী', তেরঙা ঝাণ্ডা, ট্রাকে ক'রে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকেরা দলে দলে বেরিয়েছে —স্লোগান দিতে দিতে শহরটা চ'ষে বেড়াচ্ছে—সেই বহুপ্রতীক্ষিত ও এ-তাবৎ প্রত্যাশিত দিনটা এবার সত্যিই এসে গেলো এই আশাহত পরাধীন জাতির জীবনেও—এই সংবাদটাকেই স্মরণীয় ক'রে রাখতে চায় ওরাও ওদের জীবনে—জীবনের অভিজ্ঞতায়। ওদের এই মিছিল ও মাতামাতি দেখতেই বন্ধু একবার ক্লান্তপদে তার প্রায়ান্ধকার খুপ্‌রির জানলাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়ালো। বিশেষ কারো প্রতি লক্ষ্য না ক'রেই যেন কয়েকবার আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লো যার অর্থ যেন—ঐ যা! হ'লোনা, হ'লোনা—গলদ রইলো। তারপর আবার জান্‌লা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে বসলো তার ডেক-চেয়ারে। আজ সে স্থির করলো তার এই সুদীর্ঘকাল অর্থাৎ এতোগুলো মাসব্যাপী অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে বাইরে আসবে—এই মর্মে সে আজ খবর পাঠালো কয়েকটা ক্যাম্পে—হিমাংশুর কাছে, রঙ্গিলার কাছে। এখন ওরা কাছাকাছিই এসে আছে কিছুদিন হ'লো। যদিও বন্ধু দেখা করেনা কারো সঙ্গে তবুও ওদের কাছ থেকে খবর আসে বন্ধুর কাছে নিত্যই। মনে-মনে উক্ত সিদ্ধান্তের জন্ম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধু চেঁচিয়ে ডাকলো—শর্মাজী!

পাশের ঘর থেকে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন।

সঙ্ঘের অন্যান্য কর্মীর কাছে বন্ধু আজ আত্মপ্রকাশ করবেন ব'লে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন—শর্মাজী, আপনি একবার ৩নং ক্যাম্পে এখুনি যান—রঙ্গিলাকে ও হিমাংশুকে আমি আজ অতিঅবশ্যই স্মরণ ক'রেছি বলবেন—ওদের দু'জনের নামে দু'খানা চিঠিও আছে, পাঠাবো আপনার হাত দিয়ে। আজ দুপুরেই ওরা যেন ঠিক এসে পৌঁছয় আমার কাছে।

—আচ্ছা, আমি তৈরি হ'য়ে নিচ্ছি এখুনি। চিঠি আপনি লিখে রাখুন।

বন্ধুর চিঠি লেখার ফাঁকে তৈরি হ'য়ে নিলেন শর্মাজী এবং চিঠি দুটো যেই হাতে পেলেন অমনি রওনা হলেন।

৩নং ক্যাম্পে বন্ধুর চিঠি পৌঁছনোমাত্রই হিমাংশুকে সঙ্গে ক'রে রঙ্গিলা যাত্রা করলো। ওদের সঙ্গে ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো শর্মাজী। বন্ধুর কাছে এসে ওরা পৌঁছলো দুপুর দুটোর পর।

ওরা দুজনেই প্রথম যখন বন্ধুকে দেখলো যুগপৎ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হ'লো। বিশেষ ক'রে রঙ্গিলা তো মোটেই চেপে রাখতে পারলোনা, ব'লে উঠলো—একি চেহারা হ'য়েছে তোমার বন্ধুদা ? সেই তুমি···আর এই তুমি ? এই জন্যেই কি তোমার অজ্ঞাতবাস দরকার হয়েছিলো ? একি করলে তুমি ? কেন এমন করলে ? কেন ? কেন ? তোমাকে সেবা করার ভাগ্য থেকেও কেন তুমি আমাদের বঞ্চিত করলে ? একটা অবুঝ আবেগে সে বন্ধুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো। বন্ধু বসেছিলো একটি জীর্ণ ডেক্‌চেয়ারে অর্থাৎ পাইন কাঠের ফ্রেমে তেলচিটে একটা চট পরানো যে আসবাব সেটাকেই ডেক্-চেয়ার ব'লে বোঝাতে চাইছি।

রঙ্গিলার এই আকুল প্রশ্নের কোনো জবাবই দিলোনা বন্ধু বরং জবাব এড়াতে গিয়ে হাসলো শুধু।

হিমাংশু বলতে যায়—সত্যি, বন্ধুদার মতো মজবুত শরীর এতো শিগ্‌গির যে এমন হ'য়ে পড়তে পারে—এ আমরা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি অথচ···

হিমাংশুর কথাগুলো বন্ধু যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে কথা ক'য়ে যাচ্ছিলো শর্মাজীর সঙ্গে।

—কই শর্মাজী, আপনাকে যা বলেছিলাম যোগাড় হ'য়েছে ?

—সব ইন্তাজাম ঠিক আছে, মহারাজ। একটা ডাণ্ডি আর তিনটে ঘোড়া তো ?

হিমাংশু আর রঙ্গিলার দিকে চেয়ে বন্ধু বলে—হ্যাঁ শোনো তোমরা—তোমাদের যেজন্য আজ ডেকে পাঠিয়েছিলুম—আমার সঙ্গে একবার যেতে হ'বে তোমাদের·· এখান থেকে মাইল পাঁচেক ঘোড়াতেই যেতে পারবে তারপর অবশ্য আরো দু'মাইল হাঁটা পথ।

রঙ্গিলা একবার বলতে গেলো—আজ থাক্ ও-সব, বন্ধুদা। তুমি একটু সুস্থ হ'লে পরে হবেখ'ন। আমার মনে হয় তোমার শরীর এখন বেরোবার মতো নয়।

বন্ধু ধমক দিয়ে ওঠে—না, না, আজ নইলে আর সময় পাওয়া যাবেনা—কী আবার ও-সব বাজে ধুয়ো তুলছো তুমি।

হিমাংশু ও রঙ্গিলা দু'জনেই অগত্যা স্বীকৃত হয়—বন্ধুদার আদেশ তাদের প্রশ্ন করার অধিকারেরও বাইরে।

ওরা চারজনেই বেরোয়। রঙ্গিলা, হিমাংশু ও শর্মাজী—তিনজনে যাত্রা করে ঘোড়ায়। অনেক মিনতি ও অনুরোধ ক'রে রঙ্গিলা শেষপর্যন্ত বন্ধুকে ডাণ্ডিতেই ওঠায় নইলে ডাণ্ডিটা রঙ্গিলার জন্যই আনিয়েছিলো বন্ধু।

রাজপুর থেকে ক্রোশ তিনেক পথ ওরা ঘোড়ায় চললো, তারপর সকলকেই

ঘোড়া থেকে নামতে বললো বন্ধু, নিজেও নামলো ডাণ্ডি থেকে, বললো—এবার ঘোড়া বা ডাণ্ডি আর চলবেনা—উঠতে হ'বে একেবারে খাড়া চড়াই পাহাড়ে, বুক বেয়ে, পাথর আঁচড়ে আঁচড়ে।

—তুমি এই শরীরে এই চড়াই ভাঙবে?···শুনে শিউরে উঠলো রঙ্গিলা।

বন্ধু বলে—কিছুদিন আগেও যে নিত্যই চড়াই ভেঙে উঠেছে আর নেমেছে তার ওপর একটুখানি আস্থা না হয় রাখলেই। ধ'রেই নাওনা বন্ধুদা সব পারে। এখুনি দেখতে পাবে। কেন, শর্মাজী কি জানেনা? জিগেস করো ওকে?

শর্মাজী বন্ধুর বক্তব্যের সমর্থনে তখুনিই বল্লেন—হাঁ, মহারাজ।

বন্ধুকে শর্মাজী বরাবর 'মহারাজ' ব'লেই সম্বোধন করেন, এটা সম্ভবত তদ্দেশীয় চাল।

তারপর বন্ধু ব'লে চলে—ঐ যে দেখছো রঙ্গিলা, (হিমাংশুর দিকে ফিরে) দেখছো হিমাংশু সামনের পাহাড়টা যার চুড়োয় দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল হ'যে প্রকাণ্ড একটা গাছ হেলে রয়েছে—ঐ চুড়ায় উঠতে হবে আমাদের, তারপর নেমে যেতে হ'বে অপর পারে—বেশি নয় খানিকটা নামলেই পাওয়া যাবে একটি গুহা—সেই গুহার মধ্যেই আছে যা কিছু যন্ত্রপাতি—শর্মাজী জানেন সব। ইদানীং ওখান থেকেই তো কাজ করতো আমাদের ওয়্যারলেস্ ট্রান্সমিটার, খবর পাঠাতো সার দেশময়। সচরাচর থাকতাম আমি একাই আর যখন নেহাত কলকব্জা যন্ত্রপাতি বিগ্‌ড়োতো তখন শর্মাজী যেতেন। জানো তো, শর্মাজী একজন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়র। আমরা দু'জনেই চালিয়েছি নিয়মিত দশ বারো ঘণ্টা ক'রে প্রচারের কাজ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। এখন তো সে প্রয়োজন ফুরোলো তাই চলেছি নিজহাতে সবকিছু তুলে নিয়ে আসতে। শর্মাজী এ-সবই জানেন এবং সেই সঙ্গে তোমাদেরও জানা থাকা দরকার। এসো তোমরা আমার সঙ্গে—এসো দেখাই যে তোমাদের বন্ধুদা আজো অপটু নয়, ইচ্ছে করলে এখনো পারে সব।··

ব'লে বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টায় উঠতে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে পাথর আঁকড়ে, গাছের শিকড় ধ'রে ধ'রে; শর্মাজী উঠতে থাকেন অবলীলাক্রমে কুশলী পাহাড়ীর মতো; আর হিমাংশু ও রঙ্গিলা ওঠে সব শেষে অপটুভাবে।

প্রাণান্ত চেষ্টায় কম্পিত পদক্ষেপে প্রথমে খানিকটা এগিয়ে যায় বন্ধু সকলকে অতিক্রম ক'রে। শর্মাজী অতো তাড়াতাড়ি উঠতে মানা করেন বন্ধুকে, কিন্তু ব' সেকথায় যেন কর্ণপাতও করেননা। শর্মাজীর পিছনে উঠতে থাকে হিমাংশু আর সবশেষে, সবার পিছনে প'ড়ে থাকে রঙ্গিলা।

যদিও বন্ধু এগিয়ে গেছে, উঠে গেছে অনেকটা ওপরে তবুও তার পদক্ষেপ যে

উত্তরোত্তর আরও অনিশ্চিত, বেপথু ও স্খলনবহুল [illegible]’তে থাকে, খুব একটা গুরুতর স্খলন থেকে বন্ধু এইমাত্র নিজেকে কোনোমতে সাম্‌লে নিলো। নিচে থেকে সেটা লক্ষ্য ক’রে তো রঙ্গিলা প্রায় আর্তনাদ ক’রেই উঠেছিলো। সেই টালটা কোনোমতে সাম্‌লে নিয়ে বন্ধু চওড়া একটা পাথরের ওপর ব’সে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে ঠোঁট দু’টি ঈষৎ ফাঁক ক’রে হাঁপাতে লাগলো আর খুব ঘামতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শর্মাজী, হিমাংশু ও রঙ্গিলা উঠে এসে দাঁড়ালো বন্ধুর পাশে। বন্ধু যেন এইমাত্র স্নান ক’রে এসেছে—এই পাহাড়ের শীতেও এতো ঘামছে সে! তার মুখের চেহারাও অস্বাভাবিক চোখ দুটো যেন আরো ব’সে গেছে, কপাল, গাল, চিবুক ও নাসিকা দিয়ে যেন স্বেদের শতধারা বইছে—সকলেই আতঙ্কিত। হিমাংশুর মুখে সেই একই প্রশ্ন—একি করলে তুমি বন্ধুদা? একি করলে? কারো কথাই শুনলেনা? রঙ্গিলাদির কথাও না? বলো তো, এখানে কোথায় কী পাই?

রঙ্গিলার মুখেও সেই একই প্রশ্ন—একি করলে তুমি বন্ধুদা! আমাকে শাস্তি দিতে আরো কতো বাকি আছে, বলো? আরো কী করলে আমাকে সাজা দেওয়া সম্পূর্ণ হয়? তবে মাথা খুঁড়ে শেষটা আমি কি মরবো এই পাথরে?

শর্মাজীর মুখেও সেই একই প্রশ্ন—এ ক্যা কিয়া, মহারাজ?

সেও হা-হুতাশ ক’রে এই মর্মে অনুযোগ করলো যে, তারা সবাই এতোবার এতো নিষেধ করলো তবু কেন বন্ধু কারো কথাই শুনলোনা।

সকলেই বিমূঢ়, হতভম্ব, শঙ্কিত ও আকুল।

অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত স্বরে রঙ্গিলা জিজ্ঞেস করলো—শর্মাজী, বন্ধুদাকে এখন কি আর নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়না নিচেয় যেখানে ডাক্তার মেলে, যেখানে সেবা সম্ভব।

শর্মাজী চুপ ক’রে থাকে।

—নামিয়ে নিয়ে গিয়ে আর দরকার কি রঙিল? এখানেই রেখে যেয়ো আমাকে কিংবা নিয়ে যেয়ো আরো ওপরে যেখানে আমি আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। ঐ নির্জন নিঃসঙ্গ চুড়োয় যেখানে মেঘের জন্ম হয়, নির্ঝরের স্বপ্ন যেখানে শতধা হ’য়ে ভাঙে, গরিমা ও মহিমা যেখানে বুক ফুলিয়ে চিরকাল মাথা উঁচু ক’রে থাকে—[illegible] পায়ের কাছে কখনো নতিস্বীকার করেনা। সেইখানে তোমাদের বন্ধুদাকে রেখে দিয়ে তোমরা চ’লে যেয়ো নেমে।

—না, না, চুপ করো তুমি—হুকুম তোমার অনেক শুনেছি আর পারবোনা, আর হুকুম কোরোনা তুমি।

২৫

—হুকুম নয় রঙিল, কাব্যই করছি। কাজে কাজে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে জীবনটাকে একেবারে কঠোর গদ্য ক'রেই রেখেছিলাম তাই কাব্যের আশ তো আর মেটেনি কখনো জীবনে। একটুখানি সাধ বুঝি র'য়ে গিয়েছিলো মনের কোণে—মরণটা তাই কি পুরোপুরি কাব্য হ'য়ে গেলো?

বলতে-বলতে একটু থেমে গিয়ে কেবল চেয়ে রইলো ঐ দূর গিরিচূড়ার দিকে স্বপ্নালু চোখে। ওর কাছে তখন বস্তুবদ্ধ পরিপার্শ্ব যেন মুছে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বন্ধু আবার যেন স্বপ্নে কথা ক'য়ে উঠলো, বললো—ঐ সুদূর চূড়ায়···পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন ঐ আমার সমাধি—যেখানে নিত্যই উষা আসে তার ফুলের উপঢৌকন নিয়ে, সদ্য-সূর্য সমতল পৃথিবীকে চেয়ে দেখবার আগে করে ওরই শিরশ্চুম্বন···প্রতি গোধূলির উদয়-তারা ঐ সমাধিক্ষেত্রেই আরতির ডালা সাজিয়ে আবাহন অনুষ্ঠান করতে আসে আবার সারারাত বিরামহীন নক্ষত্র-নৃত্যের পর প্রত্যেক ভোরেই ম্লানমুখী অস্ত-তারা ওরই সমাধি-শিয়রে মঙ্গল-আরতি দেখিয়ে বিদায় নিয়ে যায়।

—অতো কথা বোলোনা, হ'য়েছে এবার, চুপ করো তুমি। আমার প্রতি এতোটুকু কৃপাও কি করতে পারবেনা?

শর্মাজীর দিকে ফিরে অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠস্বরে রঙ্গিলা বলে—আচ্ছা শর্মাজী, তুমি কি কথা ভুলে গেলে? বলছোনা যে কিছু? আমি একা এখন কী করবো? আচ্ছা, তুমি বলোনা হিমাংশু, এখুনি সরানো যায়না এখান থেকে বন্ধুদাকে?

ভয়ে, ব্যাকুলতায়, বিহ্বলতায়, আবেগে, কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় রঙ্গিলার গলা বিকৃত হ'য়ে যায় সে যখন বলে—আমি বাঁচাতে চাই বন্ধুদাকে···এবারে আর দেশের জন্য নয়; আমার···আমার নিজের জন্যেই। নইলে আমি বাঁচবোনা হিমাংশু, তুমি দয়া ক'রে আমায় সাহায্য করো।

অত্যন্ত ধীরে মৃদুস্বরে বন্ধু উত্তর দিলো—হিমাংশু সাহায্য করলেও এখন আর তা পারবেনা।

বন্ধুর এই ভয়ঙ্কর উত্তরটার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই যেন রঙ্গিলা দু'টি কান দু'হাতে ঢেকে এবং দু'টি চোখ বুজিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে ওঠে—তাতে পাথরও বুঝি বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। প্রাণপণ জেদের সঙ্গে রঙ্গিলা বারবার খালি বলতে লাগলো—হ্যাঁ পারবো, পারবো, পারবো। পারতেই হ'বে। তুমি বাঁচবে, বাঁচতেই হ'বে তোমাকে।

বন্ধু একটুখানি হাসতে চেষ্টা করে, একটু টেনে-টেনে কথাগুলো বলে—আচ্ছা, তাই হ'বে, তাই হোক তবে। এখন থেকে বাঁচবো তোমার—তো-মা-দে-র মনে।

বন্ধুর কথা তখন এড়িয়ে গেছে। সে ঘর্মাক্ত হিমশীতল হাতখানা তুলে রঙ্গিলার হাত দু'খানা একবার ধরতে যায় কিন্তু তার সেই অবশ হাতখানা স্খলিত হ'য়ে প'ড়ে যায় রঙ্গিলার কোলের ওপরই, বন্ধুর চোখ বুজে আসে।

বন্ধুর মুখের কাছে মাথা নিচু করলো শর্মাজী, মাথা নিচু করলো হিমাংশু, বন্ধুর শরীরে শেষ প্রাণস্পন্দ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে কিনা দেখবার জন্য কিংবা তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ অভিবাদন জানাবার জন্য ঠিক বোঝা গেলোনা।

এরপর একটা অবুঝ আকুল কান্নায় রঙ্গিলা আছড়ে পড়লো ওর নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর, বার বার ক'রে কেবলই বলতে লাগলো—চোখ চাও, একবার চোখ চাও, শুনে যাও যেকথা বলিনি কখনো। না শুনে যেয়োনা তুমি, যেয়োনা।

কিন্তু বন্ধু আর চোখ চায়না। শুনতে আসেনা রঙ্গিলা কী বলতে চায়। ওর না-বলা-কথা না-বলাই থেকে যায় শেষপর্যন্ত। স্বাধীনতার প্রথম সৈনিক স্বাধীনতালাভের দিনেই চ'লে গেলো পর্দার আড়ালে বরাবরের জন্য—কেউ জানলোনা, কেউ দেখলোনা। শুধু পার্শ্ববর্তী সুহৃদ্-হৃদয় তিনটি একান্তে হাহাকার করলো খানিক।

এভাবে বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর চেয়েও এই শোক-বিমূঢ়া নারীটির আচরণ দেখে শর্মাজী ও হিমাংশু দু'জনেই সমধিক বিস্মিত হ'বার তথ্য খুঁজে পেলো।

কিছুক্ষণ বাদে ধরা গলায় হিমাংশু যখন বললো—যান তাহ'লে শর্মাজী জন কয়েক লোক যোগাড় ক'রে আনুন বন্ধুদাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে তো এখান থেকে। কী বলেন রঙ্গিলাদি? রঙ্গিলাও ব'লে উঠলো—লোক চাই নিশ্চয়ই তবে ওঁর দেহ আমরা নামিয়ে নিয়ে যাবোনা—বন্ধুদার শেষ আদেশও আমরা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবো, আমরা ওঁকে নিয়ে যাবো ওপরে, আরো ওপরে,… ঐ চুড়োয় কিংবা তারো ওপরে। তাঁর চারপাশের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে আমাদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শের দুর্দর্শ দুরারোহ উচ্চচূড়া! একক ও তুলনাহীন ছিলো তাঁর ব্যক্তিত্ব-মহিমা…অনেকটা হিমালয়ের ঐ চুড়ার মতোই। তাই ওঁর সমাধি ঐখানেই হওয়া উচিত। আমাদের যথার্থ আদেশই ক'রে গেছেন তিনি। তাঁকে যাঁরা নতি জানাতে চাইবে তাদের আসতে হ'বে সাত পাহাড় ভেঙে এখানে—উঠতে হ'বে ঐ চুড়োয়।

বন্ধুর দেহ দাহ করার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হ'লোনা রঙ্গিলা। এই শোকার্তা নারী যেভাবে বন্ধুর শব আঁকড়ে প'ড়ে রইলো, হিমাংশুও সায় না দিয়ে পারলোনা রঙ্গিলারই প্রস্তাবে। রঙ্গিলার কাছ থেকে শব ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে চিতায় চাপাবার মতো নৃশংসতা হ'লোনা কারুরই। যদিও শর্মাজী একটু গোঁড়া হিন্দু

এবং সেইসঙ্গে একটু প্রথানুবর্তীও তিনি, প্রথমটা বললেন বটে কয়েকবার কিন্তু শেষটা বুঝলেন যে রঙ্গিলাকে কিছুতেই রাজী করানো যাবেনা এ প্রস্তাবে। সুতরাং শেষপর্যন্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হ'লো যে বন্ধুদাকে সমাধিস্থ করাই হোক ঐ পর্বতচূড়ায় নিয়ে গিয়ে।

শর্মাজী একাই নেমে গেলেন নিচে। কাছাকাছি একটি গ্রাম থেকে কয়েকজন পাহাড়ী শ্রমিক যোগাড় ক'রে নিয়ে ফের ফিরে গেলেন ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই। তারপর বন্ধুর দেহ নিয়ে যাওয়া হ'লো ওপরে, সমাধিস্থ করা হ'লো একেবারে শিখর দেশে। তখন প্রায় সন্ধে হয়-হয় গোছের।

বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা ক'রে ওরা আবার যখন রাজপুরে অর্থাৎ শর্মাজীর বাসার সেই দু'খানি খুপরি-ঘরে ফিরে এলো তখন রাত হ'য়ে গেছে বেশ।

সে রাতটা কাটাবার জন্যে রঙ্গিলা শর্মাজীর বাসার যে ঘরখানিতে বন্ধু কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও বাস ক'রে গেছে সেই ঘরখানিই বেছে নিলো। বন্ধুদার সান্নিধ্যে ঘরখানা এখনো যেন সজীব—বন্ধুর গলার স্বর এখনো যেন দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিহত হ'য়ে ফিরছে।

অতিপরিচিত অথচ একটা আকস্মিক দুর্যোগে ভগ্ন ও ইতস্তত বিকীর্ণ স্মৃতি-খণ্ডগুলির মাঝখানে ব'সে সারারাত কেঁদে কাটিয়ে দেবার অবাধ অবসর পাবে রঙ্গিলা, এটাও যেন মস্ত একটা সান্ত্বনা মনে হ'লো তার। রাত্রির বিশ্রামের অছিলায় ও সেই ছোটো খুপরিটি নিজের জন্য বেছে নিয়ে দরজা বন্ধ করলো। পাশেই শর্মাজীর ঘর, ঠিক এই ঘরেরই অনুরূপ। হিমাংশুর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা সেখানেই ক'রে দিয়েছেন শর্মাজী।

রাত্তির হয়তো অনেক হ'লো—কতো? ··সাড়ে ন'টা? দশটা? বেশ হিম আসছে জানলা দিয়ে—এতোক্ষণ এটুকুও খেয়াল হয়নি তার। ··রঙ্গিলার ছোট্টো একটু জানলার মধ্য দিয়ে দেখা যায় রাস্তার ওপারে গ্রাম্য মুদীখানার দোকানের মতন একটি দোকান···দোকানদার ঝাঁপ বন্ধ করবে বুঝি এবার! তিব্বতের কাছাকাছি পাহাড়ী মানুষগুলোর কথাবার্তা বোঝা যায়না কিছুই··· কোথায় যে ঐ দেশাত্মবোধক গান বাজছে···অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে সুর···সম্ভবত নিচে থেকেই···ওকি, একটা খণ্ডযুদ্ধ যেন এগিয়ে আসছে এদিকেই ·· কী স্লোগান? বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, মহাত্মাজী কি জয়! ট্রাকে ক'রে বেরিয়েছে যুবকেরা, চিৎকার-মুখর খণ্ডযুদ্ধটা যেন এগিয়ে এলো কাছে, আরো কাছে, একটা গর্জমান ঢেউয়ের মতো একেবারে সামনে দিয়ে বেরিয়ে দূরে চ'লে গেলো।···দোকানদার এবার বন্ধ করেছে তার দোকান ··ভেতরে আছে নাকি

কেউ ? ··রঙ্গিলার ঘরের আলোটা কী দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলছে ! আলোটা কি কমানো যায়না একটু ?·· স্বাধীনতা উপলক্ষে রেডিও-তে বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে—খুব মৃদুস্বরে কানে হেড্‌ফোন লাগিয়ে শুনছেন শর্মাজী। হিমাংশুকেও দিয়েছেন একটা শোনবার জন্য···শুনছে বুঝি হিমাংশুও, রঙ্গিলাকেও তো ডেকেছিলেন শোনবার জন্যে·· কিন্তু রঙ্গিলার কানে আর কি আর ঢুকবে কিছু ? কোনো কিছু কি আর স্পর্শ করবে প্রাণ ?···বন্ধুর গলার স্বর যেন এখনো দেয়ালে-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে কানে এসে বাজছে, প্রাণ ভরিয়ে তুলছে।···স্বপ্নের মতো সময়··· ছায়ামূর্তির মতো সব মানুষ—ঘোরা-ঘুরি করছে চতুর্দিকে···ভীরু-ভীরু সব আলো—ইতস্তত জ্বলছে ! বিহ্বল যতো অন্ধকার মাতালের মতো টলছে···নেপথ্যের মতো কথা যেন সকলে কানে-কানে বলাবলি করছে···কানে যদিও বা আসে তো প্রাণে পশে না কিছুই। তার চোখের সামনেও দুলে উঠেছে যেন এক বিরাট কালো পর্দা···তারই ওপারে যেন ঢাকা পড়ছে সব। বন্ধুর বুটজোড়াটা ঐ তো রয়েছে প'ড়ে ঘরের কোণে···সেটা নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করলো রঙ্গিলা···প্রাণপণে সে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো ওটা · ওর বুকের মধ্যে উদ্বেল হ'লো সারাজীবনের কান্না···সেই অশ্রুর স্রোতে ভেসে গেলো প্রদোষের মুখ, ঝাপ সা হ'লো সেই ছবি !···অত্যন্ত উষ্ণ স্বরে পাশের ঘর থেকে প্রাণপণ প্রতিবাদে হিমাংশু যেন ব'লে উঠলো শর্মাজীকে—তাহ'লে কি বলতে চান বন্ধুদা আত্মহত্যা করলেন ? নম্র নিরুত্তরে চুপ ক'রে রইলো শর্মাজী। চমকে উঠলো রঙ্গিলা। অন্ধকার থেকে কে বলে গো এমন কথা ? ··কে ?···কে ?···কে ?···কী বললে শর্মাজী, শর্মাজী ··বলো তুমি, বলো সব কথা ··বন্ধ দোরের সামনে কান পেতে রঙ্গিলা দাঁড়ালো ··

কয়েক মুহূর্ত পরে হিমাংশু ব'লে উঠলো—মাফ করুন শর্মাজী আমার কণ্ঠস্বরে যদি উষ্মা প্রকাশ পেয়ে থাকে—আপনি তো জানেন, আমি এখন বড়ো বিচলিত আছি। আমি সব শুনতে চাই, সব কথাই জানতে চাই বন্ধুদার শেষ দিনগুলো সম্পর্কে। সেই সঙ্গে এ-সম্বন্ধে আপনার ধারণাও জানতে চাই। কারণ শেষ অব্দি বন্ধুদার কাছে-কাছে আপনিই তো ছিলেন।

শর্মাজী বলেন—সে তো ছিলামই। তাই তো বলতে চাইছি। আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা যদি কোথাও না মেলে তো যেন রাগ করবেননা ভাই-সাহেব।

ব'লে শর্মাজী একটু থেমে ধীরে-ধীরে দৃঢ়স্বরে বললেন—আমার বিশ্বাস এবং ধারণা যে, মহারাজ অসুখের জন্য আহারত্যাগ করেননি মোটেই বরং ঠিক তার

উল্টোটাই প্রকৃত ঘটনা অর্থাৎ প্রয়োপবেশনের ফলেই ক্রমে-ক্রমে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন।

—সম্প্রতি তিনি কি কিছুই খেতেননা, শর্মাজী?

—সম্প্রতি মানে মৃত্যুর আগের ক'দিনের কথা জানতে চাইছেন? না, সম্প্রতি তাঁর আর কোনো কিছু খাবার শক্তিও ছিলোনা। মৃত্যুর পূর্বে সপ্তাহখানেক কাল তিনি শুধু তো জল খেয়েই ছিলেন।

—তার আগে?

—তারও দিন পনেরো আগে পর্যন্ত দিনান্তে একবার মাত্র প্রাণধারণ একটু ক'রে দুধ খেতেন। কতোবার কতো বলেছি কিছুতেই কিছু হয়নি। বললে হয়তো তিনি মুখে বলতেন যে, তাঁর বর্তমান শরীরে এর বেশি সহ্যই হ'বেনা, কিন্তু বস্তুত তা নয়।

—আচ্ছা তারও আগে?

—তারও দিন পনেরো আগে মাত্র একবেলা ক'রে দু'টি ভাত খেতেন। দু'বেলা খাওয়া ছেড়েছেন আজ প্রায় মাস তিনেক হ'তে চললো।

পরিপাক-যন্ত্রের বৈকল্যের জন্যই তিনি আহার ত্যাগ করেছেন—একথা যে আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করিনি, তিনি তা জানতেন। এবং আমার মনের সংশয় কারো কাছে প্রকাশ করতে নিষেধও করেছিলেন।

—কিন্তু কিসে আপনার এমন সন্দেহ হ'লো শর্মাজী? এইভাবে প্রায়োপবেশনে নিজেকে হত্যা করা—এটা কী জন্য আপনার মনে হয়?

—আমার উপর রুষ্ট হবেননা ভাই-সাহেব। আমার মনে হয় তিনি যেন কোনো প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। কথাবার্তায় একদিন একথা মনেও হ'য়েছিলো।

—সেকি! কিসের প্রায়শ্চিত্ত?··চমকে উঠলো হিমাংশু, বিস্মিত হ'য়ে প্র করলো—কার কাছে কী এমন অপরাধ, কী এমন অন্যায় তিনি করেছিলেন যে নিজেকে এভাবে নষ্ট ক'রে তারই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যেতে হ'লো? এ হতেই পারেনা শর্মাজী, এ হ'তেই পারেনা। কী এমন তুচ্ছ কারণে আমরা তাঁকে হারালুম?

চিন্তিত মুখে শর্মাজী বললেন—সেই তো···আমিও তো বড়ো অবাক্ হয়েছিলাম তাঁর মুখ থেকে যখন একথা শুনি। বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু আজ ভাবছি এমনও কিছু থাকতে পারে যার সন্ধান আপনি-আমি রাখিনা অথচ যাঁরা তাঁর আরো অন্তরঙ্গ তাঁদের মধ্যে কেউ সম্ভবত এর কোনো সন্ধান দিতে পারতেন। এ-সময়ে প্রদোষবাবু যদি এখানে থাকতেন তো তিনি হয়তো কিছুটা আলোকপাত করতে পারতেন। আর একজনও পারেন··

ব'লে এ-জায়গায় শর্মাজী একটু বাধো-বাধোভাবে ঢোক গিলে শেষটা বললেন—কিন্তু তাঁকে তো এখন এ-বিষয়ে কোনো কথা জিগেস করতে আমার সাহস হচ্ছেনা—বুঝতেই পেরেছেন বোধহয়···তিনি হচ্ছেন রঙ্গিলা-বহেন্।

ঠিক তন্মুহূর্তেই নারীকণ্ঠের তীব্র একটা আর্তনাদে পাশের ঘরটা যেন বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভারী কোনোকিছুর পতনশব্দ এবং সামান্য একটু গুম্‌রানি তারপর একেবারে স্তব্ধতা।···

শর্মাজী ও হিমাংশু রঙ্গিলার ঘরের রুদ্ধদ্বার খুলতে না পেরে দোর ভেঙেই ঘরে ঢুকলো। ঢুকে দেখলো রঙ্গিলা সংজ্ঞাহীন হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে আছে।

(২)

প্রদোষ ফিরে আসেনি। ইউরোপ থেকে তার কোনো খবরও পাওয়া যায়নি আর। রঙ্গিলা সেই থেকে আশ্রয় নিয়েছে রাজপুরের সন্নিহিত অঞ্চলস্থ শর্মাজীর সেই বাসা-বাড়িতেই। প্রতি মাসে বন্ধুর মৃত্যু-তিথি এলেই সকাল হ'তে না-হ'তে রঙ্গিলা কোথায় যে বেরিয়ে যায়, কে জানে। ঘরে ফিরে আসতে বেলা প'ড়ে যায়। যে-পর্বতশিখরে একদিন ওরা সবার অলক্ষ্যে বন্ধুর দেহ সমাধিস্থ ক'রে এসেছিলো অবেলায় সেই পাহাড়ের দিক্ থেকেই রঙ্গিলাকে ফিরে আসতে দেখা যায়। রঙ্গিলার সঙ্গে থাকেন শর্মাজীও। সেদিনটা উপবাস ক'রেই থাকে রঙ্গিলা, কোনোকিছুই খায়না; আর সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানি যেটার মধ্যে বন্ধুর জীবনের শেষের কয়েকটা দিন কেটেছিলো—তারই জানলা দুটি খুলে বন্ধুর ডেক্-চেয়ারটি পেতে রঙ্গিলা ব'সে থাকে। চেয়ে থাকে সুদূর পাহাড়ের দিকে যেখানে তার বন্ধুদার স্মরণার্থে বিশাল সমাধিমন্দির ইচ্ছার ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে কল্পনার কারিগরেরা দিনে দিনে একটু একটু ক'রে গ'ড়ে তুলছে! মনশ্চক্ষে সে দেখতে পায় সেই স্মৃতিসৌধের অমর গম্বুজ-মিনার মেঘ ভেদ ক'রে উঠে গেছে শূন্যে···আরো ওপরে, স্ট্র্যাটস্‌ফিয়ার ভেদ ক'রে মহাশূন্যে, দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে অদৃশ্য নক্ষত্রলোকে কিন্তু পাদপীঠ তার ঐ পর্বত-চূড়ার সমাধি-ক্ষেত্রটা, যা এখন থেকে তার সারাজীবনব্যাপী প্রণাম নিবেদন করার পীঠস্থান হ'লো। এতে খানিকটা সান্ত্বনা আসে বটে, কিন্তু একান্ত বস্তুগত যে ক্ষতি যা তার পিপাসু অন্তর সদাসর্বদা কামনা করছে অথচ পাচ্ছেনা, তার তো আর ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়; সেই মর্মভেদী ক্ষুধার-ক্রন্দনের তো আর শেষ নেই। তার বেশির ভাগ অবসরই সেই ছোটো দু'টি জান্‌লার ধারে সেই ডেক্-চেয়ারটিতে ব'সে-ব'সে কাটে আর কেবলই ভাবে—এ কী হ'লো? কেন এমন হ'লো? এ-রকমটা না হ'য়ে অন্য রকমও তো হ'তে পারতো? বুড়ো বয়সে কেনই বা তাকে শেষটায়

এই বিয়ের বিড়ম্বনায় পেয়ে বসেছিলো? আবারও ফিরবে নাকি প্রদোষ? নাকি এখানেই শেষ। বন্ধু চ'লে গেলো চিরদিনের জন্য তবু কেন রঞ্জিলা কিছুতেই পারেনি তার জীবনের সব চেয়ে গোপন কথাটি ভরসা ক'রে ওকে একবারও শোনাতে। শোনাতে গিয়েও লজ্জায় দ্বিধায় যদি সে ম'রেও যেতো তাহ'লেও আজ যে বাঁচতো রঞ্জিলা। মৃত্যুর আগেও যদি বন্ধুকে কথাটা শুনিয়ে দিতে পারতো রঞ্জিলা তাহ'লে ··তাহ'লে ··কে জানে কী হ'তো! তাহ'লে যেন রঞ্জিলার অন্তরাত্মা কিছুটাও অন্তত তৃপ্তি পেতো আজ।

(৩)

আর বাসবী? বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সে দিব্যি ভুলে আছে অফিস্, ক্লাব, পার্টি ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমনও সময় আসে যখন তার কোনো কিছুই ভালো লাগেনা। সে তখন উপর্যুপরি অফিস্ কামাই করে। জিগেস করলে বলে—শরীরটা ভালো লাগছেনা। মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন এভাবে সে নিজের জন্য রাখে। তখন সারাটা দুপুর একা-একাই থাকে, স্মৃতির কণ্টকশয্যায় শুয়ে-শুয়ে সময় কাটায়, গড়িমসি করে, যা ইচ্ছে ভাবে, নিজের নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়া করে। কতোদিন আগের মিলিয়ে-যাওয়া মসূরীর দিনগুলোকে শূন্য থেকে হাতড়ে-হাতড়ে মনের মধ্যে টেনে আনে, স্বপ্ন ছাখে রাত্রে—তার অ্যাডোনিসের স্বপ্ন। স্বপ্নের পরদিন সারা দুপুরটাই একটি বেদনা-বিধুর মধুর স্বাদে তার দেহ-মন কানায়-কানায় ভ'রে থাকে। অর্গ্যানের ঢাকাটি তুলে গান গাইতে বসে—আজু রজনী হম্ ভাগে পোহায়লুঁ, পেখলুঁ পিয়মুখচন্দা।
কিংবা গায়—যাঁহা পঁহু অরুণ-চরণ চলি যাত—
কিংবা কবিতা পড়ে—

All night, and as the wind lieth among
The cypress trees, he lay
Nor held me save as air that brusheth by one
Close, and as petals of flowers in falling
Waver and seem not drawn to earth, so he
Seemed over me to hover light as leaves
Closer me than air,
And music flowing through me seemed to open
Mine eyes upon new colours.
O winds, what wind can match the weight of him!

—এটুকুই বাসবীর বিলাস। এই আমেজটুকুর মাধুর্যেই সে বাস করে দিন কয়েক। তারপর আবার ফিরে আসে দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে। সেই অফিস আর ক্লাব আর পার্টি···এরই পুনরাবৃত্তি চলে। সারাদিন সে যা-ই করুক, অজ অফিস থেকে ফিরলে কিন্তু সে তার দ্বিতীয় সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। নিজের সঙ্গে নিজের এই লুকোচুরি খেলাতে ক্রমশই সে অভ্যস্ত হ'য়ে আসছে।

তবে নিজের সঙ্গে এই ছলনায় এক এক সময়ে তার কষ্ট যে হয়না তা নয়। কতোদিন রাত্রে কতো মধুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে যায়, চোখ মেলে বড্ডো চমকে ওঠে—কই, কোথা অনিরুদ্ধ? কোথাও নেই। অজ শুয়ে আছে পাশে, গাঢ়ভাবে ঘুমোচ্ছে। ভয়ে তখুনি চোখ বুজিয়ে ফ্যালে তাতে কিন্তু অজই তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়, স্বপ্নের অনিরুদ্ধ তো ফিরে আসেনা কল্পনায়। একি যন্ত্রণা! বালিশে মুখ ঢেকে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে সে মনে মনে বারবার বলে—না, না, আর পারিনা, পারিনা সইতে। আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে যে, অ্যাডোনিস্। আমায় দয়া করো, রেহাই দাও। একি হ'লো আমার? একদিন খেলাচ্ছলে যে উন্মাদকে জাগিয়েছিলে আমার বুকের মধ্যে, তাকে এবার ডেকে নাও, নাও ফিরিয়ে। সে তোমার—সে তুমি, সে তুমি, সে তুমি। তোমার প্রেম আজ তোমাতেই স'পে দিলাম, তোমাতেই দিলাম ফিরিয়ে। এখন আমায় বাঁচতে দাও, এইটুকু শুধু। নেপথ্য থেকে আমার হৃদয় নিয়ে তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা শেষ করো এবার। একবার মসূরী পাহাড়ে খদের ধারে দাঁড়িয়ে যখন তোমাকে আকুল হ'য়ে ডেকেছিলাম, বলেছিলাম—দাও একটি ঠেলা, চুকে যাক্ সব। তখন কেন পারোনি? আমার সেদিনের সে-মিনতিতে মিথ্যে ছিলোনা একটুও—সেকি বোঝোনি? তখন কেন তা করোনি, কেন, কেন, কেন? আজ তবে এতো কষ্ট দিচ্ছো কেন? বারে বারে কেন তুমি স্বপ্ন হ'য়ে আসো যে-স্বপ্ন এতো সহজে ভেঙে যায়? ঘুমের বিছানায় অন্ধকারের মতো এমন ক'রে এসে কেন জড়িয়ে ধরো আমায়, যাতে জেগে উঠেই আমি কেঁদে ফেলি? মধ্যরাতের তারার মতো হাতছানি দিয়ে কী ইসারা পাঠাও, কোথা নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখাও অথচ ফেলে রাখো এই তুমি-হারা তুচ্ছতার যন্ত্রণার মধ্যেই। অমন কোরোনা গো—তোমাতেই যার জন্ম, তোমাতেই তার বিলয় হোক। সে-সমুদ্র তোমারই বুক, সে সমুদ্র তুমিই। যেখান থেকে এ-ঢেউ একদিন জেগে উঠেছিলো, আবার মিলিয়ে যাক্ সেখানেই।

'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা।'—একথাই বাসবীর অন্তস্তল থেকে বারবার উঠে আসে।···তবু শান্ত হ'তে চায়না প্রাণ। তার এই মধ্যরাত্রির নীরব কান্নায় উপাধান সিক্ত হ'য়ে ওঠে, বলে—তুমি মাঝরাতের হাওয়া।

হ'য়ে এসে কেন আমাকে ছুঁয়ে দিলে? শেষরাতের খোলা জানলায় শুকতারা হ'য়ে এসে অমন চুপিসাড়ে কেন ডাক দিয়ে গেলে? উল্কার বিদ্যুতের মতো আমার রক্তপ্রবাহে কেন ফের আগুন ধরিয়ে দিলে? চুপ ক'রে থাকলে চলবেনা, উত্তর দাও। কিছু বলছোনা কেন তুমি? কেন তুমি আকাশের মতো মৌন, কেন তুমি স্তব্ধতার মতো স্থির? হয় কিছু বলো, নাহয় তুমি যাও। দোহাই তোমার, তুমি যাও। এমন করলে আমি বাঁচবো কেমন করে?

…বেদনায়, ক্ষোভে, অভিমানে, অনুতাপে সে যেন কেঁদেও শান্তি পেলোনা। বালিশ থেকে মুখ তুললো, চোখ মেলে চাইলো। কোথাও কোনো সান্ত্বনার ছলনা পর্যন্তও নেই।

নিরুপায় বাসবী নিতান্ত অশান্তভাবে তখন জড়িয়ে ধরলো পাশের ঘুমন্ত স্বামীকেই, বললো—ঘুমোচ্ছো? একবার ওঠোনা গো।

অজের বুকের ওপর মাথা রেখে আবার চোখ বুজোলো বাসবী।

অজ জেগে পড়লো, বললো—কী হ'লো? অমন করছো কেন?

বাসবী শুধু বললো—বড্ডো কষ্ট হচ্ছে।

শুনে অজ অধীর হ'লো, বললো—কষ্ট কেন? শরীর কি খারাপ বোধ করছো?

বাসবী স্বাভাবিক স্বরেই বললো—না।

—তবে, কষ্ট হচ্ছে বলছো কেন?

—কী জানি।

—দুঃস্বপ্ন দেখেছো বুঝি?

—হুঁ।

—ও কিছুনা। জল খাবে? পিপাসা পেয়েছে?

—না।

—তবে ঘুমিয়ে পড়ো।…বাসবীর মাথায় অজ হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বাসবী আজ অনুভব করতে পারলো কতোখানি শান্তি স্বামীর সেই স্নেহস্পর্শে; ওর অশান্ত মন অনেকটা যেন শান্ত হ'য়ে নিতে পারলো এতে।

অনেকটা নিজমনেই বাসবী এবার ব'লে উঠলো—কাল থেকে অফিস যাবো কিন্তু। আর কামাই করবোনা। অফিস গেলেই বরং ভালো থাকি।

অজ বললো—সে তো থাকবেই। ঘড়ি-ধরা নিয়মের ওপরে থাকলে সবারই শরীর ও মন—দুই-ই ভালো থাকে।

আর কোনো কথা হয়না ওদের মধ্যে। অজের একখানা হাত বাসবী নিজের হাতের মধ্যে তু'লে নিলো আর একখানি হাত অজ বুলিয়ে দিচ্ছিলো বাসবীরই

কপালে। একটা অনুপম স্বস্তিতে বাসবীর মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো অন্ধকারে। কেবলই তার মনে আসছিলো কলকাতা ছাড়ার প্রাক্কালে অনিরুদ্ধ যে-উপদেশ দিয়ে বাসবীকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলো—তারই কথাগুলো। সেগুলোই সে মনে-মনে বারবার আবৃত্তি ক'রে নিচ্ছিলো—'প্রেমের যে-অমৃত তোমার বুকের ঘটে জাগিয়ে গেলাম বাসবী, তা যখনই উথলে উঠতে চাইবে—সে-অমৃতধারা তুমি নষ্ট হ'তে দিওনা, তোমার স্বামীর ভোগেই তা লাগিও। তোমার স্বামীর মধ্যেই আমাকে তুমি পাবে, খুঁজে দেখো, লক্ষ্মীটি, খুঁজে দেখো।'

তার কল্পনার ছায়াপুরুষকে সম্বোধন ক'রে এবার বাসবী মনে-মনে ব'লে উঠলো—নিরুদা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছোনা, তোমার হুকুম আমি কী রকম বর্ণে বর্ণে মেনে চলছি! পারবো, পারবো, যা ব'লে গেছো সব পারবো। বাসবীর কাছে তুমি কি শুধু প্রেমিক? তুমি যে তার সব। তোমার ছোঁয়া পেয়েই তো প্রথম দল মেলে উঠেছিলো তার হৃদয়, বেজে উঠেছিলো তার দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী শাশ্বত প্রেমের গানে গানে—মসুরী পাহাড়ে তার জীবনের সেই মহাজাগরণের মুহূর্তগুলো সে কি ভোলবার? সেই তো তোমার অবিস্মরণীয় দান—তার পর থেকে বাসবী বদলেছে অনেক—এখন সে তোমার আদেশ মেনে চলতে পারবে, এখন সে তার স্বামীকেও ভালোবাসতে পারবে। তুমি ভেবোনা নিরুদা। স্বামীকেও সে ভালোবাসে, কিন্তু সে-ভালোবাসা তার বিবাহিত জীবনের বড়ো একটা অংশমাত্র—তার সত্তার সর্বস্ব তো নয়। তার সত্তার সর্বস্ব হ'য়ে কেন তুমি আজো নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আছো এমন ক'রে? সব সময়ে সকল কিছু আড়াল ক'রে এমনভাবে আর থেকোনা গো—একটুখানি সরো। দয়া করো আমায়; নইলে তুমি যা ব'লে গেছো শুনবো কেমন ক'রে? সকল কিছু আড়াল ক'রে এমনভাবে যদি তুমি সর্বক্ষণ থাকো তো আমি দেখতে পাবো কী ক'রে স্বামীর মুখ, কী ক'রে চিনে নেবো তাঁকে? হারিয়ে ফেলবো যে কেবলই। আর কিছু না তুমি শুধু একটু ক'রে স'রে যেয়ো। তাহ'লেই আমি পারবো, যা ব'লে গেছো সব পারবো।

হঠাৎ স্বামীর হাতখানা নিয়ে সে নিজের বামবক্ষের সঙ্গে চেপে ধ'রে থাকে খানিকক্ষণ, বলে—তুমি কি কিছু বুঝতে পারছো?

অজ বলে—কই? না তো।

বিস্মিত বাসবী বলে—কিছুনা? ···এবার এক টানে ব্লাউসের টেপা বোতামগুলো খুলে ফেললো বাসবী তারপর তার নগ্ন বামবক্ষের সঙ্গে অজর হাতখানা চেপে ধ'রে রইলো কিছুক্ষণ, বললো—এবার···এবার কিছু বুঝতে পারলে?

আগের মতো ক'রেই অজ্ঞ বললো—কই, না তো। হৃৎস্পন্দন তো স্বাভাবিক। কেন, বলো তো? কিছু কষ্ট হচ্ছে?

স্বামীকে আশ্বস্ত করতে বাসবী ব'লে উঠলো—না, না, শরীর কি আমার এমনই খারাপ হ'য়ে পড়তে পারে ভাবো যে, বুকে কষ্ট হ'বে? ও কিছু না। ঘুমোও তুমি। সারাদিন খেটে-খুটে আসো তোমায় আর জাগিয়ে রাখবোনা। আমিও এবার ঘুমিয়ে পড়বো।

অন্ধকারের মধ্যেই বাসবী হাসে, আশ্বস্ত হ'য়ে ভাবে, ভাগ্যিস্ মানুষের বুকের গোপন কথাগুলো হাতে ছুঁয়ে অপর কেউ অনুভব করতে পারেনা—তাই বাঁচোয়া। নইলে বাসবী এখন কী করতো? ধরা প'ড়ে যেতোনা? সব কিছু জানলে অজ্ঞ মনে নিশ্চয়ই ব্যথা পেতো।—না, অজ্ঞের মনে কিছুতেই সে আর কষ্ট দিতে পারবেনা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞ ঘুমিয়ে পড়লো আবার। স্মৃতির জালে জড়িয়ে প'ড়ে বাসবী বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো বীতংস-বদ্ধ কুরঙ্গীর মতোই। তার এই ভাবনাবিলাসে সুখও যতো অসহ, দুঃখও ততোটাই দুঃসহ। পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো—গোছেরই যন্ত্রণা ওর। এড়াতে পারেনা ওদের—ওরা দল বেঁধেই আসে। এই সব হিংস্র-স্মৃতির শাশ্বত শিকার হ'য়ে আর কতোদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে বাসবী? তবু যতোক্ষণ ভাবে মসুরীর দিনগুলোর কথা, পটের ছবির মতো তাদের সেই 'মঞ্জুভিলা', তাদের সেই হাসি-খুশির তাসের আড্ডা, ক্যামেল্‌স্ ব্যাকের কাছেই সেই ছোট্টো 'কাফে', নিরুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে হিম-শীতের মধ্যে সেই রাত ক'রে বাড়ি ফেরা, কিংবা সারাটা দুপুর ক্যাম্পটির নির্জনতায় কাটানো···ততোক্ষণই মনে হয়, আর কিছুনা এগুলোই ভেবে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায় জীবন। কিন্তু শুধুই তো ফুল নয়, ফুলের সঙ্গে বিষাক্ত কাঁটাও রয়েছে যে—তার প্রহার সে সহ্য করবে কী ক'রে?

এভাবেই তার কেটে গেলো অনেকক্ষণ। লক্ষ্য করলো অজ্ঞের ঘুম বেশ গাঢ় হ'য়েছে এবার। নাক ডাকছে অজ্ঞের। একটা অদম্য ইচ্ছা যেন ঠেলা মেরে তুলে দিলো বাসবীকে। প্রথমটা সমস্ত শক্তি দিয়ে সে প্রতিরোধ করতে গেলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলোনা, উঠে বসলো বিছানায়। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে গেলো দোরের দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ শুনলো স্বামীর নাক-ডাকা তারপর গেলো পাশের ঘরে, তার লেখার টেবিলটার সামনেকার চেয়ারটায় বসলো, টেবিল-ল্যাম্প জ্বাললো, একটা ড্রয়ারের চাবি ঘোরালো, আস্তে আস্তে টেনে খুললো ড্রয়ারটা। ড্রয়ারের খুব গোপন স্থান থেকে বের ক'রে আনলো অনিরুদ্ধের শেষ

চিঠিটা। একটু অপেক্ষা করলো, অজের নাক তখনো তেমি ডাকছে তারপর পড়তে শুরু করলো চিঠিটা থেকে খানিকটা অংশ :

তোমার ভালোবাসার ক্ষমতা অপরিসীম বাসবী, তাই তুমি ভালোবেসেও এতোখানি সুতীব্র যন্ত্রণাভোগ করো। তোমার পাশে দাঁড়িয়েও আমাকে দেখতে হয়েছে তোমার এই প্রতিকারহীন যন্ত্রণাভোগ। যিনি তোমার দেহ-মনের এতো ঐশ্বর্য দিয়েছেন, এতো রূপ, এতো গুণ দিয়েছেন তাঁকে তো আমি নিত্যই ধন্যবাদ দিই কিন্তু তারও আগে তাঁকে অসংখ্য প্রণাম জানাই এইজন্য যে তিনি তোমাকে এমনই বিস্ময়কর এবং এমনই দুর্লভ এক প্রেমক্ষমতার অধিকারিণী করেছেন ব'লে। বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় মন আমার ভ'রে যায়। বিনিময়ে দেবার মতো কী আমার আছে। কী পেয়েছো তুমি আমার মধ্যে, কেন এতো ভালোবেসেছো আমায়? ভালোবেসে যদি এতো দুঃখ পাও তবে সমস্ত স্মৃতিসমেত আমাকেও তুমি বিসর্জন দিতে দ্বিধা কোরোনা। নাহ'লে বাঁচবে কী ক'রে? আর তুমি না বাঁচলে, আমি যাই কোথা? একবার বলো, প্রয়োজন হ'লে এবং নিতান্তই অসহনীয় হ'লে আমাকেও তুমি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করবেনা। দেখো, এতোদূরে ব'সেও আমি তোমার সে-আশ্বাস ঠিক শুনতে পাবো, একটু স্বস্তি পাবো, একটু শান্তি পাবো, একটু তৃপ্তি পাবো।

হেঁট হ'য়ে টেব্‌লের ওপর মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে চুপ ক'রে বাসবী প'ড়ে রইলো খানিক তারপর নিজ মনেই একবার ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠলো—পারবো। যা বলেছো সব পারবো।···শুনতে পেলে তুমি?

মাথা তুলে চিঠিটা আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে বাসবী আরো পড়তে শুরু করলো :

মসুরী আসার আগেও তো তুমি আমায় ভালোবাসতে বাসবী—তখন তো কেমন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পেরেছিলে—দেখে আমিও কতো স্বস্তি পেয়েছিলাম। ভাবতাম আমার সেই বাসবী আজ কতো বড়ো ঘরের গৃহকর্ত্রী হ'য়েছে, কতো সুন্দর হয়েছে, কতো সম্ভ্রান্ত হয়েছে—রানীর মতো যার গৌরব, ফুলের মতো যার সৌরভ, রত্নের মতো জলুস্—সেই তো তোমার যোগ্য ভূমিকা ছিলো বাসবী। আমার মতো হতভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেলাবার মতো পোড়াকপাল তো তোমার নয়। আবার সেই ভূমিকায় তুমি ফিরে যেতে পারোনা? কেন পারবেনা? নিশ্চয় পারবে। মসুরীর কয়েকটা মাসে আমি তোমার এমনই কি ক্ষতি ক'রে দিলাম? ভেবে ভেবে অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছে প্রাণ্। ওগো, একবার বলো ওতে কোনো ক্ষতি হয়নি তোমার। বলো, তুমি আবার ফিরে যেতে

পারবে তোমার আগের জীবনে, নিতে পারবে আগের ভূমিকা? তা যদি পারো তবেই আমার প্রেমের তুমি শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিলে। তোমাকে আবার আমি আগের সেই স্বাস্থ্যের মধ্যে, সেই দীপ্তির মধ্যে, সেই প্রফুল্লতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। ফিরে এসো বাসবী—তুমি সহজেই তা পারবে। আমায় আশ্বাস দাও লক্ষ্মীটি, বলো পারবে, তাহ'লে আমি এতোদূরে ব'সেও ঠিক শুনতে পাবো তোমার সে-আশ্বাস। কতো স্বস্তি পাবো, কতো শান্তি পাবো, কতো তৃপ্তি পাবো। শুধু একবার বলো পারবে।

হেঁট হ'য়ে আবার টেব্‌লের ওপর মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে চুপ ক'রে বাসবী প'ড়ে রইলো খানিক তারপর নিজের মনেই আবার ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠলো—পারবো। যা বলেছো সব পারবো। শুনতে পেলে তুমি?

তারপর মাথা তুলে ফের চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করলো :

যেদিন তুমি বললে—'আজকাল আমার কী-যে হয়েছে জানিনে, জেগে-জেগেও খালি চমকে উঠি ভয়ে। দিনরাত্রি শুধু তোমার কথাই ভাবি কিনা। চমকে ওঠার পরেই বুকের ভেতরটা বড়ো কাঁপতে থাকে ভয়ে। শেষটা আমি অপ্রকৃতিস্থ না হ'য়ে পড়ি এ-রকম ভয় পেতে পেতে।' সেদিন প্রকাশ্যে তোমার কথাগুলো হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু অন্তরে অন্তরে এতো বেশি বিচলিত হ'য়েছিলাম যে কী বলবো। আমারও বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো তখন, মনে পড়লেই কেঁপে ওঠে এখনো। তখন শতবার ধিক্কার দিয়েছিলাম নিজেকে, এখনো ধিক্কার দিই। তোমার একি করলাম, তোমার অবস্থা কেন এমন ক'রে তুললাম? কী আমার শাস্তি হওয়া উচিত? তোমার এতো ভালোবাসার বিনিময়ে একি প্রতিদান তোমায় দিলাম? আমার দিনগুলো রাতগুলো বিষিয়ে উঠেছিলো দুশ্চিন্তায় কিন্তু আজ আমি আশ্বস্ত হ'য়েছি। বেশ মনে পড়ে, অচেতন মলয়ার শিয়রে আমি যখন ব'সে আছি, মৃত্যুর সঙ্গে চিকিৎসার দ্বৈরথ চলেছে, দেখছি ব'সে ব'সে তখনো মলয়ার প্রাণের জন্য এতোটুকুও উদ্বেগ অনুভব করলামনা কেন কে জানে। মনের মধ্যে তখনো উদ্বেগ ছিলো শুধু তোমারই জন্য। এই ঘটনায় পাছে মনে তুমি খুব আঘাত পাও—সে-আঘাত তুমি কী ক'রে সামলাবে বাসবী—শুধু সেকথাই ভাবছিলাম। মলয়াকে প্রাণপণে সেবা করার সেই তো আমার প্রেরণা। কতো প্রার্থনা করেছি—আহা মলয়া বাঁচুক, আমার দুঃখ যদি তাতে চিরস্থায়ী হয় হোক, তুমি তো তবু অপবাদ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা পাবে। ঈশ্বর আমার সেকথা শুনেছেন। তোমার মন থেকে এবার সে-সব স্মৃতি ধুয়ে-মুছে যাক্‌। আবার তুমি সহজ হও। সেই ভয়টা আর যেন তোমায় না পীড়া দ্যায়। ও

তোমার মিথ্যে ভয়—তোমার-আমার মনের মাঝখানে কোনোদিন কোনো ব্যবধান গ'ড়ে উঠতে পারবেনা। বাইরের ব্যবধান একান্তই যদি গ'ড়ে ওঠে তো উঠুক, আমৃত্যু আমার অন্তরে তুমি শুধু চিরন্তন 'তুমি'-ই থাকবে আর তোমারও অন্তরে আমি তোমার সেই চিরন্তন 'তুমি' হ'য়েই থাকবো। ভয় কোরোনা; ভয়কে জয় করতে চেষ্টা করো। আজ নিজেও যখন আশ্বস্ত হয়েছি তোমাকেও আশ্বাস দিতে পারি যে, এ-ভয় তোমার অমূলক বাসবী। চিরন্তন প্রকৃতি তোমার মধ্যে সদাজাগ্রতা —তুমি অপ্রকৃতিস্থ হ'বে?—অসম্ভব। ও-ভয় তুমি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করো, সহজেই পারবে। তুমিও আশ্বাস দাও, নিশ্চয় পারবে। দেখো, আমি এতোদূরে ব'সেও তোমার সে-আশ্বাস ঠিক শুনতে পাবো, কতো স্বস্তি পাবো, কতো শান্তি পাবো, কতো তৃপ্তি পাবো।

আবার হেঁট হ'য়ে টেবিলের ওপর মাথা রাখে বাসবী। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ প'ড়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। তারপর নিজ মনেই আগের মতো ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠলো—পারবো। যা বলেছো সব পারবো। শুনতে পেলে তুমি?

তারপর ফের মাথা তুলে পড়তে লাগলো চিঠি :

কালে যদি তোমার মনে আমার প্রেমিক রূপটা অস্পষ্ট ও ঝাপসা হ'য়ে আসে তো আসুক—তা নিয়ে আমার তরফ থেকে কোনো কিছু নালিশ থাকবেনা। কারণ এটা যে আমি জানি, তোমার মন থেকে আমি মুছে যাবোনা একেবারে, কোনোদিনই মুছে যাবোনা। কারণ আমার স্বাক্ষর রেখে এসেছি তোমার মনের গহনতম গভীরে—সেটুকুর মধ্যেই আমার যা কিছু আশা, যা কিছু আশ্বাস, যা কিছু সান্ত্বনা। তোমার চিরকালের বন্ধু হিশেবেও অন্তত আমাকে তুমি মনে রাখবে, বিপদে-আপদে স্মরণ করবে, ডাক দেবে। কী বলো? দেবেনা?— এতে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। আমার কাছ থেকে ডাক পেলে তুমিও কি আসবেনা? নিশ্চয়ই আসবে। বলো? চুপ ক'রে আছো কেন?

এবারও হেঁট হ'য়ে টেব্‌লের ওপর মাথা রাখলো বাসবী। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ প'ড়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। তার পর নিজ মনেই কী-যেন বলতে গেলো কিন্তু কিছুই বলতে পারলোনা শুধু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ কান্নার পর যখন মাথা তুললো তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো— সুন্দর, তুমি এতো মধুর তবু কেন এতো নিষ্ঠুর? প্রিয়তম, তুমি এতো মহৎ তবু কেন এতো পাষাণ?

চোখ মুছে আরো পড়তে লাগলো বাসবী :

আমার জীবনে প্রেমের চেয়েও বড়ো যদি কিছু থাকে তা তোমার জন্যই

বুকের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রেখে গেলাম—এই সুদূর নির্জন থেকে চিরদিন তোমাকেই তা নিবেদন করবো।' যখন বুঝলাম কেবল আমারই জন্য বা আমারই অবিবেচনার ফলে তুমি একটা অশক্ত, পঙ্গু ও হতভাগ্য জীবের বিদ্বিষ্ট দৃষ্টির তলায় কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছোনা, যখন বুঝলাম তুমি তোমার নিজের বাড়িতে, নিজেরই সংসারের অবরোধে সদাসশঙ্ক মনে বন্দিনীর মতো দিন কাটাচ্ছো তখনই তোমার ওখান থেকে মলয়াকে নিয়ে আসা স্থির করলাম। যখন বুঝলাম যে, তুমি এমনই এক অসীম আধার যার মধ্যে হৃদয়ের যথাসর্বস্ব আহরণ ক'রে দিলেও ঠিক ভরিয়ে তোলা যায়না, যখন বুঝলাম আমার জীবনে তুমি এমনই এক অমর পিপাসা যা পৃথিবীর সব জল এক ক'রে একটি গণ্ডূষে পান ক'রে নিলেও মিটবার নয়, যখন বুঝলাম তুমি এমনই এক স্বর্গীয় খেলনা যাকে এই মাটির কলুষ-ক্লেদের মধ্যে, গ্লানি-পঙ্কের মধ্যে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে টেনে নামিয়ে আনা যায়না—তখন আমি নিজেই দূরে স'রে এলাম। প্রাণ থাকতে তোমার মহত্ত্বকে তো কোনোদিন খর্ব করতে পারিনা। এটাকে আমার ঔদাসীন্য ভেবে ভুল কোরোনা বাসবী, অনর্থক কষ্ট পেয়োনা। তাই আজ আমার জীবনের যতো ক্ষুধিত কান্না তোমার প্রতি স্তুতি-বন্দনা হ'য়েই উৎসারিত হচ্ছে, আমার জীবনের সকল প্রেমাবেগ অর্ঘ্য ক'রে পাঠিয়ে দিতে পারছি তোমার কাছে, তোমার জন্য এতোদিনের যে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা তা আজ তপস্যার মতো হয়েই প্রশান্তি আনতে পারছে মনে।

আমাদের প্রণয়-সম্পর্কের মধ্যে এ-জন্মের এই যে অসঙ্গতি, এই যে অভিশাপ, সমাজ-মানা মনের এই যে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার—ইহ জন্মের সঙ্গেই যেন এর শেষ হয়। পরজন্মে এই অভিশাপ থেকে তোমাকে যেন মুক্ত ক'রে নিতে পারি। তখনো এসো ঠিক এমনটি হ'য়ে—ঠিক এই রকম সুন্দর, এই রকম মধুর, এই রকম উচ্ছল, এই রকম প্রণয়-কাতর, এই রকম প্রণয়-গ্রহণক্ষম—আমার সর্বস্ব দিয়ে তখন তোমায় ভরিয়ে তুলবো, দেখো। এবারকার মতো তোমার কাছ থেকে তৃষ্ণা নিয়েই স'রে এলাম। প্রতীক্ষায় রইলাম পরের জন্মে আশ মিটবে।

দু'মাস হোক, ছ'মাস হোক, বছর খানেক হোক—ঠিক জানিনা কতোদিন পরে, শুধু এইটুকুই জানি যে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, তখন আমরা দু'জনেই বুঝতে পারবো যে দু'জনের প্রতি দু'জনের আকর্ষণ কমেনি একতিলও। ভেবোনা তুমি, চিন্তা রেখোনা মনে। স্বাস্থ্যের মধ্যে, সম্পদের মধ্যে, রূপের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠ হও। সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, প্রেমে থাকো, গৌরবে থাকো, সৌরভে থাকো—আশীর্বাদের কি শেষ আছে? তুমিও আমার

আশীর্বাদ করো তোমার মহত্ত্বের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে যেন বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, আশীর্বাদ-ই তো বললাম—তোমাকে সম্বোধন করতে গেলে আমার কাছে সকল সম্ভাষণের ভেদাভেদ একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়। তুমি দেবী হ'য়ে আমাকে আশীর্বাদ করো, প্রিয়া হ'য়ে আলিঙ্গন দাও, ভগিনীর মতো স্নিগ্ধ করো প্রাণ স্নেহ-প্রীতির রসনিষেকে। তাই তোমায় আমি প্রণাম করি, তাই তোমায় আমি আলিঙ্গন দিই, তাই তোমায় আমি আশীর্বাদ করি। আমার অন্তরের এই মিশ্রিত সম্বোধন তুমি গ্রহণ করো বাসবী।

পুনশ্চ॥ চিঠিটা পড়া হ'য়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলে দিও লক্ষ্মীটি। রেখে দিতে লোভ হ'লেও রেখোনা।

চিঠিটা এবার প্রাণপণে বুকের সঙ্গে চেপে ধ'রে বাসবী যেন অনেকটা মরীয়া হ'য়েই স্বগতভাবে বলে—না, না, পারবোনা ছিঁড়ে ফেলতে। এইখানে তোমার অবাধ্যতা ক'রে ফেললাম, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। এটাও যদি যায় তবে আমি কী নিয়ে থাকবো? এটাই আমার সব চেয়ে গোপন সম্পদ্, সবার চোখের আড়ালে একে রেখে দেবো কেবল আমার নিজেরই জন্য। ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এরই সঙ্গে যে আমি কথা কইবো যতোদিন না আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়। শুনতে পাচ্ছো তুমি?

চিঠির কাগজগুলো খামের মধ্যে ভ'রে ফেললো। এদিক-ওদিক চাইলো কয়েকবার। কান খাড়া ক'রে শুনলো অজের নাক-ডাকা থেমে গেছে। চিঠিটা সেখানেই ফেলে রেখে একবার শোবার ঘরে ঘুরে এলো, আলো জেলে দেখে এলো অজ তেমনিভাবেই ঘুমোচ্ছে। তারপর ড্রয়ারের সেই গুপ্ত জায়গায় চিঠিটা রেখে ড্রয়ারে চাবি দিলো নিঃশব্দেই। তারপর টেব্‌ল-ল্যাম্পটা নিবিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো অন্ধকারে সঞ্চারিণী ছায়ার মতো। উঠে বসলো খাটে—স্বামীর পাশে। অজের নাক তখন আবার ডাকতে শুরু করেছে। ঘুমন্ত অজ এবার পাশ ফিরলো আর তার একখানা হাত এসে পড়লো বাসবীর কোলের ওপর। স্বামীর হাতখানা কোলে ক'রেই জেগে ব'সে রইলো বাসবী অনেকক্ষণ।

মসুরী পাহাড়ে থাকতে একদা যে মহাজাগরণের লগ্ন এসেছিলো জীবনে তার পরও যে আরেক মহত্তর জাগরণ অপেক্ষা ক'রে ছিলো তার জন্য—বাসবী নিজেও কি তা জানতো? রাত্রির শেষ প্রহর যেন থমকে থেমে রইলো কিছুক্ষণ—জাগরণ-কুতূকিনী বাসবী সমানেই জেগে-জেগে দেখতে লাগলো—অজ ঘুমোচ্ছে, পৃথিবীর সবাই ঘুমোচ্ছে, পশু, পাখি, মানুষ। কেবল জেগে আছে পড়শীদের কয়েকটা

কুকুর, জেগে আছে রাত-চরা পাখিরা। আর জাগছে জানলার বাইরে আকাশে খুচরো কয়েকটা তারা। ওরাও তারই মতো রাত জাগছে। আজকের দিনে রাত জাগছে আর কে?—অনেক দূরে, নিদ্রা-ভীরু—ও দুটি চোখ কার? কে সে? অজ ঘুমের মধ্যেই ন'ড়ে ওঠে, জেগে পড়ে। বাসবী চমকে উঠে কোলের ওপর স্বামীর হাতখানাই চেপে ধরে।

—তুমি কি সেই থেকে জেগে আছো?···ঘুম-জড়ানো গলায় অজ বললো।

—হ্যাঁ গো। ঘুম হ'লোনা। দেখছিলাম তুমি কেমন ঘুমোচ্ছো। তুমি ঘুমোও, ব'সে-ব'সে আমি দেখি। বেশ লাগছে।

জীবনের সব চেয়ে গোপন এবং চরম মিথ্যাভাষণে বাসবী এই প্রথম এমন ক'রে লুটিয়ে পড়লো স্বামীর বুকে। চিরবাঞ্ছিত অপরূপ তনুদেহের সমস্ত শৃঙ্গার-সুরভি, সমস্ত মাদক উত্তাপ দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো স্বামীকে। অজের চোখ থেকে ঘুমের জড়তা নিমেষে চ'লে গেলো, সে বললো—হ্যাঁ গো, ঘুম আসছেনা?

—না।···বাসবী অজের প্রশস্ত রোমশ বুকে গাল, নাকের ডগা বা থুতনি ক্রমাগত ঘষতে লাগলো আর খুব অস্পষ্ট একরকম খুঁৎ খুঁৎ শব্দ করতে লাগলো।

স্ত্রীর মেদ-সুকোমল মসৃণ পিঠের ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে অজ বললো—এখন শরীর ভালো বোধ করছো তো?

—হ্যাঁ। কেন? কিছু তো হয়নি আমার। শরীর কি আমার কখনো খারাপ হয়?

—তা বটে, কিন্তু তোমার গাটা এক্ষুনি কেমন যেন একটু গরম-গরম ঠেকলো কিনা, তাই জিগেস করছি।

প্রস্ফুট লজ্জার স্বরে বাসবী ব'লে ওঠে—ধ্যেৎ, ও কিছু না।

মুখে সে ওকথা বললো বটে কিন্তু অজের ওপর ন্যস্ত বাসবীর আবক্ষ দেহ-ভারটুকু যেন একটা চাপা হাসির হিল্লোলে বার কয়েক কেঁপে উঠলো—এটুকু বেশ অনুভব করতে পারলো অজ, জিগেস করলো—হাসলে কেন?

বাসবী বললো—হাসবোনা? তুমি একটি আস্ত ইয়ে···

—অর্থাৎ বোকা, এই তো?···অজ নিজেও মনে-মনে কৌতুক অনুভব করলো। আষ্টে-পৃষ্ঠে বেষ্টন ক'রে ফণা তুলে রইলো নাগিনী। মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো বাসবী—হ্যাঁ, নইলে এ-সময়ে এ-ভাবে একথা জিগেস ক'রে বসতেনা।

ওর সুরভি-মদির নিশ্বাস এসে লাগছিলো অজের গালে যখন সে দু'হাতে ধ'রে

অজের মুখখানা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিলো—বোকা, বোকা, বোকাই তো।

অজ মনে-মনে আরো হাসলো। ভাবলো মাসের আজ কতো তারিখ? ফাল্গুন শেষ হ'তে চললো নাকি? একবার সবিস্ময়ে ভাবলো—আচ্ছা, ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে বাসবীর শরীরে তাপসঞ্চার হ'লে কেমন একরকম মৃগনাভির মতো সুরভি ওঠে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। সব মেয়েরই কি এমন হয়? কখ্খনোনা। তার সঙ্গে-সঙ্গে অমনি মনে প'ড়ে গেলো একবার এক জ্যোতিষী বলেছিলো তাকে—'আপনার স্ত্রী সর্বসুলক্ষণা। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক জীবন আপনার সুখেরই হ'বে। তবে আপনার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হ'তে হয়তো কিছু দেরি হ'তে পারে।' অজ এতোদিন সেই সুসময়েরই প্রতীক্ষায় ছিলো—তার সেই প্রতীক্ষা সার্থক হ'য়ে উঠছে আজ। বহুকাল বাদে অজ আবার এমন নিবিড় ক'রে টেনে নিলো স্ত্রীকে নিজের কাছে, বললো—কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে দেখো। নইলে তোমার সঙ্গে এখন থেকে আমিও এই রইলাম জেগে।

স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেই বাসবীর মনে হ'লো জানলার বাইরে দূর দিগন্তের কয়েকটা তারা চোখ মিট্‌ মিট্‌ ক'রে তাকে একবার বিদ্রূপ করলো। শেষরাত্রে উঁকি-মারা পাতলা একটু চাঁদের ফালি দূর আকাশের কোণে একটু যেন হাসলো। জানলার দিক্ থেকে সে সভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ে রইলো কেবল স্বামীর মুখের দিকেই। জীবনের সব চেয়ে মধুর আয়োজনে বাসবী এবার প্রাণপণে প্রস্তুত করতে থাকলো নিজেকে। প্রতীক্ষা ক'রে রইলো সেই আসন্ন মহালগ্নের—যখন তার এতোদিনকার সমস্ত ছলনা সত্য হ'য়ে উঠবে। নিরুদার আশীর্বাদে যেন সব সত্যই হ'য়ে ওঠে আজ। যেন সত্য হ'য়ে ওঠে।